ওয়ান ইলেভেনের পূর্বাপর দৃশ্যপট

আবুল আসাদ

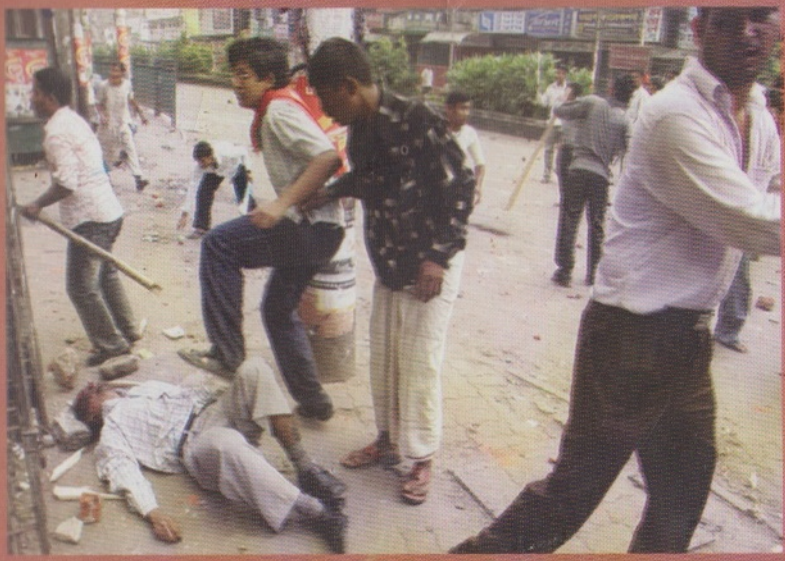

ওয়ান ইলেভেনের পূর্বাপর দৃশ্যপট

আবুল আসাদ

লেখাপ্রকাশ

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৯
প্রথম প্রকাশ
ঢাকা বইমেলা ২০০৮
সত্ত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
ফেরদৌস খান ০১৭১২ ৫৬১৯১৯
মূল্য : ১৮০ টাকা $ 10
প্রকাশক
বিপ্লব ফারুক

লেখাপ্রকাশ
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুঠোফোন
০১৭১৮ ১১৭৭৫৫/০১৭১৫ ৪৫৭২৩৪
শব্দপ্রয়োগ
মাইক্রোসফট কম্পিউটার
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০
বাঁধাই
নজরুল এন্ড ব্রাদার্স
ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

One Elevener Purbapor Drishyapot By Abul Asad
Published By Biplob Faruque, Lekhaprokash
33 North Brook Hall Road Banglabazar Dhaka 1100
Printed By : Moumita Printers
25 Pyaridas Road Dhaka 1100

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উ/ ৎ/ স/ র্গ

ওয়ান-ইলেভেনের
ভিকটিম
রাজনীতি ও রাজনীতিকদের
উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ/ চি/ প/ ত্র

ক্রিমিনালদের স্বাধীনতা বিপদজনক ৯
বিশ-বাইশে আগস্টের পটভূমি ১৪
সাপ মারতে হবে লাঠি না ভেঙেই ১৮
এক আটাশ এবং তার কাহিনী ২৪
রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার ৩৬
রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল ৪২
বিদ্যুৎ খাতে কালো হাত ৪৯
এরদোগানের তুরস্ক ৫৫
দুর্নীতি দমনের ফর্মুলা তালাশ ৬২
চালুনি সূচেরে বলে ৬৮
বাংলাদেশ-ভারত রেল চলাচল ৭৪
রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশন ৮০
দক্ষিণ এশিয়ার মনিবত্ব ৮৬
হিরন্ময়-সুমন সিএএন'দের আঁতাত ৯১
ওরা বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দেখতে চায় ১০৬
ডায়ালগ বিষয়ক মক্কা সম্মেলন : একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ১১২
মাদ্রিদ সম্মেলন : নতুন দিগন্তের দুয়ার উন্মোচন ১২৩
ওয়ান-ইলেভেনের পূর্বাপর দৃশ্যপট ১৩৭

www.pathagar.com

ক্রিমিনালদের স্বাধীনতা বিপজ্জনক

আমাদের সময়ের সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে তার পত্রিকায় ভালো কভারেজ দেয়ার সমালোচনার জবাবে যা বলেছেন, তার সার কথা হলো, নিউজ মেকার যারা তারা কভারেজ পাবেনই। তার ভালোটাও নিউজ, খারাপটাও নিউজ। নাইমুল ইসলাম সাংবাদিক নীতিবোধের কথা বলেছেন। এ নীতিবোধের সবটাই আমরা জানি, কিন্তু মানি খুব কম। নীতিবোধের মাথা খেয়ে অনেকে দুর্নীতিও করে। নিউজ মেকারদের আমরা বিকৃতভাবে উপস্থিত করি। তাদের যেটা নিউজ নয়, তাকে নিউজ বানিয়ে আমরা তাদের ছোট করতে, অপমান করতে চেষ্টা করি, আবার তাদের যেটা নিউজ তাকে আমরা হাইড করি, গোপন করি। আবেদ খান দেশের প্রবীণ সাংবাদিকদের একজন। তিনি এখন সমকালের সম্পাদক। সাংবাদিকতার বহুপথ পাড়ি দিয়ে এই পর্যায়ে এসেছেন। সাংবাদিক নীতিমালা তিনিই সকলকে শেখাবেন, তাকে শেখাবার দরকার নেই। দরকার নেই একথা কিন্তু অনেক সময় মনে হয় না এই প্রবীণের প্রবণতা দেখলে। বরং মনে হয় তিনি নিউজ মেকারদের নিউজ করেন না, তিনি নিজে নিউজ 'মেক' করে নিউজমেকারদের বিকৃত করেন। খুব তাজা একটা দৃষ্টান্ত। তিন দিনি আগে তার পত্রিকায় ৫ কলামব্যাপী প্রধান শিরোনাম ছিল ঃ 'নিজামী মুজাহিদ পুরস্কৃত।' এই শিরোনামের 'নিজামী' হলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর এবং জোট সরকারের সাবেক কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী এবং শিরোনামের 'মুজাহিদ' জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল ও জোট সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। শিরোনামে কথিত 'পুরস্কৃত' হবার ঘটানটি হলো, নিজামী ও মুজাহিদ সাহেব ঢাকার উত্তরায় ৫ কাঠার দুইটি প্লট কিনেছেন। আরও অনেকে কিনেছেন, তাদের দু'জন হলেন নিজামী ও মুজাহিদ সাহেব। তারা দীর্ঘদিন ঢাকায় বাস করছেন। কোন জমি, বাড়ি তাদের ঢাকায় নেই। হাজারো মানুষ যেভাবে ঢাকায় সরকারি প্লট কিনেছেন, সেভাবেই যথাযথ আইন ও বিধি-নিয়মের মাধ্যমে তারা প্লট কিনেছেন। একজন খান তার পত্রিকার যে স্থানে 'নিজামী-মুজাহিদ'-এর খবর ছেপেছেন, তার মাথার উপরে 'একটা বাড়ির জন্ম কথা' ছবিসহ ছেপেছেন। বাড়িটা বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের। ধানমন্ডির বাড়ির এই জমিটা শেখ মুজিব একজন রাজনীতিক হিসাবে পেয়েছিলেন পাকিস্তান আমলে। উক্ত খান সাহেব জানেন, শুধু শেখ মুজিব নন পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, আমলা, সিনিয়র সাংবাদিক (যাদের মধ্যে তিনি খানও আছেন) সরকারি প্লট কিনেছেন ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, বারিধারায়। অনেকে দশ কাঠা এবং তারও বেশি বিঘা পরিমাণের জমি পেয়েছেন ধানমন্ডি-গুলশানে। সেই হিসাবে সর্বনিম্ন পরিমাণের ১টি করে প্লট উপযুক্ত দামে কিনেছেন নিজামী ও মুজাহিদ সাহেব। তাহলে এই খবর আবেদ খানের পত্রিকায় ৫ কলামব্যাপী প্রধান শিরোনাম হলো কি করে? তাদের প্লট কেনার অন্য একটা বিষয় এ ধরনের শিরোনাম হতে পারতো। সেটা হলো, ৫ কাঠা পরিমাণের সরকারি প্লটের দাম দেবার মত টাকা নিজামী ও মুজাহিদ সাহেবের না

www.pathagar.com

থাকায় আংশিক মালিকানা ছাড় দেয়ার মত ক্ষতি স্বীকার করে ডেভেলপারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে জমির দাম পরিশোধ করেছেন। ৫ বছর ক্যাবিনেট মন্ত্রী থাকার পর ৫ কাঠার একটা প্লট তাদেরকে কিনতে হয়েছে ঋণ করে, এটা শুধু আমাদের দেশ নয়, বহু দেশের জন্যই খুব বড় খবর। উক্ত খান যখন নিজামী ও মুজাহিদ সাহেবদের প্লট কেনাকে শিরোনামে এনেছেন, তখন ৫ বছর ক্যাবিনেট মন্ত্রী থাকার পর ঋণ করে ৫ কাঠার প্লট কেনার অবাক হওয়ার মত বিষয়টিই শিরোনামে আসা উচিত ছিল। কিন্তু আবেদ খান সৎ-রাজনীতি বা সৎ-জীবনের এই দৃষ্টান্তকে বরং সাবোটাজ করে নিজামী ও মুজাহিদ সাহেবের প্লট কেনাকে তাদের জন্য সরকারের 'পুরস্কার' আখ্যা দিয়ে তাদেরকে উল্টো অভিযুক্তই করেছেন। একেই বলে 'সতীনের ভাতের থালায় বিষ্ঠা খাওয়া।'

এই খানরা সাংবাদিকতাকে অন্ধ বিদ্বেষের এই পর্যায়েই নামিয়ে এনেছেন। তারা ইনফরমেশন মিডিয়াকে 'ডিসইনফরমেশন মিডিয়া'তে পরিণত করছেন। এখন দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। তারাও এ অভিযানকে সমর্থন করছেন, অন্তত তাদের বহিরাঙ্গ দেখে তাই মনে হয়। তাহলে তো নিজামী ও মুজাহিদ সাহেবদেরকে উক্ত খানরা ধন্যবাদ ও প্রশংসা করাই উচিত ছিল। কারণ তারা ছিলেন দুর্নীতির সয়লাবে দুর্নীতির স্পর্শহীন দুই উন্নতশীর দ্বীপের মতো। দুর্নীতিমুক্ত থেকে মন্ত্রণালয় যে চালানো যায়, দেশ চালানো যায়, তার একটা মডেল তারা সেট করেছেন। তাদের মন্ত্রণালয়ের আমলারা এটা দেখেছেন। তাদের মধ্যে ইতিবাচক প্রবণতা কিছুটা হলেও উৎসাহিত হয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে। এই প্রবণতা যদি সবার মধ্যে সার্বিক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে দুর্নীতি দেশে থাকতো না। একটা দৃষ্টান্ত হাজারো উপদেশের চেয়ে অধিক কার্যকর। এই দৃষ্টান্তেরই অভাব আজ দেশে। শুধু আমাদের দেশে কেন, গোটা দুনিয়ায় এই অভাবটা আজ সার্বিক হয়ে উঠছে। ওয়াশিংটন কি এ থেকে মুক্ত? মুক্ত নয়। লন্ডন-প্যারিস কি মুক্ত? মুক্ত নয়। মুক্ত হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের রাজনীতিকে যারা প্রমোট করেছে, তাকে নির্বাচনকালে যারা অর্থ সাহায্য করেছে, তারা ইরাকে অর্থকরী ঠিকাদারী পেল কি করে একেবারেই অনৈতিকভাবে? আমাদের দেশে আজ যারা দুর্নীতির অভিযোগে জেলে গেছেন, তাদের চেয়ে বুশ কি তাহলে নৈতিকতার বিচারে খুব বেশি ভাল? রাজনীতিক বা শক্তিমানদের এই ঘুষ, চাঁদা দেয়া, চাঁদা নেয়া, লালসা-লিপ্সাই আজ দুনিয়াব্যাপী দৃশ্যমান। এটা আজ মানব জাতির একটা বড় ক্রাইসিস। জাপানের দার্শনিক দাইসাকু ইকেদা বলছেন, "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের যতবেশি উন্নতি হয়েছে একালে, ইতিহাসে তার নজির নেই। প্রযুক্তি বিজ্ঞান বর্তমান যুগে অসামান্য দ্রুততার সাথে অগ্রসর হয়েছে, অথচ মানুষের নৈতিক বোধের উন্নতি হয়নি, বরং অবনতি ঘটেছে। তাতে যে অসম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের বিপদ বাড়িয়েছে।" ইকেদা কথিত এই 'বিপদ'টা কিসের বিপদ? এই বিপদটা হলো, ভালোর অভাব সম্পর্কে সার্বিক হতাশার বিপদ, অনিয়ন্ত্রিত জীবন অনিয়ন্ত্রিত শক্তির বিপদ, সমাজ-সভ্যতা এক অনিয়ন্ত্রিত লোভ-লালসার শিকার হওয়ার বিপদ। এই বিপদের স্বরূপ সম্পর্কে আর্নল্ড টয়েনবী বলছেন, "আধুনিক মানুষ, প্রাচীন মানুষের মতই, নিজেদের পরিবেশের নিজেরা নিয়ন্ত্রক নয়। নিয়ন্ত্রণে তাদের এই ব্যর্থতার কারণ মানুষ তার নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। আত্মনিয়ন্ত্রণই একমাত্র অস্ত্র যা দিয়ে আত্ম-নৈরাজ্য এড়ানো যায়।" এটা সত্য যে, বুশের

www.pathagar.com

আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাবই তার শক্তিকে অনিয়ন্ত্রিত করেছে। যার ফলে তার আপন লোকরা ইরাকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ঠিকাদারী পেয়েছে এবং ইরাক-আফগানিস্তান ধ্বংস হচ্ছে। আবার এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণেই আমাদের দেশে দুর্নীতির অভিযোগে কিছু রাজনীতিক জেলে গেছেন। আর্নল্ড টয়েনবী মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণকে 'মানব-পরিচয়' বা 'মানব-মর্যাদা'র সমার্থক হিসাবে দেখেছেন। তার মতে 'মানব-মর্যাদা' বা 'মানব-মিশন'কে ধারণ করার মাধ্যমেই শুধু মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণে সফল হতে পারে এবং এইভাবে নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটালেই মানুষ লোভী ও আগ্রাসী হওয়ার বদলে বালবাসা ও সৎ ভাবাবেগ দ্বারা উজ্জীবিত হতে পারে। আর্নল্ড টয়েনবী বলছেন, "মানুষরা আজ যে বিষয়ে দক্ষ, সেই টেকনোলজি দিয়ে মানব-মর্যাদা অর্জন করা যাবে না, নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমেই শুধু মানব-মর্যাদা অর্জন সম্ভব এবং মানুষ নৈতিকতা অর্জনে কতটা সফল হলো তার পরিমাপক হলো মানুষ কতটা লোভ ও আগ্রাসী আচরণ পরিহার করে ভালবাসা ও সহমর্মিতার নীতি গ্রহণ করলো। উক্ত খানদের মত সাংবাদিকদের কাছে মানব-মর্যাদার কোন মূল্য নেই, নেই নীতি-নৈতিকতার বালাই, যা তাদের আগ্রাসী করে তুলেছে। এ জন্যই দু'জন মন্ত্রীর বৈধভাবে উপযুক্ত টাকা দিয়ে কেনা ৫ কাঠার প্লট আবেদ খানের পত্রিকায় ৫ কলাম শিরোনাম পেয়েছে। অথচ এই দু'জন সিটিং মন্ত্রীকে আর্থিক দৈন্যতার কারণে প্লটের আংশিক মালিকানা ডেভলপারদের দিয়ে প্লট কেনার জন্য তাদের অর্থ যোগাড় করতে হয়। আজকের দুর্নীতি দমন অভিযানের প্রেক্ষাপটে এই খবরটাই শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে আবেদ খানরা উল্টো দু'জন মন্ত্রীকেই অভিযুক্ত করেছেন। এক শ্রেণীর সাংবাদিকরা এভাবেই আমাদের সাংবাদিকতাকে দায়িত্বহীনতা ও অবিশ্বস্ততার প্রায় শেষ তলে এনে ঠেকিয়েছেন। সংবাদ এখন মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, দিশেহারা করছে, অসুস্থ করছে।সত্য কি তা জানাকে তাদের জন্য অসম্ভব করে তুলছে। সমাজের একটা বিকৃত ছবিই ফুটে উঠছে সংবাদপত্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান এই অবস্থারই প্রতিধ্বনি করে লিকেছেন, "সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সমাজের ভালো-মন্দ, সঙ্কট, সম্ভাবনা, ব্যত্যয়-ব্যঞ্জনা– এসব কিছুই সংবাদপত্রের পাতায় আমরা দেখতে চাই। কিন্তু সমাজের এ দর্পণে আমাদের সমাজ-চিত্র কতোটুকু প্রতিফলিত হয়? অনেকেই তাই বলে থাকেন, আমাদের এ দর্পণটি ভাঙ্গা বিবর্ণ। ভাঙ্গা আয়নায় তাই সমাজের সব প্রতিচ্ছবি ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেখায়। ...কেন পাঠক একাধিক পত্রিকা পড়ে তথ্যের গভীরতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তথ্যের বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে? একটি প্রসঙ্গ একটি সংবাদপত্রে পরিবেশনের ধরন-ধারণ কিংবা আঙ্গিক ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু পৃথক দু'টি পত্রিকা পড়ে পাঠক এতোই বিভ্রান্ত হচ্ছেন যে, তিনি পত্রিকা পাঠ থেকে বিরত থাকতে পারলে নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে করতেন। সংবাদের তথ্য বিভ্রান্তি শুধু সংখ্যাগত কিংবা পরিমাণগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকছে না। লেখকের (সাংবাদিকের) ইচ্ছা ও আচরণের খেয়ার-খুশীতে পর্যবসিত হচ্ছে। ...সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠতার ওপরই বিদ্যমান। এক্ষেত্রে সত্য সব সময় সত্য, যার কোন আংশিক বাস্তবতা নেই, অর্ধ সত্য বলে কিছু নেই। অর্ধ সত্য মিথ্যারই নামান্তর' এবং তা ভয়ঙ্কর।" (লেখকের 'দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা : কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মাত্রা' শীর্ষক

www.pathagar.com

প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এক শ্রেণীর সাংবাদিকের এই মিথ্যাচার ও ভয়ঙ্কর সাংবাদিকতা সম্পর্কে প্রবীণ সাংবাদিক সিরাজুর রহমান তার "সংবাদপত্রে নৈরাজ্য অবসানের জন্য তদন্ত কমিশন প্রয়োজন" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, বিগত কিছু বছরে সাংবাদিকতার নামে বাংলাদেশে যা ঘটছে সেটা রীতিমত এক কেলেঙ্কারী। তাতে দেশের জনমত প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হচ্ছে, সমাজ জীবন তাতে বিষাক্ত হয়ে পড়ছে।" সংবাদপত্র যেখানে সমাজের দর্পণ, সমাজকে সুস্থ রাখার মাধ্যম সেখানে আমাদের একশ্রেণীর সংবাদপত্র জনগণকে প্রতারিত করছে, বিভ্রান্ত করছে এবং এইভাবে সমাজ জীবনকে করছে বিষাক্ত। আশির দশকের শেষ দিক থেকে যখন নতুন কিছু সংবাদপত্র ব্যবসায়-পণ্য হিসাবে মাঠে এলো, তখন থেকেই এই প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্র ব্যবসায়-পণ্য হওয়ার পর 'মুনাফা-প্রবণতা' এর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশাল পুঁজি প্রবেশ করেছে সংবাদপত্রে। তার সাথে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন স্বার্থের। এই স্বার্থই অস্ত্র হিসাবে সংবাদপত্রকে ভাঙা দর্পণে পরিণত করেছে, সমাজকে করে তুলেছে বিষাক্ত। এখন সংবাদপত্র কোন আদর্শ নয়, মিশন নয়, এক শ্রেনীর সংবাদপত্র এখন 'মুনাফা' নামক স্বার্থের হাতে পণবন্দী এবং বিভিন্ন স্বার্থ শিকারী মহলের হাতের পুতুল। প্রবীণ সাংবাদিক সিরাজুর রহমান সংবাদপত্রে নৈরাজ্য অবসানের জন্যে তদন্ত কমিশন দাবি করেছেন। এটা ঠিক সময়ের সঙ্গত দাবি। এক শ্রেণীর পত্রিকার এক শ্রেণীর সাবাদিক প্রতিযোগিতা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যাচাইহীন খবরের মাধ্যমে দেশকে পৃথিবীর শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বানিয়েছে, যেমন সমকাল দুর্নীতিমুক্ত একটা ঘটনাকে পাঁচ কলামে বিকৃত করে ছাপিয়ে নিজামী ও মুজাহিদ সাহেবকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করেছে। এ থেকে একটা কথা পরিষ্কার বলা যায়, এক শ্রেণীর পত্রিকার অভ্যন্তরে টাকার খেলা এবং স্বার্থের কালো হাত দেশের বর্তমান দুর্গত দুরবস্থার জন্যে বহুলাংশে দায়ী। যায় যায় দিনের একজন পাঠক যায় যায় দিনে লিখেছিলেন, "বাংলাদেশ আর সাধু মানুষের দেশ নয়। এখানে কোন দুর্নীতি নেই এমন দাবি কেউ করবে না। একই সঙ্গে বাংলাদেশই পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ এটা মেনে নেয়া যায় না। ...টিআইবি'র কর্মপদ্ধতিতে কিছুটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। কারণ, যে সংবাদপত্রের রিপোর্টিং এর ওপর ভিত্তি কের তারা সূচক নির্ধারণ করে, সেই সবাদপত্র নিজে কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত তা টিআইবি জানে না। জানার প্রয়োজনও বোধ করে না। পৃথিবীর তাবৎ পেশার জবাবদিহিতা থাকলেও সাংবাদিকদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। স্বাধীন সংবাদপত্র এই অধিকারকে পুঁজি করে নব্বই দশকে বাংলাদেশে ফুলে ফেঁপে উঠা সংবাদপত্র শিল্প এখন প্রায়ই তার অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকরা পরিণত হচ্ছে মহীরূহে, ফ্রাংকেনস্টাইনে। তারা সব বোঝেন, সব জানেন। বাকি সবাই বেকুব, কেউ কিছু জানে না, বোঝে না। এমনকি দাম্ভিক আচরণ সাংবাদিক ও সম্পাদকদের মাঝে ক্রমেই স্থায়ী হচ্ছে। সাইফুর রহমান-এর সংবাদপত্র বিষয়ক উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'টিআইবি ছয়টি আন্তর্জাতিক রিপোর্টের সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই দুর্নীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা সূচক তৈরি করেছে। এই রিপোর্টগুলো তৈরি করেছে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, ইকনোমিষ্ট পত্রিকা এবং ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম'এর মত নামকরা সব প্রতিষ্ঠান। সেখানে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের কোন উল্লেখ নেই। এ রকম

www.pathagar.com

চাতুর্যপূর্ণভাবে নিজেদের দোষ সাফাই শুধু সম্পাদক ও সাংবাদিকদের দ্বারাই সম্ভব। এরা একাই জ্ঞানী ও জ্ঞানপাপী। টিআইবি'র উচিত কোন দেশ সর্বাধক দুর্নীতিগ্রস্ত তা নির্ধারণের পাশাপাশি কোন দেশের সংবাদপত্র সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত তাও নির্ধারণ করা এবং সমস্ত পৃথিবীব্যাপী তা প্রকাশ করা।" (৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৫)।

যায়যায়দিনের পাঠকের এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত। কিছু ফুলে ফেঁপে ওঠা সংবাদপত্র শিল্প এখন তার অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কিছু সম্পাদক ফ্রাংকেনস্টাইল সেজেছেন, তার এ কথায় এক নগ্ন সত্যতা আছে। একশ্রেণীর পত্রিকা সাংবাদিক স্বাধীনতাকে তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করে যথেচ্ছা ব্যবহার করছে। খবর ছাপিয়ে কারও চরিত্রহননকে তারা তাদের অধিকার মনে করে। প্রতিবাদ ছাপা প্রয়োজন মনে করে না। ছাপলেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এমন জায়গায় ছাপে এবং এমন আকারে ছাপে, যা কারুনের কৃপণতাকেও হার মানায়। দেশের সব খারাপ খবরে তারা দারুণ উৎসাহী, দেশকে অকার্যকর দেখানোতো তাদের আনন্দ। এসব কিছুর পেছনে, আমি আগেই বলেছি, থাকতে পারে কোন কালো হাতের কালো স্বার্থ। এই কালোকে দিনের আলোতে আনা প্রয়োজন। সবল সিদ্ধান্তই এটা পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, কোন দুর্বল তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না এবং ক্রিমিনালরা স্বাধীনতা পেলে তারা অন্যের স্বাধীনতা হরণ করে। সেই অন্যে'টা দেশও হতে পারে।

অপরাধের স্বাধীনতা নয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিন্তু প্রয়োজন। এ স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে খোদ সংবাদপত্রকেই উদ্যোগী হতে হবে। আজকের প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই এই কথা বলে যে, সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা সেলফ কনট্রোলে এগিয়ে না এলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে এক সময় নৈরাজ্যের প্রতিষেধকের রূপ নিয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থ কিংবা যে নামেই হোক বাইরের কনট্রোল তাদের ওপর আসতে পারে। বাইরের এই কনট্রোলের যৌক্তিকতা ও ভাল দিক একটা সীমিত পর্যায়ের জন্য অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু সংবাদপত্রের জন্য এটা মৃত্যু স্বরূপ। অনেকের মতো ভারতের মহাত্মা গান্ধীও তাই সাংবাদিকদের সেলফ কনট্রোলের ওপর জোর দিয়েছেন এবং একেই কল্যাণকর বলেছেন। তিনি বলেন, "The sole aim of Journalism should be service. The Press is a great power, but just as an unchained torrent submerges the whole countryside and devastates crops, even so an uncontrolled pen serves but to destroy...if the control from without, it proves more poisonous than want of control. it can be profitable only when exercised from with in." মিঃ গান্ধীর এই উক্তিকে আমরা এক বাক্যে এইভাবে বলতে পারি, সাংবাদিকদের অপরিমেয় শক্তির আধার তাদের অনিয়ন্ত্রিত কলম যদি ধ্বংসের সয়লাব নিয়ে আসে, তাহলে বাইরের নিয়ন্ত্রণ আসবেই, যা হবে সাংবাদিক-স্বাধীনতার জন্য এক বিষাক্ত মৃত্যু। সাংবাদিকদের আত্মনিয়ন্ত্রণই এর একমাত্র বিকল্প। মিঃ গান্ধীর এই কথা আবেদ খানরা খুব ভালো করে জানেন, কিন্তু মানেন না।

১৮ আগষ্ট, ২০০৮

www.pathagar.com

ঘরের শত্রু বিভীষণের কারণেই সোনার লংকা পুড়ে ছাই হয়েছিল। আমাদের দেশেও বিভীষনরা খুবই সক্রিয়। বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র কি না এই প্রশ্ন এই বিভীষণরা তুলেছেন। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তারা বলতে চেয়েছেন বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র। অথচ ব্যর্থ রাষ্ট্রের যে সব সূচক নিরুপিত হয়েছে (যেমন জনসংখ্যার আধিক্য, উদ্বাস্তু ও আশ্রয়হীন জনসংখ্যার আধিক্য, গোষ্ঠীগত শ্রেণীর দুর্দশা, জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগ, অসম উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবনতি, রাষ্ট্রের অবৈধ কাজে সম্পৃক্ততা), তার যে কোন একটির দিক থেকেও বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্রের পর্যায়ে পড়ে না। বাংলাদেশে জনসংখ্যা অধিক বটে, কিন্তু এটা কোন সমস্যা নয়। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বহু দেশের তুলনায় ভাল। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার বড় বড় দেশের চেয়ে ভাল। বাংলাদেশে উদ্বাস্তু নেই, গোষ্ঠীগত কোন দুর্দশা নেই, মানুষের দেশত্যাগ নেই, অসম উন্নয়ন নেই এবং অর্থনৈতিক অবনতিও নেই। এসব নেতিবাচক সূচকের অধিকাংশই ভারতে বর্তমান। কিন্তু কেউ ভারতকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বলছে না এবং ভারতের মিডিয়াও এটা বলেনি, বলছে না। কিন্তু আমাদের বিভীষণরা এটা বলে।

ঠিক এভাবেই এই বিভীষণরা বাংলাদেশকে জঙ্গীরাষ্ট্র ও মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য গলদঘর্ম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার সময় থেকে বিভীষণী এই কাণ্ড পালে হাওয়া পায়। সরকারিভাবে বই ছাপিয়ে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশ সফররত ক্লিনটনকে জানান বাংলাদেশ আফগানিস্তান হওয়ার সম্ভাবনার কথা। তারপর বিভীষণরা গত ৭ বছর ধরে এই অপপ্রচার চালাচ্ছে। বর্তমান অবস্থায় সর্বশেষ এই অপপ্রচারে যোগ দিয়েছেন জনকণ্ঠের হারুন অর রশিদ। তিনি নাইন ইলেভেনের স্মরণে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের কথা বলতে গিয়ে নিশ্চিতই ধরে নিয়েছেন মৌলবাদী জঙ্গীরা টুইনটাওয়ার ধ্বংস করেছে। অথচ তার লিখাতেও অভিযুক্ত মুসলিম জংগীদের অভিযুক্ত লিখেছেন,প্রমাণিত অপরাধী লিখতে পারেননি। লিখতে পারবেন না। কারণ, অধিকাংশ মার্কিনীও আজ একথা বিশ্বাস করে না। গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিভেন্স জোন্সের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ৭৫ জন বুদ্ধিজীবীর একটি দল নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এ সম্পর্কে বলেছেন, 'তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন দখলদারিত্বকে যৌক্তিক প্রমাণ করতেই হোয়াইট হাউজের রণোন্মাদকরা এ জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে।' এরা তাদের অনুসন্ধান থেকে আরও জানায়, টুইনটাওয়ার ধ্বসিয়ে দিতে এ বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে তার নিশ্চিত প্রমাণ তারা টাওয়ারে ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে পেয়েছেন। এর চেয়েও বড় কথা নাইন ইলেভেনের অভিযুক্তের তালিকা থেকে লাদেনকে বাদ দেয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এটর্নি কোন রাখঢাক না করে সরাসরি বলেছেন, যার বিরুদ্ধে সরাসরি কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, তাকে আসামী করে বিচার চালানো সম্ভব নয়। এ খবর জনকণ্ঠেই ৩০ আগস্ট ২০০৬ সালে ছাপা হয়েছে। অন্যদিকে তার সাথে আরও ১৯ জন যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল ঘটনার সাথে তাদেরও সম্পৃক্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এসব কথা

www.pathagar.com

জনকণ্ঠের অজানা নয়, তবু তারা পুরানো গীতই গেয়েছেন। তা গাইতে থাকুন আপত্তি নেই। কিন্তু জনকণ্ঠ যখন ঐ জঙ্গীদের বাংলাদেশে দেখতে পান, আপত্তি উঠে তখনই। বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা ও জঙ্গীপনার ঘটনা অনেক ঘটেছে। এর মধ্যে জেএমবি'র জঙ্গী তৎপরতা সবচেয়ে বড়। জোট সরকারের আমলে এই জঙ্গীবাদীদের সফলভাবে দমন করা হয়েছে। তাদের প্রায় সব নেতাকেই গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। তাদের মধ্যে ৬ জনের ইতোমধ্যে ফাঁসিও হয়েছে। অন্যান্য সন্ত্রাসী তৎপরতারও অনুসন্ধান ও বিচার চলছে। কিন্তু এই জঙ্গী বা সন্ত্রাসীদের সাথে লাদেন-জঙ্গীদের কোন সম্পর্ক আছে একথা এযাবত কোনভাবেই প্রমাণ হয়নি। কিন্তু এরপরও আমাদের বিভীষণরা দেশের সন্ত্রাস ও জঙ্গীপনাকে বাইরের সাথে যুক্ত করে দেশে বাইরের হস্তক্ষেপকে ডেকে আনতে চায়।

এই বিভীষণী চরিত্রই হলো একশ্রেণীর সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সুশীলদের। বাইরের বিশেষজ্ঞেরাও বলছেন, বাংলাদেশের সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে বাইরের কোন যোগসূত্র পাওয়া যায়নি। ২১ আগস্ট শাহজালালের (রহঃ) মাজার, জেএমবি'র সিরিজ বোমা ইত্যাদির মত বড় ঘটনার পর্যবেক্ষন কিংবা তদন্ত কাজে সহায়তার জন্য এপবিআই, ইন্টারপোল ইত্যাদির মত বাইরের বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এসেছে। তারাও বাংলাদেশের সন্ত্রাসের সাথে বাইরের কোন যোগসূত্র পায়নি। ২০০৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন বাংলাদেশে জঙ্গী তৎপরতা, জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা, বাংলাদেশের রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সরেজমিনে রিপোর্ট করেছিল, তাতেও বাংলাদেশের সন্ত্রাসকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং জামায়াতকে গণতান্ত্রিক সরকারের অংশীদার দুর্নীতিমুক্ত দল হিসাবে দেখানো হয়েছে। ঐ রিপোর্টে হেরাল্ড ট্রিবিউন বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সন্ত্রাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছে, "It is all too easy, however, to overemphasize the dangers of political islam here. As in India, here is little history of islamic violence, more of leftist violence and general political thuggery. The bedrock identity of Bangladesh is being Bengali first, Muslim second. Surrounded by non-Muslim states and far from the middle East, Bangladesh is closer in spirit to south-east Asia that to Pakistan or Arab world. Instances of intolerance are the exception, not the rule and have been widely condemned by the news media." অর্থাৎ বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইসলাম সম্পর্কে অতিরঞ্জন খুবই সস্তা একটা শ্লোগান। যেমন ভারতে ইসলামিক সন্ত্রাসের তেমন একটা ইতিহাস নেই, বরং সেখানে বেশি পরিমাণে আছে বামপন্থী সন্ত্রাস এবং সাধারণ রাজনৈতিক সংঘাত। অনুরূপভাবে বাংলাদেশে মানুষের পরিচয় তারা প্রথমে বাংলাদেশ, তারপরে মুসলিম। অমুসলিম রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত মধ্যপ্রাচ্য থেকে বহুদূরের বাংলাদেশ আবেগের দিক দিয়ে পাকিস্তান ও আরব বিশ্বের চাইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে অধিক ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশে অসহনশীলতার দৃষ্টান্ত খুবই ব্যতিক্রম একটা বিষয়, নিয়মিত কোন বিষয় নয়। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমও অসহিষ্ণুতার ঘোর সমালোচক। অন্যদিকে জামায়াত তার দলীয় শক্তির চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে এমন কথা বলার সাথে সাথে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন লিখে, "The Jamaat has not pressed an Islamic agenda too over-

www.pathagar.com

lly, but its ministers have aquired a reputation for being competent and uncorrupt, which could serve it well if disillusion with the major parties spreads" অর্থাৎ জামায়াত সরকারে থেকেও তার ইসলামী এজেন্ডা বাস্তবায়নে কোন দৃষ্টিগোচর বাড়াবাড়ি করেনি। কিন্তু তার মন্ত্রীরা যোগ্য ও দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার সুখ্যাতি অর্জন করেছে, যা জামায়াতের খুবই উপকারে আসবে। (Philip Bowring, International Herald Tribune, April 16, 2005).

এখানে হেরাল্ড ট্রিবিউন কয়েকটা সত্য কথা খুব স্পষ্ট করে বলেছে। এক. বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদ উত্থানের শ্লোগানটি বাস্তবতা নয়, ঘটনার অতিরঞ্জন, দুই. বাংলাদেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত একটা ব্যতিক্রম, চলমান কোনো বিষয় নয় এবং তিন. বাংলাদেশ দূরত্বের কারণে পাকিস্তান বা আরব বিশ্বের চাইতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে 'অধিকতর' ঘনিষ্ঠতাবোধ করে।

ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনকে ধন্যবাদ। দূর থেকে এসে সরেজমিনে তদন্তে বাংলাদশকে তারা চিনেছে, কিন্তু বাংলাদেশের খেয়ে পরে, বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে, বাংলাদেশের আলো-বাতাসে বড় হয়ে জনকণ্ঠ ও প্রথম আলোর মত সংবাদ মাধ্যমের কিছু বিভীষণরা এবং তাদের কিছু 'সুশীল' দোস্তরা বাংলাদেশকে চেনেনি। অবশ্য আমার এ কথার সাথে দ্বিমত করে অনেকেই বলেন যে, তারা চেনেনি নয়, তারা চিনতে চায়না বাংলাদেশকে। চিনতে চায় না কারণ তারা নিজের চোখে নয়, অন্যের চোখে বাংলাদেশকে দেখে। এই 'অন্য'রা কারা? এরা হলেন, তাদের মতে, সিএনএন-আইবিএন এর তথাকথিত সংবাদদাতা সুমন চক্রবর্তী এবং Bangladesh : next Afghanistan গ্রন্থের লেখক হিরন্ময় কারলেকাররা। দিল্লীর আধিপত্যবাদী স্বার্থের অস্ত্র সুমিত চক্রবর্তী বাংলাদেশকে 'দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসের উদীয়মান ভাগাড়' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর দিল্লী-স্বার্থের আরেক ক্রীড়নক কারলেকার 'মৌলবাদী ইসলামিস্টরা বাংলাদেশে ক্ষমতা দখল করতে পারে', 'বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকারকে মৌলবাদী ইসলামিস্টরা ডিকটেট করতে পারে', 'মৌলবাদী ইসলামিস্টরা বাংলাদশকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের হেড কোয়ার্টার না হলেও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বানাতে পারে' ইত্যাদি কথা বলে বাংলাদেশকে আরেক আফগানিস্তান বানিয়েই ফেরেছেন। হিরন্ময় বাবুরা বাংলাদেশ সম্পর্কে যে কল্পকথা ভয়ঙ্কর রূপ দিয়ে প্রচার করছেন, তাদের সে কল্পকথার উৎস আমাদের বিভীষণরা। বাংলাদেশ সম্পর্কে এই সব ভুয়া তথ্য যারা হিরন্ময় কারলেকারকে দিয়েছে, তাদের মধ্যে বিভীষণ নাম্বার ওয়ান হলেন শাহরিয়ার কবির। প্রথম আলোর দিল্লী সংবাদদাতা দিপাঞ্জন রায় হলেন তথ্য সরবরাহের আরেকজন ব্যক্তি। আরও তিন ব্যক্তির নাম হিরন্ময় বাবু লিখেননি যাদের কাছ থেকে তিনি মূল্যবান সহযোগিতা নিয়েছেন। হিরন্ময় বাবুকে বাংলাদেশবিরোধী তথ্য সরবরাহকারী এই কয়জন হলেন আমাদের বিভীষণদের আইসবার্গ মাত্র। এই বিষীষণরা ছড়িয়ে আছেন তথাকথিত সিভিল সোসাইটি, একশ্রেণীর সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের মধ্যেও।

www.pathagar.com

এই বিভীষণরা চেয়েছিল বাংলাদেশকে 'মৌলবাদী ইসলামিস্টদের সন্ত্রাসের ভাগাড়' হিসেবে প্রচার চালিয়ে পশ্চিমীদের 'War on Terror' বাংলাদেশও আমদানি করতে, যাতে বাংলাদেশ আর এক আফগানিস্তানে পরিণত হয়। কিন্তু 'War on Terror'-এর নায়করা বাংলাদেশের বিভীষণ ও দিল্লীর প্রপাগান্ডাকে বিশ্বাস করেনি। ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের সরেজমিন রিপোর্টার ফিলিপ বোরিংদের কথাই অবশেষে সত্য হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমী দেশগুলো যারা 'War on Terror'-এর নায়ক, তারা বাংলাদশকে মডারেট মুসলিম দেশ হিসেবে অভিহিত করেছে, মৌলবাদী ইসলামিস্টদের 'Terror-hub' নয়।

বিভীষণরা বাংলাদেশকে 'Terror-hub' প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবার পর তারা আরেক বিপজ্জনক লক্ষ্যে মেতে উঠেছে। সেটা হলো বাংলাদেশের জাতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশী জনগণের প্রতিপক্ষ বানিয়ে দেশ ধ্বংসের শেষ সংঘাত সৃষ্টি করা। সবাই আমরা জানি, জরুরি অবস্থায় দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকা এবং দুর্নীতির অভিযোগে অনেক রাজনীতিক জেলে যাওয়া ও পালিয়ে থাকা এবং অবশিষ্টরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার কারণে রাজনৈতিক দলগুলো শক্তি হিসেবে সক্রিয় না থাকার ফলে দেশে শক্তি হিসেবে বর্তমানে জনগণ ও জাতীয় সেনাবাহিনীই মাত্র অবশিষ্ট আছে। বিভীষণরা মনে করছে জাতীয় সেনাবাহিনীকে জনগনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ষোল আনা সফলতা লাভের এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। জননেতাদের অভাবে জনগণ এখন সুতা ছেঁড়া মালার মত বিশৃঙ্খল ও অসংগঠিত। অসংগঠিত জনগণকে সংগঠিত উস্কানির মাধ্যমে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যদি দাঁড় করানো যায় প্রতিপক্ষ হিসেবে, তাহলে দেশের অবশিষ্ট দুই শক্তিকে সংঘাতে জড়ানো সম্ভব হবে। এই সংঘাত হবে প্রথম আলো'দের কাঙ্ক্ষিত ব্যর্থ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সূচক। এই সূচকের ওপর ভর করে তখন ব্যর্থ রাষ্ট্র বাংলাদেশে শান্তি রক্ষার জন্যে ভারতীয় সৈন্যদের আমন্ত্রণ জানাবে বিভীষণ সুশীলরা। ষোলকলা পূর্ণ হবে তাদের ষড়ঙন্ত্রের। আটঘাট বেঁধে এই ষড়যন্ত্রেরই যাত্রা তারা শুরু করেছিল ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোট একটা ঘটনা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত একটা ছাত্র বিক্ষোভকে তারা হাতে নিয়েছিল জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির একটা মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রও তাদের ব্যর্থ হয়েছে।

এখন দেখার বিষয় বিভীষণদের পরবর্তী টার্গেট কি? টার্গেট যাই হোক, মাত্র গণতন্ত্রই তার মোকাবিলা করতে পারে। লক্ষণীয়, জোট সরকারের পাঁচ বছরে ষড়যন্ত্রকারীরা বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সূত্রপাত ঘটা ২০-২২ আগস্টের মত ঘটনা ষড়যন্ত্রকারীরা সৃষ্টি করতে পারেনি। এর কারণ দেশে গণতন্ত্র ও জননেতাদের উপস্থিতি। তাই দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবিলার জন্য যতো শীঘ্র সম্ভব দেশে নির্বাচন দিয়ে গণতন্ত্র ও জননেতাদের দেশ শাসনে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিভীষণদের কালো হাত ভেঙে দেয়ার এটাই একমাত্র পথ।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রায়ত্তখাতের ৮টি পাটকল লীজ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারের পাটকল ছিল মাত্র ১৮টি। এই ৮টি পাটকল লীজ দেয়ার পর অবশিষ্ট থাকবে ১০টি। সাতাত্তরটি থেকে মাত্র দশটি। অর্থাৎ পাট খাতে গত পঁয়ত্রিশ বছরে আমাদের অধোগতির হার দাঁড়াবে প্রায় আটশত ভাগ। এই অধোগতির ব্যাখ্যা কি? সরকারি উত্তর হলো, পাট শিল্পখাতের লোকসান। লোকসান বাঁচাবার জন্যই পাটকল বন্ধ করা, পাটকল লীজ দেয়া, পাটকল বেসরকারি হাতে তুলে দেয়া। প্রশ্ন দাঁড়ায় এই লোকসান কেন? সরকারি জবাব হবে দুনিয়ায় পাটজাত পণ্যের বাজার নেই, পাটজাত পণ্য বিক্রি হয় না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে ভারতের পাটজাত পণ্যের বাজার কোত্থেকে আসছে? ভারতে পাটকল বন্ধ হবার বদলে নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে কেন? ভারতের এক পশ্চিমবঙ্গেই ৫৯টি পাটকল রয়েছে। তারপরও পাটকল বন্ধ না করে তারা দশ হাজার কোটি রুপি খরচ করে তিনটি পাটকল স্থাপন করছে কেন? কেন পাটজাত পণ্যের রফতানি ১ হাজার কোটি রুপি থেকে আগামী ২০১০ সাল নাগাদ ৫ হাজার কোটি রুপিতে উন্নীত করার টার্গেট নিয়েছে ভারত? তাদের পাটের রফতানি খাত অর্থকরী ও অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ না হলে কেন তারা পাটখাতে ভর্তুকি ৩০ শতাংশে উন্নীত করেছে? এই প্রশ্নগুলো বিভিন্নজন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তুলেছেন। কিন্তু সরকারি তরফের কোন জবাব আসেনি। আসার কথা নয়। কারণ এসব জিজ্ঞাসার কোন জবাব নেই, আসবে কিভাবে? পাট শিল্পখাতকে তো আমরা নিজেদের অযোগ্যতা বা বাইরের কোন স্বার্থে ধ্বংস করছি। একজন পাট বিশেষজ্ঞ কিছুদিন আগে লিখেছিলেন, "ইংরেজ, পাকিস্তানীরা ব্যবসায়িক স্বার্থে পাটের গুরুত্ব বুঝেছিল, আমরা তা বুঝিনি। স্বর্ণসূত্র পাট তার সোনালী জীবন হারিয়েছে তা আমরা মনে করি না। আসল কথা হচ্ছে, পাট শিল্পের প্রতি আমরা যথাযথ মনোযোগ দিতে পারিনি। এখনো পারছি না। এ শিল্পের উন্নয়নে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এখনো সময় আছে পাটের সোনালী জীবন ফিরে পাবার। পাটের দিকে কারো নজর নেই। এ শিল্পের ওপর জাতীয়ভাবে টোটাল সাপোর্ট দরকার। কিন্তু কোথাও কেউ নেই তা নিয়ে ভাববার।" ভাববার নেই বলেই সহজ যে কাজ, পাটকল বন্ধ করা, লীজ দেয়া, সেই কাজই এখন হচ্ছে। উদ্যোগী হলে, আন্তরিক হলে, চেষ্টা করলে যে পাট শিল্পখাতকে অবশেষে লোকসান থেকে বাঁচানো যাবে, লাভজনক করে তোলাও সম্ভব হবে, তার একটা ঝলক দেখা গেছে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে। ২০০০-২০০১ সালে পাট শিল্প সংস্থার লোকসানের পরিমাণ ছিল ৩৮০ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী শিল্পমন্ত্রী হবার পর সরকার উদ্যোগী হলে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পাট শিল্প সংস্থার লোকসান ১৬২ কোটি ২৮ লাখ টাকায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। এটা স্বল্প সময়ের একটা ছোট দৃষ্টান্ত, কিন্তু বড় ভবিষ্যতের একটা বড় স্মারক বটে। এসবের তোয়াক্কা করা হয়নি, হচ্ছে না। পাট শিল্পের নিধনযজ্ঞ শুরু হয় ১৯৭২ সালে। ভারতকে অনুমতি দেয়া হয় বাংলাদেশের পাট ভারতে নিয়ে সে বিদেশে রফতানি করতে পারবে। ৭২-৭৫ সময়ে বাংলাদেশে প্রতিদিন দু'তিনটি পাটকলে আগুন লাগত। খুলনায় একদিনে ২৯টি পাট গুদামে আগুন

www.pathagar.com

লাগে (ইত্তেফাক, ১৬ নভেম্বর, ৭২) পাট শিল্প নিয়ে আমাদের আরেকটা পাপের কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের পাটকে আমরাই মর্যাদা দেইনি, নিজেদের পাট আমরা নিজেরাই ব্যবহার করিনি। পাটের বিকল্প কৃত্রিম আঁশজাত পণ্যকে আমরাই ব্যবহার করছি পাট বাদ দিয়ে। পাাট উৎপাদনকারী কোন দেশেই এমনটা নেই। যেমন, ভারতে প্রয়োজনের ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার হয়, আর বাংলাদেশে ব্যবহার হয়মাত্র প্রয়োজনের ৮ শতাংশ। আমরা যারা বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে পাটের প্রতিযোগীকে পাটের দেশে টেনে আনি, তারা কিভাবে বিদেশে পাটের বাজার রক্ষা করবে? এটাই আমাদের পাটের ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডিই পাটের বিলয় ঘটাচ্ছে।

আমাদের গার্মেন্টিস শিল্পকে পাটের রোগই ধরতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। পাট উৎপাদন ও পাটশিল্পে আমরা যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলাম, গামেন্টস শিল্পের উন্নয়ন বিকাশেও আমরা তেমনি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছি। ২০০৪ সালের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের গার্মেন্টিস রফতানির বিশেষ সুবিধা কোটা প্রথা বাতিল হচ্ছিল, তখন প্রথম আলোর মত কিছু পত্রিকা মহানন্দে হৈ চৈ তুলেছিল যে, বাংলাদেশের গার্মেন্টিস শেষ হয়ে যাচ্ছে। নানা হিসেব কষে তারা দেখিয়েছিল, কোটা সিস্টেম উঠে যাবার পর আমাদের গার্মেন্টিস শিল্প প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে অকাল মৃত্যু বরণ করবে। কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা এই অকাল মৃত্যুর দিনও গুণছিল। কিন্তু সবার মুখে ছাই দিয়ে সব অংক মিথ্যা প্রমাণ করে আমাদের গার্মেন্টিস শিল্প কোটা প্রথা উঠে যাবার পরও এশিয়ার শ্রেষ্ঠ হিসেবে মাথা উঁচু করে থাকে। ২০০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গার্মেন্টিস রফতানির শেয়ার ছিল ভারতের ৩ দশমিক ১ ভাগ, পাকিস্তানের ২ দশমিক ৬ ভাগ, শ্রীলংকার ২ দশমিক ১ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ার ৩ দশমিক ৫ বাগ, ভিয়েতনামের ৩ দশমিক ৯ ভাগ এবং কম্বোডিয়ার ৩ দশমিক ২ ভাগ। আর বাংলাদেশের ছিল ৪ দশমিক ৭ ভাগ। ২০০৫ সালে বাংলাদেশের কোটা সুযোগ উঠে যাবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গার্মেন্টিস রফতানিতে বাংলাদেশের শেয়ার ছিল ৫ দশমিক ১ ভাগ। আর ভারতের ছিল ৩ দশমিক ৬ ভাগ, পাকিস্তানের ছিল ২ দশমিক ৬ ভাগ, শ্রীলংকার ২ দশমিক ১ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ার ৩ দশমিক ৭ ভাগ, ভিয়েতনামের ৩ দশমিক ৬ ভাগ এবং কম্বোডিয়ার ৩ দশমিক ২ ভাগ। ২০০৪-২০০৫ সালে কোটা উঠে যাবার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের গার্মেন্টিস রফতানির মোট পরিমাণ ছিল ৮৬৫৪ দশমিক ৫২ মিলিয়ন ডলার, আর কোটা প্রথা উঠে যাবার পর ২০০৫-২০০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের গার্মেন্টিস রফতানির মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫২৬ দশমিক ১৬ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ কোটা সিস্টেম উঠে যাবার পর বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের গার্মেন্টিস বেশি রফতানি করে। এটা বাংলাদেশের গার্মেন্টিস শিল্পের শক্তিমত্তার প্রমাণ। মনে করা হচ্ছে এই শক্তিমত্তাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন হয়েছিল পাটের ক্ষেত্রে। গত অক্টোবরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সময় থেকেই আমাদের গার্মেন্টিস শিল্পে বড় ধরনের দুর্যোগ শুরু হয়। গত কয়েকমাসে গার্মেন্টিস খাতে রফতানি কমেছে ৩০ শতাংশ। ইতোমধ্যেই আরও গার্মেন্টিস বন্ধ হয়েছে। অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গে, ভারত ইপিজেড গড়ে তুলতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ মন্থর হয়েছে। আমাদের ইপিজেডের কোন কোন বিদেশী

www.pathagar.com

বিনিয়োগকারী তাদের কারবার বন্ধ করেছে, আরও বন্ধ হবে কিনা কে জানে! অনেকেরই আশঙ্কা এসব বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গের ইপিজেডে যাচ্ছে কিনা?

পাট ও গার্মেন্টস শিল্পের মত আমাদের সার্বিক অর্থনীতিও আজ সংকটে। গত ৬ মাসে গার্মেন্টস খাতের আয় ৩০ শতাংশ কমে যাওয়াই শুধু নয়, বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়া, গত দেড় দশকের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়া, ব্যবসায়ে মন্দা, বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি দেশের সার্বিক অর্থনীতিকে পেছন দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মনে করা হচ্ছে চলতি অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি গত ১০ বছরের ঐতিহ্য ভঙ্গ করে ২ শতাংশ কমে যাবে। তারচেয়েও বড় কথা হলো, জনগণের আর্থিক দুর্ভোগ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, গত জুনে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ২০ শতাংশ। কিন্তু এটা দুর্ভোগের প্রকৃত চিত্র নয়। 'সমুন্নয়' নামক একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতে নিম্ন-আয়ের বিভিন্ন গ্রুপের উপর মূল্যস্ফীতির প্রকৃত চাপ অনেক বেশি। তারা দেখিয়েছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ২১ দশমিক ৬০ শতাংশ, গার্মেন্টস শ্রমিকরা ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ, রিকশাচালকরা ২৩ দশমিক ১১ শতাংশ, দিন মজুরেরা ২২ দশমিক ৫৪ শতাংশ মূল্যস্ফীতির শিকার। ব্যবসায়ে মন্দা ও বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বকে যদি এর সাথে যুক্ত করা হয়, তাহলে মানুষের অর্থনৈতিক দুর্ভোগের আসল চিত্র আরও উদ্বেগজনক হবে। এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে পারে বলে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন। বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক সম্প্রতি এক পত্রিকাকে জানিয়েছেন, সামষ্টিক অর্থনীতি গত অর্থ বছরে চাপের মধ্যে ছিল, বর্তমানে ঐ চাপ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। বেসরকারি খাতের তৎপরতা নেই বললেই চলে। বিনিয়োগকারীরা শঙ্কিত। তাদের মধ্যে ওয়েট এন্ড সি মনোভাব রয়েছে।' এ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স-এর চেয়ারম্যানও এমন কথাই বলেছেন। তার মতে বেসরকারি খাতে উদ্যোক্তাদের মাঝে আস্থার অভাব দেখা যাচ্ছে। এ কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধীরগতির সৃষ্টি হয়েছে। লোকজন ব্যাংক থেকে টাকা নিতে চাইছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও স্বীকার করেছেন, গত অর্থ বছরের সার্বিক হিসাবে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৫ দশমিক ১২ শতাংশ হলেও গত ছয় মাসে এই প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কিন্তু এই হাল হবার কথা ছিল না। বাংলাদেশ অর্থনীতিতে হয়ে উঠছিল এক ইমার্জিং টাইগার। গত ১০ বছরে পৃথিবীর যেসব দেশ দ্রুত উন্নতি করেছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে ছিল এক বিশিষ্ট আসনে। জিডিপি'র ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে প্রবৃদ্ধি করে, তা ছিল অন্যের জন্য অনুকরণীয়। পৃথিবীর ৫০টি বড় অর্থনীতির দেশের মধ্যে মাত্র ৪টি দেশ ছিল বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে, অন্য ৪৫টি দেশ বাংলাদেশের পেছনে পড়েছিল। এর স্বীকৃতি বিদেশী বিশষজ্ঞরাও দিয়েছে। ২০০৬ সালের শেষে বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেয়া বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এ দেশ থেকে যাবার সময় বাংলাদেশের অর্থনীতির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেন, "১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশ স্থিতিশীলভাবে বছরে ৫-৬ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। এখানে মূল্যস্ফীতি ও ঋণের হার নিচু অংকের। সুদের ও মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল। মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে

www.pathagar.com

গেছে সব কম আয়ের দেশকে। এই সাফল্যের প্রতিফলন রয়েছে ছাপ ফেলার মতো দারিদ্র্য কমানোর হারেও। ২০০০ তেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সময়ে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর ২ শতাংশ হারে দারিদ্র্য কমেছে, যা আগের ৫ বছরের হারের তুলনায় দ্বিগুণ। ২০০০ সালে যখন মোট জনসংখ্যার ৪৯ শতাংশই ছিল গরীব, ২০০৫ সালে তা নেমে আসে ৪০ শতাংশে। আমরা আরও দেখেছি এ সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে, এমনকি প্রতিটি গরীব মানুষের জন্যেও।

অনেক সামাজিক সূচকের উন্নয়ন ঘটেছে একই ধরনের উল্লেখযোগ্যভাবে। শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে প্রায় সার্বজনীন সুযোগে এগিয়েছে বাংলাদেশ। জন্মের সময় মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুরোধে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়ন ঘটেছে বাংলাদেশে।" (যায়যায়দিন, ২০ নভেম্বর, ২০০৬)

বলা যায়, বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৪ দলীয় জোট সরকারের আমলে এসে সবচেয়ে দ্রুত হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা বড় ধরনের উল্লম্ফন ঘটে এ সময়। ২০০১ সালে মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৩৬২ ডলার, ২০০৬ সালের দিকে তা প্রায় ৫০০ ডলারে উন্নীত হয়। জোট সরকারের পাঁচ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ১৩০ কোটি ডলার থেকে ৩৬০ কোটি ডলারে পৌছে। মোট বার্ষিক রফতানি ৬৪০ কোটি ডলার থেকে ১০৫২ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোট ও খামার-শিল্পের বিকাশ মানুষের প্রধান অর্থকরী মাধ্যমে পরিণত হয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতসহ সামাজিক খাতের উন্নয়ন এই সময়ই অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যায়।

এমন অর্থনীতি হঠাৎ আজ সংকটে পড়লো কেন? এই 'কেন'র উত্তরে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া, গার্মেন্টস খাতে আয় হ্রাস পাওয়া, অর্থনৈতিক স্থবিরতা, মূল্যস্ফীতির উচ্চ চাপ, ব্যবসায়ীদের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, বন্যা ইত্যাদি কারণেই বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন দাঁড়ায় অর্থনীতিতে বিপর্যয়কারী এ ঘটনাগুলো ঘটলো কেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে যে জবাব আসছে তা হলো, "দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কড়াকড়ির সূত্র ধরে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এখন মন্দায় আক্রান্ত। অর্থনীতিতে পড়ছে যার বিরূপ প্রভাব। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কেউ জেলে, কেউ পলাতক, কেউবা দেশান্তরী। বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে বিজিএমএইএ'র সাবেক প্রেসিডেন্ট আনিসুল হক বলেছেন, 'কি হয়, কোথায় যাচ্ছি, কি দাঁড়ায়– এসব ভাবনাতেই ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা।' দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মীর নাসির হোসেন বলেছেন, 'দুর্নীতি দমন অভিযান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কড়াকড়ির কারণে ব্যবসায়ীরা এখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত। সবাই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে ইত্যাদি।' (জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর, ২০০৭)

অর্থনীতির বর্তমান বিপর্যয়ের উপরোক্ত কারণগুলো যে সত্য, এ কথা আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারও উপলব্ধি করেছেন। এ উপলব্ধির ফল হিসেবেই ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গত ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ব্যবসায়ীদের নিয়ে এক বৈঠকের আয়োজন হয়। এতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ও সেনাপ্রধান ব্যবসায়ীদের সাথে

www.pathagar.com

কথা বলেন। তাঁরা নির্ভয়ে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার আহ্বান জানান এবং ব্যবসায়ীদের ভীতিমুক্ত করার জন্য বলা হয়, 'সেপ্টেম্বরের পর দুর্নীতিবাজদের আর কোন তালিকা প্রকাশ করা হবে না। নতুন করে দুর্নীতি না করলে তার তালিকায় আসার আর ভয় নেই।'

এই মিটিং-এর পর এক মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের ভয় কাটেনি, তারা স্বাভাবিক হননি। কেন তাদের ভয় কাটেনি, কেন তারা স্বাভাবিক হতে পারেননি? এর পিছনে খুবই সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিছুদিন আগে আমি এই কলামে যে কথাটা লিখেছিলাম, সে কথাই আবার বলতে চাই। দুর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয় ও ব্যয়ের যে অসঙ্গতিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে ধর-পাকড় চালাচ্ছে, সে অসঙ্গতি ব্যবসায়ীদের শতকরা নব্বই জনের মধ্যেই রয়েছে। এদের দেখা যাবে রাজধানীর র‍্যাংস বিল্ডিং থেকে গ্রাম্য বাজারের কাচা ঘরের কারখানা পর্যন্ত। এদের সবার মধ্যেই দুদক ও এনবিআর ভয় ও অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। এই সাথে প্রতিদিন বিভিন্ন চ্যানেল ও মাধ্যমের খবর এবং চারদিকের আলোচনা তাদের ভীতি ও অস্থিরতা আরও বাড়াচ্ছে। এসব কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ এবং সেনাপ্রধান মইন উ আহমদের অভয়দান এবং নতুন তালিকা প্রকাশ না করার আশ্বাস বাণী তাদের ভীতি ও অস্থিরতা দূর করতে পারেনি।

প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাদের কি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভীতি ও অস্থিরতা সৃষ্টি না হোক, এ জন্যে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান না চালানো উচিত ছিল? দুর্নীতিবিরোধী অভিযান কি ঠিক হয়নি? সবার কাছ থেকেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর আসবে, দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অবশ্যই উচিত হয়েছে, ঠিক হয়েছে। কিন্তু এর সাথে এও বলতে হবে, এই উচিত ও ঠিক কাজের ফলাফল ভালো হয়নি। তাহলে এই দুই বৈপরীত্যের সমন্বয় হবে কিভাবে? ভীতি ও অস্থিরতা সৃষ্টি না করেও দুর্নীতি দমন কিভাবে সম্ভব?

লাঠি না ভেঙ্গে সাপ মারার এই কাজ সম্ভব ছিল। দুর্নীতি একটি অপরাধ। একে দমন করার আইনী বিধান আছে। কোন সরকার আন্তরিক হলে এবং সিদ্ধান্তে অনড় হলে আইনের মাধ্যমেই এক এক করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া যায়। এবার মামলা দায়ের হবে, বিচার শুরু হবে, বিচার চলবে, রায় হবে এবং অপরাধী শাস্তি পাবে, এটাই আইনের পথ। ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে, গ্রেফতারের মহোৎসব না করেও এই কাজ করা যায়। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো এটা করে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই কাজ এইভাবেই হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই কাজ শুরু হয়েছিল ঝড়ের মত। একদিকে তদন্ত নাই, মামলা নেই কিন্তু গ্রেফতারের হিড়িক, অন্যদিকে দেশজুড়ে অবৈধ স্থাপনা ভাঙ্গার তীব্র-গতি সয়লাব, এই সাথে রাস্তার হকার, বস্তি উচ্ছেদের টর্নেডো– সব মিলে ভীতির এক কাল চাদর ঢেকে দেয় দেশের মানুষকে, বিশেষ করে ব্যবসায় ও রাজনীতিকদেরকে। আমি মনে করি অনড় সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনী পন্থায় দুর্নীতি দমনে এগুলে এই ঝড় সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন যে ছিল না একথা পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও উপলব্ধি করেছেন, করছেন। বস্তি উচ্ছেদ এখন তারাই বন্ধ করেন, তারাই আবার এখন ঘোষণা দিচ্ছেন হকাররা রাস্তায় আবার আগের মতই বসতে পারে। সবশেষে ব্যবসায়ীদের আতঙ্ক তারা নিজেরাই দূর করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। তদন্তের

www.pathagar.com

আগে ধরা হবে না। আশ্বাসও এখন তারা দিয়েছেন। দুর্নীতিবাজদের তালিকাও আর প্রকাশ করবেন না, এ কথা তারাই বলছেন। ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে এসব কথা বলার পর তারা রাজনীতিকদের ব্যাপারে কি করেন, এটাও দেখা অপেক্ষায় এখন মানুষ। কারণ, ব্যবসায়ী রাজনীতিক অথবা ব্যবসায়ী-প্রযোজিত রাজনীতিকদের সংখ্যাই এখন বেশি। যা হোক, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এসব পেছন-হটাই প্রমাণ করে দুর্নীতি দমনের নামে 'গ্রেফতার ও ভাঙ্গা'র ঝড় তোলা ঠিক পদ্ধতি ছিল না। এই পদ্ধতি দেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র ও সংবিধানের কি ক্ষতি করেছে তার মূল্যায়নের সময় এখনও আসেনি, কিন্তু অর্থনীতির কি করেছে তা খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে।

আরেকটা কথা, দেশের উন্নয়নের জন্যেও ঝড়ো-পদ্ধতির দুর্নীতি দমন অভিযান আশু হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না। কারণ দেশের লাখো ব্যবসায়ী-রাজনীতিকদের আয়-ব্যয়ের অসঙ্গতি, কথিত চাঁদাবাজি, অনিয়ম, আত্মসাতের মধ্যেই বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইমার্জিং টাইগারে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অস্থিরতা এবং দুই বড় দলের মধ্যে হানাহানি না থাকলে দেশের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হতো অবশ্যই। কিন্তু এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত-অস্থিরতা দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি, অধোগতির দিকে ঠেলে দেয়নি, বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নই এর প্রমাণ। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের তদানীন্তন (২০০৬) কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিনা ওয়ালিকও এই বাস্তবতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার এক বিদায়ী বক্তব্যে বলেন,

"বাংলাদেশ এসব (দ্রুত উন্নয়ন) অর্জন করেছে, যদিও ব্যাপকভাবে ধারণা রয়েছে যে, এ দেশে সুশাসনের অভাব আছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নেই জবাবদিহির নিশ্চয়তা এবং এ দেশের প্রধান দু'টি দলের তিক্ত শত্রুতা যেখানে ব্যাপক অনিষ্টের কারণ। এই অগ্রগতি ঘটেছে এমন এক পরিস্থিতিতে যখন দেশটি লড়ে চলেছে এর রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্যে এবং দেশটি দেশের নাগরিকদের প্রয়োজনীয় জনসেবা যোগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটাই বাংলাদেশী প্যারাডক্স। যেখানে ধরে নেয়া হয় এখানে সুশাসনের অভাব, সেখানে এ ধরনের ছাপ ফেলার মত সাফল্য অর্জন কি করে সম্ভব হলো? এর চাবিকাঠি হচ্ছে শাসন প্রক্রিয়ায় এসব সাফল্য ও ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নেয়া।" (যায়যায়দিন, ২০ নভেম্বর, ২০০৬)

ক্রিস্টিনা ওয়ালিক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শক্তিমত্তার প্রশংসা করার সাথে রাজনৈতিক দুর্বলতার দিকেও অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, এই দুর্বলতা নিয়েই বাংলাদেশের রাজনীতিকরা বাংলাদেশের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছেন।

দুর্নীতি নামক কালসাপ মারা দরকার অবশ্যই। কিন্তু সে সাপ মারতে হবে লাঠি না ভেঙ্গেই। আমাদের রাজনীতি ও রাজনীতিকদের দুর্বলতা ও দুর্নীতি অবশ্যই দূর করতে হবে, কিন্তু তা রাজনীতি ও রাজনীতিকদের মাথা ভেঙ্গে নয়। অপরাধ করে ব্যক্তি। দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিকে পাকড়াও করবে আইন। এ জন্যে সাজগোজ করে ঝড় তোলার প্রয়োজন নেই। সকলেরই জানা, ঝড় নির্বিচারে আগাছা, গাছ দুইয়েরই ক্ষতি করে। আমাদের অর্থনীতিতে আজ এটাই ঘটেছে।

২০ অক্টোবর, ২০০৭

www.pathagar.com

আমাদের সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার এক বক্তব্যে বলেছেন, শুধু বৈদেশিক শত্রু নয়, দেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্যও ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়।' দেশকে দেশের শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য শুধু জরুরি অবস্থা ঘোষণা নয়, ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনও স্থগিত করতে হয়।

যে কারণে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন হতে পারেনি, যে অপরিহার্য কারণে দেশে জরুরি আইন ঘোষণা করতে হয়েছে, সেটা অবশ্যই খুব বড় কারণ এবং যে শত্রুরা এই কারণ সৃষ্টি করেছে, তারা খুবই বড় শত্রু। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই শত্রুরা দেশের ভেতরেও রয়েছে। এদের হাত থেকেই দেশকে রক্ষার জন্য ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়েছিল এবং সেনাবাহিনী এগিয়ে এসেছিল জাতির পাশে দাঁড়াবার জন্য। আমাদের সেনাপ্রধান এই শত্রুর হাত থেকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে দেশকে রক্ষার কথা বলেছেন, কিন্তু শত্রুর পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলেননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের গত ১ বছরের শাসনে এই শত্রুকে চিহ্নিত করেছেন, এমন কথা তাঁরাও বলেননি, কিংবা দেশের বিরুদ্ধে শত্রুসুলভ আচরণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন বলেও জানা যায়নি। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। দেখা যাচ্ছে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাইরে দুর্নীতি দমনকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের প্রধান কর্মসূচি বলে মনে করছে। দেশের শত্রুদের চিহ্নিত করা, শাস্তি দেয়ার কোন চিন্তা, কোন কথা, কোন উদ্যোগই দেখা যায়নি।

অতএব দেশের শত্রু যাদের কারণে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হতে পারেনি, যাদের কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছে বলে সেনা প্রধান বলেছেন, তারা ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলেও তারা বায়বীয় বস্তু নয়। তারা মানুষ। জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগে তারা সক্রিয় ছিল। দেশের শত্রুতামূলক কাজে তারা এতটাই সক্রিয় ছিল যে দেশ রক্ষার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে। সুতরাং এদের খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগের দিনগুলোর ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই এদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয় ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি। ১১ জানুয়ারির পর দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিন ছিল ২৮ অক্টোবর। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় ৩১ অক্টোবর তারিখে। আরেকটি বড় ঘটনা ঘটে ২৮ অক্টোবর তারিখে। এদিন পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লগি-বৈঠা খ্যাত গণহত্যা ও লাশের ওপর উঠে নৃত্য করার ঘটনা ঘটানো হয়। যা জাতিসংঘ অফিসকেও আলোড়িত করে। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান দেশের মানুষকে সংযম ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার আহ্বান জানান।

চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিনে অন্তর্বর্তীকালের সূচনায় একটা 'no-government' সিচুয়েশনে এই নৃশংস গণহত্যা কেন ঘটল? প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেন

www.pathagar.com

জন। ১৪ দলের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন, বলেন খালেদা জিয়া। জাবি ভর্তি পরীক্ষা ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত।

২০ নভেম্বর : সিইসিকে স্বেচ্ছায় ছুটির প্রস্তাব। আবার অবরোধ শুরু : সব অচল, বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ভাংচুর, ১৫ জন গুলীবিদ্ধসহ আহত শতাধিক। ১১ দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ চলবে বলেন শেখ হাসিনা। ১৪ দলের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে জাপা : এরশাদ-জলিল বৈঠক। বাণিজ্য স্থবির। বঙ্গভবনের দক্ষিণ পাশের রাস্তায় বোমা বিস্ফোরণ। আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করুন, প্রেসিডেন্টের প্রতি ১১ শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন।

২১ নভেম্বর : অবরুদ্ধ ঢাকা : রাজপথে ১৪ দলের পাশে জাপা, এলডিপি। সংবিধানের মধ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন মেনে নেবে, বলে বিএনপি। প্রতিদিন সিইসির বাসায় খাদ্য পাঠাতে চায় নিউ মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি।

১৯ নভেম্বর : নির্বাচন কমিশন আস্থা হারিয়েছে, বলেন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। ইসি পুনর্গঠন ও ভোটার তালিকা হালনাগাদ ছাড়া তফসিল ঘোষণা ১৪ দল মানবে না, বলেন জলিল। সব ওসি, এসপি বদলি। সংবিধানের বাইরে গেলে চারদলীয় জোটও মাঠে নামবে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। সময়ক্ষেপণ করলে গণঅভ্যুত্থান হবে, বলেন শেখ হাসিনা। সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব দলের সহযোগিতা চাই, বলেন প্রেসিডেন্ট।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে তুমুল সংঘর্ষ : পটিয়ায় এলডিপির গাড়িবহরের চাপায় ২ ছাত্রদল নেতা নিহত। অবরোধে চট্টগ্রাম-বগুড়াসহ বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আহত দেড় শতাধিক : লক্ষ্মীপুরে নিহত ১ জন। বঙ্গভবনের দক্ষিণ পাশের রাস্তা থেকে বোমাসহ দুইজন গ্রেফতার।

২২ নভেম্বর : আজ থেকে ৯০ দিনের ছুটিতে যান সিইসি আজিজ। নতুন দুই কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে আজকের বৈঠক বাতিল। অবরোধে রাজধানীতে দিনভর উত্তেজনা। রাজধানীতে পিকেটারদের ইটের আঘাতে বাস থেকে পড়ে হেলপারের মৃত্যু। অবরোধে বগুড়ায় যুবদল নেতা নিহত : বিভিন্ন স্থানে হামলা-সংঘর্ষে নিহত ৫০ জন। নির্বাচন কমিশনার কে হলেন তা বড় কথা নয়, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে হবে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। জোট সরকারের তাবেদার ব্যক্তিকে সিইসি করলে মানবো না, বলে ১৪ দল। নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হবে, ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ নয়, জাতীয় স্বার্থকে উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে, জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রেসিডেন্ট। নির্বাচন সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য না হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যাহত হবে, বলেন ঢাকায় বৃটিশ মন্ত্রী। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখনো কিছু করেনি– ৬ মুসলিম কূটনীতিককে আওয়ামী লীগ। তেলবাহী ট্যাঙ্কারকে চট্টগ্রামে সীমা অতিক্রম করতে দেয়া হবে না, বলেন মেয়র মহিউদ্দিন। সোনাগাজীতে যুবদল নেতার বাড়িতে হামলা, ৪ বছরের শিশু নিহত। নির্বাচন হলে বিজয়ী হবে না, বুঝতে পেরে ১৪ দল নৈরাজ্য চালাচ্ছে– বলেন খালেদা জিয়া।

www.pathagar.com

২৩ নভেম্বর : আজকের অবরোধ কর্মসূচি বিজয় উৎসবে পরিনত হবে– বলেন জলিল। অবরোধ স্থগিত। আন্দোলন চলবে। ঘোষণা দেয় ১৪ দল। বিপর্যস্ত শিক্ষাঙ্গন, সব পরীক্ষা এলোমেলো। পোশাক খাত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে রাখুন : অনুরোধ করে বিজিএমইএ।

২৪ নভেম্বর : নির্ভুল ভোটার তালিকা ছাড়া তফসিল প্রত্যাখ্যান করবে, বলে ১৪ দল। বঙ্গভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নিতে লাঠি নিয়ে তৈরি থাকুন, বলেন মেয়র মহিউদ্দিন।

২৫ নভেম্বর : বিভিন্ন স্থানে ১৪ দলের সংঘর্ষ, ভাংচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ। রফতানি কার্যক্রমকে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে রাখুন : এক্সপোর্টার্স অফ বাংলাদেশের আহ্বান। ৫ বছর পর বরিশালে ফিরলেন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ।

২৬ নভেম্বর : চট্টগ্রাম বন্দরে অচল অবস্থা অব্যাহত। ১১ জাহাজ বোঝাই পণ্য আটক।

২৭ নভেম্বর : বঙ্গভবনের চারপাশে ১৪ দলের অবস্থান কর্মসূচি। ২১ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা। নতুন দুই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ। বাংলাদেশে নির্বাচনের বিকল্প নেই, বলে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তফসিল ১৪ দলের প্রত্যাখ্যান। বৃহস্পতিবার বঙ্গভবন ঘেরাও। রোববার থেকে লাগাতার অবরোধ। রাজনৈতিক অস্থিরতায় কক্সবাজারের অর্থনীতিতে ৩০০ কোটি টাকা ক্ষতি। বিভিন্ন স্থানে ৪ ও ১৪ দলের মধ্যে সংঘর্ষ। বাড়ি, দোকানপাট ভাংচুর।

২৮ নভেম্বর : নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করে ১৪ দল। আলোচনা করতে জাতিসংঘ বিশেষ দূতের আগমন। ৬ জেলা নির্বাচন অফিসে আগুন। ৩ দিন ধরে শেয়ার বাজারের সূচক পড়ছে।

২৯ নভেম্বর : প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জাতিসংঘের বিশেষ দূত ক্রেইগ জেনেস-এর বৈঠক। রাজনৈতিক সহিংসতায় জাতিসংঘের উদ্বেগ প্রকাশ। জানুয়ারি নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাতে আমরা উদ্বিগ্ন, বলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র নিকোলাস বার্নস। প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ চ্যালেঞ্জ করে রিট। প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব নিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন, বলেন বাদীপক্ষের আইজীবী। প্রেসিডেন্ট সংবিধান লঙ্ঘন নয়, রক্ষা করেছেন, বলেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

৩০ নভেম্বর : আজ বঙ্গভবন ঘেরাও। শুনানি স্থগিত। প্রধান বিচারপতির কক্ষসহ সুপ্রীম কোর্টে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ। স্থগিতাদেশ দুরভিসন্ধিমূলক, জঘন্য, প্রধান বিচারপতি মানি না, তাকে আর মাননীয় বলবো না– বলেন ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ। ১৪ দল সমর্থক আইনজীবীদের ঘোষণা : পদত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির আদালত বর্জন। প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগ করলেই কেবল অবরোধ প্রত্যাহার : বলেন জলিল। ৪ দলের প্রতিক্রিয়া : সুপ্রীমকোর্টে আওয়ামী আইনজীবীদের তাণ্ডবের নিন্দা। আওয়ামী লীগ স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত, বলেন খালেদা জিয়া। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সঙ্কটের দ্রুত সমাধান সম্ভব, বলেন জাতিসংঘ দূত।

www.pathagar.com

ব্যর্থ হলো? জরুরি অবস্থা কোন পরিস্থিতিতে এল? এসব প্রশ্নের জবাব সামনে এলেই জেনারেল মইন কথিত দেশের 'শত্রুরা' দিনের আলোতে আসতে পারে। শুরুর প্রশ্ন থেকেই শুরু করা যাক।

চারদলীয় সরকারের মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে যে মহাবিতর্ক সৃষ্টি করা হয়, তারই একটা বা পরিণতি নাম্বার ওয়ান হলো ২৮ অক্টোবর হত্যাকাণ্ড। যেদিন এই নৃশংস ও বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেদিন বিচারপতি কে, এম, হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার অপারগতার কথা ঘোষণা করেন। পর্বত প্রমাণ চাপ ও হুমকি ধমকি যে বিচারপতিকে টলাতে পারেনি, সেই বিচারপতি যেন এই হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যে একেবারেই ভেঙে পড়েন।

একটা দলের ব্যানারে এই অপরাধ সংঘটিত হয়। হঠাৎ করেই এটা ঘটেনি। এই অপরাধ-কর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল এই দলের অযৌক্তিক, বেআইনী ও অসাংবিধানিক দাবির ঘাড়ে চড়ে। সংবিধান অনুসারে তত্ত্বাবৃধায়ক সরকার গঠন করতে না দেয়ার এই দাবি উঠে জনপ্রিয় চারদলীয় জোটের কাছে তাদের নির্বাচনী পরাজয়ের ভয় থেকে। দেশ জাতি সংবিধান গোল্লায় যাক চারদলীয় জোটকে আবার নির্বাচিত হতে দেয়া যাবে না, এই দুরভিসন্ধি থেকেই তারা প্রথম টার্গেট করে সংবিধান অনুসারে যিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পাবেন, সেই বিচারপতি কে এম হাসানকে। যাতে তিনি নিজের থেকেই এই দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশে বাধ্য হন। এজন্য তাকে হুমকি, ধমকি থেকে শুরু করে তার বাড়ি পর্যন্ত অবরোধ করা হয়। শেষে ২৮ অক্টোবরের নৃশংস গণহত্যার দৃশ্যে নিরপরাধ মানুষের রক্তস্নাত লাঠি-বৈঠার জিঘাংসা দেখে তিনি দায়িত্ব নেয়া থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন।

অপরাধের এটা প্রথম ও ভয়ঙ্কর সাফল্য। এই সাফল্যে পৌঁছতে শুধু ২৮ অক্টোবরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুধু নয়, সংঘাত সংঘর্ষ এবং সড়ক ও নৌপথ অবরোধের মত অনেক অপরাধ সংঘটিত তারা করে। প্রথম সাফল্য তাদের এই অপরাধের হাত আরও বর্ধিত করে।

২৮ অক্টোবর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রক্তরঞ্জিত লগি-বৈঠার মধ্যে এই ক্রাইমের জন্য বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ জাগ্রত হয়নি, বিচারপতি কে এম হাসানকে জঘন্য পন্থায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়া থেকে বিরত রেখে কিছুমাত্র লজ্জাবোধও করেনি। বরং এই দিনই তারা আলটিমেটাম দিয়ে বলে, ২৯ অক্টোবরের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গটিত হতে হবে। সাংবিধানিক অন্যান্য অপশনের ব্যাপারে অনৈক্য, সময়ের অভাব ইত্যাদি নিরূপায় অবস্থার কারণে ২৯ অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট নিজেই সংবিধানের শেষ অপশন হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং ৩১ অক্টোবর তারিখে পূর্ণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়।

এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাত্র ২ মাস ১১ দিন টিকেছিল। লগি-বৈঠাঅলারা এই সময় যে নীতি গ্রহণ করে তা হলো, তাদের কথামতো সব কিছু চলতে হবে, সবকিছু করতে হবে, না হলে তারা কিছুই মানবে না। তাদের ইচ্ছার কাছে নীতি নিয়ম, আইন, সংবিধান কিছুই নয়। লগি-বৈঠার প্রতাপের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থিতিশীলতা

www.pathagar.com

কখনই আসেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে বিদ্রোহ হয়েছে, গণপদত্যাগ হয়েছে, বিভেদবিতর্ক হয়েছে, সবকিছুর মধ্যেই ছিল লগি-বৈঠার কেরামতী। সাংবিধানিক একটি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-কমিশন লাঠি-বৈঠার ছোবল থেকে বাঁচেনি। লণ্ড-ভণ্ড করা হয় নির্বাচন কমিশনকে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ না করলে তাকে ঠ্যাং ধরে টেনে নামানো হবে, এমন ঘোষণা লাঠি-বৈঠাঅলারা করে। শেষ পর্যন্ত তাকে স্বেচ্ছায় বাধ্যতামূলক ছুটিতে যেতে হয়। আরও একজন নির্বাচন কমিশনারকেও ছুটি নিতে বাধ্য করা হয়। দু'জন নির্বাচন কমিশনারকে নেয়া হয়। এরপরও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আস্ফালন থামেনি। সাংবিধানিক আরেকটি প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীমকোর্টও লাঠি-বৈঠার দ্বারা আক্রান্ত হয়, প্রধান বিচারপতি লাঞ্ছিত হন, তার এজলাশ ভাংচুর হয় এবং আগুনও লাগানো হয় সুপ্রীমকোর্টে। আর লাঠি-বৈঠা অপূরণীয় ক্ষতি করে অর্থনীতির। প্রতিদিন ৪০০ কোট টাকা ক্ষতি হয় নির্মাণ শিল্পে। ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি অংকের বাজার হারায় গার্মেন্টস শিল্প। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয় প্রতিদিন ৭০০ কোটি টাকা। আর অচল চট্টগ্রাম বন্দর প্রতিদিন ৪০০ কোটি টাকা হারায়। ২ মাস ১১ দিনের দিনপঞ্জির দিকে একবার তাকালে লাঠি-বৈঠা কি অপরাধ করেছে তার একটা চিত্র দেখা যাবে। আসুন সে দিনপঞ্জির দিকে তাকাই।

৩১ অক্টোবর ঃ দশজন উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ। শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বিউটেনিসের আশা প্রকাশ–রাজপথে সহিংসতা বন্ধ হবে। সব দল নির্বাচনে অংশ নেবে। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আহত ৪৪ জন। বাংলাদেশের সহিংস ঘটনায় জাতিসংঘ ও বৃটেনের উদ্বেগ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য।

১ নভেম্বর : সংঘাত সহিংসতা এড়াতে ১৪ দলের প্রতি বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও দাতাদের আহ্বান। বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সহিংসতা, হামলা, ভাংচুর অব্যাহত, আহত ১৩০। খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমেরিকান অ্যামবাসাডারের দীর্ঘ বৈঠক।

২ নভেম্বর ঃ শেখ হাসিনার সঙ্গে উপদেষ্টা শফি সামী ও সুলতানা কামালের এক ঘন্টা অনির্ধারিত ও গোপন বৈঠক। বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে আহত ৫০ জন। চিকিৎসাধীন দুইজনের মৃত্যু।

৩ নভেম্বর ঃ প্রেসিডেন্টকে ১৪ দলের সাত দিনের আলটিমেটাম : 'নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ দিন, দাবি না মানলে ১২ নভেম্বর থেকে লাগাতার অবরোধ, পল্টনের সমাবেশে ঘোষণা।

৪ নভেম্বর : আওয়ামী লীগের সংঘর্ষে অন্তর্কোন্দলে বিভিন্ন স্থানে নিহত ১, আহত ৩১। কমনওয়েলথের দুই কর্মকর্তা ৯ দিনের সফরে ঢাকায়।

৫ নভেম্বর : সহিংসতার বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার অবস্থান প্রশংসনীয়, বলেন কানাডিয়ান হাই কমিশনার। নির্বাচনে সহায়তা দেবে ইইউ। সংবিধানের বাইরে কোনো কিছু করার সুযোগ নেই, বলেন প্রেসিডেন্ট। বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে আহত ৩২, ৩ শতাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা, তিনটি স্থানে ১৪৪ ধারা জারি।

৬ নভেম্বর : ছাত্রদল-শিবিরকে রাজপথে কবর দিতে ছাত্র-জনতাকে লগি-বৈঠা নিয়ে প্রস্তুত হতে বলেন মুক্তাঙ্গনের সমাবেশে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ নেতারা।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বর : নয়া পল্টনে ৭ নভেম্বরের জনসভায় খালেদা জিয়া বলেন, উপদেষ্টাদের কাজ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, কারো এজেন্ডা বাস্তবায়ন নয়। শেখ হাসিনা বলেন, আজিজকে রেখে নির্বাচনের চেষ্টা হলে রক্ত ঝরবে।

৮ নভেম্বর : নিরপেক্ষ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্তরিক, সবার সহায়তা দরকার : বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের ১২ নভেম্বর থেকে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি নিয়ে সারাদেশের মানুষের উদ্বেগ। উদ্বেগ দেখা দেয় কূটনৈতিক মহলে। আজিজ সরে দাঁড়ালে অবরোধ হবে না, বলে ১৪ দল।

৯ নভেম্বর : ১৪ দলের নানা কর্মসূচি : সিইসি হটাও। অবাধ নির্বাচনে ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালনে সচিবদের প্রতি প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ। ১৪ দলের কর্মসূচিতে রাজধানীতে যানজট ও যানবাহন সঙ্কটে মানুষের চরম দুর্ভোগ।

১০ নভেম্বর : শেখ হাসিনার হুঁশিয়ারি, সারাদেশে অবরোধের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। সিইসিকে অপসারণ করে কমিশন পুনর্গঠন করলে নির্বাচনে অংশ নেবো : অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারকে শেখ হাসিনা।

১১ নভেম্বর : দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক আমেরিকার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচারের আগমন। বাউচার বলেন, আমেরিকা কোনো সহিংসতা দেখতে চায় না। আশা করি সব দল নির্বাচনে অংশ নেবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সময় দেয়া উচিত।' অবরোধ জনগণের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র বিঘ্নিত হলে ১৪ দল দায়ী থাকবে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। বিএনপি পাল্টা কোনো কর্মসূচি দিচ্ছে না। অবরোধে ৮০০ কোটি ডলারের পোশাক শিল্পের বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবে – হুঁশিয়ারি দেয় বিজিএমইএ। কঠোর হস্তে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ : লগি-বৈঠার সমাবেশ নিষিদ্ধ। ১৪ দল নির্বাচন চায় না বলেই দেশকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, পেশাজীবীদের সঙ্গে খালেদা জিয়ার মতবিনিময়। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ইবলিশের সঙ্গে যেতেও রাজি আছি, বলেন এরশাদ।

১২ নভেম্বর : অনির্দিষ্টকাল অবরোধ শুরু। অবরোধে রাজধানী বিচ্ছিন্ন। টঙ্গীতে ট্রেনে আগুন। কয়েক স্থানে ট্রেন আটকা, গাড়ি ভাংচুর। অবরোধ অব্যাহত থাকবে, নতুন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করুন : বলেন জলিল। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাউচারের বৈঠক : নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে আমেরিকা আস্থাশীল। অবরোধে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা। মান্নান ভূঁইয়া বলেন, অবরোধ চলতে থাকলে বিএনপি বেশিদিন বসে থাকবে না। সেনা মোতায়েন হচ্ছে– ডিসি-এমপিদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ। চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল।

১৩ নভেম্বর : অবরোধ কর্মসূচিতে চট্টগ্রাম বন্দর অচল। অবরোধে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ী মহল– একদিনে ক্ষতি ৭০০ কোটি টাকা। অবরোধে দেশ অচল, ঢাকায় পুলিশের গাড়িচাপায় নিহত একজন। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিন, বিএনপি স্থায়ী কমিটি দাবি করে। পরীক্ষা ও ভর্তির মওসুমে অবরোধ : শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। অবরোধে গফরগাঁয় স্লিপার তুলে নেয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনা, আহত ৫০ জন, যাত্রীদের শ্লীলতাহানি, লুটপাট। অবরোধে অসহনীয় দুর্ভোগ, উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। জগন্নাথ

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। সিলেট ও খুলনায় ডাক পরিবহনে বিঘ্ন, আটকে পড়ে কয়েক হাজার চিঠি। চারদলীয় জোটের নীল নকশার নির্বাচন বরদাশত করা হবে না। সম্মিলিত নাগরিক সম্মেলনে ঘোষণা।

১৪ নভেম্বর : উৎকণ্ঠায় গোটা দেশ। অবরোধে স্থবির জনজীবন। অবরোধে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বন্ধ; অচল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রধান উপদেষ্টার পদ ছাড় ন : প্রেসিডেন্টের প্রতি আব্দুল জলিল। ১১ দফা বাস্তবায়ন করুন– শেখ হাসিনা। চট্টগ্রাম বন্দরে ভয়াবহ জাহাজ কনটেইনার জট, ডেলিভারি বন্ধ। চলমান সঙ্কটের দ্রুত সমাধান চেয়েছে ব্যবসায়ী নেতারা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা স্থগিত, ছুটি বৃদ্ধি। চলমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কূটনীতিক তৎপরতা অব্যাহত।

১৫ নভেম্বর : রোববার পর্যন্ত অবরোধ স্থগিত। চার দিনের আলটিমেটাম : নতুন কর্মসূচি ঘোষণা। নাশকতার আশঙ্কায় নির্বাচন কমিশনে নিরাপত্তা জোরদার। ১৪ দলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার হতে হবে, বলেন খালেদা জিয়া। ১৫ লাখ নির্মাণ শ্রমিকের রুটি-রুজি বন্ধ হওয়ার উপক্রম, অবরোধে নির্মাণ শিল্পে দৈনিক ক্ষতি ৪০০ কোটি টাকা : রিহ্যাব। অবরোধে নগরে চিকিৎসা, চাকরি, পরীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন কাজে আটকে পড়া হাজারো মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ। আইন করে অবরোধ, হরতাল বন্ধের দাবি জানান, বাংলাদেশ দোকান মালিক-ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদ নেতারা।

১৬ নভেম্বর : ব্যক্তি নয়, নির্বাচন প্রক্রিয়াই গুরুত্বপূর্ণ : বলেন বৃটিশ হাই কমিশনার। দেশে গণঅভ্যুত্থান পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে দায়-দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের : বলে আওয়ামী লীগ। যাই করি না কেন সংবিধান মেনে চলতেই হবে : বলেন প্রেসিডেন্ট। অবিলম্বে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করুন : খালেদা জিয়া। অবরোধে প্রতিদিনের ক্ষতি আড়াই হাজার কোটি টাকা। হরতাল-অবরোধ নয়, একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান চান ব্যবসায়ী নেতারা। নির্বাচন কমিশনার হাসান মনসুরের বাসায় গুলিবর্ষণ। আরো রক্ত দিয়ে হলেও ১১ দফা বাস্তবায়ন না করে ঘরে ফিরবো না, স্লোগান ওঠে। ঢাকাসহ সারা দেশে ১৪ দলের শোক মিছিল। ইউএনডিপির আশাবাদ : আসন্ন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে।

১৭ নভেম্বর : তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কাল ভোর থেকেই অবরোধ হবে, বলেন শেখ হাসিনা। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন : ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বাড়ি অবরোধ। সিইসিকে না খেয়ে মরতে দেবে না, জানায় বরিশালবাসী। ভোটার তালিকা প্রকাশ ছাড়া নির্বাচনের তফসিল মানবে না ১৪ দল, বলেন জলিল। সিইসির অপসারণ ছাড়া তফসিল ঘোষণা হবে জাতির জন্য চরম প্রতারণা, বলেন মেনন। অবরোধ কর্মসূচি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকর– এ কথা স্বীকার করলেন মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। সিইসি পদত্যাগ না করলেও জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেবে বলেন এরশাদ।

১৮ নভেম্বর : দুই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব। প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সহিংসতা, হামলা-ভাংচুর, আহত ৩৯

www.pathagar.com

০১ ডিসেম্বর : সামরিক শাসন জারির ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে– সুপ্রীমকোর্টে ভাংচুরে প্রবাসীদের প্রতিক্রিয়া। বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের হুমকি রাজনৈতিক বিরোধ– ক্রেইগ জেনস।

০২ ডিসেম্বর : ৫ বিদেশী কূটনীতিকের সঙ্গে জলিলের বৈঠক। অবরোধের কারণে তৃতীয়বারের মতো ভর্তি পরীক্ষা পেছালো জাবির। অনিশ্চয়তায় খুবি। অনেক হয়েছে এবার ভাংচুর, নৈরাজ্য ছেড়ে নির্বাচনে আসুন, বলেন মান্নান ভূঁইয়া।

০৩ ডিসেম্বর : ১৪ দলের লাগাতার অবরোধ, অবরুদ্ধ ঢাকা। অচল দেশ। বিভিন্ন স্থানে হামলা, সংঘর্ষে আহত ৭৩ জন। রাজনৈতিক সংকট নিরসনে নির্বাচনকালে র‍্যাবের কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হবে, বলেন জলিল। অবরোধ প্রত্যাহার করুন, বলেন প্রেসিডেন্ট। রাজনৈতিক হানাহানির কারণে বিদেশী বিনিয়োগ প্রস্তাব অর্ধেকে নেমে যায়। অবরোধে আবারো অচল চট্টগ্রাম বন্দর। পোশাক শিল্প অবরোধের আওতামুক্ত রাখতে বিকেএমইএর আহ্বান। চট্টগ্রামে সব নির্বাচন অফিস বন্ধ রাখুন, বলেন মেয়র মহিউদ্দিন।

০৪ ডিসেম্বর : নির্বাচন এক মাস পিছিয়ে দিতে বললেন শেখ হাসিনা। অবরোধের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন স্থানে হামলা, সংঘর্ষে আহত শতাধিক। চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা, স্থলবন্দরগুলোতে পঁচনশীল পণ্যবাহী শত শত ট্রাক আটক। বাংলাদেশ কঠিন সময় অতিক্রম করছে, বলেন জাপানিজ অ্যামবাসাডার। অবরোধের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাবেন, বলেন পরিবহন মালিকরা।

০৫ ডিসেম্বর : ২০ লাখ লোক নিয়ে বঙ্গভবন ঘেরাও করা হবে, বলে ১৪ দল। নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে আন্দোলনে যাবে ৪ দল, বলেন মান্নান ভূঁইয়া।

০৬ ডিসেম্বর : ১৪ দলের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচিতে মানুষের দুর্ভোগ। প্রচণ্ড যানজট।

০৭ ডিসেম্বর : নির্বাচন ২ দিন পেছালো, নতুন তফসিল ঘোষণা, ২৩ জানুয়ারি ভোট গ্রহণ। ১৪ দলের সঙ্গে মহাজোট করবে, ঘোষণা দেন এরশাদ।

০৮ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু। খবরে প্রকাশ, নির্বাচন সামনে রেখে সীমান্ত পেরিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্র।

০৯ ডিসেম্বর : সারাদেশে সেনা মোতায়েন। বঙ্গভবনের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি।

১০ ডিসেম্বর : সেনাবাহিনী নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে, আমেরিকা ও বৃটেনের আশাবাদ।

১১ ডিসেম্বর : চার উপদেষ্টার পদত্যাগ। ১৪ দলের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মত প্রকাশ। গণতন্ত্রের জন্য আগামী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বলেন বৃটিশ হাই কমিশনার।

১২ ডিসেম্বর : নতুন চার উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ। চার উপদেষ্টাকে ধাওয়া দিয়ে সমাজচ্যুত করুন, বলেন জলিল। ১৪ দলকে নির্বাচনে আনতে পদক্ষেপ নিন– প্রেসিডেন্টের প্রতি মান্নান ভূঁইয়া।

www.pathagar.com

১৩ ডিসেম্বর : ইয়াজউদ্দিনকে হটিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে হবে, বলেন জলিল।

১৪ ডিসেম্বর : এরশাদের ২ বছরের জেল : নির্বাচনে তার ও জাতীয় পার্টির অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। আমেরিকা চায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিক– বলেন বাউচার। এরশাদের বাসভবনে জলিল, তোফায়েল ও মাহী বি চৌধুরী। বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা আসতে শুরু করে : ইইউ থেকে ১৬০ জন আসতে পারে। বিচারপতি হাসান, আজিজ তো এখন নেই, এবার নির্বাচনে আসুন, ১৪ দলকে বলেন মান্নান ভূঁইয়া। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কমে যাবে– বিশ্বব্যাংকের আশঙ্কা প্রকাশ।

১৬ ডিসেম্বর : ইয়েস উদ্দিনের খপ্পরে পড়ে জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে, বলেন শেখ হাসিনা।

১৭ ডিসেম্বর : এরশাদ নিখোঁজ। ৯ সদস্যের ইইউ পর্যবেক্ষক দল ঢাকায়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আবারো সমঝোতার আহ্বান জানালেন কফি আনান। নির্বাচন ছাড়া অন্য পথে সরকার গঠনে এলডিপি বিশ্বাস করে না, বলেন, ডা. বি চৌধুরী।

১৮ ডিসেম্বর : এরশাদ বি চৌধুরীকে নিয়ে ১৪ দলের মহাঐক্যজোট গঠন। ঘোষিত তফসিলে নির্বাচন নয়, বলেন হাসিনা। ২১ ডিসেম্বর মনোনয়ন দাখিলের দিন হরতাল ঘোষণা। অধ্যাদেশ কিংবা আদালতে নির্বাচনের তারিখ পেছানো যাবে না, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। নিখোঁজ থেকে সোজা পল্টনে জনসভায় যান এরশাদ। দু'দিন ছিলেন শেখ হেলালের বাসায়।

১৯ ডিসেম্বর : ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে, বলেন খালেদা জিয়া। সংকট মোচনে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতে হবে– আমেরিকা ও কানাডার পরামর্শ।

২০ ডিসেম্বর : নির্বাচন কমিশনার স ম জাকারিয়া ছুটিতে যাবার ঘোষণা দেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাপার রাজনৈতিক চুক্তি হয়েছে, বলেন কাজী জাফর। তৃতীয়বারের মতো নির্বাচনী তফসিল পরিবর্তন। ভোট গ্রহণ ২২ জানুয়ারিতেই। রাজনৈতিক লোভ ও ক্ষমতার মোহ জাতীয় কাঠামো ধ্বংস করে দিচ্ছে, বলেন ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি।

২১ ডিসেম্বর : আজ মহাজোটের হরতাল, হরতালে অ্যাকশনে সেনাবাহিনী। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে, বলেন ইইউ পর্যবেক্ষণ দল। নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনপ্রিয়তা যাচাই করুন, বলেন ১৪ দলকে মান্নান ভূঁইয়া।

২২ ডিসেম্বর : আবারো তফসিল পরিবর্তনের দাবি করেছে ১৪ দল। হাসিনা-এরশাদ দীর্ঘ বৈঠক।

২৪ ডিসেম্বর : আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা পুনঃনির্ধারণ করা হয় ২৬ ডিসেম্বর। মহাজোটের নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা। আসন ঘোষণা নিয়ে মহাজোটের টানাপড়েন। আওয়ামী লীগের ঘোষণা বিলম্বিত। ফেলাফত মজলিসের সঙ্গে পাঁচ দফা চুক্তিতে সমালোচনার ঝড়।

www.pathagar.com

২৫ ডিসেম্বর : মহাজোটের আসন বণ্টনে ফয়সালা হয়নি। এলডিপি অসন্তুষ্ট। দলীয় প্রার্থিতা প্রত্যাহারপত্র রেখে দেয় আওয়ামী লীগ।

২৬ ডিসেম্বর : পাঁচ বছর পর বিদেশ থেকে ফিরলেন শামীম ওসমান। রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে শতাধিক আহত, দুই শতাধিক গাড়ি ভাংচুর। নির্বাচনে অংশ নেয়া এরশাদের অনিশ্চিত। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের ৩০০ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল।

২৭ ডিসেম্বর : এরশাদের মনোনয়ন বাতিল। ভোট বর্জনের হুমকি। শেখ হাসিনার সঙ্গে এরশাদের দীর্ঘ বৈঠক : আবার হরতাল, অবরোধ, ঘেরাওয়ের হুমকি।

২৮ ডিসেম্বর : এরশাদ ইস্যুতে সংকটে মহাজোট। মহাজোট নিয়ে আওয়ামী লীগ মহাজটে পড়ে নির্বাচনের বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। নির্বাচন কমিশন থেকে ১০৮ জন বিদেশী পর্যবেক্ষককে ক্লিয়ারেন্স। আল-জাজিরা ও ইনডিয়া থেকে সাংবাদিক এলেন।

২৯ ডিসেম্বর : নো এরশাদ, নো ইলেকশন অবস্থান মহাজোটের নয়, জাতীয় পার্টির, বলেন শেখ হাসিনা। দাবি না মানলে ৭, ৮ জানুয়ারি মহাজোটের অবরোধ হবে। নির্বাচন শেষ পর্যন্ত হবে না, বলেন এরশাদ। সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির জন্য ১৪ দল আবার অবরোধ দিয়েছে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। আঘাত এলে পাল্টা আঘাত হানো, ভোট কারচুপি হলে ভোট কেন্দ্র বন্ধ করে দাও– নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে শামীম ওসমান।

৩০ ডিসেম্বর : জাতীয় পার্টি ছাড়া মহাজোট নির্বাচনে যাবে না, বলেন এরশাদ। অবরোধের নামে ফের অরাজকতা সৃষ্টি করলে জনগণ বসে থাকবে না, বলেন মান্নান ভূঁইয়া।

৩ জানুয়ারি, ২০০৭ : মহাজোটের প্রেস কনফারেন্স : 'নির্বাচন বর্জন, ইয়াজউদ্দিনকে প্রধান উপদেষ্টার পদ ছাড়তে হবে, নতুন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করতে হবে।" জাতি যখন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত, তখন মহাজোটের এ ঘোষণায় হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। অবরোধ কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে, সেনাবাহিনী মাঠে থাকবে। সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার জন্য মহাজোটের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান : যুক্তরাজ্য ও ইসি হতাশ।

৪ জানুয়ারি : এলডিপি ভেঙে বিএলডিপি গঠিত। ১৭ জানুয়ারির মধ্যে এরশাদকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ। ২২ জানুয়ারি নির্বাচন বন্ধ করুন– ১৪ দলের দাবি। ভারপ্রাপ্ত সিইসি'র পদকে চ্যালেঞ্জ করে রিট। হাসান, আজিজ গেছে, এবার ইয়াজউদ্দিনের পালা, বলেন শেখ হাসিনা। গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সব দলের অংশগ্রহণ জরুরি– বিএনপি নেতাদের সঙ্গে ইইউ পর্যবেক্ষণ দলের বৈঠকের মন্তব্য। পরিস্থিতি জটিল হলেও নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হতে হবে, নির্বাচন কমিশনের মন্তব্য।

৫ জানুয়ারি : নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ জয়ের নিশ্চয়তা চায়– ৪ দলের প্রতিক্রিয়া। মহাজোটের বিক্ষোভ সমাবেশে ঘোষণা, "ভোট কেন্দ্রে গেলে জীবন নিয়ে ফিরতে দেয়া হবে না।" এলডিপি'র ১২ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত লাগাতার অবরোধ ঘোষণা। ২২ জানুয়ারি নির্বাচন যেকোন মূল্যেই প্রতিহত করা হবে, বলেন মেয়র মহিউদ্দিন।

www.pathagar.com

৬ জানুয়ারি : ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশনের কার্যক্রম আপাতত স্থগিত। সুধাসদনে মার্কিন ও বৃটিশ রাষ্ট্রদূত। ৯০ দিনের বাইরে নির্বাচন করার সুযোগ নেই, বলেন প্রেসিডেন্ট। এফবিসিসিআই জরুরি অবস্থা চায়। নির্বাচন না করার অধিকার সবার আছে বাধা দেয়ার অধিকার কারও নেই, বলেন মান্নান ভূঁইয়া।

৭ জানুয়ারি : মহাজোটের টানা তিন দিন অবরোধের সূচনা। রাজধানী বিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন স্থান রণক্ষেত্রে পরিণত। দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা, সংঘর্ষ, গাড়ি ভাংচুর, আহত অর্ধশতাধিক। অচল চট্টগ্রাম বন্দর। রাষ্ট্রপতি ভোটারবিহীন সাজানো নির্বাচন করছেন, বলেন জলিল। নির্বাচন হতেই হবে, রেফারেন্সের সুযোগ নেই, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। ভোটার সংখ্যা ৯ কোটি ৩০ লাখ ৫১৩ জন যা ২০০১-এ ছিল ৭ কোটি ৪৯ লাখ ৪৬ হাজার ৩৬৪ জন। অবরোধে পিছিয়ে গেল রাজধানীর বেশিরভাগ স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা। রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিপর্যয়ের মুখে তৈরি পোশাকশিল্প। মহাজোট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেলে চট্টগ্রাম বন্দরকে ট্রানজিট সুবিধা দেবে, বলেন মেয়র মহিউদ্দিন। আন্দোলন অবরোধের কারণে ৭৭ দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষাও হয়নি, ক্লাস হয়েছে মাত্র তিন দিন। অবরোধের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা স্থগিত।

৮ জানুয়ারি : অবরোধে স্থবির জনজীবন : রাজধানীর ৭ পয়েন্টে দফায় দফায় সংঘর্ষ, বোমাবাজি, মালিবাগ ও চকবাজার রণক্ষেত্রে পরিণত। চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার জট। পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারবে সেনাবাহিনী।

৯ জানুয়ারি : বঙ্গভবন ঘেরাও। অবরোধে বিভিন্ন স্থানে হামলা-সংঘর্ষ : আহত দেড় শতাধিক। ৫৫টি গাড়ি ভাংচুর, জয়পুরহাটে ট্রেনে হামলা। সংকট নিরসনে বিদেশি কূটনীতিকদের কোন ভূমিকা নেই, বলেন কানাডিয়ান হাইকমিশনার। দেশে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চলছে, বলেন খালেদা জিয়া। অবরোধে সাভার ইপিজেডের কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থবির, কর্মহীন দুই লাখ শ্রমিক। ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে রাজনৈতিক সংকটমুক্ত রাখতে ভিসির আহ্বান।

১০ জানুয়ারি : পল্টনে মহাজোটের বিশাল জনসভা : যারা নির্বাচনে অংশ নেবে তারা গণদুশমন, নির্বাচন প্রতিহত করুন– বলেন শেখ হাসিনা।

১১ জানুয়ারি : জরুরী অবস্থা ঘোষণা। জাতির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের ভাষণ।

৩১ অক্টোবর থেকে ১১ জানুয়ারি '০৭ পর্যন্ত সময়ের যে দিনপঞ্জি সামনে আনা হলো, সে দিনপঞ্জির রঙ্গমঞ্চে প্রধান সক্রিয় নট হলো লাঠি-বৈঠার অবরোধ ও সন্ত্রাস। রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য নটের মধ্যে রয়েছে সদ্য ক্ষমতাত্যাগী ৪ দলীয় জোট, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিরা। এদের মধ্যে ৪ দলীয় জোটের ভূমিকা ছিল সংবিধান, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষে। অবশ্য তারা নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তন মেনে নিয়েছে। সিইসি আবদুল আজিজ ও অন্য একজন নির্বাচন কমিশনারের পরিবর্তনে তাদের মত ছিল না, কিন্তু লাঠি-বৈঠার আওয়ামী লীগের দাবিকে এ্যাকোমোডেড করার জন্য তারা এসব পরিবর্তন মেনে নেয়। দ্বিতীয় নট হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার

www.pathagar.com

সংবিধান মেনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন করার জন্য সব দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের দাবি যথাসাধ্য এ্যাকোমোডেট করার জন্য কসরত চালিয়ে গেছে। তৃতীয় নটরা ছিলেন ঢাকাস্থ বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিরা। তাদের ভূমিকা ছিল দুর্বোধ্য। তারা কখনও বলেছেন, 'আইন ও সংবিধান রক্ষা করতে হবে।' কখনওবা বলেছেন, সবদলের মত নিয়ে, সকলকে সম্মত করে চলতে হবে। এক কথায় সদস্যা তারা বাড়িয়েছেন, কমাননি। ২ মাস ১১ দিনের উপরোক্ত ঘটনাপঞ্জির সময়ে একক নটের ভূমিকায় ছিল লাঠি-বৈঠা। এই লাঠি-বৈঠা যেমন ২৮ অক্টোবরের গণহত্যার জন্য দায়ী, তেমনি প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। তারা যেমন দায়ী বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্যে, তেমনি সিইসি আবদুল আজিজ ও নির্বাচন কমিশনার স ম জাকারিয়াকে সরে যেতে বাধ্য করার জন্যও দায়ী। দুই মাস এগার দিনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যত সন্ত্রাস, যত অবরোধ এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী যত ঘটনা ঘটেছে, তা ঘটিয়েছে লাঠি-বৈঠাধারীরা তাদের কারণেই ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হয়নি এবং ১১ জানুয়ারি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে দেশকে রক্ষার জন্যে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগের কয়েকদিন বঙ্গভবন অবরুদ্ধ ছিল। বঙ্গভবনে এমনকি অক্সিজেন বন্ধেরও হুমকি দেয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

জেনারেল মইন উ আহমেদ যাদেরকে দেশের শত্রু বলেছেন, তারা উপরোক্ত নটদের মধ্যেই রয়েছে। দেশের শত্রুদের পরিচয় হলো তাদের কারণেই দেশকে রক্ষার জন্য জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। এই পরিচয় থেকে পরিষ্কার লাঠি-বৈঠাকেই দেশের শত্রু বলা হয়েছে। লাঠি-বৈঠার কারণেই দেশে জরুরি অবস্থা হয়, যার কারণে ২২ জানুয়ারির নির্বাচনও বাতিল হয়ে যায়।

দেশের শত্রু চিহ্নিত হবার পর যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দাঁড়ায় সেটা হলো দেশের শত্রু লাটি-বৈঠার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। তাদের পাকড়াও করছে, মামলা দিচ্ছে। কিন্তু লাঠি-বৈঠা দেশের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করল, তার বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যারা ২৮ অক্টোবরের গণহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে, যারা বিচারপতি কে এম হাসানের গাড়ি অবরোধ করেছিল, যারা বিচারপতি আবদুল আজিজের বাসভবন অবরোধ করেছিল, যারা সুপ্রিমকোর্ট ভাংচুর করেছিল, যারা বঙ্গভবন ও নির্বাচন কমিশন অবরোধ করেছিল, যারা রাস্তাঘাট, নদীপথ, রেলপথ অবরোধ করে মানুষকে অসীম কষ্ট দিয়েছে, শত মানুষের আহত-নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অপরাধী ও নির্দোষ উভয়ের জন্য লেভেল প্লেইং গ্রাউন্ড তৈরি সুবিচার নয়, অবিচার। আর দুর্নীতি দমন দেশ ও জাতির জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়, কিন্তু দুর্নীতি জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে কোন ইস্যু ছিল না, ইস্যু ছিল লাঠি-বৈঠার সন্ত্রাস। নাম উচ্চারণ না করলেও জেনারেল মইন উ আহমদ জরুরি অবস্থা ঘোষণার কারণ লাঠি-বৈঠাকেই দেশের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অভিযান পরিচালনা করলেও লাঠি-বৈঠার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশনে যায়নি।

www.pathagar.com

সরকার ও প্রশাসনকে ধন্যবাদ যে, ২৮ অক্টোবর গণহত্যার জন্য লাঠি-বৈঠাকে আসামী করে দায়ের করা একটা বড় মামলা সিএমএম আদালতের মামলার তালিকায় রয়েছে। লাঠি-বৈঠার অপরাধের এটাই একমাত্র মামলা। লাঠি-বৈঠা যদি দেশের শত্রু হয়, তাহলে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে এটাই একমাত্র মামলা। কিন্তু এই একটি মাত্রা মামলাও যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি, পাচ্ছে না। এক বছরে এই মামলার চার্জশীট দাখিল হওয়ার মত কাজটাও হয়নি, বিচার তো দূরে!

এই অবহেলা সত্যিই বিস্ময়কর। একদিকে দেশের শত্রু লাঠি-বৈঠা ২ মাস ১১ দিন ধরে একের পর এক যে অপরাধ করেছে, তার কোনটিকেই আমলে এনে মামলা দায়ের হয়নি, একমাত্র ২৮ অক্টোবরের একটি ঘটনা ছাড়া। কিন্তু সেই আটাশ কেন্দ্রিক মামলাগুলোও সীমাহীন অবহেলার শিকার।

এর অর্থ হলো, যে কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলো, যে কারণে দেশে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হতে পারলো না, সেই কারণকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। সে কারণ গুরুত্ব পাচ্ছে না বলেই প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গ্রহণ করেনি। ব্যাপারটা 'টাকা ছেড়ে আঁচলে গেরো'র মতো। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর লাঠি-বৈঠার বিচারই প্রথম হওয়া উচিত ছিল। এটাই হতো দেশের সুস্থ রাজনীতি সুরক্ষার সবচেয়ে বড় কাজ। দেশের লাটি-বৈঠার সাথে বাইরের কালো হাত অবশ্যই ছিল। এই কালো হাতের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফল হতে না দেয়, এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে দুর্বল করা এবং তাদের আধিপত্যবাদী নীলনকশা এই পথে বাস্তবায়ন করে তোলা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার লাটি-বৈঠার অপরাধকে আমলে না এনে বিদেশী কালো হাতকে আড়ালে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে। জেনারেল মইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে নিউইয়র্ক ত্যাগের আগে গত ২৪ অক্টোবর বলেছেন, "রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি হিসেবে জীবন্ত মানুষ হত্যার বিভীষিকার সেই দৃশ্য কেউ কখনো ভুলতে পারবে না।" অন্য কেউ ভুলতে না পারলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভুলে গেছেন, এটাই সত্য। এই সত্য বড় বেদনাদায়ক!

২৮ অক্টোবর, ২০০৭

রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার

আবু সোহায়েল : মার্কিন রাষ্ট্রদূত তার গোটা কার্যকালে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন, যাবার সময়ও বলে গেলেন। সে দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সাথে বিদায়ী সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'সংস্কার চাপিয়ে দেয়া যায় না, রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর থেকেই সংস্কার আনতে হবে।' মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের মধ্যে এই ইঙ্গিত আছে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর সংস্কার চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস এ কথা

www.pathagar.com

বলার পরদিনই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. এ. মতিন পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, সংস্কার কারও ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে না। যোগাযোগ উপদেষ্টা একথা বললেন, আইন ও তথ্য উপদেষ্টা কিন্তু কিছুদিন আগে এ ধরনের কথা বলেছিলেন যে, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার না হলে ঘরোয়া রাজনীতি চালু হবে না। এই কথায় চাপ আছে এই অর্থই দাঁড়ায়। আমি মনে করি, এ বিষয়টা বিতর্কের ইস্যু হওয়া উচিত নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার চাইতে পারেন, যা চাইতে পারেন তার জন্যে চাপও দিতে পারেন। কারন, তাদের এই চাওয়াটা শুধু তাদের নয়, দেশের জনগণও রাজনীতির, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার চাচ্ছেন। আর রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের বলে রাজনৈতিক দলগুলোও সংস্কার চাচ্ছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার এইভাবে সকলের চাওয়া হয়ে উঠল কেন? ১১ই জানুয়ারির জরুরি অবস্থা ঘোষণা তো রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের উদ্দেশ্যে হয়নি। হয়েছে নৈরাজ্যের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য। তাহলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার প্রথম এজেন্ডা হয়ে দাঁড়াল কি করে?

এর উত্তর পেতে হলে পেছনের রাজনীতির দিকে, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব, আমদের রাজনীতি সুস্থ নয়। তার নাম গণতন্ত্র বটে, কিন্তু গণতন্ত্র সেখানে নেই। গণতন্ত্রের নিয়ামক হবেন যে রাজনৈতিক দলগুলো, তা দায়িত্বশীল নয়। বিচার মানি কিন্তু তাল গাছটা আমার, এটাই অনড় নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের। তারা নির্বাচন মানেন, রায় মানেন, যদি সে রায় তাদের ক্ষমতায় পাঠায়। এই প্রবণতা আমাদের রাজনীতিতে উৎকট হয়ে উঠেছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ আওয়ামী লীগ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও প্রথম দিন থেকেই সংসদকে তারা অচল করেনি। পরে মেয়াদের শেষ দিকে তারা সরকার বিরোধী হিংসাত্মক ও জ্বালাও-পোড়াও এবং লাগাতার হরতালের যে রাজনীতি করে, তা কোন মতেই কোন দিক দিয়েই গণতান্ত্রিক দায়িত্ব বোধের মধ্যে পড়ে না। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ বিএনপি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সংসদকে অচল করে দেয়ার মত কার্যক্রম দু'বছর পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। দু'বছর পরে বিএনপি, জামায়াতসহ কতিপয় দল মাঝে মাঝে পার্লামেন্ট বর্জনসহ সরকারকে অচল করে দেয়ার আন্দোলন শুরু করে। এই সময় পার্লামেন্টের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কলংকের একটা কালোদাগ আসন গেড়ে বসে। সেটা হলো 'টেলিভিশন থেরাপি'। 'থেরাপি' চিকিৎসা করার এবং মানুষকে সুস্থ করার একটা পদ্ধতি। কিন্তু পার্লামেন্টের ভেতরের দৃশ্য টেলিকাস্ট করার সুযোগে গণতন্ত্রকে অসুস্থ করার কাজে আওয়ামী সরকার ব্যবহার করে। পার্লামেন্টের টিভি প্রচারে সরকারি সদস্যের ভূমিকাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা এবং বিরোধী পক্ষের ভূমিকাকে বিকৃত করে দেখানো হতে থাকে। বিএনপি-জামায়াতসহ বিরোধীদলীয় সদস্যরা একে তাদের সংসদ বর্জনের একটা ইস্যু হিসাবে কাজে লাগায়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে এই মেয়াদের শেষদিকে সংসদের ভেতরে ও বাইরে তীব্র আন্দোলন করে বিএনপি ও জামায়াত। তবে পার্থক্য এই ছিল যে, বিএনপি-জামায়াতের আন্দোলন আগের আওয়ামী আন্দোলনের মত ধ্বংসাত্মক ছিল না। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নিজেই তখন বলত, হরতাল ডাকে

www.pathagar.com

বিএনপি, জামায়াত, কিন্তু মাঠে থাকে আওয়ামী লীগ। গণতন্ত্রের জন্যে আন্দোলনে শক্তির ব্যবহার করতে চায়নি বিএনপি ও জামায়াত। শক্তির জোরে মাঠে থাকার চ্যালেঞ্জকে তাই বিএনপি-জামায়াত মোকাবিলা করতে চায়নি।

কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে শক্তির ব্যবহার এবং নির্বাচন মানি, তবে বিজয় আমার হতে হবে –এই আওয়ামী অভ্যাস ও মানসিকতা ২০০১ সালের নির্বাচনের পর গণতন্ত্রের সকল নীতি-নিয়ম পদদলিত করে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের রাতে যখন আওয়ামী লীগের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন তারা নির্বাচনের ফল বাতিল করার জন্যে প্রেসিডেন্টের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। প্রেসিডেন্ট তাদের বেআইনি ও অন্যায় দাবি প্রত্যাখ্যান করলে এরপর তারা সংসদ সদস্যরা যাতে শপথ নিতে না পারে, এজন্যে তাদের স্পীকারকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে নিষেধ করে। এ উদ্যোগ তাদের ব্যর্থ হলে আওয়ামী সংসদ সদস্যরা শপথ না নেয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু সংসদ সদস্যপথ হারানোর ভয়ে তারা শপথ নেয় বটে, কিন্তু সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই তারা সংসদ অধিবেশন বর্জন শুরু করে। তারপর ৪ দলীয় জোট সরকারের গোটা ৫ বছর মেয়াদেই তারা সরকার পতনের আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা জোট সরকারের পতন ঘটাতে তারা পারেনি। অবশেষে তারা টার্গেট করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে। যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবে, সেহেতু তাদের জনসম্পৃক্ততা থাকবে না এবং যেহেতু তারা শেকড়হীন দুর্বল হবে, সেহেতু তাদেরকে প্রচণ্ড চাপে ফেলে ও ভয় দেখিয়ে আওয়ামী লীগ সব দাবি আদায় করে এমন এক নির্বাচনে যাবে যে নির্বাচন তাদের বিজয়ী করবে। এই লক্ষ্যেই আওয়ামী লীগ ২৮শে অক্টোবরের গণহত্যার মধ্য দিয়ে যে হিংসাত্মক ঘেরাও অবরোধের আন্দোলন শুরু করে, তা দেশ ও জনগণকে ধ্বংস, বিপর্যয় ও নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়। এই ধ্বংস, বিপর্যয় ও নৈরাজ্য থেকে বাঁচানোর জন্যেই আসে জরুরি অবস্থা।

এই যে ধ্বংসের রাজনীতি, এর জন্যে দেশের গোটা রাজনীতিকে আসামি করা সুবিচার হবে না। কারণ, ২৮শে অক্টোবর থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজনীতির যে ধ্বংসাত্মক চেহারা আমরা দেখি তার সাথে দেশের সব রাজনীতিক ও সব রাজনৈতিক দল জড়িত ছিল না। কিন্তু এই পার্থক্য এখন সামনে রাখা হচ্ছে না। তথাকথিত লেভেল গ্রাউন্ডের নামে দোষী-নির্দোষী সবাইকে একপাল্লায় রাখা হচ্ছে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নকে গালি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু ২৮শে অক্টোবর থেকে ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ের বেনজির রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপনাকে অপরাধ হিসাবে দেখা হচ্ছে না। এই সুবিচারেরই বিকল্প হিসাবে এসেছে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার প্রয়াস। এই সংস্কার প্রয়াসে সবাইকে এক সমতলে দাঁড় করাতে গিয়ে 'ভালো'কে ভালো এবং মন্দকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। অথচ ১৯৯১ সাল থেকে গত ১৫ বছরের রাজনীতির যদি গণতান্ত্রিক মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে গণতন্ত্রমনা কিছু দলের সন্ধান মিলবে, আবার শক্তির কাছে গণতন্ত্রকে পণবন্দী করা দলেরও সন্ধান পাওয়া যাবে। এই মূল্যায়নে ভালোদের যদি ভাল বলা হতো এবং মন্দদের মন্দ বলা যেত, তাহলে রাজনীতিতে আরও স্বচ্ছতা আসত এবং সংস্কারও আরও অর্থবহ হতো। এর অভাবে চোররাই এখন চোর চোর বলে চিৎকার করছে বেশী।

www.pathagar.com

তবু সংস্কারই এখন একমাত্র বিকল্প। কিন্তু সংস্কার বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি, কি চাচ্ছি, তা কিন্তু স্পষ্ট হয়নি। বড় দুই দল, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ, সংস্কার নিয়ে এখন খুব বেশী সোচ্চার। দল দু'টির সংস্কারবাদী কিছু নেতা সংস্কার নিয়ে অবিরাম কথা বলছেন। কিন্তু সংস্কারের কোন রূপরেখা তাদের কারও কাছ থেকেই এখনও আসেনি। তারা বলছেন, তারা দলে গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতা নিয়ে আসবেন। কিন্তু কি সংস্কারের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করবেন, কিভাবে তার বাস্তবায়ন হবে, এসব জিজ্ঞাসার জবাব এখন নেই (অবশ্য এমন বিষয়ে মত প্রকাশ ও মত বিনিময়ের জন্যে যে মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ দরকার তা এখন নেই)। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন যে সংস্কারের একটা রূপরেখা দিয়েছে, তা খুবই অসম্পূর্ণ। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্তাবলী বিবেচনা করতে গিয়ে কিছু সংস্কারের চিন্তা তারা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা, কেন্দ্রীয় বা নির্বাহী কমিটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা, দলীয় ফাণ্ডের অডিট করানো ইত্যাদি ধরনের গঠনতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কিছু সংস্কার কাজ। কিন্তু এতটুকু সংস্কারে সংস্কারের দাবি পূরণ হবে না। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতা আনলে রাজনৈতিক দলের সংস্কার হয়তো কিছু হবে, কিন্তু রাজনীতির সংস্কার তাতে হবে না। আর রাজনীতির সংস্কার না হলে ১৯৯১ সাল থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের পরেও আমাদের রাজনৈতিক অংগনে অগণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থ বিরোধী যা ঘটেছে, ২৮শে অক্টোবর থেকে ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত যা ঘটেছে, তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হবে না। এই ধরনের ঘটনা আন্তঃদল দূষণযুক্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ও স্বৈর মানসিকতার ফল। রাজনৈতিক এই বিরোধ-সংঘাত নিরসনের কার্যকর সংস্কার-চিন্তা দলগুলোর চিন্তা-ভাবনায় দেখা যাচ্ছে না এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কার রূপরেখাতেও নেই। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সংস্কার প্রস্তাবে। নিজামী সাহেব একটি দৈনিকে প্রকাশিত (দৈনিক সংগ্রাম, ২২ মে, ২০০৭) 'রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধে সংস্কার বিষয়ে তার ব্যক্তিগত কিছু মত প্রকাশ করেছেন। দশ দফায় লিখিত তার ব্যক্তিগত অভিমতের মধ্যে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার ছাড়াও সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও দাতাদের সাথে সম্পর্কের বিষয়েও মূল্যবান বক্তব্য রয়েছে যা সংস্কার প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তাঁর প্রস্তাবগুলোর ওপর কিঞ্চিত আলোকপাত করা যাক।

তিনি লিখেছেন, সংস্কার কার্যক্রম আইন করে কিংবা বাইরে থেকে চাপিয়ে দিয়ে নয়, স্ব স্ব দলের উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে হবে। একটি রাজনৈতিক দলের ঐক্য এবং এগিয়ে চলার গাইডিং ফোর্স কি হবে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গাইডিং ফোর্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনাব নিজামী বলেছেন, "দলসমূহের রাজনীতিকে অবশ্যই ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে আদর্শ ও কর্মসূচিভিত্তিক হতে হবে। নিজামীর মতে একটি দল ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার বদলে আদর্শ ও কর্মসূচি-কেন্দ্রিক হলে সে দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তিভিত্তিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকতা বৃদ্ধি পায়, নেতা নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয় এবং দলের কোন পর্যায়েই দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব স্থান করে নিতে পারে না। তৃতীয় দফায় নিজামী আন্তঃদলীয় সম্পর্ক বৈরিতামুক্ত বন্ধুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন এবং দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যান, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় ভূমিকা পালন রাজনীতির মূল দাবি হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি লিখেন, ক্ষমতার মসনদে বসে যেমন দেশ সেবা করা যায়, তেমনি ক্ষমতার বাইরে থেকে এমনকি বিরোধী দলে বসেও এই সেবার দায়িত্ব পালন করা যায়", –এই বোধ দল ও রাজনীতিকদের মধ্যে জাগ্রত হবে। চতুর্থ ও পঞ্চম দফায় নিজামী সাহেব আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে হরতাল, অবরোধ এবং উন্নয়ন-উৎপাদন বাধাগ্রস্ত করার মত রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করে এসব কর্মসূচি থেকে বিরত থাকার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে অংগীকারাবদ্ধ হতে বলেছেন। ষষ্ঠ দফায় তিনি নির্বাচনের আচরণবিধি এবং সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে প্রস্তাব রেখেছেন। তিনি লিখেছেন, নির্বাচনের রায় মেনে না নেয়ার মনোভাব অবশ্যই গণতন্ত্রের পরিপন্থি এবং এই মনোভাব অবশ্যই সকলকে পরিহার করতে হবে। তার মতে, সংসদ সদস্যরা আইনপ্রণেতা। তাদেরকে অবশ্যই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিমন্ডল থেকে দূরে থাকতে হবে এবং দূরে রাখতে হবে। জনাব নিজামীর সাত ও অষ্টম দফা দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ দু' দফায় কূটনীতিক ও দাতাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশীদের জড়িত করার প্রবণতা রুখতে হবে। ... . ছুতানাতা কিছু হলেই বিদেশীদের দ্বারে ধরনা দেয়া, দেশের কোন ইস্যুতে বিদেশী কূটনীতিকদের প্রকাশ্য বিবৃতি দানের খারাপ সংস্কৃতি চলছে, তার অবসান হওয়া দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে। দাতাদের ক্ষেত্রেও তিনি একই বলেছেন যে, দাতাদের সাহায্য-সহযোগিতা আমাদের কাম্য, তবে এই সুযোগে তাদেরকে দেশের রাজনীতিতে নাক গলাতে দেয়া যাবে না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখার কথা তিনি বলেছেন নয় নাম্বার দফায়। দশ নাম্বার দফায় ছাত্র-শ্রমিকদেরকে রাজনৈতিক দলসমূহের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি বানাবার বিরোধিতা করেছেন নিজামী।

জনাব নিজামীকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি প্রথম একজন রাজনীতিক যিনি ইদানিংকালের সবচেয়ে হট ইস্যু সংস্কার ব্যাপারে প্রায় সবদিক মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি বক্তব্য দিয়েছেন।

রাজনীতি ও রাজনৈতিকদলগুলো এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কার চিন্তায় যতগুলো বিষয় এ পর্যন্ত উঠে এসেছে, তা দেশের রাজনৈতিক সংকট দূরীকরণে যথেষ্ট নয়। দেশে এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতন্ত্রের সংকট আমাদের রাজনৈতিক সংকটের সবটুকু নয়। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ ও অসহনশীলতা এবং সংঘাত-সংঘর্ষের একটা বড় কারণ হলো জাতীয় মৌলিক ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের অভাব। জাতীয় এই মৌলিক ইস্যুগুলোর মধ্যে রয়েছে দেশ ও জনগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং আমাদের জাতিগত পরিচয়। জাতীয় এই মৌলিক ইস্যুগুলোর ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুধু ঐকমত্যের অভাবই নয়, প্রচণ্ড মতপার্থক্য ও বিরোধ রয়েছে। আমাদের জাতির ইতিহাসে অনেকগুলো মাইল-স্টোন আছে। ১৯৭১, ১৯৪৭, ১৯৪০, ১৯০৬, ১৯০৫, ১৭৫৭ ইত্যাদি এই মাইল-স্টোনের কয়েকটি। এই মাইল-স্টোনগুলোর ইতিহাস নিয়ে যেমন ঐকমত্য নেই (যেমন ১৯৭১

www.pathagar.com

সালে স্বাধীনতার ঘোষণা, জাতির জনক ইত্যাদি), তেমনি ঐকমত্য নেই জাতির পরিচয় ব্যাপারেও। জাতীয় মৌলিক ইস্যুতে এমন বৈপরিত্য কোন দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের রাজনৈতিক বিভেদ ও সংঘাতের বড় কারণ মৌলিক বিষয়ে এই মতবিরোধ। এই মতবিরোধের নিরসনকে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখতে হবে। জনাব নিজামীও জাতীয় এই বিষয়কে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এই বিষয়কে তাঁর নিবন্ধে নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট হিসেবে আলোচনা করেছেন। জাতীয় মৌলিক বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তিনি লিখেছেন, "বাঙলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং এই ব্যাপারে অবশ্যই ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে।"

আনন্দের বিষয় এই ঐকমত্য গড়ে উঠতে পারে যে ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর নিজামী সাহেব তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "আজকের বাংলাদেশ ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে মুসলিম জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিও এটাই। আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় চার জাতীয় নেতা মরহুম শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মরহুম মাওলানা ভাসানী ও মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক ছিলেন। মরহুম শেক মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মরহুম তাজউদ্দীন ও খোন্দকার মুশতাক আহমদ তাদের তরুণ বয়সে ঐ আন্দোলনে শরীক ছিলেন। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পন করে ১০ই জানুয়ারিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণে মরহুম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে ঘোষণাটি কেন দিয়েছিলেন তার তাৎপর্য ভেবে দেখার দাবি রাখে। এখানেই শেষ নয়। তিনি এর বাস্তবতার উপলব্ধি থেকেই প্রতিবেশী দেশ ও রাশিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওআইসির শীর্ষ সম্মেলনে লাহোরে যোগদানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৫-এর সিপাহী-জনতার মাঝে যে আবেগ-অনুভূতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আস্থাকে সকল কাজের উৎস হবার ঘোষণা দিয়ে। এক পর্যায়ে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে সংবিধানে স্থান দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশকে এখান থেকে পেছনে টানার সুযোগ নেই। কারণ, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এখানে মুসলিম শাসন ছিল দীর্ঘ ছয়শত বছর। দুশ' বছরের বৃটিশ শাসনেরও প্রথম ৫০ বছর আদালতে চালু ছিল ইসলামী শরীয়া আইন। দুশ' বছরের শাসনে তারা এটাকে মেটাতে চেয়েও পুরোপুরি মেটাতে পারেনি। আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তি এটাই। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ভিত্তিমূল হিসেবে এটার প্রতি সকলের স্বীকৃতি অবশ্যই থাকতে হবে।"

নিজামী সাহেব তার বক্তব্যে জাতীয় পরিচয়ের একটা রূপরেখা তুলে ধরেছেন। এই বক্তব্যের মৌলিক বিষয়ে যারা দ্বিমত পোষণ করেন, তাদের এ সংক্রান্ত মত কি তা আসা দরকার। তাছাড়া রাজনীতিকরা কিংবা কেউ যদি কোন নতুন বক্তব্য দিতে চান

www.pathagar.com

তাদের বক্তব্যও আসা দরকার। সবার বক্তব্য সামনে রেখে সত্যটা বের করে আনা দরকার, যে সত্য জনগণ দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করবে এবং যে সত্যের ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ থাকবে না। রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার নিয়ে আজ জাতীয়ভাবে যে আলোচনা চলছে, তার মধ্যে এ বিষয়টিকে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা দরকার। এই মৌলিক বিষয়ের সমাধান ছাড়া আমাদের রাজনৈতিক সংস্কার সম্পূর্ণ হবে না।

২৩ জুন, ২০০৭

রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল

রাজনীতিকদের মহাদুর্দিনের সময় এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব বদিউর রহমান রাজনীতিকদের জন্য আশার কথা বলেছেন। গত ২ জুলাই চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভায় সম্ভবত ব্যবসায়ীদের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "ব্যবসায়ীরা সকালে একজন পলিটিশিয়ান কিনে বিকেলে তাকে বিক্রি করে দিতে পারেন।" এনবিআর চেয়ারম্যান তার এই বিশাল মাপের বক্তব্যের কারণও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পলিটিশিয়ানদের চেয়ে আমলারা অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট। কিন্তু ব্যবসায়ীরা পলিটিশিয়ান ও আমলাদের চেয়েও ইন্টেলিজেন্ট।'

এনবিআর চেয়ারম্যানের উক্তিকে আমি রাজনীতিকদের জন্য আশার কথা বলছি এই জন্য যে, তাদের দুর্দিনের দায় তার কথায় কিছু লাঘব হতে পারে। কারণ অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমানদের চারপাশে যদি বেশি বুদ্ধিমানের বাস হয়, তাহলে কম বুদ্ধিমানদের দুর্নীতি দুরাচারের দায় চারপাশের বুদ্ধিমানদের ওপর বেশিরভাগ না হলেও একটা বড় অংশ অবশ্যই বর্তায়। চারপাশের বেশি বুদ্ধিমানরা সৎ হলে, ন্যায়ের পক্ষে সক্রিয় হলে মাঝের কম বুদ্ধিমানরা, যা বলা হচ্ছে, লুট-আত্মসাতের সয়লাব বহাতে পারতো না।

কথাগুলো এনবিআর চেয়ারম্যানের কথার প্রেক্ষিতে 'মজা' করার জন্য বলছি না। একশ্রেণীর রাজনীতিকের দুর্নীতি-দুরাচারপনার কারণে গোটা রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে এমন সব কথা বলা হচ্ছে, যা দেশের চিন্তাশীল মহলকে হতভম্ব করার মত। গত ৪ জুলাই ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার একটা উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। তার শিরোনাম হলো : Should political parties be banned for wholesale corruption? (সর্বব্যাপী দুর্নীতির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত কিনা) শিরোনামে প্রশ্ন চিহ্ন রাখা হলেও নিবন্ধের বক্তব্যে রাজনীতিকদের যেভাবে মুণ্ডুপাত করা হয়েছে, তাতে সব রাজনৈতিক দলকে কার্যত নিষিদ্ধ করতেই বলা হয়েছে। স্টারের নিবন্ধে রাজনীতিকদের যে ছবি আঁকা হয়েছে তার কিঞ্চিৎ এখানে তুলে ধরা যাক। নিবন্ধকার লিখেছেন, "গত ১৫ বছর রাজনীতিকদের আচরণে মানুষ দারুণ আহত ও বিক্ষুব্ধ। শাসক কিংবা বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলের গোটা রাজনীতিক গোষ্ঠীর (whole lot) দ্বারা মানুষ প্রতারিত, বিভ্রান্ত, বিপথগামী হয়েছে এবং তারা

www.pathagar.com

মাংসাসী জন্তুর মত মানুষকে কুরেকুরে খেয়েছে।" স্টারের নিবন্ধ অনুসারে সব রাজনীতিকরা মিলে এই কাজগুলোই করেছেন। কোনই ভাল কাজ তারা করেননি। তাহলে দেশের উন্নয়ন কিভাবে হলো? সরকার যদি কিছুই না করে থাকে, দেশের উন্নয়ন করল কে? এরও উত্তর দিয়েছেন স্টার পত্রিকার নিবন্ধকার। বলেছেন যে, ব্যবসায়ী, আমলা ও পেশাজীবীরাই এই উন্নয়ন করেছেন। লিখেছেন তিনি, "দেশ উন্নতি করেছে কারণ সাধারণ সৎ মানুষ, কৃষক, মিস্ত্রি, স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার এবং সরকারি আমলারা কঠোরভাবে কাজ করেছেন।"

ডেইলি স্টার পত্রিকার উল্লেখিত নিবন্ধটির উদ্ধৃতি দুইটিতে এ কথা পরিষ্কার যে, দেশের রাজনীতিকরা সবাই মিলে গত ১৫ বছর ধরে দেশজুড়ে শুধুই লুটপাট চালিয়েছে, আর ব্যবসায়ী, আমলা ও পেশাজীবীরা রাজনীতিকদের এই লুটপাটের মধ্যে দিয়েই দেশের বর্তমান বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়েছেন। এই আষাঢ়ে গল্পটি দৈনিক স্টারের সহকারী সম্পাদক শাহনুর ওয়াহিদের। লেখক কেন লিখেছেন, তাঁর গন্তব্য কোন দিকে, এ বিষয়ে আলোচনায় পরে যাব। তার আগে এনবিআর চেয়ারম্যানের কথায় ফিরে যেতে চাই। তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলেছেন ব্যবসায়ীদের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বুদ্ধিমান তার মতে আমলারা। আর সবচেয়ে কম বুদ্ধিমান, তিনি বলেছেন, রাজনীতিকরা, যাদের ব্যবসায়ীরা সকালে কিনে বিকেলে বিক্রি করতে পারে। এখন একটা দেখার বিষয় হলো, অভিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে রাজনীতিকরা সর্বোচ্চে এবং বুদ্ধিমান হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্নে, রাজনীতিকদের এই দুর্দশা কেন?

একবাক্যে এর কারণ হলো, রাজনীতিকরা রাজনীতিক, তারা জনগণের মধ্যে জনগণের জন্য কাজ করেন এবং তারা জনপ্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দায়িত্বে যান বা যেতে চান। এই পরিচয়ের দিক থেকে রাজনীতিকরা আমলা ও ব্যবসায়ীদের থেকে একেবারেই ভিন্ন। আমলাদের সাথে জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। জনগণের সাতে-পাঁচে তারা নেই, জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিতারও কোন প্রশ্ন নেই। ব্রীজ হলো না কেন, রাস্তা নেই কেন, স্কুল ভাঙ্গা কেন, অপরাধ বাড়ছে কেন, বিচার নেই কেন –এমন হাজারো 'কেন'-এর জবাব আমলারা জনগণকে দেয় না, দিতে হয় রাজনীতিকদেরকে, রাজনীতিকদের সরকারকে। অন্যদিকে জনগণের সাথে ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক পক্ষ-প্রতিপক্ষের মত। শিল্প ব্যবসায়ীরা উৎপাদক, আমদানিকারক ও বিক্রেতা আর জনগণ হলো ক্রেতা। শিল্প-ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য হলো পণ্যের বিক্রয় মূল্য বাড়িয়ে তাদের সর্বোচ্চ লাভ নিশ্চিত করা, আর জনগণের চাওয়া হলো সহনীয় মূল্যে পণ্য কিনতে পারা। শিল্প-ব্যবসায়ীদের সাথে জনগণের এই দ্বন্দ্বমান দর কষাকষিতে সব সময় পরাজিত ও প্রতারিত হয় জনগণ। ব্যবসায়ীদেরকে এর জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। এখানেও জবাবদিহি করতে হয় রাজনীতিকদেরকে। পণ্যের মান খারাপ কেন, সরবরাহ কম কেন, মূল্য বেশি কেন– এসব প্রশ্নের জবাব জনগণকে রাজনীতিকদেরই দিতে হয়।

এর অর্থ হলো, আমলারা সরকারের, অন্য অর্থে রাজনীতিকদের কাজের হাত হিসেবে সরকারি অর্থ নাড়াচাড়া করেন, প্রশাসনের শাসক হিসেবে জনগণের ওপর ছড়ি ঘুরান এবং ব্যবসায়ীরা জনগণের মূল্যে কোটি কোটি টাকার মুনাফা গুণেন, কিন্তু

www.pathagar.com

পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয় বেচারা রাজনীতিকদেরকে। তাদেরকে আমলাতন্ত্রের স্বার্থ দেখতে হয়, কারণ তারাই রাজনৈতিক সরকারের হাত-পা। রাজনীতিকদেরকে ব্যবসায়ীদেরও মন যুগিয়ে চলতে হয়, কারণ অর্থ শক্তির মালিক-মোক্তার ব্যবসায়ীরাই। জনগণের সাথে সম্পর্কহীন এই দুইপক্ষকে ম্যানেজ করেই রাজনীতিকদেরকে জনগণের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে হয়, তাদের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হয়।

এই কঠিন ও ব্যাপক কাজ করতে গিয়ে আধুনিক রাজনীতির প্রবণতা অনুসারে রাজনীতিকদের প্রয়োজন হয় প্রচুর পয়সার। এর অর্থ ভোট নেবার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থ, প্রয়োজন হয় জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্যেও। একজন রাজনীতিকের কাছে জনগণের, তার ভোটারদের চাহিদা অনেক। তারা মনে করে তাদের কারও ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে এমপি তাকে খুলে এনে দেবেন, কারও বিরুদ্ধে মামলা হলে তাকে উদ্ধার করে দেবেন, কারও ছেলের চাকরি না থাকলে তা পাইয়ে দেবেন, চাকরিতে কোন সংকট হলে তা দূর করবেন। স্কুল-কলেজ-মাদরাসা মঞ্জুরি পাওয়া-না পাওয়া, সাহায্য পাওয়া-না পাওয়া, বিল্ডিং হওয়া না হওয়া, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট তৈরী হওয়া, না হওয়া, মানুষের অভাব-অভিযোগ-সংকট-সমস্যার সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে পারা, না পারা ইত্যাদির ওপর এলাকার এমপি ও রাজনীতিকদের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে। এছাড়া নির্বাচনের সময়তো বটেই নির্বাচনের পর ও পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত কর্মী-সমর্থকদের দাবি-দাওয়া, অনুযোগ-আবদার শুনতে হয় এবং যথাসাধ্য তাদের পোষণ করতে হয়। শুধু জনপ্রিয়তা ধরে রাখা নয়, ব্যক্তিগত ও দলীয় রাজনীতি-রক্ষার জন্যও এটা করতে হয়। আমাদের মত দেশে এটাই এখনও একটা রাজনৈতিক কালচার। এর বাইরে সাধারণত কোন রাজনীতিক যান না, যেতে পারেন না। এর জন্য প্রচুর পয়সার প্রয়োজন হয় রাজনীতিকদের। রাজনীতিকদের এই প্রয়োজনটাকেই লুফে নেয় আমলা ও ব্যবসায়ীরা। বুদ্ধিমান আমলারা (সবাই নয়, যেমন রাজনীতিকরাও সবাই এটা করেন না) কম বুদ্ধিমান রাজনীতিকদের টাকা কামাইয়ের পথ-ঘাট হাতে-কলমে শিখিয়ে দেন। অন্যদিকে সবার চেয়ে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা টাকার থলে নিয়ে হাজির হন রাজনীতিকদের কাছে। তারা এই অর্থ রাজনীতিকদের দানও (যদিও বলা হয় donation) করেন না, চাঁদাও দেন না। তারা বিনিয়োগ করেন, লক্ষ্য, এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করে একশত কোটি টাকা অর্জন। ব্যবসায়ীদের এই বিনিয়োগ-বুদ্ধির কাছে আমলারাও নস্যি। কারণ আমলারা রাজনীতিকদের টাকা কামাইয়ের পথ দেখিয়ে যে শেয়ার হাত করেন, তা ব্যবসায়ীদের মত অতবড় বিনিয়োগ-বাণিজ্য নয়। এদিক থেকে এনবিআর চেয়ারম্যানের উক্তি খুবই সংগত যে, ব্যবসায়ীরা রাজনীতিকদের চেয়েতো বটেই, আমলাদের চেয়েও বুদ্ধিমান। এই 'বুদ্ধি'র সংজ্ঞা এনবিআর চেয়ারম্যান কি দেবেন জানি না, তবে আমার মতে এই বুদ্ধিটা হলো টাকার শক্তি। এই বুদ্ধিটার নাম বলা যায় 'ব্যবসায়-বুদ্ধি'। ব্যবসায়-বুদ্ধি চরিত্রগতভাবে আত্মকেন্দ্রীক এবং তাকে সৎ ও সাধু বলা যায় না। এই ব্যবসায়ীদেরকেই দৈনিক 'স্টার'-এর নিবন্ধকার দেশের সব উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নিয়ামক বলেছেন। আরও নিয়ামক বলেছেন আমলা ও পেশাজীবীদের। আর উন্নয়ন নাশকারী ধরেছেন রাজনীতিকদের, মানে রাজনীতিকদের সরকারকে। বলেছি, এটা একেবারেই একটা আষাঢ়ে গল্প। ব্যবসায়ী, আমলা, পেশাজীবী সবারই অবদান

www.pathagar.com

আছে উন্নয়নে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবদান আছে রাজনীতিকদের, রাজনীতিকদের সরকারের। কারণ, তারা ব্যবসায়ী, আমলা ও পেশাজীবীদের চালক শুধু নয়, উন্নয়নের পরিকল্পক এবং পরিচালকও। ব্যবসায়ী, আমলা, পেশাজীবী সকলেই উন্নয়নের হাত-পা, কিন্তু উন্নয়নের মাথা হলো রাজনীতিকদের সরকার। মাথা বাদ দিয়ে হাত-পায়ের কোন মূল্য নেই। এখন দেশে রাজনৈতিক সরকার নেই, কিন্তু তাদের জায়গায় আছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এরা রাজনীতিকদের আসনে বসেই দেশ চালাচ্ছেন। এদের মাথাটাও রাজনৈতিক মাথা।

রাজনীতিকরা যে অর্থলিপ্সা বা তাদের টাকার যে প্রয়োজনের কারণে তারা ব্যবসায়ীদের 'বাণিজ্য-বুদ্ধি'র শিকার হন, সে ব্যাপারে আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজনীতিকদের টাকার যে প্রয়োজনের কথা উপরে বলা হলো তা যৌক্তিক কিনা। রাজনীতিকরা সৎ, সজ্জন হলে, জনদরদী হলে রাজনীতি করার জন্য, ভোট যোগাড়ের জন্য, দল রক্ষার জন্য, কর্মী-সমর্থকদের পোষণের জন্য টাকার প্রয়োজন পড়বে কেন? পড়বে না, নীতিগতভাবে একথাই ঠিক। রাজনীতিক, ভোটার এবং দেশের মানুষ সবাই সৎ, সচেতন ও দায়িত্বশীল হলে রাজনীতি করার জন্য ঐ রকম টাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের চাওয়া এমন আইডিয়াল সিচুয়েশন বাংলাদেশে নেই। বাংলাদেশে কেন দৃশ্যমান কোন দেশেই এই আইডিয়াল সিচুয়েশন নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের শিরোমণি দেশ। সেখানে গণতন্ত্রের বয়স দুশ' বছরের বেশি। সেখানে মানুষের আমাদের দেশের মতো অভাব-অনটনও নেই। তারা ধনেও সেরা, শক্তিতেও সেরা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দিক দিয়েও সেরা। এই সব সেরাদের দেশের রাজনীতিতে কিন্তু টাকারই সেরা ভূমিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন শীর্ষ রাজনীতিবিদ বলেছেন, "Money is the mother's milk of politics. (টাকা হলো রাজনীতির মায়ের দুধ)" নির্বাচনে টাকার সয়লাব হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে খরচ হওয়া সরকারিভাবে জ্ঞাত টাকার পরিমাণই হলো ৬০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নির্বাচনে বিজয়ী প্রত্যেক সিনেট সদস্যের সরকারিভাবে জ্ঞাত খরচের গড় পরিমাণ ৭ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার। এই জ্ঞাত খরচের বাইরে রয়েছে বিশাল খরচের অংক, যার হদিস সরকারের পক্ষে নেয়া সম্ভব হয় না। 'The State of Campaign Finance' শীর্ষক প্রবন্ধে Josehp E. Cantor লিখেছেন, "In contemporary elections, political parties and interest groups both contribute to favored candidates and spend money more directly to maximize their own influence on the election outcome. This phenomenon makes it harder to monitor the flow of money in election." (Election 2001, US Department of State, Bureau of International Information Programs, page-31) অর্থাৎ সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্টমহল উভয় পক্ষ তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীদের টাকা দেয় এবং নির্বাচন বিজয়ে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে সরাসরি খরচ করে থাকে। এই অবস্থার কারণে নির্বাচনে কি পরিমাণ টাকা ঢুকে পড়ছে তা মনিটর কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলো প্রধান চারটি উৎস থেকে টাকা পায়। এক– ব্যক্তি নাগরিকদের

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ চাঁদা, দুই– রাজনৈতিক দলগুলোর স্ব স্ব তহবিল, তিন– স্বার্থ সংশ্লিষ্টমহল এবং চার– প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎস। আমাদের দেশেও রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিলের উৎস এই ধরনেরই। তবে আমাদের দেশে ব্যক্তি নাগরিকদের কাছ থেকে রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলো আমেরিকান রাজনীতিকদের মত চাঁদা তোলে না। আমেরিকার রাজনীতিকদের তহবিলের তৃতীয় উৎস 'স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল'ই কার্যত বাংলাদেশী রাজনীতিকদের তহবিলের প্রধান উৎস। বাংলাদেশে এই 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল'-এর প্রধান অঙ্গ হলো ব্যবসায়ীরা। অর্থ লিপ্সা ও টাকার প্রয়োজনের দিক দিয়ে মার্কিন রাজনীতিক ও বাংলাদেশী রাজনীতিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের বিনিয়োগ-বাণিজ্যের শিকার হয়ে যে দুর্নীতি করতে বাধ্য হয় বাংলাদেশের রাজনীতিকরা, সেই একই ধরনের দুর্নীতি করে থাকে মার্কিন রাজনীতিকরা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের প্রভাবে। Joseph E. Cantor তার প্রবন্ধে এরও স্বীকৃতি দিয়েছেন। লিখেছেন, "... ... high spending in US elections, combined with the reliance for funds on private sources, raises concerns about undue influence over public policy by wealthy donors and interests." (ঐ) অর্থাৎ মার্কিন নির্বাচনসমূহে বিশাল মাপের খরচ এবং তহবিলের জন্য প্রাইভেট উৎসের প্রতি নির্ভরতা রাষ্ট্রীয় নীতি কর্মে দাতা ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

সুতরাং গণতন্ত্রের পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলের তুলনায় বাংলাদেমের রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলসমূহ মৌলিক ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে না, এক আচরণগত অসহনশীলতা ও ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে মরিয়া হওয়া ছাড়া। তবে এই নেতিবাচকতাও বাংলাদেশের সব দল ও সব রাজনীতিকের জন্যে প্রযোজ্য নয়।

'ডেইলি স্টার'-এর নিবন্ধ কেন সব দোষ রাজনীতিকদের ওপর চাপাল এবং কেন নিবন্ধটি কার্যত রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করতে বললা, এখন সে আলোচনায় আসা যায়। যেসব 'কেন'র উল্লেখ এখানে করলাম, তার উত্তর ডেইলি স্টার-এর নিবন্ধটিই তার পরবর্তী প্যারাগ্রাফে দিয়েছে। উত্তরটা আঁতকে উঠার মত। নিবন্ধটি 'মিলিটারি ডিক্টেটরশীপ'কে উৎকৃষ্টতর অপশন হিসাবে সামনে এনেছে। তার মতে 'তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসকদের চেয়ে অতীতের মিলিটারী বা স্বৈরাশাসকরাই ভাল ছিল। নিবন্ধে লেখা হয়েছে, "... The 'so called democratic' rulers were no better than the military or autocratic rulers." নিবন্ধের এই উক্তিটা খুব বড় নয়, সরাসরি-শক্ত কোন পরামর্শও নয়, কিন্তু ছোট এই কথা আমাদের সামনে বড় একটা দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে।

ডেইলি স্টার-এর নিবন্ধ যে 'মিলিটারী ডিক্টেটরশীপ'কে ভাল মনে করেছে, আমাদের প্রতিবেশী একটি দেশেরও কিন্তু গোপন অভিলাষ এটাই। সে দেশটি বড় ভাইগিরীর অভিভাবকত্ব নিয়ে বাংলাদেশের মাথায় চেপে বসতে চায়। এই চেপে বসার ক্ষেত্রে তার প্রধান বাধা হলো বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী রাজনৈতিক শক্তি এবং সেনাবাহিনী। তারা জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ধ্বংস চায় এবং সেনাবাহিনীকে

www.pathagar.com

করতে চায় বিতর্কিত। বিতর্কিত করার জন্যেই তারা চায় আমাদের সেনাবাহিনী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড় ক। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী রাজনৈতিক দল শুধু নয়, দেশের গোটা রাজনৈতিক শক্তি বলা যায় আজ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। অটুট একমাত্র সেনাবাহিনী। এখন সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িয়ে বিতর্কিত করতে পারলেই বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যাকবন ভেঙ্গে দেয়া সম্ভব। এটাই চাচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী দেশটি। দু'দিন আগে দেশের দু'জন খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এ দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করে সকলকে সাবধান হওয়ার জন্যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। দেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং জাতীয় অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান সাম্প্রতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে 'দৈনিক আমার দেশ'-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "বর্তমান দৃশ্যপটে আমরা চারটি শক্তি দেখতে পাচ্ছি। এগুলো হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সেনাবাহিনী, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষণস্থায়ী।

বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এ দুটি রাজনৈতিক শক্তিকে যদি সংস্কারের নামে দুর্বল করে ফেলা হয়, তাহলে দেশে একক ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হবে সেনাবাহিনী। এর ফলে সেনাবাহিনী জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় হবে। আর এটা হবে সবচেয়ে বিপর্যয়কর। ... তাহলে জাতি হিসাবে আমরা যে ক্ষতির মধ্যে পড়বো তা থেকে উত্তরণ মোটেই সহজ হবে না।" অন্যদিকে একইদিনে 'দৈনিক আমার দেশ'-এর সাথেই এক সাক্ষাৎকারে বিশিস্ট বুদ্ধিজীবী ও কলামিস্ট ফরহাদ মজহার তার বক্তব্যের এক জায়গায় বলেছেন, "আমি বার বার একটি কথাই মনে রাখতে বলছি যে, এই সংকটের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছ থেকে আমাদের সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে।" (দৈনিক আমার দেশ, ৭ জুলাই, ০৭) এখানে দেশের দুই প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যে যে আকুল আকুতি প্রকাশ পেয়েছে সেটা হলো, জনগণের গৌরবের এবং নির্ভরতা ও নিরাপত্তার শেষ ভরসাস্থল সেনাবাহিনী বিতর্কিত হয় কিংবা জনগণের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এমন অবস্থা সৃষ্টি না হোক। এটা জনগণেরও কথা। কিন্তু দেশের শত্রুদের চাওয়া হলো, আমাদের রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল দুর্বল, বিপর্যস্ত হোক এবং আমাদের সেনাবাহিনী রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আসুক। এরপর শত্রুদের কাজ হবে খোদ সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা, যা সৃষ্টি করবে দেশে নৈরাজ্য। আসলে শত্রুরা চায় আমাদের দেশে এই নৈরাজ্যই, যাতে এ দেশকে অকার্যকর অভিহিত করে একে আরেক সিকিম তারা বানাতে পারে। বেদনার বিষয় 'ডেইলী স্টার'-এর নিবন্ধে কৌশলে শত্রুদের এই চাওয়াকেই তুলে ধরা হয়েছে, প্রমোট করা হয়েছে।

শত্রুদের, শত্রুর এজেন্টদের এই ষড়যন্ত্র থেকে দেশকে, দেশের অতন্দ্রপ্রহরী সেনাবাহিনীকে রক্ষা করার জন্য রাজনীতির স্বাভাবিকতায় আমাদের ফিরে আসতে হবে। রাজনীতিকদের একটা অংশের যে চরিত্র বিপর্যয় ঘটেছে, তাকে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের চরিত্র বিপর্যয়ের একটা অংশ এবং চলমান প্রবণতার একটা ফল হিসেবে দেখতে হবে। সংস্কারের মাধ্যমে রাজনীতিকদের এ বিপর্যয় রোধ করতে হবে, চরিত্র-বিপর্যয় রোধ করতে হবে ব্যবসায়ী ও আমলাদেরও। না হলে তাদের কু-চরিত্র রাজনীতিকে যেমন কলুষিত করেছে, ভবিষ্যতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। কিন্তু কোনভাবেই দেশের রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলকে খাটো করে ফেলা যাবে না। রাজনীতিকরা

www.pathagar.com

বিতর্কিত, সমালোচিত কোন দেশে নয়; জনগণের মধ্যে জনগণের জন্য কাজ করে বলেই তারা স্বাভাবিকভাবে আলোচনা-সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও রাজনৈতিক দল তীব্র সমালোচনার শিক্ষার। 'Political Parties in the Unites States' নিবন্ধে John F. Bubby লিখছেন, "Inspite of the long and impressive evidence of partnership within the Amercian political system, an ingrained component of the American civic culture is a distrust of political parties. The adoption of the primary system for nominating congressional and state candidates early in the 20th century, and the more recent proliferation of the presidential primaries, which have become the determining factor in presidential nominations are testimony to anti-party sentiment within the public. Americans are uncomfortable with the leaders of their party organisations exercizing great power over their government." (Elections 2001, US Department of State, Bureau of International Information Programs, page-4)

মিঃ জন এফ বাব্বি'র এই বক্তব্যের সারকথা হলো, আমেরিকান পলিটিক্যাল সিস্টেমে পারস্পরিক সমঝোতা ও অংশীদারিত্বের দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনাস্থার একটা কালচার মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস প্রার্থীদের নমিনেশেন পদ্ধতির বিভিন্ন সংস্কার তাদের এ্যান্টি-পার্টি মনোভাবেরই প্রকাশ। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা তাদের সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করে এটাকে মার্কিন নাগরিকরা খুব অস্বস্তির চোখে দেখে।

দুইশ' বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মার্কিন রাজনৈতিক দলগুলো যদি এই সমালোচনার সম্মুখীন হয়, তাহলে আমাদের দুই যুগ-আড়াই যুগের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনীতিকরা ও রাজনৈতিক দলগুলো আরও দোষ-ত্রুটি করবে, আরও সমালোচনার সম্মুখীন হবে, এটাই স্বাভাবিক। মার্কিন গণতন্ত্র সংস্কার সংশোধনের মাধ্যমেই সামনে অগ্রসর হয়েছে। তাদের সংস্কার এখনও চলছে। আমাদেরকেও অপরাধীদের শাস্তি এবং সংস্কার সংশোধনের মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হতে হবে। তা না করে যদি রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলোরই মুণ্ডুপাত করি, তাহলে গণতন্ত্রের দু'আড়াই যুগে আমরা যতটা এগিয়েছি, ততটাই আবার পিছিয়ে পড়বো। ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন উত্তরণ অসম্ভব না হলেও কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সুতরাং রাজনীতির সংস্কার হোক, রাজনীতিকদের যারা দোষী তাদের বিচার হোক, কিন্তু রাজনীতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ঠিক হবে না, রাজনীতিকদের মাঠছাড়া করা উচিত হবে না এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্বল ও তাদের ধারাবাহিকতা ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করা ঠিক হবে না। মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক মাওলানা আকরাম খাঁ'র সম্পাদিত দৈনিক আজাদের একটা সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করে আমার আজকের বক্তব্য শেষ করতে চাই। সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে প্রবেশের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ১৯৬২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর দৈনিক আজাদ লিখেছিল, "দেশে রাজনীতি চলিবে কিন্তু রাজনৈতিক দল থাকিবে না, এ অবস্থা চলিতে পারে না। দলহীন রাজনীতি আর

www.pathagar.com

নোঙ্গরহীন নৌকার অবস্থা সমান। এ অবস্থা আগুন নিয়ে খেলার শামিল। এরূপ পরিবেশে রাজনীতি করিতে যাওয়া আর নৈরাজ্য এবং উচ্ছৃংখলতা ডাকিয়া আনা একই কথা।" প্রায় অর্ধশত বছর আগে দৈনিক আজাদের এ সম্পাদকীয় নিবন্ধে মাওলানা আকরম খাঁ দেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, রাজনীতির জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিকে অপরিহার্য হিসেবে দেখেছিলেন। এ সম্পাদকীয় লেখার ৪৪ বছর পর এ দেশেরই বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানও তাঁর এক বক্তব্যে শক্তিশালী, সংহত রাজনৈতিক দলকে জাতি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সমার্থক হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "রাজনৈতিক ইনস্টিটিউশন যদি (ভাঙন বা নেতৃত্ব সংকটের কারণে) দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে জাতি রাষ্ট্র হিসেবে আমরা আদৌ টিকে থাকতে পারবো কিনা, সে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেবে। কারণ শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামো ছাড়া কোনো জাতি রাষ্ট্র কখনো টিকে থাকতে পারে না।" (দৈনিক আমার দেশ, ২ জুলাই, ০৭) অতএব ডেইলী স্টার-এর উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ (Should political parties be banned for wholesale corruption?) রাজনৈতিক দলগুলোকে সব ক্ষতি ও ধ্বংসের নিয়ামক ধরে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার কথা বলে কার্যতঃ আমাদের এই প্রিয় জাতি-রাষ্ট্র ও জাতি-রাষ্ট্রের অতন্দ্রপ্রহরী সেনাবাহিনীকে যুগপৎ ধ্বংসের শত্রু-ষড়যন্ত্রের 'হিজ মাস্টার ভয়েস' হিসেবেই কাজ করেছে।

৭ জুলাই, ২০০৭

বিদ্যুৎ খাতে কালো হাত

বিদেশী সাহায্য কোন দেশকে কোন সময় স্বনির্ভর করেনি, স্বনির্ভর করে না। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা দুর্দশাই বাড়িয়ে থাকে। এক পর্যায়ে সাহায্য নামক বস্তুটি উন্নয়নশীল দেশের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে বসে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল বিশ্ব ঋণ পরিশোধ করে ১ লাখ কোটি ডলার। বিস্ময়ের বিষয় এই পরিশোধ সত্ত্বেও কিস্তির বকেয়া ও নতুন ঋণসহ ১৯৮৩ সালের ৮০ হাজার কোটি ডলার সাহায্য ১৯৯০ সালে ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি ডলার এবং ১৯৯৭ সালে উন্নীত হয় ২ লাখ কোটি ডলারে। এককভাবে আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ১৯৮৪ সালের ৮ হাজার ৪শ' কোটি ডলার ঋণ উপরোক্ত সময়ে ২০ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হয়। উন্নয়নশীল দরিদ্র বিশ্বের এই উদ্বেগজনক দায় বৃদ্ধির কারণ শিল্পোন্নত বিশ্ব সাহায্য আকারে দরিদ্র দেশগুলোকে যা দেয়, তার চেয়ে বেশি তারা নিয়ে যায়। এই প্রবণতা বাড়ছে। ২০০২ সালে শিল্পোন্নত বিশ্ব উন্নয়নশীল দেশ থেকে নিয়েছিল ২২৯ বিলিয়ন ডলার। আর ২০০৬ সালে ৭৮৪ বিলিয়ন ডলার বেশি নিয়েছে। এটা দাতাদের এক ধরনের শোষণেরই ফল। সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রে তারা আন্তরিক নয়। যেসব খাতে সাহায্য দিলে দেশ দ্রুত উন্নতি করবে, দেশ স্বাবলম্বী হবে, তেমন খাতে তারা সাহায্য দেয় না। আমাদের কৃষি খাত কখনই দাতা দেশের সুনজর পায়নি। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত আমরা উন্নয়ন খাতে খরচ করিছে ২ লাখ ৮৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে পাওয়া সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা। বিদেশী এই

www.pathagar.com

সাহায্যের মধ্যে কৃষি উন্নয়নে প্রত্যক্ষ সাহায্য নেই বললেই চলে। অথচ কৃষিই বাংলাদেশের জন্যে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবার মাধ্যম ছিলো। অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাতেও দাতারা আন্তরিকভাবে সাহায্য করে না। সাহায্য করলেও তাদের নিয়ন্ত্রণ ও শর্তাবলী অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পকে বিলম্বিত করে সমস্যায় ফেলে একে কার্যত ভণ্ডুল করে দেয়।

আমাদের বিদ্যুৎ সেক্টর বিদেশী কালো হাতের ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত এ ধরনেরই একটি খাত। বিদ্যুৎ খাত সম্পর্কে অভিযোগের শেষ নেই, এই খাতের ব্যর্থতারও কোন সীমা সরহদ নেই। উচ্চ পর্যায়ের একজন দায়িত্বশীল কিছুদিন আগে এক অভিযোগে বলেছিলেন, গত পাঁচ বছরে এক বিদ্যুৎ খাত থেকেই ২০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে। এই অভিযোগ নিঃসন্দেহেই এক অতি কথন। জোট সরকারের গৃহীত পাঁচটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে তদন্তের জন্য শক্তিশালী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্তের জন্য গটিত টাস্কফোর্সটির নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল ওয়াদুদ। তদন্তের আওতায় ছিলো ঘোড়াশাল-১ নামের ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, ঘোড়াশাল-২ নামের ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেঘনা ঘাট-২ নামীয় ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বগুড়ায় রেন্টালের একটা ২০ মেগাওয়াট ও কর্ণফুলী-৩-এর ১৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প। টাস্কফোর্স মাসাধিককালব্যাপী তদন্তের পর টাস্কফোর্সের প্রধান মেজর জেনারেল ওয়াদুদ রিপোর্ট পেশের সময় বলেন, প্রকল্পগুলোতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া বড় রকমের কোন অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা পাওয়া যায়নি।

রিপোর্টের বিষয়ে আরও বিস্তারিত বলেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা তপন চৌধুরী। তিনি বলেন, "বিভিন্ন দিক থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় আমরা বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো পর্যালোচনার জন্য টাস্কফোর্স গঠন করেছিলাম। তারা রাত-দিন পরিশ্রম করে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই শেষে প্রকল্পগুলো এগিয়ে নেবার সুপারিশ করেছে। প্রকল্পগুলোতে বড় ধরনের অনিয়ম-অস্বচ্ছতা থাকলে টাস্কফোর্স প্রকল্প এগিয়ে নেবার সুপারিশ করতো না। তারা বিস্তারিত বিচার-বিবেচনা করেই নিয়মমাফিক ও স্বচ্ছ হওয়ায় প্রকল্পগুলো এগিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন।"

আলোচ্য এই প্রকল্পগুলো নতুন। জোট সরকারই এই প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল এসব প্রকল্প সম্পর্কে। কিন্তু সরেজমিন তদন্তে তেমন কোন দুর্নীতি পাওয়া যায়নি। আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের ভুয়া দুর্নীতির অভিযোগই বাংলাদেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছে দুনিয়ায়।

তাহলে কি বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি নেই? আছে। দুর্নীতি না থাকলে বিদ্যুৎ বিভাগে এত সংকট-সমস্যা কেন। সন্দেহ নেই আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত অবকাঠামোগত দিক থেকে খুবই নড়বড়ে। আমাদের মোট ২৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি কেন্দ্র সরকারি খাতে। এসব কেন্দ্রে রয়েছে মোট ৯৭টি ছোট-বড় ইউনিট। ইউনিটগুলোর অধিকাংশই বয়সের ভারে ন্যুব্জ। স্বাধীনতা-পূর্বকালের সাতটি ইউনিটকে এখনও চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। অবশিষ্ট ইউনিটের ২৯টির বয়স ২০ বছরের উপরে, ১৬টির বয়স এখন ১৫ বছর। দেশে প্রতিষ্ঠিত সবগুলো বিদ্যুৎ ইউনিট চালু থাকলে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৫শ ৮২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব (উৎপাদন ক্ষমতা ৫ হাজার ২শ' ৭৬ মেগাওয়াট)। বর্তমান বিদ্যুৎ চাহিদাও মোটামুটি সাড়ে ৪ হাজার মেগাওয়াটের মত।

www.pathagar.com

অতএব কাগজে-কলমে আমাদের তেমন একটা বিদ্যুৎ ঘাটতি নেই। কিন্তু বিদ্যুৎ ইউনিট বন্ধ থাকা, ঘন ঘন বন্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণেই বিদ্যুৎ চাহিদা ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়ে। এই সংকট সৃষ্টির মূলে এবং সংকট-উত্তরণের ক্ষেত্রেই রয়েছে সীমাহীন দুর্বলতা ও দুর্নীতি।

এই দুর্নীতি ও দুর্বলতার স্বরূপটা খুবই জটিল। তবে এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নয়, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্নীতি-দুর্বলতাই অত্যন্ত প্রকট। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কর্মরতদের অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা ও দুর্বলতা, সমস্যাগ্রস্ত ইউনিটগুলোর মেরামতে দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতা, কেনাকাটার টেন্ডার ও স্থাপন টেন্ডার নিয়ে ভানুমতির খেল ইত্যাদি সমস্যাই সংকট কবলিত করে রেখেছে বিদ্যুৎ খাতকে। শেষের সমস্যাগুলোই বিদ্যুৎ খাতকে পঙ্গু করে রেখেছে। আর এ সমস্যাগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে মধ্যমণি হিসেবে অধিষ্ঠিত রয়েছে বিদেশী দাতা সংস্থাসমূহের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্র। তারাই হলো দুর্নীতির রাজা এবং তারাই আমাদের দেশের সরল, অনভিজ্ঞ আমলাদের দিয়ে দুর্নীতি করিয়েছে, দুর্নীতি শিখিয়েছে। কম বুদ্ধিমান রাজনীতিক নন, বেশি বুদ্ধিমান আমলা-ঠিকাদারদের (ব্যবসায়ী) দুর্নীতির দুষ্ট চক্রই আমাদের অন্যান্য খাতের মত বিদ্যুৎ খাতকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পশ্চিমী দাতাগোষ্ঠী ও দাতা সংস্থাগুলোর কোন জবাবদিহতা নেই, প্রকল্প, প্রকল্পের সংস্কার, প্রকল্পের দেখাশোনার জন্যে এডিবি ও বিশ্বব্যাংক বিদেশী উপদেষ্টা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়। দেখাশোনা ও মেরামত-সংস্কারে তাদেরই কর্তৃত্ব চলে, কিন্তু তাদের কোন দোষ নেই, কোন দোষই তাদের স্পর্শ করতে পারে না। আমরা যদি আমাদের বিদ্যুৎ প্রকল্প ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর দুরবস্থা ও এসবের সমস্যা-সংকটের দিকে তাকাই, তাহলে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাবো। দাতাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাথে শর্ত হিসেবে বিদেশী বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞরাও আমাদের দেশে প্রবেশ করে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ইউরোপীয়-আমেরিকান হলেই তিনি বিশেষজ্ঞ হয়ে যান। তার যাচাই-বাছাই হয় না, তার যোগ্যতা, কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। আমাদের দেশে এমন বিদ্যুৎ প্রকল্পও আছে যেখানে ৩০ বছর বিদেশী বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন। গত বছর আগস্টের এক তথ্য অনুসারে আমাদের রাউজান বিদ্যুৎ প্রকল্পে ১১ জন, ঘোড়াশালে ৭ জন, সিদ্ধিরগঞ্জে ১৭ জন, আরপিসিএল-এ ৪ জনসহ সব বিদ্যুৎ প্রকল্পেই বিদেশী বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত, ওভারহলিং ইত্যাদি কাজ বিদেশী দাতা সংস্থার মনোনীতদের দ্বারাই করিয়ে নিতে হয়। এখানেই সৃষ্টি হয় আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার বড় সংকট, এখানেই চলে দুর্নীতিরও মহোৎসব।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে জড়িত বিদেশী দাতা ও সংশ্লিষ্ট বিদেশী সংস্থার স্বেচ্ছাচারিতা ও বাংলাদেশের অসহায়ত্বের একটা দৃষ্টান্ত হলো বিদেশী কোম্পানী সিমেন্স আমাদের দেশীয় সংস্থা রুরাল পাওয়ার কোম্পানীর (আরপিসি) সাথে ঝগড়া করে কাজ ত্যাগ করে চলে যাওয়া এবং একতরফাভাবে বাড়তি শর্ত আরোপ করা। ২০০০-০১ সালে সিমেন্স ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃতীয় পর্বের নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষর করে ২০০২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আরপিসি'র সাথে। লক্ষ্য ছিল, ৭০ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন। এক পর্যায়ে অর্থ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঝগড়ার অজুহাতে সিমেন্স কাজ বন্ধ করে দিয়ে সরে আসে। পরে কাজ শুরু করার শর্ত হিসেবে ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হোক না বা হোক একটা নির্দিষ্ট সময়ে তার

www.pathagar.com

৪৯১ কোটি টাকা বুঝিয়ে দিতে বলে। ৩০ মে '০৬-এর এক খবর অনুসারে, কাজ বন্ধ করে সরে পড়া এবং চুক্তির ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত না করে টাকা চাওয়া চুক্তির খেলাফ কি না এ প্রশ্ন তুলে সিমেন্সকে অভিযুক্ত করার বদলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিমেন্সকে কিভাবে টাকা দেয়া যাবে এ নিয়ে বিদ্যুৎ প্রশাসন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদেশী কোম্পানীর জবাবদিহিহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আরেকটি চিত্র চট্টগ্রামের শিকলবাহা ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন হতো ৪২ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদন বাড়াবার জন্যে দু'দফা ওভারহলিং করা হয় ১৯৯২ সালে ও ১৯৯৯ সালে। ব্যয় হয় যথাক্রমে ১৪ কোটি ও ১০ কোটি টাকা। ওভারহলিং করেন নির্মাতা কোম্পানী চেকোশ্লোভাকিয়ার স্কোডা কোম্পানী। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন না বেড়ে বরং ১৮ মেগাওয়াট কমে যায়। নানা রকম দুর্নীতির দায় চাপে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর। শক্তিশালী তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। কিন্তু তারা বিদেশী কোম্পানীর কেশ স্পর্শ করেছে বলে জানা যায়নি। বিদেশী কোম্পানী অপকীর্তি করে খুলনার ১১০ মেগাওয়াট ও ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়েও। খুলনা ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সালে মিনি ওভারহলিংসহ মোট চারবার (১৯৯৯, ২০০০, ২০০৫) মেরামত ও ওভারহলিং-এ মোট খরচ হয় ৪৪৭ কোটি টাকা('৯৯ সালে ১৭৫ কোটি, ২০০০-এ ২০০ কোটি এবং ২০০৫ সালে ৭৭ কোটি) খরচ করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়েনি, বরং বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। ২০০৫ সালে ৭৭ কোটি টাকা খরচ করে ওভারহলিং-এর পরও বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হতে পারেনি। কিন্তু বিদেশী কোম্পানী স্কোডা সব টাকা ঠিকই পেয়েছে। ব্যর্থতার জবাবদিহীতা তাকে করতে হয়নি। একই অবস্থার শিকার হয় খুলনার ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র। চীনা ঠিকাদারী কোম্পানীর মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এর মিনি ওভারহলিং, ওভারহলিং ও পুনর্বাসন কাজ করা হয়। প্রতিবার ওভারহলিং-এর পর ওয়ারেনিটটং সময় পার হবার আগেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। আমার দেশ পত্রিকায় ১২ আগস্ট ০৬ তারিখের এক রিপোর্ট অনুসারে সর্বশেষ ওভারহলিং ওয়ারেন্টি পিরিয়ড তখনও চললেও বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে যেতে পারছে না, বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিদেশী কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতার আরেকটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত টংগীর ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি তৈরি করে চীনের হারুবিন কোম্পানী। ৩৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই কেন্দ্রটি উদ্বোধনের কয়েকদিন পরই বন্ধ হয়ে যায়। উদ্বোধনের পরবর্তী দশ মাসে ৮০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্রটি দৈনিক গড়ে মাত্র ৩০ মেগাওয়াটের বেশী উৎপাদন করতে পারেনি। তার ওপর দশ মাসে বন্ধ হয়েছে ৮২ বার। উৎপাদন কম হওয়ার নানা কারণ তুলে ধরা হচ্ছে। তার একটি হলো পর্যাপ্ত গ্যাস না পাওয়া। গ্যাস না পেলে উৎপাদন কম হবে, কিন্তু উদ্বোধনের পরই এবং বার বার তা বন্ধ হবে কেন? এখানেও পাওয়া যাবে বিদেশী কোম্পানীরই স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, অনভিজ্ঞতা।

আমি এই ভাবে বিদেশী কোম্পানীর স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতকে সামনে আনার কারণ হলো, আমাদের দেশ দুনিয়ায় দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কারণে আমাদের বুদ্ধিমান আমলা-কর্মচারী-ব্যবসায়ীরা দুর্নীতি দুষ্ট হবেন, কম বুদ্ধিমান রাজনীতিকরা দুর্নীতি করবেন, কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত বিদেশী কোম্পানীদের এই স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা,

www.pathagar.com

ব্যর্থতা কেন? বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যাতে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার না হয়, এজন্য নির্মাতা কোম্পানীকে দিয়েই বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তারপরও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যাতে ভালোভাবে চলে, যথোচিত উৎপাদন দেয়, অনভিজ্ঞতা প্রসূত কোন বিপত্তি বিপর্যয়ের মধ্যে না পড়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন, এজন্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো দেখাশুনার জন্যে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশী বিশেষজ্ঞ পালন করা হয়। কিন্তু এরপরও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বেহাল অবস্থা কেন? দশ মাসে ৮০ বার বন্ধ হয় কেন? নির্মাতা ও বিদেশী কোম্পানী দ্বারা স্থাপিত হওয়ার পরেও উদ্বোধনের পর তা বন্ধ হয় কেন? বিদেশী কোম্পানীরা একের পর এক ওভারহলিং, সংস্কার হবার পরেও তা ঠিক হয় না কেন, টার্গেট উৎপাদন দেয় না কেন? তারা স্বার্থপর না হলে, দুর্নীতি না করলে, অভিজ্ঞ ও আন্তরিক হলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই ধরনের দুর্দশা হবে কেন? প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ খাতের বেহাল অবস্থার জন্যে আমাদের বেশী বুদ্ধিমান আমলা ও কম বুদ্ধিমান রাজনীতিকরা দায়ী অবশ্যই, কিন্তু সবচেয়ে বেশী দায়ী 'দুর্নীতিমুক্ত' দেশের সীমাহীন দুর্নীতিপরায়ণ কিছু দাতা গোষ্ঠী ও বিদেশী সংস্থারা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তদানীন্তন জ্বালানী উপদেষ্টা এবং বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব হাসান মাসহুদ চৌধুরীও সে সময় তার রিপোর্টে এই ধরনের কথাই বলেছিলেন। তার মতে, 'বিদ্যুৎ খাতের বেহাল অবস্থা ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার পেছনে দাতা সংস্থাও দায়ী। গত পাঁচ বছর দাতা সংস্থার পরামর্শে যে সব প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল তার সবই ছিল ব্যয়বহুল। গত পাঁচ বছর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে প্রায় প্রতিদিনই বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে ছিল দাতাদের পদচারণা। এছাড়া দাতাদের বরাদ্দকৃত ঋণের বিনিময়ে দাতাদের পছন্দমতো পরামর্শক নিয়োগ, অপ্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও নীতি উন্নয়নের নামে বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করতে হয়েছে কোটি কোটি টাকা। যে সব স্টাডি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অনায়াসে করতে পারতেন, দাতাদের চাপে সে সব স্টাডির জন্যে টেন্ডার আহ্বান করা হতো। বিভিন্ন শর্ত দিয়ে তাদের পছন্দের লোককেই সে স্টাডির জন্যে নিয়োগ দেয়া হতো। যে স্টাডি মন্ত্রণালয় অনায়াসে ১০ হাজার টাকায় করতে পারতো, সে স্টাডির জন্যে বাইরের প্রতিষ্ঠানে বিল আসত কোটি টাকার ওপর। আর দাতাদের কথা না শুনলে ঋণ দেয়া বন্ধ করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হতো।' (সংবাদ, ১ জানুয়ারি, ০৭) একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মন্ত্রণালয় ছিল দাতাদের কাছে অসহায়। দাতদের পছন্দমত টেন্ডার তৈরি না করলে, তাদের পছন্দের পক্ষকে কাজ না দিলেই টেন্ডার প্রক্রিয়া যতই স্বচ্ছ হোক তা দাতাদের কাছে অস্বচ্ছ হয়ে দাঁড়াত। তাদের এইসব ভুয়া অভিযোগের কাছে মন্ত্রণালয় কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তার একটা দৃষ্টান্ত জোট সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের একটা চিঠি। চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিনা আই. ওয়ালিককে। ক্রিস্টিনা ওয়ালিক বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের একটা টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনেছিলেন। এই অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করেই বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ ক্রিস্টিনা ওয়ালিককে এই চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিতে প্রতিমন্ত্রী বলেন, "বিশ্বব্যাংক চাঁদপুর ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যে অনিয়ম রয়েছে বলে উল্লেখ করছেন, সে ব্যাপারে আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে, এ টেন্ডার

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের অস্বচ্ছতা নেই। কিন্তু তারপরেও আমি বিশ্ব ব্যাংককে অনুরোধ করছি আদৌ এসব টেন্ডারে কোন রকমের অস্বচ্ছতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্যে বিশ্ব ব্যাংকের কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হোক। ... ...

আমরা বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ২০০৪ সালের প্রথম দিকে সব উন্নয়ন সহযোগীকে ডেকেছিলাম, যেখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে কী পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন করা যায়। এ ছাড়াও এসব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি উন্নয়ন সহযোগীদের কাছেও আর্থিক সহযোগিতা চেয়েছিলাম। কিন্তু এরপর প্রায় দেড় বছর পার হয়ে গেলেও আমরা কারও কাছ থেকে কোন সাড়া পাইনি।" (সংবাদ, ১৭ মে, ০৬) দাতারা মন্ত্রীর আহ্বানে যেমন সাড়া দেয়নি, তেমনি ক্রিস্টিনা ওয়ালিকও তার ভুয়া অভিযোগ মন্ত্রণালয়ের ওপর থেকে প্রত্যাহার করেনি। দাতাদের কাছে এটা শুধু এক মন্ত্রণালয়ের অসহায়ত্ব নয়, স্বাধীন সার্বভৌম সরকারেরও অসহায়ত্ব।

দাতা সংস্থারা এক সাথে কার্যকারক ও সমালোচক দুই-ই। বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবি তাদের দেয়া ঋণের চুক্তিতে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার দুরবস্থা বলে এসেছে। তাদের মন রক্ষার জন্যে ১৯৯১ সালে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (PDB) থেকে আলাদা করে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ডেসকো) সৃষ্টি করা হয়। পরে বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবি'র প্রেসক্রিপশন অনুসারেই সঞ্চালন, বিতরণ ও পরিচালনকে আরও বিখণ্ডিত করে নতুন ট্রান্সমিশন কোম্পানী সৃষ্টি করা হয়। দুই সিদ্ধান্তই বিদ্যুৎ বিভাগের সমস্যা বাড়িয়েছে, বিদ্যুৎ খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিশ্বব্যাংক ও এডিবি এই ক্ষতি ও সমস্যারও সমালোচক। এই সমস্যা ও ক্ষতির কারণ তারা হয়েও ব্যর্থতার দায় তারা চাপাচ্ছে আমাদের বিদ্যুৎ খাতের ওপর।

দাতা সংস্থা এডিবি'র দুর্নীতি, অন্যায় চাপ ও পদে পদে হস্তক্ষেপের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ২৪০ মেগাওয়াটের দুইটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ পাবার জন্যে একটি চীনা ও একটি ভারতীয় কোম্পানী পাগল হয়ে ওঠে। ভারতীয় কোম্পানী এডিবি'তে থাকা তাদের লোকদের মাধ্যমে এডিবি'কে বশে আনতে সমর্থ হয়। কিন্তু টেন্ডার অনুসারে কাজ পাবার কথা চীনা কোম্পানীর। চীনা কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানীর চাইতে ১৪০ কোটি টাকা কম দর প্রস্তাব করে। নির্মাণ সময় সীমার দিক দিয়েও চীনা দরপত্র গ্রহণযোগ্য ছিল। বাংলাদেশ পক্ষ চীনা দরপত্র গ্রহণ করে মতামতের জন্যে ফাইলটি এডিবি'র কাছে পাঠায়। এডিবি ভারতীয় কোম্পানীকে কাজ দেবার পক্ষে সুস্পষ্ট মত দেয়। এ নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলা অবস্থায় চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এডিবি'র অন্যায় চাপের ফলে ভারতীয় কোম্পানীই সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ পেয়ে গেছে। এডিবি তার এই মহা দুর্নীতিকে নিশ্চয় তার অধিকার বলে মনে করে! এডিবি'র মত দাতাদের এই ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি আমাদের 'বুদ্ধিমান' একশ্রেণীর আমলা ও 'কমবুদ্ধির' একশ্রেণীর রাজনীতিকদের দুর্নীতিগ্রস্ত বানিয়েছে। কিন্তু তারা দুর্নীতির নির্মাতা হয়েও আজ সাধু, আর আমরা আজ চোর বটে। এই চোর ধরার অভিযান চলছে বাংলাদেশে, কিন্তু চোর যারা তৈরি করেছে সেই দাতাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাধ্যটুকুও কিন্তু আমাদের কারও নেই। থাকলে ভারতীয় কোম্পানী সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ পেল কি করে?

www.pathagar.com

এডিবি'র মত দাতাসংস্থাগুলো শুধু দুর্নীতি নয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে, বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতকে তাদের জমিদারি বলে মনে করছে। পশ্চিমী উৎসের দাতা সংস্থাগুলো অন্য কোন দাতা সংস্থাকে তাদের এই জমিদারিতে ঢুকতে দিতে নারাজ। আবার তারাও ঋণ দিচ্ছে না তাদের স্বার্থের ষোল আনা পূরণ না হলে। গত পাঁচ বছর এডিবি প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে কোন ঋণ দেয়নি। অথচ তাদের ঋণ পাবার শর্ত পূরণ করতে গিয়েই জোট সরকারের পাঁচ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৪ বার। জ্বালানী তেলের দাম বেড়েছে ৮ বার, গ্যাসের দাম বেড়েছে ৩ বার। কিন্তু তাদের শর্ত পূরণ করার পরেও তারা ঋণ দেয়নি, নানা সংস্কারের অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করেছে। হতাশ হয়ে বাংলাদেশ সরকার ভিন্ন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহের উদ্যোগ যখনই নিয়েছে, তখন এডিবি'রা ছুটে এসেছে। বলেছে তারাই ঋণ দেবে। গাজীপুরে ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা ছিল। একটি জার্মাণ সংস্থা ৯০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ দিতে রাজী হয়েও অজ্ঞাত কারণে পিছিয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকারের চেষ্টার ফলে ওআইসি'র ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ঋণ দিতে রাজী হয়। কিন্তু এই প্রকল্প যাতে কার্যকরী না হয় পশ্চিমী দাতা সংস্থাগুলো এর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে যায়। প্রকল্পটি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বার বার প্রতিশ্রুতি দিলেও এডিবি'র ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না। এডিবি ও বিদেশী দাতাদের ঋণ প্রস্তাবের সাথে থাকে তাদের পছন্দনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা এবং তাদের মনোনীত কোম্পানীকে কাজ দেয়ার শর্ত। শর্ত না মানলে বিভিন্ন অজুহাতে ঋণ অনিশ্চিত করে তোলা হয়। জোট সরকারের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারও আজ এই সংকটের মুখোমুখি। ভারতীয় কোম্পানীকে কাজ দেয়ার ফলে সন্তুষ্ট এডিবি'র কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সিদ্ধিরগঞ্জ প্রকল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় ঋণ পাবে। কিন্তু তার পরে? পরেও এইভাবে এডিবি'র দুর্নীতির সাথী হতে হবে। দুর্নীতির সাথী হলে ঋণ মিলবে বটে, জনগণের মাথায় ঋণের বোঝা বাড়বে বটে, কিন্তু বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন হবে, এটা বলা যাবে না। বিগত বছরগুলোতে বিদ্যুৎ খাতের জন্য পশ্চিমী উৎস থেকে পাওয়া সহযোগিতা ও ঋণের এটাই ইতিহাস। এই বাস্তবতা ছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্যে আরেকটা সমস্যা আছে। সেটা হলো, দেশীয় দুর্নীতিবাজদের জেলে পুরে তারা দুর্নীতিবাজ দাতাদের সাথী হবেন কি করে? আর দাতাদের শেষহীন সংস্কারের দাবি পূরণই বা করবেন কি করে? দু'দিন আগেও তারা সংস্কারের নতুন নকশা দিয়েছে। আমাদের বিদ্যুৎ খাতকে প্রতুল অথবা বিদ্যুৎ চাহিদাকে পরনির্ভরশীল না করা পর্যন্ত তাদের সংস্কার রাজনীতি থেকে আমাদের উদ্ধার নেই, তাদের সন্তুষ্ট করাও সম্ভব নয়। আমার মনে হয় ঋণের বিকল্প উৎস তালাশ করার সময় এসেছে, যদি বিদ্যুৎ খাতের সত্যিই আমরা উন্নতি চাই।

১৬ জুলাই, ২০০৭

এরদোগানের তুরস্ক

তুরস্কে জনতার বিসয় হয়েছে, বিজয় হয়েছে গণতন্ত্রের। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আহমেদ নেকদেত সেলজারের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার প্রশ্নে তুরস্কে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। তুরস্কের জনগণ এরদোগানের এ. কে. পার্টিকে বিরাট বিজয় দান করে সংকটের অবসান ঘটিয়েছে। ইসলামপন্থী বলে পরিচিত ক্ষমতাসীন জাস্টিস এন্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি (এ.কে. পার্টি) প্রেসিডেন্ট পদে

www.pathagar.com

তাদের প্রার্থী হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুলকে দাঁড় করায়। সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার জন্যে পার্লামেন্টের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট দরকার হয়। তবে তিন পর্যায়ের নির্বাচনের প্রথম দুই পর্যায়ে যদি কোন প্রার্থীই দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না পায়, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেলেই তিনি নির্বাচিত হবেন। এই হিসাবে আব্দুল্লাহ গুলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া অবধারিত ছিল। কারণ পার্লামেন্টে এ.কে. পার্টির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, যার ফলে তৃতীয় পর্যায়ে এসে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে যেতেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সেনাবাহিনী ও প্রেসিডেন্ট যাতে কোন ইসলামপন্থী প্রেসিডেন্ট হতে না পারে এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। প্রথম রাউন্ড ভোটের দিনেই সেনাবাহিনী কোন ইসলামপন্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার বিপক্ষে শাসনতান্ত্রিক আদালতে একটা নোট প্রেরণ করে। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি হুমকিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে যে, 'তুরস্কের সেনাবাহিনী প্রয়োজন হলে প্রকাশ্যে তাদের অবস্থান প্রদর্শন করবে।' তাদের সাথে বিরোধী কিছু দল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাতিল করার জন্যে শাসনতান্ত্রিক আদালতের কাছে আবেদন জানায়। গণতন্ত্রের মাথা খেয়ে সেনাবাহিনীকেও উস্কানি দিয়ে তারা বলে, 'আব্দুল্লাহ গুলকে প্রেসিডেন্ট হবার অনুমতি দেবেন না।' রাজপথেও তারা ভয়ঙ্কর আন্দোলন গড়ে তোলে। ইস্তাম্বুল, আংকারার রাজপথ লাখ মানুষের মিছিল, প্ল্যাকার্ড, ব্যানারে ছেয়ে যায়। রাজপথে সেনাবাহিনীর প্রশংসা এবং এ.কে. পার্টির বিরুদ্ধে ধ্বনি ওঠে, প্রধানমন্ত্রী এরদোগান এবং আব্দুল্লাহ গুলকে রাষ্ট্রীয় ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি হুমকি হিসাবে অভিহিত করা হয়। তারা বলে, 'আমরা শরিয়া আইন চাই না, সামরিক অভ্যুত্থানও চাই না, আমরা চাই পূর্ণ গণতন্ত্র।' তারা আরও বলে, 'তুরস্ক আজ এ.কে. পার্টির হুমকির মুখে। তারা ক্ষমতায় এলে আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা থাকবে না।' ইস্তাম্বুলে তাদের সবচেয়ে বড় মিছিলে ৬শ' এনজিও জনশক্তি অংশগ্রহণ করে।

এই সংকট মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী রেসিপ তাইয়েব এরদোগানের এ.কে. পার্টি সংঘাত এড়ানোর পথ অনুসরণ করে। আব্দুল্লাহ গুল প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়া থেকে সরে দাঁড়ান। এ.কে. পার্টি রাজপথে না গিয়ে জনগণের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। জনরায় নেয়ার জন্য পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। গত ২২ জুলাই তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে এ.কে. পার্টি তুরস্কের ৫০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ভোটে বিজয় লাভ করে। ৫৫০ সদস্যের পার্লামেন্টে তারা ৩৪১ আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। মাত্র অল্প ব্যবধানে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। সকল অপপ্রচার, গালিগালাজ ও মিথ্যাচার এ.কে. পার্টির জনপ্রিয়তার সয়লাবে ভেসে যায়। এ.কে. পার্টির জনপ্রিয়তা তুরস্ককেও এক সংকট থেকে বাঁচায়।

আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইস্যু আসে। এ.কে. পার্টি আব্দুল্লাহ গুলকেই আবার প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড় করায়। এবার কিন্তু সেনাবাহিনীর তরফ থেকে আগের মত বিরোধিতা আসে না। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট চুপচাপ থাকেন। শাসনতান্ত্রিক আদালত আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। এবার আব্দুল্লাহ গুলের প্রার্থিতার বিরোধিতায় একটি মিছিলও তুরস্কের রাজপথে নামেনি। জনতার রায় এভাবে বিরোধী সকলের মুখ বন্ধ করে

www.pathagar.com

দিয়েছে। অবশেষে জনতার জয় হয়েছে, জয় হয়েছে গণতন্ত্রের। সংকট থেকে বেঁচেছে তুরস্ক। আরও শক্তিশালী হয়ে ইসলামপন্থী বলে অভিহিত এ.কে. পার্টি তুরস্কের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

সংকট থেকে সাফল্যে উত্তরণ তুরস্কের ইসলামী দলের এক গৌরবজনক ইতিহাস। অন্ধকারে পথ চলেই তারা সবসময় আলোর তালাশ করেছে। শত নির্যাতনের মধ্যেও তারা অগণতান্ত্রিকতাকে পরিহার করেছে এবং ধৈর্যের সাথে গণতন্ত্রকে ধারণ করে চলেছে। মিসরের একজন কলামিস্ট আমর তাহা সম্প্রতি লিখেছেন, "The majority of Islamic Parties in Turkey rejects violence or forceful attempts to over-rule the established regime, except for minor limited groups. More significantly, the evolution of political Islam in Turkey has dynamically changed to absorb ideas of democracy, human rights, rule of law and accountability." 'Political Islam in Turkey', Amr Taha, Islam online, net, Aug 29, 07. অর্থাৎ দু'একটি ক্ষুদ্র ও সীমিত গ্রুপ ছাড়া তুরস্কের অধিকাংশ ইসলামী দল প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারকে সন্ত্রাস ও শক্তির জোরে উৎখাত করাকে প্রত্যাখ্যান করে। অধিকন্তু তুরস্কে 'রাজনৈতিক ইসলাম'-এর ক্রমবিকাশ পরিবর্তনের মাধ্যমে জওয়াবদিহিতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও গণতন্তের ধারণাকে আত্মীকরণ করেছে।' অবশ্যই কলামিস্ট এখানে তার বক্তব্যে ইসলামী দলগুলোর গণতান্ত্রিক চরিত্র তুলে ধরার সাথে এই বৈশিষ্ট্য তারা ক্রমবিকাশের পরিবর্তনের ধারায় আত্মীয়করণ করেছে বলে যে মন্তব্য করেছেন তা কিন্তু ইতিহাস নয়, তুরস্কের ইসলামী দলগুলোর গত ৩৭ বছরের ইতিহাস বলে না এই কথা। তাদের যাত্রার শুরু থেকেই তারা গণতন্ত্রের পথে চলেছে। পদে পদে তাদের যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। বাধা সত্ত্বেও জনগণের কাছে হাজির হওয়ার পথেই তারা অগ্রসর হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় ৩৭ বছর আগে ১৯৭০ সালে নাজমুদ্দিন আরবাকান, পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার, প্রথম ইসলামী দল 'মিল্লি সালামত পার্টি' (ন্যাশনাল সলভেশন পার্টি) গঠন করেই মানুষের বিপুল সমর্থন নিয়ে সোলেমান ডেমিরেলের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। সোলেমান ডেমিরেল হন প্রধানমন্ত্রী এবং নাজমুদ্দিন আরবাকান উপপ্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ১৯৭১ সালেই সেনাবাহিনী মিল্লি সালামাত পার্টিকে তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য হুমকি অভিহিত করে বেআইনী ঘোষণা করে। নাজমুদ্দিন আরবাকানের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়।১৯৮০ সালে নাজমুদ্দিন আরবাকানের অনুসারী বন্ধুরা মিল্লি সালামত পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করে। কিন্তু ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের সময় এই দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বেআইনী হওয়ার অব্যবহিত পরেই জনৈক আলী তিরকমেন্ট 'ওয়েলফেয়ার পার্টি' প্রতিষ্ঠা করে দলের কাজকে পুনরুজ্জীবিত করে। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে 'ওয়েলফেয়ার পার্টি' আহমেদ তেকদাল-এর নেতৃত্বে ৪ দশমিক ৪ পারসেন্ট ভোট লাভ করে। দলটি নানা রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে আরও ভালো করে এবং মোট ভোটের ৭ শতাংশের অধিকারী হয়। এর ৪ বছর পর ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই দল লাভ করে ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট। কিন্তু পৌর নির্বাচনের মত স্থানীয় ভোটে ওয়েলফেয়ার পার্টি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়। ১৯৮৯ সালের পৌর নির্বাচনে এই দল একশটি ছোট নগরী ছাড়াও ৫টি বড় বড় শহরের মেয়রের পদে বিজয় লাভ করে।

www.pathagar.com

আবার বিধি-নিষেধের কবলে পড়ে ওয়েলফেয়ার পার্টি। তার রাজনীতি বন্ধ হয়ে যায়। 'রাফা' পার্টি নামে নতুনভাবে দল গঠন করা হয়। নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হয়ে নাজমুদ্দিন আরবাকান নতুন দলের দায়িত্বে আসেন। ১৯৯৪ সালের পৌর নির্বাচনে দলটি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। মোট ভোটের ১৯ শতাংশ লাভ করে রাজধানী আংকারা ও বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুলের মেয়র পদসহ ২৭টি বড় শহর ও ৪শ'টি ছোট শহরের মেয়র পদে বিজয়ী হয়। তুরস্কের আজকের প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েব এরদোগান রাফা পার্টি তেকে ইস্তাম্বুলের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরের বছর তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে নাজমুদ্দিন আরবাকানের 'রাফা' পার্টি ২১ দশমকি ৩২ শতাংশ ভোট পেয়ে তুরস্কের সর্ববৃহৎ দলে পরিণত হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন 'ট্রুথ পার্টি" পেয়েছিল ১৯ দশমিক ২০ পারসেন্ট এবং মাদারল্যান্ড পায় ১৯ দশমিক ৬৬ পারসেন্ট ভোট। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তখন সোলেমান ডেমিরেল। তিনি বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবে নাজমুদ্দিন আরবাকানকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করেন। 'ট্রুথ পার্টি'র সাথে কোয়ালিশন করে নাজমুদ্দিন আরবাকান সরকার গঠন করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সরকার টিকেনি ট্রুথ পার্টি কোয়ালিশন ত্যাগ করায়। এর পরই আবার বিপদ নেমে আসে 'রাফা' পার্টির ওপর। ১৯৯৭ সালে সামরিক বাহিনী রাফা পার্টির ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং ১৯৯৮ সালে এই দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে রাফা পার্টির স্থলে 'ভার্চু পার্টি' নাম নিয়ে নাজমুদ্দিন আরবাকানরা আবার কাজ শুরু করেন। এই সময় একটা বড় ঘটনা ঘটে। তুরস্কের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েব এরদোগান ও তার সাথীরা কিছু নীতির প্রশ্নে নাজমুদ্দিন আরবাকানের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২০০১ সালে তারা 'জাস্টিস এন্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি' (A.K.P.) গঠন করেন। ২০০১ সালেই এই পার্টি সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৩৪ পারসেন্ট ভোট লাভ করে বৃহত্তম দল হিসাবে সরকার গঠন করে। পার্টিপ্রধান এরদোগানের জন্য ভোটে দাঁড়ানো তখন নিষিদ্ধ ছিল। ফলে দল বিজয় লাভ করে ক্ষমতায় গেলেও এরদোগান কিন্তু নির্বাচিত হতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী হন তারই সহকারী আবদুল্লাহ গুল। পরে পার্লামেন্টে আইন পাস করে এরদোগানের ওপর নিষিদ্ধ-আদেশ প্রত্যাহারের পর তাকে বাই-ইলেকশনে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত করার পর তাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। আব্দুল্লাহ গুল হন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এই আব্দুল্লাহ গুলকেই প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে প্রার্থী করায় এরদোগানের এ.কে. পার্টি সামরিক বাহিনীর হুমকির মুখে পড়ে এবং বিরোধী দলগুলোর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। পূর্বের মতই সংঘাত এড়িয়ে দলটি রায়ের জন্যে জনগণের কাছে যায় এবং জনগণ তাদেরকে আরো বেশি ভোট দিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় পাঠিয়েছে। আব্দুল্লাহ গুলই আবার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এইভাবেই তুরস্কের ইসলামপন্থী দল সকল প্রতিকূলতার মধ্যে গণতন্ত্রকে আঁকড়ে থেকে ক্রমবর্ধমান হারে জনগণের সমর্থন ও ভালোবাসা লাভ করছে। ক্রমবিকাশের ধারায় তারা গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে আত্মীকরণ করেনি, বরং গণতনত্র ও আইন সাথে নিয়েই তাদের জন্ম।

অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়ে এই প্রসঙ্গে একটা বেদনাদায়ক ইতিহাসের এখানে উল্লেখ করা যায়। শতকরা ৯৯ জন মুসলমানের দেশ তুরস্কের আধুনিক ইতিহাসে ইসলামপন্থী দলগুলো যেভাবে নির্যাতিত হয়ে এসেছে, অতীতে উসমানীয় খেলাফতের আমলেও ইউরোপকে খুশি করার জন্য খৃস্টান নাগরিকদের অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে

www.pathagar.com

মুসলিম প্রজাদের ওপর নিপীড়ন চালানো হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, তুরস্কের উসমানীয় খলিফারা ইউরোপের খৃস্টান শক্তিসমূহের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার জন্যে তাদের মন জয়ের কম চেষ্টা করেনি। রাজস্ব, বিচার, সামাজিক প্রথা, আর্থিক, সামাজিক, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে খৃস্টান প্রজাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হতো। এমনকি বৈধ, কি অবৈধ তারও তোয়াক্কা করা হতো না। ইতিহাস বলছে, তুর্কি সরকার বহুবার বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন ও খৃস্টানদেরকে নানা প্রকার সুবিধাদানে বাধ্য হয়েছেন। মুসলমানেরা প্রতিবারই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু সেসব অরণ্য-রোদনে পর্যবসিত হয়েছে। অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও এ কথারই সাক্ষ্য দিয়েছেন। লিখেছেন, "সুলতানের খৃস্টান প্রজারা সংখ্যায় বাড়ছে এবং ধন ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হচ্ছে। –এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনেক পেছনে ফেলেছে।" (Luke, 66-67) "প্রকৃতপক্ষে রায়াহ (খৃস্টান) প্রজাদের উপর কর খুবই কম। নিশ্চিতভাবে দুনিয়ার কোন কৃষককেই এমন সুবিধাজনক পজিশনে রাখা হয়নি।" (Clair and Brophy, 115-116) "খৃস্টানরা যাহাতে খাজনায় ইজারা লইয়া ধনী হইতে পারে তজ্জন্য সরকার তাহার (তুর্কি মুসলমানদের) ওয়াক্‌ফগুলি বিনষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু রায়াহর (খৃস্টানদের) ওয়াক্‌ফে হাত দেয়ার সাহস তাহাদের হয় নাই। ... ... বস্তুত রায়াহ্‌র সুখ বর্ধনের জন্যে নানা জুলুমের চাপে তুর্ক জাতি যেভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে, মুসলমান জাতি রায়া অপেক্ষা অধিকতর ও কঠোরতর পরিশ্রম না করিলে ইউরোপের মানচিত্র হইতে বহু পূর্বে তাহার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইত। ... ...

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত প্রজার উন্নতি বিধান না করিয়া কেবল খৃস্টানদিগকে একচেটিয়া সুবিধা দেওয়ার ফলে হতভাগ্য তুর্ক জাতির সর্বনাশ হইয়াছে।" (তুরস্কের ইতিহাস, ডঃ আব্দুল কাদের, পৃঃ ২২০ ও ২২২) তুর্কি খলিফারা এসব করেছেন পশ্চিমী খৃস্টান রাষ্ট্রশক্তির চাপে এবং তাদের মনোরঞ্জনের জন্যেই। কিন্তু তুর্কি সুলতানরা কি তাদের মন পেয়েছিলেন? পাননি। এতো সুখে থাকার পরেও তুরস্কের খৃস্টান প্রজাদের কল্পিত দুঃখের মর্মন্তুদ কাহিনী ইউরোপে প্রচার হয়েছে। এ সম্পর্কিত বই লিখিত হয়ে পানির মত বিক্রি হয়েছে ইউরোপের বাজারে। ফল হিসেবে তুর্কি সুলতানারা পেয়েছে খৃস্টান প্রজাদের ষড়যন্ত্রমূলক বিদ্রোহ এবং সেই উপলক্ষে ইউরোপীয় খৃস্টান রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ। আজকের তুর্কি সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ পদক্ষেপে ইউরোপ-আমেরিকায় যারা আনন্দ-আহলাদে গদগদ হচ্ছে তাদেরই অতীত ইতিহাস এটা। সুতরাং তাদের কাছে আজকের তুরস্কের পাবার কিছু নেই। বরং তুর্কি সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ আচরণে সেখানকার মুসলিম জাতিসত্তা যতকানি নিঃস্ব হবে পশ্চিমের ওরা ততখানিই ঐশ্বর্যশালী হবে। কামাল আতাতুর্ককে দিয়ে ইসলামের খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে, কিন্তু পোপীয় ব্যবস্থাকে পশ্চিমীরা ধ্বংস করেনি। খৃস্টান বিশ্বের মুরুব্বী হিসেবে 'পোপ'-কে এখন তারা শক্তিশালীই করে তুলছে। এটাই পশ্চিমীদের আসল চেহারা। ধর্মনিপেক্ষতাবাদের নেশায় মুসলমানদের মাতাল করে রেখে ওরা বিশ্বব্যাপী খৃস্টরাজ্য কায়েম করার দিকে এগুচ্ছে। একদিন আফ্রিকাকে বলা হতো মুসলিম মহাদেশ। সেই আফ্রিকায় আজ খৃস্টানদের সংখ্যা ২৮ কোটি, আর মুসলমানদের সংখ্যা ২৪ কোটি। (ব্রিটানিকার সর্বশেষ ইয়ারবুক দ্রষ্টব্য) কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে ইউরোপ বানিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপ তুরস্ককে গ্রহণ করেনি। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর সদস্যপদও তুরস্ককে দেয়নি এখনও।

www.pathagar.com

যাক প্রসঙ্গের বাইরে চলে গিয়েছিলাম। আগের কথায় ফিরে আসি। একটা প্রশ্ন খুব বড় হয়ে উঠছে, আব্দুল্লাহ গুলকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে না দেয়ার ক্ষেত্রে তুরস্কের সামরিক বাহিনী, সাংবিধানিক আদালত এবং বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কেন? এই কেন-এর উত্তর প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত। তুরস্কে সরকার নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হলেও প্রেসিডেন্টের হাতে মৌলিক কিছু ক্ষমতা রয়েছে যা রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ন্ত্রণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সব প্রতিষ্ঠানেরই প্রধানকে নিয়োগ করেন প্রেসিডেন্ট। সাংবিধানিক আদালত, সেনাপ্রধান, আপীল আদালত, কাউন্সিল অব স্টেট, হায়ার এডুকেশনাল কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রেক্টরসহ মন্ত্রণালয়েরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পদের নিয়োগ প্রেসিডেন্ট করে থাকেন। তাছাড়া মন্ত্রীদের নিয়োগ এবং পার্লামেন্ট প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক সংশোধন ও বিল অনুমোদনের অধিকার প্রেসিডেন্টের। তুর্কি প্রেসিডেন্টের এই সব দায়িত্ব নিছক আলঙ্কারিক নয়। গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব কোন ইসলামপন্থীর হাতে যাক, তা সেনাবাহিনী, ধর্মনিরপেক্ষ দলসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো চায়নি। তারা ভয় করেছে সরকার ইসলামপন্থী একটা দলের হাতে যাবার পর প্রেসিডেন্ট পদও তাদের হাতে গেলে দেশের চরিত্র তারা পাল্টে দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট পদে আব্দুল্লাহ গুলের বিরোধিতার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখিয়েছেন তুরস্কের দৈনিক জামান পত্রিকার কলামিস্ট ও কূটনৈতিক সংবাদদাতা কিউমালি ওনাল। তার মতে আব্দুল্লাহ গুলের বিরোধিতার পিছনে গোষ্ঠী স্বার্থও কাজ করেছে। এই গোষ্ঠী-স্বার্থ, তার মতে, গত প্রায় তিনশ' বছর ধরে তুরস্কের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনি লিখেছেন, "Thorughout all the history of the Turkish Republic and the last 200 years of the Ottoman Empire, the power has been in the hands of the same elites community. Who are these elites? They are the people of big enterprises, the army, universities, high courts and the important posts in some Ministries... In its 80 year history, the Turkish Republic has had 10 Presidents, but just Turgut Ozal was seen out of the elites and was portrayed as a 'civil, democrat and devout' president who made many extra-ordinary changes."

'অর্থাৎ তুর্কি প্রজাতন্ত্রের গোটা কাল এবং তার পূর্ববর্তী ওসমানীয় খিলাফতের শেষ ২০০ বছরের ইতিহাস হলো ক্ষমতা একটা এলিট শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত থেকেছে। বড় ব্যবসায়ী, সশস্ত্র বাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয়, হাইকোর্ট এবং উল্লেখযোগ্য পদের আমলারাই ছিল এই এলিট। প্রজাতন্ত্রের ৮০ বছরের ইতিহাসের ১০ প্রেসিডেন্টের মধ্যে মাত্র একজন, তুরগুত ওজাল, এই শ্রেণীর বাইরের ছিলেন এবং এই কারণেই তাকে 'গণতন্ত্রী' বলার সাথে সাথে গোঁড়া ধর্মপ্রাণও বলা হতো। তিনি এলিটদের অপছন্দনীয় অনেক অসাধারণ আইনী সংস্কার নিয়ে আসেন।'

আব্দুল্লাহ গুলকে এলিটদের বাইরে এবং তুরগুত ওজাল-এর চেয়েও আরও বেশি 'গোঁড়া' মনে করছে এলিটরা। তিনি প্রেসিডেন্ট হলে তুরগুত ওজালের পরিবর্তনের ধারাকে আরও বেগবান করবেন বলে তাদের আশঙ্কা। এর কারণ হিসাবে তারা বলছেন যে, এ.কে. পার্টি নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী এরদোগান সব সময় তুরগুত ওজালের সূচিত সংস্কারের প্রশংসা করেন। এসব কারণেই আব্দুল্লাহ গুলের বিরোধিতায় তারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

তুরস্কের উক্ত এলিটরা সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হিসাবে বলেন, 'রাষ্ট্রের দর্শন' ও 'সংবিধানের ভিত্তি' ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংস্কারের নামে আহত করবে এ.কে. পার্টি। এলিটদের আশংকার যে ভিত্তি সেটাই একেবারে অমূলক। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তুরস্কের 'রাষ্ট্র দর্শন' এবং 'সংবিধানের ভিত্তি' এটা বাস্তবতা নয়, অতিরঞ্জন। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক যখন খিলাফত উৎখাত করে তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র ও সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে তিনি গ্রহণ করেননি, বরং রাষ্ট্র দর্শন হিসাবে ইসলামই বর্তমান ছিল। মোস্তফা কামাল ইন্তিকাল করেন ১৯৩৮ সালে। তার মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে তুরস্কের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাব ঘটে। তুরস্কের এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট এবং ট্রুথ পার্টির নেতা সোলেমান ডেমিরেল এ সম্পর্কে বলেছেন, "১৯২৪ সালে মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নতুন তুর্কি প্রজাতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। প্রতিষ্ঠিত হবার দীর্ঘ তের বছর এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ছিল ইসলাম। কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে ১৯৩৭ সালে শাসনতান্ত্রিক নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা পরবর্তীকালের উড়ে আসা একটা বিষয়, নতুন প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি তা কিছুতেই ছিলো না।" সোলেমান ডেমিরেল এই স্পষ্ট সত্য উচ্চারণের পর এ ব্যাপার নতুন কোন যুক্তির প্রয়োজন পড়ে না। তবু আর একটা কথা, মোস্তফা কামাল জাতির কাছ থেকে 'আতাতুর্ক' বা 'জাতির পিতা' উপাধি পান ১৯৩৫ সালে, তখনও কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা তুরস্কের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আসেনি। অর্থাৎ যখন তিনি 'আতাতুর্ক' হলেন তখনও তুরস্কের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ধর্মনিরপেক্ষ মোস্তফা কামালকে তুর্কি জাতি 'আতাতুর্ক', উপাধি দেয়নি। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের জীবনের শেষ বছরে কিভাবে তুরস্কের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবেশ করলো, এ নিয়েই বরং প্রশ্ন উঠতে পারে।

তবু কিন্তু আব্দুল্লাহ গুল এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এরদোগান তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতাকে এই দৃষ্টিতে দেখছেন না এবং প্রশ্নও তুলছেন না। সাবেক প্রেসিডেন্ট সোলেমান ডেমিরেল 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে উড়ে এসে জুড়া বসা' বিষয় বললেও এরদোগানরা তা বলছেন না। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে লড়াইয়ে নামতে চান না। কিন্তু মানবাধিকারের পক্ষে অনড় অবস্থান নিতে চান। উল্লেখ্য, এরদোগানের এ. কে. পার্টির ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে মানবাধিকার, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, বিশ্বায়ন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়া ইত্যাদি। তাদের মানবাধিকার দাবির মধ্যে মানুষের ধর্মীয় অধিকারের বিষয়ও রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মানুষের এই অধিকার লংঘন করা যাবে না তারা মনে করেন। কিন্তু তুরস্কের চলমান ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের ধর্মীয় অধিকার হরণ করে রেখেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা-নীতির এই মানবাধিকার লংঘনের প্রতিবিধান করে এরদোগানরা তুরস্কের জনগণকে তাদের ধর্মীয় অধিকার ফিরিয়ে দিতে চান। যতটা আমার মনে পড়ে, নির্বাচনে বিজয় লাভের পর তাৎক্ষনিক এক অনুষ্ঠানে এরদোগান ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, ধর্ম রাষ্ট্র-কাজে হস্তক্ষেপ করুক এটা যেমন চাই না, তেমনি চাই না রাষ্ট্র মানুষের ধর্মীয় জীবন ও তাদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করুক। এটা নিশ্চিত যে, এরদোগানরা তাদের চাওয়া আইন সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবেন। তা যদি হয়, তাহলে তুরস্কের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে রাষ্ট্রের এক প্রকারের জুলুম থেকে রক্ষা পাবে। মাথায় ওড়না

www.pathagar.com

পরার মত বহু কাজ তারা বিনাবাধায় করতে পারবে। নিছক আবেগ নয়, এই আইনের পথে চলেই তুরস্কের ইসলামী দল তুরস্কের ক্ষমতায় এসেছে। ঝড়ের মধ্যে পথ চলে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছা তুরস্কের ইসলামী দলের একটা বিরাট যোগ্যতা।

রাষ্ট্রের পলিসি-প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এরদোগানের এ.কে. পার্টির যোগ্যতার প্রকাশ আরও বেশি। গত সাড়ে চার বছরের শাসনে তারা অর্থনীতি, তুরস্কের আইন-শৃঙ্খলা, তুরস্কের মান-মর্যাদা ও স্থিতিশীলতাকে একেবারে ভূতল থেকে বহু উপরে নিয়ে এসেছে। সাড়ে চার বছর তুরস্কের অর্থনীতি দ্বিগুণ আকার লাভ করেছে। তুরস্কের রফতানি ৩০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৯০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। জিডিপি বলা যায়, লাফ দিয়ে ২০০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৪০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রতিবছর বেড়েছে ৩০ বিলিয়ন ডলার করে। মুদ্রাস্ফীতি কমেছে, দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেয়েছে। এরদোগান সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, যোগাযোগ, পরিবহন এবং কর-ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী সংস্কারের সূচনা করেছে। তুরস্কের স্থিতিশীলতা ও তুরস্কের অর্থনীতির ওপর বিদেশীদের আস্থা বেড়েছে। সকল রাষ্ট্র বিশেষ করে পশ্চিমী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের পররাষ্ট্রনীতি সফল হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে আলোচনায় তারা সফল হচ্ছে।

এ.কে. পার্টির সর্ববিধ এই যোগ্যতাই পর্বত প্রমাণ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তাদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। এই যোগ্যতার বলেই তারা নির্বাচনের পর মুহূর্তে দ্বিধাহীনভাবে বলতে পেরেছে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দল তুরস্কে নেই। তুরস্কের মানুষকে সন্তুষ্ট করার মতো পলিসি-প্রোগ্রাম তুরস্কের আর কোন রাজনৈতিক দলেরই নেই। এ.কে. পার্টির কথা আবেগতাড়িত কোন শূন্যগর্ভ বক্তব্য নয়। এটাই বাস্তবতা। তাদের কাজ, কাজের ফলাফল এবং নির্বাচনের রেজাল্ট এর সাক্ষী। অশেষ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ধৈর্য ও আইনের মাধ্যমে তাদের অব্যাহত সংগ্রাম তাদের অতুলনীয় সাফল্যে অভিষিক্ত করেছে।

৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

দুর্নীতি দমনের ফর্মুলা তালাশ

আমাদের দেশের ললাটে দুর্নীতির যে সাইনবোর্ড ঝুলছে, তা বোধ হয় এখন দেশ-বিদেশের কারও দৃষ্টির বাইরে নেই। তাই আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশন সবার আকর্ষণের একটা বস্তু। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, দাতা সংস্থার লোকরা সেখানে যাচ্ছেন। করুণা ও উপদেশ বিতরণই লক্ষ্য। অনেকের কথা-বার্তা শুনলে মনে হয় দুর্নীতি নামক কোন বস্তুই তাদের দেশে নেই, সব এসে আসন গেড়েছে বাংলাদেশে। সেদিন ভারতীয় হাইকমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশনে গিয়ে এর চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করলেন, আলোচনা করলেন। এই আলোচনার উপর ব্রিফ করতে গিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বললেন, বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের সাথে ভারত একাত্মতা ঘোষনা করেছে। এ ব্যাপারে তারা সাহায্য করতে আগ্রহী।' দুদক চেয়ারম্যানের এই বক্তব্য পর্যবেক্ষক মহলের চোখে লেগেছে। তারা বুঝতে পারছেন না বাংলাদেশর দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের সাথে ভারতের একাত্ম হওয়ার অর্থ কি! ভারত একটি ভিন্ন দেশ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কার্যক্রম তাদের ভালো লাগলে তারা এর প্রশংসা করতে পারেন, উৎসাহিত করতে পারেন, কিন্তু একাত্ম হওয়ার অর্থ এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন কিছুর সাথে একাত্ম হওয়ার অর্থ কার্যক্রমটির লক্ষ্য অর্জনে এক সাথে হয়ে যাওয়া। এই অর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে পর্যবেক্ষক মহল ভারতের আগ্রহটাকে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি মনে করছেন। তারা বলছেন, ভারত যদি দুর্নীতিমুক্ত দেশ হতো তাহলে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিবেশীর প্রতি এই ধরনের আগ্রহের একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত, কিন্তু ঘটনা তা নয় মোটেই। ভারতও দুর্নীতিমুক্ত দেশ নয়। কলকাতার 'দেশ' গত ১৭ই এপ্রিলের সংখ্যায় ভারতের দুর্নীতি প্রসঙ্গে লিখেছে, "দুর্নীতি অবিসংবাদিতভাবে আজ প্রতিটি মানুষের জীবনের অঙ্গীভূত। সাধারণত দুর্নীতি বললেই যে চেনা ছবিটা আমাদের মনে ভেসে ওঠে তা হলো, মন্ত্রী-নেতৃবৃন্দের কেলেঙ্কারী অথবা একটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে আসীন কোনও ব্যক্তির ঘুষ নেয়ার ঘটনা। কিন্তু সমাজের প্রতিস্তরে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতির রূপ এখন বিবিধ।"

ভারতীয় সমাজের প্রতিস্তরে ছড়িয়ে পড়া এই 'বিবিধ' দুর্নীতিকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে 'দেশ' পত্রিকা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে, "প্রথমতঃ মন্ত্রী-আমলা-পার্টি, এই ত্রিকোণ স্তম্ভ লালিত রাজনৈতিক পরিকাঠামো ও জনসেবামূলক কাজকর্মের নামে গাড়ি-বাড়ি, অর্থলাভের, এক কথায় আখের গুছিয়ে নেয়ার নির্লজ্জ দুর্নীতি। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষা প্রকল্পের নামে অর্থ তছরূপ। তৃতীয়তঃ প্রশাসন-পুলিশ-পার্টি নিয়ন্ত্রিত বাজার-নীতি থেকে (যাকে লোকে দুর্নীতি বলেই জানে)। চতুর্থতঃ প্রশাসন-আইন-মাফিয়া পরিচালিত সরকারি অর্থের লেনদেনমূলক কুকর্ম, যেখানে অন্তর্ভুক্ত প্রতিরক্ষা-স্বরাষ্ট্র-রেল-পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য অর্থকরী সরকারি দপ্তর সমূহ।" (দেশ ১৭ এপ্রিল, ২০০৭)

দেখা যাচ্ছে, ভারতের এই বিভিন্ন ক্যাটাগরির দুর্নীতি সেখানকার সমাজের সকল স্তরকেই গ্রাস করেছে। ভারতে সর্বব্যাপী এই দুর্নীতি রোধের চেষ্টা কাগজে-কলমে কম হয়নি। ১৯৫০ সালে একটি অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালে 'সান্তানাম' নামক কমিটির সুপারিশে গঠিত হয় 'সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন' (সিভিসি)। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এই দুর্নীতি দমন উদ্যোগের আওতার বাইরে রাখা হয় 'পুলিশ', 'প্রশাসন' ও 'অরণ্য'-এর মত দুর্নীতি জর্জরিত ক্ষেত্রগুলোকে। অনেক পরে 'জনস্বার্থ' সম্পর্কিত আর একটা মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্ট ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের দুর্নীতি খতিয়ে দেখার জন্য একটা কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ অনুসারেই ২০০৪ সালের ২১ এপ্রিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বে গঠিত সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন' (সিভিসি) কেই এই কাজে নিযুক্ত করে। এই দায়িত্ব দেয়ার পরও দুর্নীতি দমনে কোন অগ্রগতি হয়নি। 'দেশ' লিখেছে, "কিন্তু কার্যত (সিভিসি দ্বারা) কিছুই হয় না। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নশীল দেশ ভারতে গণতন্ত্র শুধুই একটা সাইনবোর্ড, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে। যদিও এ দেশে দুর্নীতির উৎসগুলো তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে অনেক গভীরে, এ সমস্যা একদিনে সমাধান হওয়ারও নয়।' ভারতে দুর্নীতির মূল সন্ধান করতে গিয়ে দেশ সর্বশেষে বলেছে, "একটি গণতান্ত্রিক দেশে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই 'ধনলক্ষ্মী'র আশীর্বাদ ধন্য হওয়া একান্ত জরুরি, কিন্তু সেই সাথে

www.pathagar.com

এটাই ভীষণ সত্যি, সেই আশীর্বাদের 'উৎস'গুলোর কাছেই টিকি বাঁধা থাকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ব্যক্তিদের। শেষ পর্যন্ত তাদেরই অঙ্গুলি হেলনে নির্ধারিত হয় ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা।' (দেশ, ১৭ এপ্রিল, ০৭)

ভারতে দুর্নীতির এই যে মহাচিত্র, এর মুখে লাগাম দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ২০০৪ সালে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের দুর্নীতি খতিয়ে দেখার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতের 'সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন' লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। আরও বলা যায়, ১৯৬৪ সালে সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন (সিভিসি) গঠিত হবার পর তার যে ইতিহাস সেটা আমাদের সাবেক দুর্নীতি দমন ব্যুরোর চেয়ে ভালো নয়।

সুতরাং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের খুব ভালো ইতিহাস আছে, এটা ঠিক নয়। দুর্নীতি দমনে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া কিংবা তারা আমাদের সাহায্য করতে পারার মত দুর্নীতিমুক্ত বা দুর্নীতিদমনে তারা সিদ্ধহস্ত, এটাও বাস্তবতা নয়। বরং আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশনের মত স্বাধীন ও শক্তিশালী সংস্থা ভারতে নেই। আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় বিষয়টা জানেন না, তা বলা যাবে না। কিন্তু দুর্নীতি দমনে তিনি ভারতের সাহায্যের প্রশ্নে যে পরিমাণ উৎসাহী হয়েছেন, তাতে ব্যাপারটা তিনি জানেন তাও মনে করা মুশকিল। যেখানে ভারতে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশের পরও সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন কোন কাজে আসেনি এবং যে ভারত নিজেই দুর্নীতি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, সে দেশের সাহায্যের ব্যাপারে একটু বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠা কিছুটা বিদঘুটেই দেখায়।

একটি দেশের সাহায্য প্রস্তাব পাওয়া, কিংবা একটি দেশের সাহায্য চাওয়া নিয়ে এই আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন যেভাবে দেশে-বিদেশে দুর্নীতি দমনের উপায় হাতড়ে বেড়াচ্ছে, তা থেকেই এই আলোচনার প্রয়োজন পড়েছে। দুদক অফিসে বহু বিদেশীর পদধুলি পড়েছে। পদধুলির সাথে তাদের ভাব-গতি দেখে মনে হয়েছে তারা সবাই ধোয়া তুলসিপাতা। কিন্তু তাদের প্রকৃত চিত্র কিন্তু তা নয়। অন্যদিকে দুদকের নতুন কমিশন দায়িত্ব নেবার শুরু থেকে তাদের কথা-বার্তা, দৌড়াদৌড়ি দেখে মনে হচ্ছে রাতারাতিই তারা দেশের ললাট থেকে দুর্নীতির কালদাগ মুছে ফেলবেন। মনে হয়েছিল আগের কমিশনই ছিল সমস্যা। তারা চলে গেছে, এখন দুর্নীতি দমনের কাজ রকেটের গতিতে এগিয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। গত দুই মাসে তাদের সাফল্য মাত্র কয়েকটি মামলা দায়ের। দুদকের ঐ দৃষ্টিভঙ্গি দুর্নীতিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখার ফল অবশ্যই নয়। দুর্নীতির অভিযোগে রাজনীতিক ও কিছু ব্যবসায়ীকে ধরলেই দুর্নীতি দূর হবে না। উপরে 'দেশ' তার শেষ বক্তব্যে বলেছে যে, রাজনীতিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতি করে তাদের রাজনীতির প্রয়োজনে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতেও টিকে থাকার প্রতিযোগিতা থাকে। এই প্রতিযোগিতায় জেতার জন্যই রাজনীতিকদের প্রয়োজন হয় অর্থের। এই অর্থ আসে অরাজনৈতিক এমন সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে যারা প্রকৃতপক্ষে হয় রাজনীতি ও প্রশাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। 'এটা শুধু ভারতের অবস্থা নয়, আমেরিকা-ইউরোপের গণতন্ত্রের জন্যও এ কথা সত্য, বাংলাদেশের জন্যও সত্য। দুর্নীতির এই মূল বা উৎস অব্যাহত রেখে রাজনীতিকদের মুণ্ডুপাত করলেই দুর্নীতি দূর হয়ে যাবে না। কারণ যাদের মুণ্ডুপাত করা হবে, তাদের জায়গায় নতুন যে রাজনীতিকরা

www.pathagar.com

মাঠে আসবেন, তারাও তাদের রাজনীতির স্বার্থে 'দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ঐ ধনপতি ব্যক্তি'দের হাতের পুতুল হয়ে যাবেন।

এটা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত রাজনীতিকেন্দ্রিক দুর্নীতির এক দুষ্টচক্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর রূপ যতটা কদর্য, উন্নত দেশগুলোতে তা নয়। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র আসলে ধনতন্ত্র। গণতন্ত্র সেখানে টাকার আয়ত্তাধীন, দরিদ্ররা এর নাগাল পায় না। সেখানে একজন কংগ্রেস ও সিনেট প্রার্থীকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে হয়। এই অর্থের মালিক হতে গিয়ে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠী স্বার্থের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এবং তারা পরিণত হয় গোষ্ঠী স্বার্থের ক্রীড়নকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও এটাই সাধারণ দৃশ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের দুর্নীতির এই দৃশ্যকে আমাদের দেশে আরও একটু ক্রুড ফর্মে দেখা যায়। আমাদের দেশে দুর্নীতিই শুধু ক্রুড হয় না, দুর্নীতির প্রচারও অনেক ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে হয়। শত বছরেরও বেশি আগে একজন বৃটিশ কর্মকর্তা উইলিয়াম হান্টার আমাদের দেশ সম্পর্কে লিখেছিলেন, এ দেশে সব অভিযোগকে যদি আমলে আনা হয় তাহলে প্রতি থানায় জেলখানা করতে হবে। একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে দেশের অধিকাশ মানুষ জেলখানায় গিয়ে ঢুকতে পারে।'

আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় দেখা যাবে পাল্টাপাল্টি অভিযোগের ছড়াছড়ি, যার অধিকাংশই অসত্য কিংবা বড় একটা অংশই ভিত্তিহীন। পাইকারীভাবে সত্য-অসত্য নির্বিশেষে দুর্নীতির এই প্রকাশই আমাদের দেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কারণ। ভারতে দুর্নীতি থাকলেও ভারত দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ধারে কাছে যায়নি। কারণ প্রথম আলোদের মত পত্রিকা ভারতে নেই, যারা যে পাতে খায় সে পাতই ছিঁড়ে ফেলে। সংবাদ মাধ্যমের এই ভূমিকাও একটা দুর্নীতি। সংবাদ মাধ্যমের এই দুর্নীতিই দেশকে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত দেশ হিসেবে তুলে ধরেছে। এক শ্রেণীর সংবাদপত্র দেশের চেহারা বিকৃতরূপে দেখাতেই যেন আনন্দ পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান এ বিষয়ে একটা সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সামজের ভাল-মন্দ, সংকট-সম্ভাবনা, ব্যত্যয় ব্যঞ্জনা–এসব কিছুই সংবাদপত্রের পাতায় আমরা দেখতে চাই। কিন্তু সমাজের এ দর্পণে আমাদের সমাজচিত্র কতোটুকু প্রতিফলিত হয়? অনেকেই তাই বলে থাকেন, আমাদের এ দর্পণটি ভাঙ্গা বিবর্ণ। ভাঙ্গা আয়নায় তাই সমাজের সব প্রতিচ্ছবি ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেখায়।...কেন পাঠক একাধিক পত্রিকা পড়ে তথ্যের গভীরতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তথ্যের বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে? একটি প্রসঙ্গ, একটি সংবাদ পরিবেশনের ধরন-ধারণ কিবা আঙ্গিকে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু পৃথক দু'টি পত্রিকা পড়ে পাঠক এতোই বিভ্রান্ত হচ্ছেন যে, তিনি পত্রিকা পাঠ থেকে বিরত থাকতে পারলে নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে করতেন। সংবাদের তথ্য বিভ্রান্তি শুধু সংখ্যাগত কিংবা পরিমাণগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকছে না। লেখকের (সাংবাদিক?) ইচ্ছা এবং আচরণের খেয়াল-খুশীতে পর্যবসিত হচ্ছে।" বলাই বাহুল্য এরাই দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন সাজাবার ক্ষেত্রে আত্মঘাতি বাহন হিসেবে কাজ করেছে।

আমি সম্প্রতি এক লেখায় বলেছিলাম, ঠগ অবশ্যই বাছতে হবে, কিন্তু অভিযোগ শুনেই সবাইকে নির্বিচারে ঠগ সাজিয়ে গ্রাম উজাড় করা যাবে না। আরও বলেছিলাম,

www.pathagar.com

দুর্নীতিবাজদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করে বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে অবৈধ পথে, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ভোগকে অসম্ভব করে তোলার পদক্ষেপকে। এ দু'টি কাজ অবশ্য কমবেশী সবদেশেই হয়। অনেক দেশে দ্বিতীয় কাজটি খুব কড়াকড়িভাবে হয়, কিন্তু দুর্নীতি বন্ধ করা যায়নি। এর কারণ এটাই যে, দুর্নীতি প্রবণতার মূল এতটাই গভীরে যে, এই প্রতিকারগুলো যথেষ্ট নয়। নয় বলেই দুর্নীতি দমনের বড় বড় কথা, লম্বা লম্বা পরিকল্পনা মাঠে মারা যায়। এই ব্যাপারে কলকাতার 'দেশ' পত্রিকা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছে, "রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী মুখে যতই বলুন দুর্নীতি দমনের কথা, বাস্তবে তার প্রয়োগ ও ফলাফলে আশার আলো খুবই ক্ষীণ। এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে প্রয়োজন কড়া দাওয়াই, স্বচ্ছ ও সৎ প্রশাসনই যার মূল শর্ত।"

এটা শুধু কলকাতার 'দেশ' এর কথা নয়, আমাদেরও কথা। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় স্বচ্ছ ও সৎ প্রশাসন গড়ে উঠবে কি করে? প্রশাসনের সাথে কমপক্ষে তিনটি পক্ষ জড়িত। রাজনীতিক ও আমলা এবং রাজনীতিক ও আমলাকে যারা ব্যবহার করে সেই 'ধনপতি'রা। এই তিন পক্ষের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 'ধনপতি'রাই দুর্নীতির প্রধান রক্তবীজ। এরাই টাকা বাড়াবার জন্য টাকা বিনিয়োগ করে রাজনীতিতে এবং আমলাদের পকেটে বা আমলাদের সংসারে। এদেরকে স্বচ্ছ ও সৎ না করে প্রশাসন ও রাজনীতিকে সৎ ও স্বচ্ছ করা যাবে না। এই ধনপতিদের মুখে লাগাম পরাবে কে? ভারতের রাজনীতিক ও রাজনীতির ভিত্তি অনেক মজবুত। কিন্তু তারাও পারছে না 'ধনপতি'দের অর্থ-বাণিজ্য রাজনীতিকদের পুতুল সাজিয়ে সততাকে গলা টিপে মারছে। এর হাজারো দৃষ্টান্ত আছে ভারতেই। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। সত্যেন্দ্র দুবে ৩১ বছর বয়সী একজন প্রতিভাবান সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকান মোটা স্কলারশীপ ও লোভনীয় চাকরির অফার উপেক্ষা করে দেশ সেবার জন্য তিনি যোগ দিয়েছিলেন ভারতের 'ভূতল পরিবহন মন্ত্রণালয়ে'। দায়িত্ব পেয়েছিলেন, ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান ৬০ কিলোমিটার লম্বা 'সোনালী চতুর্ভুজ' প্রকল্পের ডিভিশনাল ম্যানেজারের। কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, অসংখ্য ত্রুটিতে ভরা প্রজেক্ট রিপোর্ট, ঠিকাদারদের মধ্যে বেআইনিভাবে প্রভূত পরিমাণে অগ্রীম অর্থ বণ্টন, অযোগ্য ঠিকাদারদের এই মেগা প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সরকারি চাকরিরত ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে বহুজাতিক নির্মাতা সংস্থা ও স্থানীয় রাজনৈতিক দল-নেতৃবৃন্দের সীমাহীন অর্থ হরিলুটের দৃশ্য। সৎ ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্র দুবে এই অর্থ হরিলুট বন্ধের কোন উপায় না দেখে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে লুটের কাহিনী সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন তার নাম ও পরিচয় যেন গোপন রাখা হয়। কিন্তু গোপন থাকেনি। পরিণতি হয়েছিল সৎ ও প্রতিভাবান তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যু। সে প্রজেক্টের হরিলুট আর বন্ধ হয়নি এবং ইঞ্জিনিয়ার হত্যার মামলাও চাপা পড়ে যায়। এই কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে একজন দেশপ্রেমিক সৎ ইঞ্জিনিয়ার দুর্নীতির মোকাবিলা করতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয় নিয়েও রক্ষা পেলেন না। এই মহা দুর্নীতি চক্রের হাতে ইঞ্জিনিয়ার নিহত হওয়ার জন্য কাকে আসামী করা হবে, কাকে ফাঁসি দেয়া হবে? দেশের নির্বাহী প্রধান হিসেবে রাজনীতিক প্রধানমন্ত্রীকে আসামী করা হবে, ফাঁসি দেয়া যাবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ দুর্নীতি তাঁরই ব্যর্থতার ফল ও ইঞ্জিনিয়ার নিহত হয় তারই কারণে।

www.pathagar.com

এটা ন্যায়বিচার হবে অবশ্যই। কিন্তু তাতে কি দুর্নীতি বন্ধ হবে? সত্যেন্দ্র দুবের মত সৎ ইঞ্জিনিয়ার নিহত হওয়া কি বন্ধ হবে? হবে না। কারণ রাজনীতিক যিনি নতুন প্রধানমন্ত্রী হবেন, তিনিও সৎ কোন ইঞ্জিনিয়ারকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবেন, যেভাবে আগের প্রধানমন্ত্রী সৎ ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্র দুবেকে রক্ষা করতে পারেননি। আসল অপরাধী হলো রাজনীতিক ও আমলাদের ব্যবহারকারী দুর্নীতিবাজ ধনপতিরা। এদের দুর্নীতি বন্ধ না হলে রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রও দুর্নীতিমুক্ত হবে না। এই ধনপতিদের দুর্নীতি রাজনীতিক ও আমলাদের মধ্যেও অনেক ধনপতি সৃষ্টি করেছে এবং এই নতুন ধনপতিদের দুর্নীতি সমাজে নতুন ধনপতিরও সৃষ্টি করেছে। সব মিলিয়ে দুর্নীতির মাকড়সাজাল সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

সুতরাং রাজনীতিকে দোষ দিয়ে কিংবা কিছু রাজনীতিককে জেলে পুরলেই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে না। দুর্নীতি-জালে আবদ্ধ সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে আইনী ব্যবস্থার সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছা-বাসনাকে সৎ বানাতে হবে এবং এটা মানুষের মনে খোদাভীতি সৃষ্টির মাধ্যমেই মাত্র সম্ভব। এই খোদাভীতি আসে ঈমান থেকে। ঈমান অনুযায়ী আমলই মানুষের মধ্যে অন্যান্য গুণাবলির সাথে স্বচ্ছ ও সৎ স্বভাব সৃষ্টি করে থাকে। এ ধরনের মানুষ ব্যবসায়ী হলে সৎ ব্যবসায়ী হন, আমলা হলে সৎ আমলা হন, রাজনীতিক হলে সৎ রাজনীতিক হন এবং তারা "ধনপতি" হলে সৎ ধনপতি হয়ে থাকেন। মানব-মনের এই অভ্যন্তরীণ এই সংস্কারকই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ ঘটাতে পারে। বিগত সরকারের মন্ত্রিসভায় জামায়াতে ইসলামী থেকে দু'জন মন্ত্রী ছিলেন। সকলেই তাঁদেরকে সততার একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেছেন। তাদের মন্ত্রণালয় থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ হয়তো হয়নি, কিন্তু তারা দুর্নীতিমুক্ত থাকতে পেরেছেন এবং দৃশ্যমান কোন দুর্নীতি তারা চলতে দেননি, এটা সত্য। মন্ত্রণালয়ে এবং মন্ত্রণালয়ের বাইরে এই দুই মন্ত্রীর কাজের একটা বিস্তারিত সমীক্ষা যদি হয়, তাহলে দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এটা একটা দিক-নির্দেশনা হতে পারে।

এটাই বাস্তবতা, দুর্নীতি দমন ফর্মুলা তালাশের জন্য দিল্লী, লন্ডন, ওয়াশিংটন হাতড়ে ফেরা নয়, নিজের ঘরের দিকেই নজর দিতে হবে। জাতি হিসেবে আমরা আদর্শ জাতি গঠনের উৎস অমূল্য আদর্শ-ভাণ্ডারের মালিক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের এই নীতি-আদর্শের কথা আমরা জানি, কিন্তু মানি না। এই না মানাটাই আমাদের দুর্নীতির যাত্রা শুরুর বাহন। একজন বিশ্বাসী মানুষ যখন আল্লাহর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করে, তখন সে জাগতিক সব আইন ও নীতি-নিয়ম ভাঙায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। বিশ্বাসী হবার পর সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ তায়ালার আইন ভাঙ্গার চেয়ে বড় দুর্নীতি আর নেই। একজন এই দুর্নীতি করার পর যেকোনো দুর্নীতিই তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এই পতিত অবস্থা থেকে ফিরে আসতে হলে স্রষ্টার দিকে আবার ফিরে আসতে হবে। বাড়তি আইনী ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু মানুষ ও সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য এই অভ্যন্তরীণ সংস্কারই হলো প্রাকৃতিক পথ, প্রাকৃতিক বলেই এটাই নিশ্চিত কার্যকর পথ। এর বাইরে গিয়ে শুধুই আইনী ব্যবস্থা দ্বারা অস্থায়ী ও আংশিক ফল পাওয়া যাবে মাত্র, যেমন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশ পাচ্ছে।

২৮ এপ্রিল, ২০০৭

www.pathagar.com

জেএমবি ভিন্ন নামে আবার আঘাত হেনেছে। আঘাতটা বড় নয়। বড় নয় এই অর্থে যে, তিনটি বোমার বিস্ফোরণ থেকে বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। একজন আহত রিকশাওয়ালার একটা আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয়েছে। এদিক থেকে আঘাতটি বড় না হলেও জাতীয় মনন ও মর্যাদার জন্য আঘাতটা বড় বলেই অনুভূত হয়েছে। সামান্য শক্তির তিনটি বোমা বিস্ফোরণ অসামান্যভাবে প্রচারিত হয়েছে গোটা বিশ্বে। ঘটনার হোতাদের সাথে আল কায়েদার নাম থাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, 'বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নাজুক।'

বালাদেশে এই নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টিই বোমাবাজির লক্ষ্য। এই বোমাবাজির আগে পত্র-পত্রিকায় আমরা তথ্য বোমাও দেখেছি। তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে দেখানো। জেএমবি'র এটাই লক্ষ্য। তারা বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলাকে নাজুক দেখিয়ে ঐ একই লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। জেএমবি তার লক্ষ্য হিসেবে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার যে কথা বলে সেটা তাদের একটা মুখোশ। পরিকল্পিতভাবে এই শ্লোগান তারা মুখে তুলে নিয়েছে বা তাদের মুখে তুলে দেয়া হয়েছে তাদের আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার জন্য। গোটা ইসলামের ইতিহাসে বোমা মেরে বা লোক হত্যা করে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কোন ঘটনা নেই। আইন প্রতিষ্ঠার জন্য শাসন অথরিটি দরকার। বৈধ ও স্বীকৃত শাসন অথরিটিই আইনের প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইসলামী শাসন-অথরিটি প্রতিষ্ঠার কাজ ইসলামের ইতিহাসে হাজারো দেখা যাবে। কিন্তু লোক মেরে বোম ফেলে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কোন দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। আল কোরআনে যেখানে শত্রু বা শত্রু জাতির প্রতিও অবিচার বা সীমা লংঘনকে অবৈধ করা হয়েছে, সেখানে ইসলামের নামে কেউ মানুষের ওপর, দেশের ওপর বোমা ফেলতে পারে কি করে?

জেএমবি তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইসলামের মুখোশ পরেছে কেন? পরেছে নয়, ইসলামী মুখোশ তাদের পরানো হয়েছে। এটা আজকের সময়ের একটা সুপরিকল্পিত কূটনীতি। আমরা কেউ ভুলিনি, এক সময় কম্যুনিজম ছিল পশ্চিমা একটা পক্ষের সকল আক্রমণের টার্গেট। উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের সকল বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলার মধ্যে কম্যুনিস্ট তৎপরতার হাত আবিষ্কার করা হতো। এ সবের অনেকগুলোর সাথেই কম্যুনিস্টরা বা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল, কিন্তু সবগুলোর সাথে ছিল, একথা সত্য নয়। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক এ্যাকশন নেয়াকে সহজ করার জন্য সবাইকে কম্যুনিস্টদের সাথে ব্র্যাকেটেড করা হতো। এমনকি ভুয়া কম্যুনিস্ট পার্টি তৈরি করে তাদের দ্বারা অপকর্ম করিয়ে আসল কম্যুনিস্ট পার্টিকে ফাঁদে ফেলার ব্যবস্থা করা হতো। কম্যুনিজমের পতনের পর আজ ইসলাম হয়েছে অনেকেরই টার্গেট। যে কূটনীতি কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হতো, তা এখন ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কূটনৈতিক কার্যক্রমের একটি হলো, জ্ঞানহীন আবেগগ্রস্ত মুসলিম অথবা ভুয়া ইসলামিস্টদের মুখে সস্তা শ্লোগান এবং হাতে অর্থ ও অস্ত্র তুলে দিয়ে ইসলামকে ও ইসলামপন্থীদের সন্ত্রাসী সাজানো। পৃথিবীর অনেক ভুয়া ইসলামিস্টদের মত জেএমবি'ও

www.pathagar.com

এই কূটনীতিরই সৃষ্টি। জেএমবি'র বিশেষ বিদেশী লিংক এর একটা প্রমাণ। লক্ষণীয়, এবার জেএমবি কাদিয়ানী ও এনজিও বিরোধী যে হিংসাত্মক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে, সেটা ইসলামের আন্তর্জাতিক শত্রুদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগসাজশ কিংবা তাদের হাতে ক্রীড়নক হবারই প্রমাণ। দুনিয়ার কোন দেশে কোথাও কোন ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা কোন ধর্ম পরিচয় নেয়াকে ও নিছক এনজিও সদস্য হওয়াকে কারও অপরাধ হিসেবে অভিহিত করে তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কর্মসূচি নেয়নি, নেয়াকে বৈধ মনে করেনি। এটাই ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের মহান ইমেজকে কলঙ্কিত করার জন্যই ইসলামের শত্রুরা ইদানীং মুসলিম নামের কিছু লোককে তথাকথিত ইসলামপন্থী সাজিয়ে তাদের হাতে মানবতা বিরোধী হিংসাত্মক কর্মসূচি তুলে দিচ্ছে। জেএমবি বাইরের ও বিজাতীয় এই ষড়যন্ত্রেরই ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।

জেএমবি'র পেছনের ষড়যন্ত্রকারী এই 'কূট-নীতিক'রা কারা? এই প্রশ্নের সহজ জবাব সম্ভব নয়। কারণ, এই ধরনের ষড়যন্ত্রকারীরা সব সময় নেপথ্যে থাকে, মুখোশ খুলে সামনে আসে না। এরা মাধ্যম ব্যবহার করে উদ্দেশ্য সাধন করে। এই মাদ্যমদের এমনভাবে বাছাই করা হয়, যাতে তারা টার্গেটদের (জ্ঞানহীন আবেগগ্রস্ত মানুষ) নিঃসন্দেহ আস্থাভাজন হতে পারে। ষড়যন্ত্রকারীদের এ ধরনের মাধ্যমের সাথে জেএমবি'র গোপন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার খবর তাদের মুখ থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। জেএমবি'র অর্থের কিছুটা সৌদি আরব, ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের কিছু সূত্র থেকে আসলেও অস্ত্র, ট্রেনিং ও পরিকল্পনা-পরামর্শ এসেছে কিছু ভারতীয় নাগরিকের কাছ থেকে। এই ভারতীয় নাগরিকরাই মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ২০০৬ পর্যন্ত জেএমবি'র যে অস্ত্র ধরা পড়েছে তা হলো, ১৯টি পাইপ গান, একটি রিভলভার, ৭ হাজার ৮৯৫টি ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ১০০টি নন-ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৩১০টি পাওয়ার জেল, ২২টি ওয়ার জেল, ৫০ কেজি গান পাউডার, ১৩ কেজি হোয়াইট পাওডার, ২৭ কেজি এলুমিনিয়াম পাউডার, ৭৯ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ৪২ কেজি লিড অ্যাজাইড ও ৩৮ কেজি পটাসিয়াম নাইট্রেট। এর মধ্যে ওয়ান শুটার গান, ডেটোনেটর, পাওয়ার জেল, গান পাউডারের মত সব অস্ত্রই ভারত থেকে আসা। জঙ্গীদের মূল ট্রেনিংও ভারতেই হয়। এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ভারতকে জানানোও হয়েছে। বিডিআর-বিএসএফ'র দিল্লী বৈঠকের (২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ ২০০৬ অনুষ্ঠিত) বরাত দিয়ে যায় যায় দিন লিখে, "১৭ আগস্টের বোমা হামলার পরিকল্পনায় ইন্ডিয়ান মাওলানা মহসিন ভাদুড়িয়া, মিস্টার রামেশ্বর প্রসুনসহ আরো অনেকে জড়িত ছিল। ইন্ডিয়ার উত্তর চব্বিশ পরগনার মিস্টার রামেশ্বর প্রসুনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নয়টিরও বেশি ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলাদেশ বিরোধী ট্রেনিং ক্যাম্প চালু আছে। ওইসব ক্যাম্পেই ১৭ আগস্টের (একই সাথে ৬৩ জেলায়) বোমা হামলার হোমওয়ার্ক সম্পন্ন হয়।" (যায়যায়দিন, ৪ অক্টোবর, ২০০৫) গ্রেফতারকৃত ভারতীয় নাগরিক নাসিরউদ্দিন ও গিয়াসউদ্দিনের কাছ থেকে এসব তথ্য বাংলাদেশ পেয়েছে। তারা বেশ কয়েক বছর বাংলাদেশে অবস্থান করে ইন্ডিয়ান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে লিপ্ত ছিল বলেও যায়যায়দিন গোয়েন্দা জিজ্ঞাসাবাদ সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়। জেএমবি'র কাছ থেকে উদ্ধার করা পাওয়ার জেল, এক্সপ্লোসিভ ও ইলেক্ট্রনিক ডেটোনেটরগুলো ভরতের ঝাড়খন্ড কারখানা থেকে তৈরি। এ তথ্যও ভারতকে জানানো

www.pathagar.com

হয়। জেএমবি'র সাথে জড়িত অর্ধডজনের বেশি ভারতীয়ের নাম এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, এদের কেউই এখনও ভারতে গ্রেফতার হয়নি। বাংলাদেশ জেএমবি'র শীর্ষ সব নেতাসহ তাদের সাতশ' কর্মীকে গ্রেফতার করতে পেরেছে, কিন্তু ভারত জেএমবিকে অস্ত্র সরবরাহকারী, ট্রেনিংদানকারী কোন ভারতীয়কেই গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ জেএমবি'র সাথে ভারতীয় নাগরিকদের যোগসাজশের কথা বাংলাদেশের কাছে জানতে পেরে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, সে দেশে জঙ্গীদের তৎপরতা তাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাদের আশঙ্কা ও অ্যাকশনের মধ্যে এই ফারাক কেন? এই আশঙ্কা প্রকাশ কি নিছকই লোক দেখানো, না এর মধ্যে দিল্লী-সরকার ও তার গোয়েন্দা বিভাগের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত না জানা না বুঝার কোন ব্যাপার আছে?

আছে এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ সরকারের আগে চলে, এটা দেখা গেছে। অবশ্য ঠিক আগে চলা একে বলে না, সেখানকার বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রীয় দিক-নির্দেশনা বা মিশন সামনে রেখেই কাজ করে যায়। দিল্লীর তখতে সরকার আগে সরকার যায়, এতে গোয়েন্দাদের এই কার্যধারার কোন ব্যত্যয় ঘটে না। আসা-যাওয়া সরকারের কাছে এই গোপন তৎপরতার অনেক কিছুই আড়ালে থেকে যেতে পারে। এটাই সেখানে ঘটে আসছে। অনেক উদাহরনের মধ্যে সিকিম নিয়ে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ 'র' এর অগ্রবর্তী ভূমিকার দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরের ঘটনা। এই সময় দিল্লী সরকার সিকিম নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা শুরু করার অনেক আগে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সিকিম দখলের কাজ শুরু করে দেয়। ভারতীয় লেখক অশোক রাইনা তার বিখ্যাত 'ইনসাইড 'র' বইতে বিষয়টা এইভাবে শুরু করেছেন, "অপারেশন বাংলাদেশ শেষ। এক মাস পর একজন উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা 'র' প্রধানের অফিসের বারান্দা দিয় হেঁটে সভাকক্ষের দরজার নিকটে এসে থামলেন। টোকা দেয়র পূর্বেই তাঁকে সাদরে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে চারজন লোক নীরবে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। শান্ত-নীরব পরিবেশ তপ্ত চঞ্চল হয়ে উঠল মুহূর্তে। 'ভালো দেখিয়েছেন, কাজটা ভালোভাবেই হয়েছে (অপারেশন বাংলাদেশ)। এখন আমাদের পরবর্তী কাজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে।' বাকি চারজন বিস্মিত হয়ে ভেবেই পেলেন না 'এ আবার কি?' 'সিকিম' ভদ্রমহোদয়গণ 'সিকিম'। দেখুন এ টার্গেট কি বের করতে পারেন। আপনারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে ২৪ মাস সময় পাবেন', অবশ্য সরকার যদি আদৌ কোন ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা নেয়।' বাকি আলোচনায় সকলই একটার পর একটা আশ্চর্যজনক অথচ সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কথাই শুনলেন। আর নতুন চিন্তার সূত্রগুলো সাজাতে লাগলেন গোয়েন্দা মস্তিষ্কের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। অবশ্য ঐ ক্ষমতাবান কর্মকর্তার এটা কোন অফিসিয়াল সভা ছিল না বটে, তবুও সিকিম নিয়ে আন-অফিসিয়াল চিন্তা-ভাবনা এভাবেই শুরু।" (ইন সাইড 'র' পৃষ্ঠা-৭৫)

এই আন-অফিসিয়াল সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই সিকিমকে অস্থিতিশীল করার কাজ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' শুরু করে দেয়। অশোক রাইনা লিখছেন, "অতঃপর সিকিমের চারটি জিলা সদর গ্যাংটক, মাঙ্গান, নামচিত্ত, গিয়ালসিং-এর 'র'-এর এজেন্টদের অনুপ্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তারা ধীরে ধীরে অপারেশনাল তথ্যাদি

www.pathagar.com

সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল এবং ভারতকে যদি মাঠে নামতেই হয় তবে যেন সবকিছু গুছানো পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করার চেষ্টায় রইল। আগন্তুক কর্মকর্তার সাথে 'র' সদর দপ্তরে সেই 'চারজন' 'র' কর্মকর্তার সেই আলাপচারিতার আঠার মাসের মধ্যে 'র' এর সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়। এখন শুধু মাঠে নামার পালা। এ সবের পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 'সিকিম অপারেশন' সম্পর্কে অবহিত করা হয়।" (ইনসাইড 'র' ৭৮)

সিকিমের এই দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে, 'সিকিম অপারেশন'-এর সব প্রস্তুতি শেষ করার পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে, অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে জানানো হয়। সুতরাং দিল্লী সরকারের অজান্তেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশের জেএমবি'কে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ এবং ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেছে বা করতে পারে তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। ভারতীয় কারখানায় ভারতীয় সামরিক উপকরণ পাওয়ার জেল, ডোটোনেটরের মত দ্রব্যের বিপুল সরবরাহ মুসলিম নামের অজ্ঞাত, অখ্যাত কিছু ভারতীয় নিজেরাই করেছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আগের আলোচনায় ফিরে আসি। জেএমবি'র ইতিপূর্বেকার বোমাবাজি, বিচারক হত্যা, সেদিন তিনটি স্থানে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো, সর্বহারাদের সন্ত্রাস সবকিছুরই লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক করে তোলা এবং নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত করা। লক্ষণীয়, জেএমবি ও সর্বহারাদের সন্ত্রাস শুধু নয়, নির্বাচনের মুখে আমরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত হতেও দেখেছি। সেনাবাহিনী এগিয়ে না এলে রাজনৈতিক বিপর্যয় গোটা দেশকেই বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিত। এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রকাশ্য একটা রাজনৈতিক কারণ আছে, কিন্তু অপ্রকাশ্য কোন কারণ ছিল কিনা, প্রকাশ্য মঞ্চ-নটদের আমরা সকলেই চিনি, কিন্তু নেপথ্যে কোন নট-নটি ছিল কিনা, থাকলে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল, এসব বিষয়ে অনুসন্ধান এখনো হয়নি। দুর্নীতির বিষয়টা আমাদের এমনভাবেই গ্রাস করেছে যে তার বাইরে আমরা যেন কিছুই দেখছি না। নৈরাজ্য সৃষ্টির গোটা ব্যাপারের নেপথ্যটা আমাদের অজানাই থেকে যাচ্ছে। তবে একথা খুবই সত্য যে, দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রেরও প্রথম টার্গেট দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটানো। বিপর্যয় ঘটে যায় আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই বিপর্যয় আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। জরুরি অবস্থা ভেঙে পড়া শাসনব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলার নৈরাজ্য থেকে দেশকে ফিরিয়ে এনেছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার স্বাভাবিকতায় এখনও ফিরে যেতে পারেনি।

এই পরিস্থিতিতেই দেশের তিনটি স্থানে একই সাথে জেএমবি'র বোমা বিস্ফোরণ। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে বসেছে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্কলা পরিস্থিতি নাজুক। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশ সন্নিহিত তার জেলাগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে বাংলাদেশের সন্ত্রাস যেন তাদের দেশের শান্তিতে কোন বিঘ্ন না ঘটায়। তারা বুঝাতে চাচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলার দিক থেকে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নাজুক ও অস্থিতিশীল। এ মন্তব্য সম্পর্কেই আমার ঘোর আপত্তি।

এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে অতিকথন। জেএমবি বোমা এই প্রচারই চাচ্ছে। আর তারা পরিস্থিতি 'নাজুক' বলে এই প্রচারই করছে। বিভিন্ন স্থানে কিছু বোমা ফুটলেই কি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক হয়ে যায়? ৬৩ জেলায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকেও

www.pathagar.com

কি বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে শামাল দেয়নি? জঙ্গী দমনে বাংলাদেশের যে সাফল্য, যেভাবে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী জেএমবি জঙ্গী ও সর্বহারা সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করছে, তাতে বাংলাদেশ সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলার দিকে ভারতের আঙুল উঁচানো 'চালুনি সূচেরে বলে তুই বড় ছেদা' প্রবাদ বাক্যের মতই লাগে শুনতে। বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভারতের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত এবং আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতাও ভারতের তুলনায় চোখে পড়ার মত। ভারতে সন্ত্রাসী ঘটনা এবং এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আতঙ্কিত হবার মত। সেখানে প্রতি ১৬ মিনিটে একটি খুন এবং প্রতি ২৯ মিনিটে ১টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বড় সন্ত্রাসী ঘটনা আরও আতঙ্কজনক। গত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় ভারতে মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ২১০ জন। এর মধ্যে পুলিশের সংখ্যাই ৭৬ জন। জানুয়ারিতে এক গেরিলা হামলায় আসামে ৫৫ জন নিহত হয়। ফেব্রুয়ারিতে দুইটি গেরিলা হামলার ঘটনায় মনিপুরে নিহত হয় ২১ জন পুলিশ। ফেব্রুয়ারিতেই ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় ৬৬ জন। মার্চে তিনটি বড় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। দিল্লীতে একজন পুলিশ কর্মকর্তার গুলীতে তার পাঁচজন সহকর্মী নিহত হয়। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের গুলীতে নিহত হয় ১৩ জন কৃষক। মাচ্ মাসেই ছত্তিশগড়ে একটি থানায় মাওবাদী আক্রমণে ৫০ পুলিশ নিহত হয়। ভারতে সন্ত্রাসী ঘটনার এই চিত্র শুধু এই কয়েক মাসের নয়। বহুদিন ধরে সেখানে চলছে এই প্রবণতা। ২০০৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লী থেকে জয়ন্ত ঘোষাল 'নকশাল সদস্য ৩ লক্ষাধিক, সশস্ত্র ক্যাডার ৭ হাজার' শীর্ষক এক রিপোর্টে বলেন, 'বিভিন্ন নকশাল সংগঠনের শাখাগুলোর সদস্য সংখ্যা এখন তিন লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এর মধ্যে সাবেক জনযুদ্ধের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার এবং এমসিসি'র ৭৫ হাজার।... অন্ধের নাল্লামাল্লা জঙ্গল এবং দন্তকারণ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ-উড়িষ্যা-ঝাড়খন্ডের সংযোগ স্থলে নকশালরা আরও একটি গেরিলা অঞ্চল তৈরির চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের নকশালেরা জলপাইগুড়িতে একটি রাজনৈতিক সেল তৈরির চেষ্টা করছে। এছাড়া মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর দিয়ে নেপাল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগের একটি নিরাপদ করিডোর তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।... এই মুহূর্তে দেশের ১২৬টি জেলাকে নকশাল প্রভাবিত বলে মনে করছে কেন্দ্র। নিজেদের প্রভাব বাড়াতে আরও ৩১টি জেলায় তারা ঢোকার চেষ্টা করছে। ১১টি রাজ্যে মোট ৮০টি জেলা থেকে এখন সব থেকে বেশি হিংসাত্মক ঘটনার খবর আসছে।... ২০০২-০৩ সালে সারাদেশে ১৬০১টি হিংসাত্মক ঘটনায় ৫৭২ জনের মৃত্যু হয়।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

এই একই তারিখে আসামের শিলচর থেকে পাঠানো উত্তম সাহার একটি দীর্ঘ রিপোর্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়। সে রিপোর্টের ভূমিকাই ছিল এই রকম, "হাফলং থেকে ১২২ কিলোমিটার গেলে দয়ামুখ, যেখানে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা এবং কার্বি আংলং বিভাজিত হয়েছে, সেখান থেকে জঙ্গলের পথ ধরে তিন কিলোমিটার এগোলে 'নো এন্ট্রি জোন।' পুরোপুরি সামরিক কায়দায় এসএলআর, এম-১৬, এ কে-৮, এ কে-৫৬ নিয়ে ঘোরাফেরা করছে ২০ থেকে ২৫ এর একদল চোয়াল শক্ত করা যুবক।" এই রিপোর্টের ১ বছর পর ২০০৬ সালের ২৩ অক্টোবর India Today এই ধরনের আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট ছিল শুধু নকশাল তৎপরতার

www.pathagar.com

ওপর। এ রিপোর্টে বলা হয়, নকশাল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ১৬৫টি জেলা। ২০০৬ সালে নকশালরা ৯৩০টি হামলা চালায়। প্রায় ১১শ'র মত লোক নিহত হয়। মারা যায় ৫০০ নকশাল। পুলিশ নিহত হয় ১৩০ জন। নকশাল তৎপরতা রোধে দিল্লী সরকারকে খরচ করতে হয় ৮০০ কোটি টাকা। উপরের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২০০২, ২০০৩ সালে সন্ত্রাসী ঘটনায় মোট নিহত ৫৭২ জন, কিন্তু এক ২০০৬ সালেই নিহত ১০৭২ জন। ২০০৭ সালের পরিসংখ্যান ভালোর দিকে নয়। মাত্র তিন মাসের ৭টি বড় সন্ত্রাসী ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২১০ জন। এই তিন মাসে পুলিশ নিহত হওয়ার সংখ্যা ৭৬ জন। অথচ ২০০৬ সালে ১২ মাসে পুলিশ নিহত হয় ১৩০ জন। অন্যদিকে ২০০৩ সালের দিকে নকশাল প্রভাবিত জেলার সংখ্যা ছিল ১২৬, গত ২০০৬ সালে এই সংখ্যা উন্নীত হয় ১৬৫ টিতে। অতএব সেখানে পরিস্থিতি ভালোর দিকে নয়, খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এই অবস্থাতেও যদি ভারতের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক না বলা হয়, তাহলে বাংলাদেশের অবস্থাকে নাজুক বলা হবে কেন? জাতিগত অসন্তোষ, বিদ্রোহ, দারিদ্র্যজনিত কারণে সোসিয়াল সেক্টরের বেহাল অবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বিপর্যয়, ধর্মীয় সংঘাত ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে ভারতের রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ হলেও উল্টো বাংলদেশের ঘাড়ের ওপর অকার্যকর রাষ্ট্রের বদনাম চাপাবার চেষ্টা করা হয় কেন?

আসলে বাংলাদেশ অপপ্রচারের শিকার। এই অপপ্রচারে ইন্ধন দিচ্ছে বাংলাদেশেরই একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা। অন্যদিকে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী কালিদাসের মত যে ডালে বসে সে ডালেরই গোড়া কাটার চেষ্টা করছে। নিরাময় ব্যবস্থাকে ব্যাধি হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করছে তারা। গত পরশু একজন শীর্ষ আইনজীবী এবং সিপিডির অন্য একজন শীর্ষ নেতা একটা টিভি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে বললেন, ধর্মের নামে জঙ্গী উত্থান বন্ধ করতে হলে দেশের ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে। তাদের এই কথা বাস্তবতার একেবারেই উল্টো। ধর্মীয় জঙ্গীবাদ-চিন্তাকে নির্মূল করার জন্যে বরং ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। সকলেই জানেন, জঙ্গীপনা গণতান্ত্রিক চিন্তার বিপরীত। অনুরূপভাবে ধর্মের নামে জঙ্গীপনাও ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির খেলাফ। ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারণা যত শক্তিশালী হবে, যত বিকশিত হবে, ধর্মীয় জঙ্গীবাদের ততই বিলয় ঘটবে। এই সাদা কথাটা উল্লেখিত শীর্ষ বুদ্ধিজীবীরা জানেন না তা নয়। তাদের এই উল্টো কথা বলাটা, আমি বলতে চাই, একটা ষড়যন্ত্রের অংশ। ষড়যন্ত্রটা হলো, ধর্মীয় জঙ্গীপনাকে সামনে এনে, একে অজুহাত সাজিয়ে ইসলামের অবস্থান ও উত্থানের ওপর আঘাত হানা। জেএমবিকে যারা তৈরী করেছে এবং অস্ত্র দিয়ে, ট্রেনিং দিয়ে, অর্থ দিয়ে মদদ দিচ্ছে, তাদের লক্ষ্য এটাই। আমাদের ঐ বুদ্ধিজীবীরাও এই লক্ষ্যেই উল্টো কথাগুলো বলছেন। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা কথা বলতে হয়, বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গীবাদকে উস্কে দেয়া বা লেলিয়ে দেয়ার মধ্যে ভারতের একটা ঐতিহাসিক স্বার্থ আছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গীপনাকে সামনে এনে ইসলামকে কলংকিত করে এবং একে বিপজ্জনক অভিহিত করে যদি এখানকার ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও জনগণের ইসলামী চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়, তাহলে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের যুক্তি ও ভিত্তিকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে ফেলা যাবে এবং তাতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীক ভিত্তিরও ধীরে ধীরে বিলয় ঘটবে। যার ফলে বাংলাদেশ সিকিম হওয়ার পথে অলংঘনীয় কোন বাধা আর থাকবে না। বাংলাদেশের ধর্মীয় জঙ্গীপনাকে মদদ দেয়াকে ভারত এই কারণেও অপরিহার্য মনে করতে পারে।

www.pathagar.com

আমি আমার আলোচনার বিষয় থেকে আবার একটু দূরে সরে গেছি। যারা বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক বলে অভিহিত করেছেন, তারা সত্য কথা বলছেন না। এমন কথা বলছেন কেন তারা? বলার কারণ আছে। বাইরের যারা বলছেন, তারা বাংলাদেশকে চাপে রাখতে চান বা চাপে ফেলতে চান যাতে তারা বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে পারেন। আর ভেতর থেকে যারা বলছেন বা বলবেন, তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উত্তরণকে বাধাগ্রস্ত করা। বাইরেরও কেউ কেউ এটা চায় বাংলাদেশে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। এদের কারও চাওয়াই সফল হবে না ইনশায়াল্লাহ। ৬৩টি জেলায় এক যোগে বোমা বিস্ফোরণের পর উদ্ভূত সংকট বাংলাদেশ যোগ্যতার সাথে যেভাবে কাটিয়ে উঠেছে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্যকর যে সংকট দেশকে গ্রাস করে, সে সংকট যেভাবে বাংলাদেশ কাটিয়ে উঠেছে, গণতন্ত্রের উত্তরণের পথেও যে বাধা আসবে তাকেও বাংলাদেশ সেভাবেই টপকে যাবে।

৬ মে, ২০০৭

বাংলাদেশ-ভারত রেল চলাচল

আজকের লেখার বিষয়টাতে যাবার আগে একটা জরুরি বিষয়ে কয়েকটা কথা না বলে পারছি না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রদান জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ গত বুধবার বিবিসি'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে দেশের কিছু বিষয়ে কথা বলেছেন। এর মধ্যে দুই নেত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা সম্পর্কেও কথা আছে। তাদের চলাচলের উপর বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, দুই নেত্রীই মুক্ত নাগরিক। দেশে ফেরার ব্যাপারে শেখ হাসিনার উপর নিরাপত্তাজনিত কারণে বিধি-নিষেধ ছিল। তা তুলে নেয়া হয়েছে। তিনি দেশে ফিরেছেন।' অন্যদিকে বেগম জিয়াকে চাপ দিয়ে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'যা সত্যি তাই আমি বলছি। বেগম খালেদা জিয়া তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ওমরা করার জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই পরিকল্পনা করছিলেন।' এখানে দুইটি বিষয়– এক, দুই নেত্রীর চলাচলের উপর বিধি-নিষেধ, দুই, বেগম জিয়াকে বিদেশ যেতে বাধ্য করার চেষ্টা। এই দুই বিষয়ে জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ যা বলেছেন, তা মানুষ যা জানেন তার একেবারেই উল্টো। গত বৃহস্পতিবার যেদিন জনাব ফখরুদ্দীনের এই বক্তব্য ছাপা হয়ছে, সেদিনই আরও দু'টি নিউজ ছাপা হয়েছে তার বক্তব্যের পাশাপাশিই। নিউজ দু'টি দুই নেত্রী সম্পর্কে। একটিতে বলা হয়েছে, খালেদা জিয়ার বাসায় গতকালও কেউ যেতে পারেননি। অন্য নিউজ বলেছে, শেখ হসিনার সাথে সাক্ষাতে কড়াকড়ি। তিনি ৩২ নম্বরে যেতে চেয়েও পারেননি।' এই দুই নিউজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ফখরুদ্দীন আহমদের এই বক্তব্যকে অসত্য প্রমাণ করে যে, দুই নেত্রী মুক্ত মানুষ। দ্বিতীয়তঃ ফখরুদ্দীন আহমদ সাহেবের এই কথাও সত্য নয় যে, বেগম জিয়াকে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, এ কথা দেশের সব সংবাদপত্র লিখেছে। দেশের মানুষ জেনেছে। বিদেশও তা বুঝেছে। একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, এমন মানুষ খুব কম পাওয়া যাবে যে লোক অবাক হয়নি জনাব ফখরুদ্দীন

www.pathagar.com

আহমদের কথায়। এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও কূট-কূটনীতিকের মত তিনি সত্যকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তিনি তো রাজনীতিক নন, কূট-কূটনীতিকও নন। সাধারণ মানুষও যা ঠিক মনে করে না এমন কথাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি চাইলেন কেন? মিথ্যা সব পাপের মা। কিন্তু সাধারণ মানুষের মুখের মিথ্যা অতবড় হয় না যতটা তা বড় হয় একজন অসাধারণের মুখে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ সাধারণের মধ্যে পড়েন না। অসাধারণদের মিথ্যাও অসাধারণ হয়ে থাকে। অসাধারণরা অসাধারণ কাজে যুক্ত থাকেন। সেসব অসাধারণ কাজে মিথ্যা যুক্ত হলে তা অসাধারণ অর্থাৎ মারাত্মক ফল হয়ে দেখা দেয়। এ কারণেই পশ্চিমী সমাজে 'ফ্রি সেক্স' খুব আপত্তির না হলেও তাদের অসাধারণদের অর্থাৎ নেতাদের 'ফ্রি সেক্স'কে কিন্তু তারা খুবই আপত্তির দৃষ্টিতে দেখে। বহু প্রতিভাবান নেতার পতন ঘটেছে এমন অপরাধের কারণেই। আমাদের দেশে জনমতকে এমন মূল্য দেয়া হয় না এবং আমাদের জনমত এমন শক্তিশালীও নয়। তাই একশ্রেণীর নেতা-নেত্রীরা জনমতকে, গণরায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে বিবেকের দংশন একটুও অনুভব করে না। আমাদের রাজনৈতিক সংকটগুলো এভাবেই তৈরি হয়। এই তো তিন দিন আগে ফ্রান্সের নির্বাচনে পরাজিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বিজয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানাতে একটুও দেরি করেননি। কিন্তু আমাদের দেশের একটা বড় দলে একজন নেত্রী পরাজিত হবেন এই ভয়ে এমন রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করলেন যে, শুধু নির্বাচন বাতিল নয়, দেশের রাজনীতিকেও সংকটের মুখে ফেলেছেন। এ ধরনের রাজনীতিকরাই মিথ্যাকে সত্যের মত করে বলতে পারেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ফখরুদ্দীন আহমদ তো এই শ্রেণীর রাজনীতিক নয়, এমনকি তিনি রাজনীতিকও নন। তাহলে কেন বিদেশী মিডিয়ার কাছে তিনি এমন কথা বললেন, যা সত্য নয়। 'যা সত্যি তাই আমি বলছি' বলে তিনি যে কথা বলেছেন, তাকে সত্য বলা যাবে না, একথা তিনিও জানেন। বিদেশী মিডিয়ার এই অসত্য কথা বলে তিনি শুধু নিজের মর্যাদা নষ্ট করেননি, কেয়ারটেকার সরকারের মর্যাদা নষ্ট করেছেন এবং মর্যাদা নষ্ট করেছেন দেশেরও।

কথায় কথা আসে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ফখরুদ্দীন আহমদের বক্তব্য মানুষকে যেমন অবাক করেছে, তেমনি ৮ই মে'র আরেকটি ঘটনা মানুষকে বিস্মিত করেছে। সেটা হলো, সুপ্রিম কোর্ট ভাংচুরের অভিযোগে আনিত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার শুনানি এক বছর পিছিয়ে দেয়া। মামলাটির বিষয় বাংলাদেশের ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা। গত বছর ৩০শে নভেম্বর একটা রীট আবেদনের কার্যক্রম প্রধান বিচারপতি স্থগিত করায় কিছু শীর্ষ আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে নজিরবিহীন তাণ্ডব চালায়। তারা দফায় দফায় ব্যাপক হামলায় প্রধান বিচারপতির এজলাস, তার কক্ষ, এটর্নি জেনারেলের কার্যালয় ভাংচুর, দরজায় লাথ এবং লুটপাট চালিয়েছে। এই ঘটনাটির সচিত্র বিবরণ দেশ-বিদেশের পত্রিকায় ছাপা হয়। একমাত্র ভাংচুরকারী মহল ছাড়া সকল মানুষের পক্ষ থেকে এই তাণ্ডবের নিন্দা জানানো হয় এবং এর বিচার দাবি করা হয়। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিরা এই তাণ্ডবের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন। তারা কয়েক দিন একযোগে বিচার কাজ পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন। ঘটনা কত বড় অন্যায় ও ভয়াবহ হলে বিচারপতিরা একযোগে এটা করতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়। সাবেক প্রধান বিচারপতি ও বাংলাদেশ আইন কমিশনের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টে সেদিন যা ঘটেছে তার

www.pathagar.com

ফলে আমাদের গোটা বিচার ব্যবস্থাই আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। সেদিন যা ঘটেছে তাতে পুরো বিষয়টি নিয়ে আমি ভীষণ বিমর্ষ, শঙ্কিত।' আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, "সুপ্রিম কোর্টে ভাংচুরের ঘটনা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। শুধু তাই নয় এমন ঘটনা যাতে হাজার বছর কেন কোনদিনই না ঘটে তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।" আমার মনে হয় সুপ্রিম কোর্টে ভাংচুরের যে ঘটনা সেদিন ঘটেছিল, তার প্রতিক্রিয়া আরও ভয়ঙ্কর হতো যদি ভাংচুরের ঘটনার সাথে ড. কামাল, ব্যারিস্টার আমির উল-ইসলাম, ব্যারিস্টার রুকনউদ্দিন মাহমুদ, ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর প্রমুখের মত শীর্ষ আইনজীবী জড়িত না থাকতেন। কোনো সাধারণের দ্বারা এমন ঘটনা ঘটলে তাদেরকে বাইরের আলো-বাতাসের মুখ আর দেখতে হতো না। নজিরবিহীন তাণ্ডবের বিচার চেয়ে হাইকোর্টের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে মামলাও দায়ের হয়েছে। আসামীরা সকলেই জামিনে আছেন। এই মামলার কার্যক্রমই গত ৯ই মে ১ বছরের জন্যে স্থগিত করা হয়েছে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা দীর্ঘদিনের জন্যে স্থগিত করে দেয়ার বিষয়টি মানুষকে বিস্মিত করেছে। বহুল প্রচলিত একটা নীতিকথা হলো, Justice delayed justice denied. অর্থাৎ সুবিচার বিলম্বিত হওয়া সুবিচার না হওয়ারই শামিল। এই মামলাটির দুই পক্ষের কে ঠিক, কে বেঠিক, তা নিয়ে আমার ব্যথা নেই। মহামান্য আদালত এই মামলার কি রায় দেবেন, তা নিয়েও আমার কোন কথা নেই। আমার বক্তব্য বিচার বিলম্বিত করা নিয়ে। মামলাটি যে কত বড়, কত চাঞ্চল্যকর তা আগেই বলেছি। এ মামলার প্রতি সর্ব সাধারণের আগ্রহ থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। মামলাটি বিলম্বিত হওয়ায় মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। মামলার আসামী যদি কতিপয় শীর্ষ আইনজীবী না হতেন, তাহলে কি মামলার এই পরিণতি হতো? হতো না, এই ধারণাই আজ মানুষের মধ্যে প্রবল। এই ধারণা সৃষ্টি হওয়া আমাদের উচ্চতর আদালতের মর্যাদার জন্যে কোনভাবেই কাঙ্খিত নয়। সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামালের– 'সুপ্রীম কোর্টে সেদিন যা ঘটেছে তার ফলে আমাদের গোটা বিচার ব্যবস্থাই আজ প্রশ্নের সম্মুখীন'–কথাটাকে আবার সামনে এনে বলতে চাই, মামলাটির বিচার কার্যক্রমের অস্বাভাবিক বিলম্বতা কি এই প্রশ্নটাকে আজ আরও তীব্র করে তুলল না?

যাক এসব প্রসঙ্গ। আজ আমার লেখার বিষয় বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যেকার আসন্ন রেল যোগাযোগ। আমি বিষয়টিতে ফিরে আসছি। বাংলাদেশ-ভারত রেল যোগাযোগের ব্যাপারটি আগের দু'টি বিষয়ের মত বিস্ময়কর কিছু নয় বটে, কিন্তু দ্বিপাক্ষিক এ বিষয়ে দরকষাকষির ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতাকে উদ্বেগজনক হিসাবে দেখার যুক্তিসংগত কারণ আছে। ঢাকা-কলকাতা রেল চালুর সিদ্ধান্তগত সব কাজই সম্পন্ন। রেল চলাচল শুরু হবার বিষয়টি এখন সময়ের ব্যাপার। মাস দেড়েক আগে ইন্ডিয়ান এক টিভি চ্যানেলে ভারতের একজন কর্মকর্তা বললেন, কলকাতার শিয়ালদহ ও ঢাকা জয়দেবপুরের মধ্যে ট্রেন চলাচল পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হচ্ছে।' 'ঢাকা থেকে এ খবর অস্বীকার করে বলল, 'ডেট ঠিক হয়নি, এ নিয়ে আলোচনা চলছে।' পরে আবার ভারতের কর্মকর্তাদের তরফ থেকে বলা হলো মধ্য জুলাই থেকে রেল চলবে। কিন্তু ঢাকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন আগামী বছরের প্রথম দিকের আগে রেল চলাচল শুরু হচ্ছে না। তবে যখনই হোক রেল চলাচল শুরু হচ্ছে ঢাকা-কলকাতার মধ্যে, এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

পশ্চিম বাংলা-বালাদেশ রেল যোগাযোগ নতুন বিষয় নয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত কলকাতা থেকে বাংলাদেশের গোয়ালন্দ অবধি ট্রেন চলেছে। তবে এবারের রেল যোগাযোগকে আগের মত নিছক বাংলাদেশ-পশ্চিমবংগ রেল যোগাযোগ হিসাবে দেখা হচ্ছে না। বিশেষ করে ভারত তা দেখছে না। অবস্থা দেখে বাংলাদেশেও এ প্রশ্ন জোরদারভাবে উঠেছে, Is the proposed Kolkata-Dhaka train service prelude to transit facility to Tripura and Agartala? অর্থাৎ ঢাকা-কলকাতা রেল চলাচল কি ভারতের রেল ট্রানজিট লাভের পূর্ববার্তা? ভারতে কিন্তু কোন প্রশ্ন নয়, ঢাকা-কলকাতা রেলকে তারা ভারতের বহুল আকাংখিত transit-এর অংশ বলে মনে করছে। ভারতের সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই একটা নিউজ করেছে। নিউজটি ছাপা হয়েছে ভারতের 'দি হিন্দু' পত্রিকায় ২১শে এপ্রিল (০৭) সংখ্যায়। এই নিউজে বলা হয়েছে যে, ত্রিপুরার কুমার ঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের কাজ শেষ হবে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে। এরপর বাকি থাকবে শুধু বাংলাদেশের আখাউড়া হতে আগরতলা রুটে সংযোগ গড়ে তোলা। ভারত এই কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে বাংলাদেশকে অনুরোধ জানিয়েছে।' বাংলাদেশের সরকারি সূত্র আগরতলা-ঢাকা রেল চলাচলের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও নিরবে ঢাকা-আগরতলা রেল চলচল তথা ভারতকে টানজিট দেয়ার পক্ষে কাজ করছে। একটি পত্রিকা সম্প্রতি খবর দিয়েছে, 'গত ৬ থেকে ৮ই মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩ দিনব্যাপী দুই দেশের মধ্যে আন্ত রেল বৈঠকে এ সংক্রান্ত (ঢাকা-আগরতলা রেল) ভারতীয় জরীপ রিপোর্ট হস্তান্তর করা হয়েছে বাংলাদেশ রেল কর্তৃপক্ষের কাছে। তারা (বাংলাদেশ রেলওয়ে) এ সংক্রান্ত জরীপ কাজ চালাবেন বলে ওই বৈঠকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে। ট্রানজিটের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করা ও এগিয়ে নেয়ার জন্যে ভারত বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে ১৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। রেল সূত্র থেকে প্রকাশ, ট্রানজিট বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে ভারত পণ্য বা পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের সুযোগ পাচ্ছে না। পরবর্তী ধাপে পাচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

অর্থাৎ ভারত রেল ট্রানজিট পাচ্ছে। নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া হয়েছে। না হলে জরীপের প্রশ্ন উঠে কি করে, এজন্যে ভারতীয় ঋণ প্রস্তাব আসে কেন এবং ট্রানজিটের ধাপ নিয়ে পরিকল্পনা হয়ে যায় কি করে?

বহুল আলোচিত, বহুল বিতর্কিত ট্রানজিট নিয়ে সিদ্ধান্ত এভাবে হতে পারে কি করে? দেশে এখন জরুরি অবস্থা চলছে। দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ। রাজনীতিকদের মতামত প্রকাশেরও সুযোগ নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসন এখন দেশে। মাত্র দশজন উপদেষ্টা চালাচ্ছেন কয়েক ডজন মন্ত্রণালয়। কোন বিষয়েই প্রয়োজনীয় সময় দেবার এবং কোন বিষয়ের গভীরে যাবার সুযোগ তাদের নেই। যে কাজ পার্লামেন্টে আলোচনার মাধ্যমে হয়, যে কাজ কয়েক ডজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর দ্বারা হয়, সে কাজ তাদের দ্বারা হবার প্রশ্নই উঠে না। এ অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্ত বহুলাংশেই আমলা নির্ভর হবার সম্ভাবনা বেশী। ট্রানজিটের মত মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত যদি এই পরিস্থিতিতে হয়, তাহলে সেটা যথার্থ না হবার আশঙ্কা রয়েছে। এই আশঙ্কাই সত্য হতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ঢাকা-আগরতলা রেললাইনের ব্যাপারে ভারতের সাথে অবশ্যই

www.pathagar.com

উপযুক্ত দরকষাকষি করা হয়নি। এমনকি ঢাকা-কলকাতা রেললাইন নেয়ার পর ঢাকা-আগরতলা রেললাইনকে ভারত কার্যত যে ট্রানজিট নিয়ে নিচ্ছে এ বোধ আমাদের মধ্যে এসেছে বলে আমার মনে হয় না। ঢাকা-কলকাতা, ঢাকা-আগরতলা রেললাইন এক সাথে নেয়ার চেষ্টা ভারত কেন করেনি? একটা পাওয়ার পর অন্যটা পাওয়ার চেষ্টা করছে কেন? এ 'কেন' এর উত্তর হলো, এই দুই রেল সংযোগ এক সাথে চাইলে ভারতের ট্রানজিট আদায়ের গোপন অভিলাষটা নগ্নভাবে ধরা পড়ে যেত। তাতে করে তাদের উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যেত বলে তারা মনে করেছে। এ জন্যেই ভারত তাদের ট্রানজিট নেয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে ধাপে ধাপে। ভারতের এই কৌশল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানীদের গৃহীত কৌশলের মত। জাপান তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে, জাপানের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ তখন মার্কিনীদের হাতে। সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় জাপানীদের কোন স্বাধীন ভূমিকার অবকাশ ছিল না। এই অবস্থায় জাপানীরা ধীরে ধীরে মার্কিনীদের হাত দিয়েই খণ্ড খণ্ড সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে গোটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। মার্কিনীদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় যখন তারা দেখতে পায় যে, হাজারো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা জাপানীদের হাতে চলে গেছে এবং তা মার্কিনীদের দস্তখতেই গেছে। খণ্ড খণ্ড সিদ্ধান্ত দেয়ার সময় তারা এটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু খণ্ড খণ্ড সিদ্ধান্ত একত্র জোড়া দেয়ার পরই পরিষ্কার হয়ে যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গোটা প্রক্রিয়া জাপানীদের হাতে চলে গেছে। ভারতীয়রা এইভাবেই বাংলাদেশের কাছ থেকে ট্রানজিট হাত করতে চাচ্ছে। এক সময় কলকাতা-গোয়ালন্দ রেলসংযোগ ছিল, সেই যুক্তিতে কলকাতা-ঢাকা রেল সংযোগ পাওয়া যুক্তিসঙ্গত। তা আগে নিয়ে নেয়ার কাজ ভারত সম্পন্ন করেছে। এরপর যুক্তি উঠেছে, ঢাকা-কলকাতা রেল সংযোগ যে কারণে হয়েছে, সে কারণে ঢাকা-আগরতলা রেল সংযোগও হওয়া উচিত। কলকাতার লোকরা ঢাকা আসার সুযোগ পেলে ত্রিপুরা-মিজোরামের মানুষ ঢাকা-বাংলাদেশে আসার সুযোগ পাবে না কেন? খুবই সত্য কথা। এ সুযোগ ভারত পেয়ে যাচ্ছে। এ সময় বলা হবে সংযোগ রেলপথে ভারতীয়রা কলকাতা-ত্রিপুরা চলাচল করবে, এটা মেনে না নিলে রেল সংযোগের প্রয়োজন ছিল না। অতএব এ নিয়ে আপত্তির কোন প্রশ্ন নেই। এরপর আসবে সংযোগ রেলে মানুষ চলাচলের সাথে পণ্য চলাচলের প্রমাণ। মানুষ যখন চলছে, তখন পণ্য চলতে আর আপত্তি কেন? আপত্তি থাকবে না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পণ্য চলাচল শুরু হবে মালবাহী বগি সংযোগের মাধ্যমে। পরে কথা তোলা হবে ভারতের পক্ষ থেকে যে, প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পণ্য পরিবহন অসুবিধাজনক হচ্ছে এবং প্রয়োজনও পূরন করছে না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যখন পণ্য পরিবহন করতে দেয়াই হচ্ছে, তখন পণ্যবাহী মালট্রেন চলতে না দেয়ার পেছনে যুক্তি নেই। এ দাবীর পেছনে যুক্তি আছে। যুক্তিটি মেনেও নেয়া হবে। এভাবে জাপানীদের মত কৌশল বা অপকৌশল ব্যবহার করে ভারত বাংলাদেশের কাছ থেকে পূর্ণ রেল ট্রানজিট ছিনিয়ে নেবে।

ঘটনা এইদিকেই যাচ্ছে। যারা ভারতকে এইভাবে ট্রানজিট দিতে যাচ্ছেন, তারা দ্বিপাক্ষিক দরকষাকষির সাধারণ নীতি জানেন না তা বলা যাবে না। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ রেল সংযোগ নিয়ে যা ঘটছে, তাতে প্রমাণ হচ্ছে না যে, তারা এই নীতি অনুসরণ করছেন। যদি অনুসরণ করতেন তাহলে তারা রেল ট্রানজিট আলোচনা শুরু করার আগেই ভারতকে বলতেন যে, নেপাল-বাংলাদেশ ট্রানজিটের উপর থেকে বাধা

www.pathagar.com

নিতে চাইছে। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য সরবরাহ, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডারের নাগাল পাওয়ার মত বিষয়।" (নয়াদিল্লী থেকে পাঠানো আনন্দবাজারের রিপোর্ট, এপ্রিল ৪, ২০০৪)। আর ৪ মে আনন্দবাজার তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখে, "অন্তর্বর্তী তদারকি শাসনে থাকা বাংলাদেশের সহিত চোখে পড়িবার মতো হার্দ্য উষ্ণতা। দলীয় রাজনীতিকরা মঞ্চ হইতে আপাততঃ অবসৃত হওয়ায় ভারত বিরোধিতার চিরাচরিত কূটনীতি হইতে তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ... রূপান্তরমুখী বাংলাদেশের উষ্ণ ও সকৃতজ্ঞ নৈকট্য দক্ষিণ এশিয়ায় নয়াদিল্লীকে যে সুবিধাজনক অবস্থানে স্থাপন করিয়াছে, মনোমোহন সিংহ তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ... ভারত যদি ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের স্থলভাগ দিয়া সড়ক সংযোগ কিংবা সে দেশের ভূগর্ভস্থ তেলভাণ্ডার ব্যবহারের সুবিধা পায, তবে তাহার চেয়ে উত্তম আর কি হইতে পারে?" (সার্ক চতুর্দশী, সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার, ৪ মে, ২০০৭) 'স্বার্থ' নামক এই 'উত্তম'-এরই অভিলাষী ভারত। প্রতিবেশী দেশে সুস্থ গণতন্ত্রের বিকাশ তার এই অভিলাষের পরিপন্থী। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের সরকার বলে তাদের দ্বারা তার অভিলাষ পূরণ হয় না। এ জন্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এত প্রশস্তি এবং তার অভিলাষ পূরণের এত আকাংখা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট নিকোলাস বার্নস এই সাদা বিষয়টা জানেন না, তা আমি মনে করি না। সব জেনেই তিনি ভারত খুশী হওয়ার মত কিছু কথা বলেছেন একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। যেখানে মিঃ বার্নস ঐ উক্তি করেছেন এবং যখন করেছেন, তা প্রমাণ করে তার মন্তব্য উদ্দেশ্যমূলক। তিনি কথাগুলো বলেছেন 'ইউএস-ইন্ডিয়া রিলেশন্স' শীর্ষক এক সেমিনারে। সেমিনারের বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে তিনি যে উক্তি করেছেন, তা এ জন্যেই বিশেষ অর্থ বহন করে না। দ্বিতীয়তঃ তার এই কথা বলার সময়টা হলো তার ভারত সফরের পূর্ব মুহূর্ত। আর তার এই সফরটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-মার্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তির ব্যাপারে তারা গত বছর যে সমঝোতায় পৌঁছেছে, তাকেই চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্যে নিকোলাস বার্নস-এর দিল্লী আসা। ভারতকে মার্কিন স্বার্থের সাথে বেঁধে ফেলার জন্যে এই চুক্তি সম্পাদন মার্কিনীদের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ নিয়তের কথা কারোই অজানা নেই যে, সে চীনের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভারতকে ব্যবহার করতে চায়। অর্থনৈতিক ও সামরিক সব দিক দিয়েই চীন একুশ শতকের এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। অন্যদিকে পারমাণবিক শক্তিধর ভারতও আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে দ্রুত সামনে এগিয়ে আসছে। ২০২৫ সালের মধ্যে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে বটে, কিন্তু ভারতও তখন চতুর্থ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। চীনের মত অত বিশাল সামরিক আয়োজন ভারতের নেই, কিন্তু এরপরও এশিয়ার আকাশ ও নীল সাগরে চীনের পরেই ভারতের সরব উপস্থিতি অনুভূত হবে। সুতরাং চীনের মোকাবিলায় ভারতকে পক্ষে পাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে অপরিহার্য। এই অপরিহার্য লক্ষ্য অর্জনেরই কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গত বছর স্বাক্ষরকৃত ভারত-মর্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি। সুতরাং এই চুক্তির বাস্তবায়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজকেই

www.pathagar.com

বার্নস-এর এই উক্তিতে দৃশ্যতঃ অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কারণ বিশ্ব রাজনীতিতে এগুলো একান্তই গদবাধা কথা। কিন্তু বিশেষভাবে যদি উপমহাদেশের রাজনীতিকে সামনে রাখা হয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্কের বিষয় যদি বিবেচনায় আনা হয়, তাহলে কথাটা দাড়ায় অনেকটাই আঁৎকে ওঠার মত। আতংকটা শিয়ালছানাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে কুমিরের হাতে তুলে দেয়ার মত। নিকোলাস বার্নস বলেছেন, 'ভারতের গণতন্ত্র তার প্রতিবেশীদের জন্যে মডেল হতে পারে।' মডেল হতে পারে যদি সে মডেল চায় যে, প্রতিবেশী দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু ভারতের ভাঁড়ারে কি এমন শুভেচ্ছাবোধের কোনো সঞ্চয় আছে? নেই, এটাই ইতিহাস। বরং ভারতের কাছে তার ছোট প্রতিবেশীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই। ভারত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তার এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটায়। প্রথমে তারা স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর হাত দেয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় ২৮১টি দেশীয় রাজ্য ছিল। দেশ বিভাগের নীতি অনুসারেই ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা ছাড়ার সাথে সাথেই তারা স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বাধীন থাকতে দেয়া হয়নি। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে তাদের গ্রাস করে ফেলা হয়েছে। ভূপাল, মহীশুর, ইন্দোর, হায়দরাবাদ, উদয়পুর, নাগাল্যান্ড, যোধপুর, ত্রিপুরা, মনিপুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি যে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল তা মানুষ ভুলেই গেছে। অন্যান্য প্রতিবেশীদের প্রতিও ভারতের এই একই লোলুপ দৃষ্টি। প্রতিবেশী ছোট দেশগুলোর সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতের বড় প্রতিবেশীসুলভ কোন উদারতা নেই। পাকিস্তান পারমাণবিক দেশ হওয়ার কারণে তার সাথে ভারতের ব্যবহার ভিন্ন। কিন্তু গরীব ও দুর্বল নেপালকে পালিত 'মুরগি'র বেশী কিছু মনে করে না ভারত। আর বাংলাদেশকে মাথা নত করতে বাধ্য করার জন্যে ভাতে মারার, পানিতে মারার কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করছে না। ভারতের পানি-কূটনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্যে ভয়াবহ এক খড়্গ। তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর চীনের বাঁধ নির্মাণের খবরে ভারত ইতোমধ্যেই চিৎকার শুরু করেছে। বলছে, ব্রহ্মপুত্র আন্তর্জাতিক নদী। এতে বাঁধ দিয়ে চীন পানি সরিয়ে নিতে পারে না। অথচ ভারত নিজের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নীতি কথা মানে না। বাংলাদেশের উজানে আন্তর্জাতিক নদীর উপর ভারত ২৪টির মত বাঁধ নির্মাণ করেছে। বৈধ ও অবৈধ বাণিজ্য পথে ভারত শোষণ করছে বাংলাদেশকে। চুক্তির টেবিলে বসলে ভারত শুধু নিতে চায়, দিতে চায় না কিছুই। বাংলাদেশের সীমান্ত জুড়ে ভারত কাঁটা তার দিয়ে অবিশ্বাসের প্রাচীর গড়ে তুলছে। এমন ভারতকে তো প্রতিবেশীরা আতংকের চোখেই দেখার কথা। নিকোলাস বার্নস যদি মনে করে থাকেন যে, এই ভারত বাংলাদেশে গণতন্ত্র এনে দেবে, তাহলে সেটা হবে শিয়ালকে কুমিরের বিশ্বাস করার মত ব্যাপার। ভারতের গণতন্ত্র ভারতের জন্যে, প্রতিবেশী দেশে গণতন্ত্র সে চায় না। চায় না কারা গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে অবৈধ ও অযৌক্তিক সুবিধা আদায় করা যায় না। লক্ষণীয়, ভারত এখন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকে তাদের দাবি আদায়ের সুবর্ণ সুযোগ মনে করছে। তারা পরিষ্কার বলছে, "এর আগের রাজনৈতিক সরকার বহুক্ষেত্রেই ভারতের কূটনৈতিক আশা-আকাংখাকে আমল দেয়নি।... নতুন তদারকি ক্ষমতায় আসার পর আশার আলো দেখা যাচ্ছে।...বাংলাদেশের রাজনীতি যে পথে যাচ্ছে, তা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক...। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারত...কিছু সুবিধা অর্জন করে

www.pathagar.com

স্বেচ্ছামূলক। এছাড়া এখন নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অন্যান্য যে বিধান প্রস্তাব করেছে, সেগুলো ঐ আদেশে ছিল না। প্রশ্ন হলো, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২-এর বিধানাবলীর সাথে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সংক্রান্ত তাদের প্রস্তাব যোগ করতে পারেন কিনা। পারেন না এটাই এর উত্তর। কারণ, সংবিধানের ১১৯(২) ধারায় 'অন্য কোন আইন'-এর পরিসীমা নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এটাই সংবিধানের স্পিরিট। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত আইন করবে, এটাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। তাদের কাজ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, নির্বাচনের বাইরের বিষয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকার কথা নয় এবং এসব বিষয়ে আইন প্রণয়নের তো প্রশ্নই ওঠে না। এ অধিকার সবিধান তাদের দেয়নি, দিতে পারে না। এই অধিকার এমনকি সংবিধান জাতীয় সংসদকেও দেয়নি। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবিধান জাতীয় সংসদকে সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বলেছে। 'নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা' শিরোনামে সংবিধানের ১২৪ ধারায় বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্যে প্রযোজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।" এই ধারায় পরিষ্কার যে, নির্বাচন সংক্রান্ত বিধানকে নির্বাচন বিষয়ক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। জাতীয় সংসদের প্রতি যদি সংবিধানের এই নির্দেশ হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে গঠিত বিশেষ সংস্থা হয়েও নির্বাচনী আইনকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে রাজনৈতিক দলগুলোর ঘর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন কি করে? পারেন না। কিন্তু নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাতেই চাচ্ছে। নিয়ত তাদের অবশ্যই সৎ, পথ কিন্তু তাদের বেআইনী, অসংগত, অনভিপ্রেত। এটা তারা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন, বিতর্কে তাদের ততোই কম জড়াতে হবে এবং তারা নিজের মাথায় চিন্তা করেন না, এমন কথাও তাহলে কেউ তাদের লক্ষ্য করে বলবে না। রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলের সংস্কারের আমি পক্ষে। কিন্তু এই সংস্কারের জন্যে নির্বাচন কমিশন নয়, এগিয়ে আসতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকেই। আর আইন যদি এখন করতেই হয়, তাহলে সেটা করতে হবে সরকারকে, রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা নিয়ে।

২৬ মে, ২০০৭

দক্ষিণ এশিয়ার মনিবত্ব

মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট নিকোলাস বার্নসের সাম্প্রতিক একটি উক্তি বাংলাদেশের জন্যে একটা বড় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বার্নস বলেছেন, "রাজনৈতিক সংঘাতে ব্যাহত হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পার্টনার হিসেবে অত্র অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতায় এক সাথে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত।"

www.pathagar.com

কমিশনের সহিত নিবন্ধিত হইয়াছে উহাকে বুঝাইবে" – এই বাক্যাংশ সংজ্ঞার সাথে যুক্ত করেছে। সবিধান প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে এই বাক্যাংশ যুক্ত হবার ফলে সংবিধানের দেয়া রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সংজ্ঞা অনুসারে কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত না হলে তাকে নির্বাচনযোগ্য 'রাজনৈতিক দল' বলা যাবে না। কিন্তু নির্বাচন কমিশন কি এতবড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে? নিলে তা কি সংবিধানসম্মত হবে? আমার মনে হয় হবে না। কারণ, সংবিধান তার দেয়া রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত হওয়াকে নির্বাচনযোগ্য 'রাজনৈতিক দল' হওয়ার শর্ত বানায়নি। নির্বাচন কমিশন যদি রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকে অপরিহার্য করে দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অভিভাবক সেজে বসে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব ব্যাপারে এইভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করে, তাহলে সেটা হবে সংবিধানের খেলাপ।

নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে আচরণ বিধি তৈরি করেছে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর নির্বাচন কেন্দ্রিক বিধিমালায় যে সংশোধন আনতে চাচ্ছে, তা সবই ঠিক আছে। সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, নির্বাচন পরিচালনা ও ফলাফল ঘোষণা এবং সংবিধান ও অন্য কোন কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে এমন দায়িত্ব পালন করতে বলেছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের 'খসড়া সুপারিশমালা' শীর্ষক বিধিমালায় রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব এনেছে, তা তাদের সংবিধান নির্ধারিত দায়িত্বের পরিপন্থী। এ সংস্কার প্রস্তাবে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে : এক. নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক, দুই. নিবন্ধিত দল ছাড়া কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবে না, তিন. দেশ-বিদেশে দলের ব্যাংক একাউন্টের নাম ও নাম্বার নির্বাচন কমিশনে দিতে হবে, চার. দলীয় গঠনতন্ত্রে দলের অভ্যন্তরে নির্বাচনের বিধান থাকতে হবে ও নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে, পাঁচ, দলীয় ফান্ডের অডিটেড রিপোর্ট এবং দলীয় নির্বাচন ও কমিটি গঠনের প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে দাখিল করতে হবে এবং অনিবন্ধিত দলের সাথে জোট বাঁধা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের এসব প্রস্তাব ভাল কি মন্দ, অযৌক্তিক না যুক্তিসঙ্গত, এ নিয়ে আমার কোন মন্তব্য নেই। আমার কথা হলো, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিধি-বিধান প্রণয়ন করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশন রাখে না। সংবিধানের ১১৯(১) থেকে এর 'ক', 'খ', 'গ' এবং 'ঘ' পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্বের যে বিধান রয়েছে, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর গায়ে হাত দেবার কোন সুযোগ নেই। ১১৯(২) ধারায় নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত কিছু দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে, "উপরিউক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।" সংবিধানের এই ধারায় অতিরিক্ত দায়িত্বের দুইটি উৎসের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো 'সংবিধান', অপরটি হলো 'অন্য কোন আইন'। বিদ্যমান 'অন্য কোন আইন'-এর মধ্যে রয়েছে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২'। এই আদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত আইনই রয়েছে। নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের বিধান এতে ছিল। কিন্তু তা ছিল

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলের অভাব শুধু নয়, জনমতের ওপর প্রভাবশালী ও জনগণের আস্থাভাজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করতে পারে। সুস্থ গণতন্ত্র ও নিরাপদ দেশের জন্যে বড় ও শক্তিশালী কিছু রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অপরিহার্য। বড় নেতৃত্ব যেমন এসব দলের সৃষ্টি করে, এসব দল তেমনি আবার বড় নেতৃত্বের জন্ম দেয়। দল যত খণ্ড-বিখণ্ডিত হবে, নেতৃত্ব ততোই দুর্বল, ভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। দেশের শত্রুদের জন্যে এমন রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই লোভনীয়। কারণ এমন দুর্বল ও ভঙ্গুর নেতৃত্ব হয়ে থাকে ক্রয়যোগ্য। ক্রয় করার জন্যে ক্রেতার অভাব নেই আমাদের দেশের চারপাশে। এই ক্রয়-বিক্রয়ে দেশের স্বাধীন রাজনীতি শুধু শেষ হয়ে যাবে না, দেশের স্বাধীনতাও সংকটে পড়তে পারে লোভী লেন্দুপ দরজীদের উত্থানে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য বলতে পারেন, আমরা দেশে এই সংকট তৈরি করতে চাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি দলগুলোতে গণতন্ত্র আসুক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রসেসটা সামষ্টিক হোক। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তারা আইন করলেই কি রাজনৈতিক দলে এসব এসে যাবে? বড় রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে কি গণতন্ত্রের চর্চামূলক ও সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহন বিষয়ক বিধি-বিধানের অভাব আছে? তাদের কি দলীয় নির্বাচনের জন্যে কাউন্সিল নেই? সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে নির্বাহী কমিটি, প্রেসিডিয়াম কী নেই? আছে। তাহলে শতভাগ গণতন্ত্র চর্চা দলগুলোতে হচ্ছে না কেন? হচ্ছে না এই কারণে যে, ঐ দলগুলোতে ঐতিহ্যিকভাবেই এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত যে, তার প্রতি দলের লোকদের আস্থা নির্ভরতা এতো বেশি যার কারণে সকলেই সাধারণভাবে তার সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী। দলগুলোর নির্বাহী কমিটি, প্রেসিডিয়াম বা স্থায়ী কমিটিতেই সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকাই মুখ্য থাকে। এর একটা কারণ মানসম্পন্ন, প্রভাবশালী ও ইমেজের অধিকারী এক সেট নেতৃত্বের অভাব। তাই দল মূল নেতৃত্বের প্রাধান্যকে স্বাভাবিক বলেই মনে করে। দল যাকে স্বাভাবিক মনে করে তাকে অস্বাভাবিক বলার মাথা ব্যথা নির্বাচন কমিশন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কেন? নির্বাচন কমিশন নতুন বিধি-বিধান দিয়ে কি এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন? বিধি-বিধান জারি করলেই নির্বাহী কমিটিতে শেখ হাসিনা কিংবা খালেদা জিয়ার বর্তমান প্রভাব খর্ব হয়ে যাবে? যাবে না যে, একথা নির্বাচন কমিশনও জানে। তাহলে রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে এতো হৈ-চৈ কেন? আর এই সংস্কারকে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু বা মুক্ত রাজনীতির জন্যে শর্ত বানানো হচ্ছে কেন?

নির্বাচন কমিশনের এই অহেতুক কসরত নিশ্চয় একটা বাড়াবাড়ি অথবা তাদের দায়িত্ব এবং সাংবিধানিক পন্থার অবশ্যই খেলাপ। নিজেরা জয়েন্ট স্টক কোম্পানী সেজে রাজনৈতিক দলগুলোকে কমার্শিয়াল ফার্মের পর্যায়ে তারা নিতে চাচ্ছেন, এটা কি সংবিধান চেয়েছে? আমি মনে করি, চায়নি। নির্বাচন কমিশন তার প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের আচরণবিধিতে রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, তা সংবিধান নির্ধারিত সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন। প্রস্তাবিত আচরণবিধিতে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো, "রাজনৈতিক দল বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১)-এ সংজ্ঞায়িত রাজনৈতিক দল যাহা নির্বাচন কমিশনের সহিত নিবন্ধিত হইয়াছে উহাকে বুঝাইবে।" এখানে নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ১৫২(১) ধারায় প্রদত্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সংজ্ঞা গ্রহণ করেছে, কিন্তু "যাহা নির্বাচন

www.pathagar.com

স্ত্রী বেগম জিয়া এবং শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আছেন তার কন্যা শেখ হাসিনা। এই দু'নেত্রী রাজনীতি করতেন না। তাদের পরিবারের গুডউইলকে দল, দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজে লাগাবার জন্যেই তাদেরকে রাজনীতিতে আনা হয় এবং তাদেরকে রাজনীতিতে আনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

এখন একেই বলা হচ্ছে একনায়কতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্র। এই একনায়কতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্রকে ধ্বংস করা বা এর অবসান ঘটানোর জন্যে নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। কিন্তু তারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্ত বানাচ্ছেন রাজনৈতিক সংস্কার ও রাজনৈতিক দল থেকে একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদকে। তাদের চোখের ষোল আনা বিষদৃষ্টি গিয়ে পড়েছে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার উপর। তারা মনে করছেন এই দুই ব্যক্তিত্ব মাইনাস হলেই দুই রাজনৈতিদ দলে গণতন্ত্রের মহাসুবাতাস বইবে। আমি নিশ্চিত, এই চিন্তা তাদের রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার ফল। তারা উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে কোনই জ্ঞান রাখেন না। আসলে খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্ব আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রয়োজন ও কালচারের অপরিহার্য ফল। নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের ইতিহাস থেকে চোখ বন্ধ করে রাখলে চলবে নাই। বিএনপি থেকে অনেকেই বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু জিয়া পরিবারের ইমেজ বাদ দিয়ে পাল্টা বিএনপি গঠন সম্ভব হয়নি। এর কারণ হলো উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের মত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র রাজনৈতিক দল হিসেবে গঠন ও প্রতিষ্ঠা সামষ্টিক নেতৃত্বে নয়, শেখ মুজিব ও জেনারেল জিয়ার একক নেতৃত্বের ফল। তাদের ইমেজ ও নেতৃত্ব অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে দল দু'টি। তাদের ইমেজ ও আদর্শই দলের মূলধন ছিল, এখনও আছে। তাদের ইমেজ ও আদর্শ মাইনাস করলে দল দু'টি থাকে না। এ কারণেই দেখা গেছে, আওয়ামী লীগের অনেক বড় বড় নেতা নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে পাল্টা আওয়ামী লীগ করেছে, কিন্তু সবাই ব্যর্থ হয়েছেন। জেনারেল জিয়ার জাতীয়তাবাদী আদর্শ ছিনতাই করে ও নিজের ক্ষমতাসীন ইমেজ নিয়ে বিএনপির বিকল্প জাতীয় পার্টি গঠন করেছিলেন জেনারেল এরশাদ ক্ষমতার আসনে বসে। কিন্তু এরশাদ যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন, ততদিন দল টিকেছে সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার কারণে, তারপর খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে। সুতরাং আওয়ামী লীগের প্রাণ যেমন শেখ মুজিবের ইমেজ ও আদর্শ, তেমনি জেনারেল জিয়ার ইমেজ ও আদর্শ হলো বিএনপির প্রাণ। শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়া মরহুম দুই নেতার ইমেজ ও আদর্শের প্রতীক হিসেবে দুই দলকে এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অন্য কথায় বলা যায়, শেখ মুজিব ও জেনারেল জিয়ার অবর্তমানে দুই নেত্রীই এখন তাদের স্ব স্ব দলের প্রাণ। এই রাজনৈতিক সত্যটা ইলেকশন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবশ্যই জানেন, কিন্তু মানেন না তা পরিষ্কার। মানেন না কি এ জন্যেই যে দল দু'টিকে দৃশ্যপট থেকে সরানো দরকার? এটা তারা নিঃসন্দেহে জানেন, শেখ হাসিনা পরিবার ও জিয়া পরিবারকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি থেকে মাইনাস করলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নাম অবশ্যই টিকে থাকবে, কিন্তু সেটা মুসলিম লীগের মত হাজারো খণ্ডের অস্তিত্ব নিয়ে। কিন্তু বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্যে এটা শুভ হবে না, আর দেশের জন্যে হবে খুবই অশুভ। কারণ এই পরিস্থিতি দেশে শক্তিশালী

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সংকট বড় রাজনৈতিক দলগুলোর একনায়ক নেতৃত্বের ফল কিনা, সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে আমার মতে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর এই ব্যাধি সাম্প্রতিককালের নয় যে, বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনাকে এ জন্যে দোষ দেয়া যাবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো অতীতে কোনো সময়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কথিত একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্ত ছিলো না। এই উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে সফল রাজনৈতিক দল মুসলিম রীগ ও কংগ্রেসের ইতিহাসও এটাই। এ দু'টি দল থেকে অনেক দলের জন্ম হয়েছে, অনেক নতুন দল দৃশ্যপটে এসেছে। তাদেরও ইতিহাস এটাই বলে। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অত্যন্ত গণতন্ত্রমনা লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, মুসলিম লীগের সভাপতির পদ অলংকৃত করে রেখেছিলেন। কংগ্রেসে সভাপতির বদল হতো বটে, কিন্তু মুসলিম লীগের চেয়ে অনেক বেশী একনায়কতন্ত্র ছিল কংগ্রেসে। সেখানে এম. কে গান্ধী যা বলতেন, সেটাই ছিল কংগ্রেসের আইন, কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। কংগ্রেসে সভাপতি পাল্টানো হতো, সেটা নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, গান্ধীর সিলেকশনের মাধ্যমে। আজ গান্ধী নেই, গান্ধীর সেই কংগ্রেস কিন্তু ভারতে আছে। সেখানে আজও চলে সেই সিলেকশন। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী এবং আজ সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসে সেই এম. কে গান্ধীরই একনায়ক রোল প্লে করছেন। ভারতের আর একটি বড় দল বিজেপি'র নেতা-নির্বাচন হয় নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, একটা গোষ্ঠী-সিলেকশনের দ্বারা। আরএসএস ও সংঘ পরিবারের গোপন মতামতের বাইরে কারও পক্ষে বিজেপি'র সভাপতি হওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্তানের গোটা ইতিহাসে মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচন কোন সময়ই নির্বাচনের উপর নির্ভর করে হয়নি; বরং নেতার মত অনুসারেই দলের কাউন্সিল ও নির্বাহী কামিটি তৈরি হয়েছে। আজও পাকিস্তানে মুসলিম লীগ জেনারেল মোশাররফের একনায়কতন্ত্রের অধীন। বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্ন নয়। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হওয়ার পর চার বছর কোন কাউন্সিল মিটিং হয়নি। চলেছে ভাসানীর একনায়কতন্ত্র। ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়া এবং সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগে যোগদান করায় ভাসানী, মুজিব, সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমানের বহুমুখী নেতৃত্বের সুযোগ হয়। কিন্তু এটা আমাদের রাজনীতির কালচার ছিল না। নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে ৪ বছর এ ব্যবস্থা চললেও পরে আধিপত্যের প্রশ্নে ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ দু'ভাগ হয়ে যায়। ভাসানী ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) গঠন করেন, সোহরাওয়ার্দী, মুজিব ও আতাউর আওয়ামী লীগে থেকে যান। দলে আধিপত্যের কোন্দলই ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন নিয়ে আসে। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন শেষে ১৯৬৪ সালে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ পুনর্জীবিত করে এর সভাপতি হলেন। আমৃত্যু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। অন্যদিকে ভাসানী ১৯৫৭ সালে ন্যাপের সভাপতি হবার পর আমৃত্যু এর সভাপতির পদে থেকে যান। জেনারেল জিয়া গঠন করেন বিএনপি এবং জেনারেল এরশাদ গঠন করেন জাতীয় পার্টি। জেনারেল জিয়ার রাজনৈতিক জীবন তুলনামুলকভাবে সংক্ষিপ্ত ছিল। জেনারেল জিয়া যতদিন জীবিত ছিলেন তার দলকে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং জেনারেল এরশাদ প্রায় দু'দশকের বেশীকাল ধরে তার গঠিত জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে বহাল আছেন। আর বর্তমানের অবস্থা হলো জেনারেল জিয়ার অবর্তমানে তার দলের নেতৃত্বে আছেন তার

www.pathagar.com

কমিশন প্রস্তাব-পরামর্শ তালিকাভুক্ত করা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এই যুক্তির সীমা মানছেন না। উদাহরণ হিসেবে তাদের সর্বশেষ একটা প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা যায়। এতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দলের সব কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব থাকতে হবে। বোধসম্পন্ন যে কেউ বলবে, কোন প্রস্তাবকে বিবেচনাযোগ্য ভাবতে হলে সর্বনিম্ন যে যুক্তিটুকু থাকা দরকার, তা এই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নেই। পৃথিবীর কোন দেশের কোন রাজনৈতিক দলে এই ধরনের ব্যবস্থা নেই। নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতায় শীর্ষে পৌঁছা কোন দেশেও এই ব্যবস্থা রাখা হয়নি। পৃথিবীর কোন নারী সংগঠনের তরফ থেকে এমন অবাস্তব দাবিও ওঠেনি। ওঠেনি কারণ তারা জানে নেতা নির্বাচনের যে মানদণ্ড তার খেলাফ এই চিন্তা। নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন মহিলার সংখ্যা যদি বেশী হয়, ৩৩ শতাংশ কেন অধিকাংশ নেতার আসন তারা দখল করে নিতে পারে। আর সেই যোগ্যতার মহিলা যদি না থাকে, তাহলে ৩৩ শতাংশ নয় ৩ শতাংশ নেতৃত্বের আসনও তারা পাবে না। নারী স্বাধীনতার দেশ বৃটেনে মহিলা রাজনীতিক থ্যাচার তিনবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচতি হয়েছেন, কিন্তু নারী স্বাধীনতার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও কোন মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেনি। এর অর্থ থ্যাচারের মত যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা মার্কিন রাজনীতিতে আসেনি। অথচ বাংলাদেশে গত দেড় দশক ধরে মহিলারাই প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। এটা তাদের যোগ্যতা ও মানুষের আস্থা লাভের কারণেই। পরিবারতন্ত্রের প্রশ্ন উঠতে পারে। পরিবারতন্ত্রও একটা যোগ্যতা। বিখ্যাত কেনেডি পরিবারের সদস্য হওয়ার সুযোগ কি ঐ পরিবারের সদস্যরা নেয় না? মিসেস ক্লিনটন কি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটএনর স্ত্রী হওয়ার সুযোগ নিচ্ছেন না? নেহেরু পরিবারের দৃষ্টান্ত সবার সামনে রয়েছে। নেহেরু পরিবারের রাজনীতি আজ ৫ম পুরুষে (fifth generation) প্রবেশ করেছে। যাহোক, আমি যোগ্যতার কথা বলছিলাম। যোগ্যতা ও তার ব্যবহারই ঠিক করবে ছেলে ও মেয়ে রাজনীতিতে কে কতটা এগুবে, তেত্রিশ শতাংশ নেতৃত্ব মহিলাদের জন্যে বরাদ্দ করার প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্রেরও এটা পরিপন্থী। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, দেশে গণতন্ত্র না থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতান্ত্রিক সংস্কার আনার জন্যে নির্বাচন কমিশনসহ সরকারের যখন চেষ্টার অন্ত নেই, তখন মহিলাদের জন্যে ৩৩ শতাংশ প্রস্তাব সংরক্ষিত করার অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব উঠেছে। ব্যাপারটা 'নীতির নামে দুর্নীতি'র মতো।

রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে নির্বাচন কমিশন যা করছে, তাকে নীতির নামে দুর্নীতি বলা যাবে না। তবে বাড়াবাড়ি বলা যাবে অবশ্যই। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যে নির্বাচন কমিশন যে সব বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে চাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন যেন জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, আর রাজনৈতিক দলগুলো যেন কমার্শিয়াল ফার্ম। রাজনৈতিক দলগুলো এজিএম করছে, ফান্ডের অডিট হচ্ছে, বিভিন্ন কমিটির নির্বাচন ঠিকমত চলছে, এসব রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনে দিতে হবে। পৃথিবীর কোন দেশে রাজনৈতিক দলগুলোকে এইভাবে কমার্শিয়াল ফার্মে পরিণত করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এটা যেন একটা পানিশমেন্ট। এই পানিশমেন্টের কারণ নাকি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেকার নৈরাজ্য। বলা হচ্ছে, বড় রাজনৈতিক দলগুলোর একনায়ক নেতৃত্বের কারণেই দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক হানাহানি এবং জরুরী আইন। সাম্প্রতিক

www.pathagar.com

হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে আগের পরিকল্পনায় এমনটা ছিল না বলেই জানি। এর ফলে ভারত বাংলাদেশে চারটি রেল রুট (কলকাতা-ঢাকা রেল সংযোগসহ) পেয়ে যাবে। এতে চোরাচালান ও অন্যান্য সমস্যাসহ নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি বাড়বে। দুই. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চূড়ান্তকৃত আন্তঃএশীয় রেল-রুটের পশ্চিমমুখী রূপরেখাটা স্পষ্ট নয়। ভারত আন্তঃএশীয় রেল-রুটের মাধ্যমে বাংলাদেশ হয়ে মায়ানমারে প্রবেশ করতে পারছে, কিন্তু আন্তঃএশীয় রেলের মাধমে বাংলাদেশ নেপাল ও পাকিস্তানে প্রবেশ করতে পারছে কিনা কিংবা কিভাবে পারছে, এ বিষয়টার কিছুই জানা যাচ্ছে না। অতীতে ভারত আন্তঃএশীয় রেল চলাচল রুটে বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানকে এই সুযোগ তাদের চাহিদা অনুসারে দিতে চায়নি। এ বিষয়টির নিষ্পত্তি যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আন্তঃএশীয় রেল-এর বাংলাদেশ অংশ চূড়ান্ত করা একটা আগাম ব্যাপার হয়ে গেছে, বলতেই হবে। তিন. আন্তঃএশীয় রেল চুক্তিতে যারা এ পর্যন্ত স্বাক্ষর করেছে কিংবা স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের তালিকায় ভারত ও পাকিস্তানের নাম নেই। আমরা চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তাদের মনোভাব বিবেচনায় রেখেছি কিনা, এ বিষয়ও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে না।

তবে ভারত আন্তঃএশীয় রেলের বাংলাদেশ থেকে মায়ানমার প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কারণ, বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক রেল-চুক্তির মাধ্যমে রেল-ট্রানজিট পাওয়ার বিষয়টি তার কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে এ উজ্জ্বলতা নিভে গেলে ভারত কি করবে সেটা বলা মুশকিল। একতরফা সুবিধা লাভ করা ভারতের অভ্যাস। তা না পেরে কোন কিছুরই কোন অর্থ থাকে না তার কাছে।

অন্যে কি করবে, তার চেয়ে আমরা কি করব এ বিষয়টিই আমাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হতে হবে। সমতাভিত্তিক সম্পর্ককে সব সময় স্বাগত জানাতে হবে। কিন্তু একতরফা সুবিধা আদায়কে কেউ যদি তার অধিকার মনে করে, তাহলে সে স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না কোনমতেই।

১০ মে, ২০০৭

রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশন

একজন সিনিয়র রাজনীতিকের অভিমত হলো, 'আমাদের নির্বাচন কমিশনের মাথায় নিজস্ব বলতে কিছু নেই।' এই উক্তির পক্ষে যুক্তিও আসছে। বলা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন এখন পোস্ট বক্সের মত। বাক্সে এসে নানা প্রস্তাব পড়ছে, আর কমিশন সেসব প্রচার করছে মতামত যাচাইয়ের জন্যে। খুঁজলে এর মধ্যে কমিশনের গণতান্ত্রিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে অবশ্যই। কিন্তু গণতন্ত্র লাগামহীন নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ যদি তার সব কাজই মানুষের কথা মনে করে, নিজের যুক্তি-বুদ্দির কোন ব্যবহার না করে, তাহলে তার দায়িত্বের মর্যাদা থাকে না। গণতান্ত্রিকতা যুক্তি ও বুদ্ধির পথ অনুসরণ করে চলে। যেমন রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় মেনিফেস্টো প্রকাশ করে, যাতে দেশের প্রয়োজন এবং সামর্থ্যের যুক্তির মধ্যেই দলের লক্ষ্য ও কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু নির্বাচন

www.pathagar.com

ভারত প্রথমে তুলে নিক, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের পন্য প্রবেশের বাধা ভারত প্রত্যাহার করুক এবং বাংলাদেশ-ভারতের কমন নদীর কণ্ঠরোধকারী বাঁধসমূহ ভারত ভেঙ্গে দিক। বাংলাদেশের এসব দাবী ভারতের বর্তমান রেল সংযোগ দাবীর চেয়ে অনেক বেশি পুরানো। নেপালের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট চুক্তি হয় ১৯৭৬ সালে। ৩০ বছর আগের এই চুক্তিটি বাংলাদেশ এখনও কার্যকরি করতে পারেনি ভারত তার ভূখণ্ড বাংলাদেশ ও নেপালকে ব্যবহার করতে না দেয়ার কারণে। ভূখণ্ড ব্যবহার করতে না দেয়ার অজুহাত হিসেবে ভারত এমন সব শর্ত আরোপ করে যা মেনে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার সম্ভব নয়। ৩০ বছরের পুরানো এই দাবী আদায় না করে কেমন করে বাংলাদেশ ভারতের সাথে রেল সংযোগ নিয়ে আলোচনা করতে পারে। অনুরূপভাবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যে বাংলাদেশী পণ্য ঢুকতে না দেয়ার পেছনে কোন যুক্তি নেই। ভারতের সাথে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি আকাশ পরিমাণ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে বাণিজ্য করতে দিলে এ ঘাটতি কিছুটা হলেও কমতে পারতো। ভারতের সাথে পানি বণ্টন সমস্যাও সাড়ে তিন দশকের পুরানো। ভারত এক এক করে আমাদের নদী মেরে ফেলছে। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় ভারত যখন তার স্বার্থ হাসিলের চেষ্টায় মরিয়া হয়েছে, তখন আমাদের এসব স্বার্থের প্রশ্ন উঠেনি কেন? আগে না উঠলেও এখন উঠতে হবে। এসব দাবী পূণের আগে ঢাকা-আগরতলা রেল সংযোগের কোন আলোচনাই আর চলা উচিত নয়। ট্রানজিট দেয়ার সাথে নিরাপত্তার যে প্রশ্ন জড়িত আছে, তা একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু এ নিয়ে আমি এখানে কোন আলোচনা করছি না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাম্প্রতিক আন্তঃএশিয়া রেল যোগাযোগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েও এই সুযোগে কয়েকটা কথা বলতে চাই। গত কয়েকদিন আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্তঃএশীয় রেল যোগাযোগ চুক্তিতে স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তঃএশীয় রেল যোগাযোগের বাংলাদেশ অংশের রূপরেখাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার চূড়ান্ত করেছেন। এই চূড়ান্ত নক্সা অনুসারে আন্তঃএশীয় রেল পশ্চিম দিক থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশের তিনটি স্থান দিয়ে প্রবেশ করবে। একটি পশ্চিমবঙ্গের গেদে থেকে কুষ্টিয়া সীমান্ত হয়ে দর্শনা দিয়ে ঈশ্বরদী আসবে। দ্বিতীয় শাখা পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গাবাদ থেকে রাজশাহী সীমান্ত হয়ে ঈশ্বরদী আসবে। তৃতীয় শাখা পশ্চিমবঙ্গের রাধিকাপুর থেকে দিনাজপুর সীমান্ত হয়ে তিনটি শাখাই ঈশ্বরদী আসবে। তারপর তিনটি শাখাই ঈশ্বরদী থেকে যমুনা সেতু-জয়দেবপুর-আখাউড়া, চট্টগ্রাম-দোহাজারী হয়ে মায়ানমারের গুনদুমে প্রবেশ করবে। আন্তঃএশীয় রেলের এই রুট-প্ল্যানের সবচেয়ে আনন্দের দিক হলা, আন্তঃএশীয় হলে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের পর তা চট্টগ্রাম হয়ে মায়ানমারে প্রবেশ করবে, এটা বাংলাদেশের দাবী ছিল, সে দাবী পূরণ হয়েছে। অন্যদিকে ভারত চেয়েছিল আন্তঃএশীয় রেল বাংলাদেশে প্রবেশ করে তা মায়ানমারমুখি না হয়ে বাংলাদেশের সিলেট হয়ে পুনরায় ভারতের আসামে প্রবেশ করুক এবং সেখান থেকে তা প্রবেশ করুক মায়ানমারে। ১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের এ দাবী মেনে নিয়ে আন্তঃএশীয় রেলের পূর্বমুখী রুট চূড়ান্ত করেছিল। নতুন রুট-প্ল্যান অনুসারে এই সিদ্ধান্ত আর কার্যকরি থাকলো না এবং ভারতের অবাস্তব দাবীও পূরণ হলো না। কিন্তু আন্তঃএশীয় রেল রুটের বাংলাদেশে অংশ চূড়ান্ত করা ও চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নেয়ার মধ্যে তিনটি প্রশ্নবোধক বিষয় রয়েছে। এক. আন্তঃএশীয় রেল ভারত থেকে তিনদিক

www.pathagar.com

চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্যে নিকোলাস বার্নস দিল্লী আসছেন। আসার মুখেই বলা যায়, তিনি ভারতকে খুশী করার মত উপরোক্ত উক্তিটি করেছেন। তার উক্তি যদি এই দিক দিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে দেখা যাবে উক্তিটি কোন রিজনিং থেকে আসেনি, এসেছে 'গরজ বড় বালাই'-এর মজবুরি থেকে।

আমি যখন এই নিবন্ধটি লিখছি, তখন নিকোলাস বার্নস দিল্লীতে ভারত-মার্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। চূড়ান্ত চুক্তির খসড়া এখানে চূড়ান্ত হলে জার্মানীতে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন "G-8"-এর বৈঠককালে একে চূড়ান্ত রূপ দেয়া যাবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনোমোহনও সে সময় 'পর্যবেক্ষক' হিসেবে "G-8" বৈঠকে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত এই বৈঠককালে চুক্তিটি চূড়ান্ত রূপ পাবে কিনা কিংবা কখন পাবে অথবা পেলেও চুক্তিটি ভারতকে বেঁধে রাখতে পারবে কি না মার্কিন স্বার্থের সাথে, এ নিয়ে গুরুতর সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই সন্দেহের কারণ হলো, ভারত কোন দেশ বা কোন চুক্তির প্রতি নয়, তার স্বার্থের প্রতিই মাত্র আন্তরিক। ভারত তার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা চুক্তিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখবে। বিশেষজ্ঞরা একমত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারমানবিক সহযোগিতা চুক্তি ভারতের জন্যে খুবই প্রয়োজন। কারণ ভারত মনে করে, এই সহযোগিতা চুক্তির মাধ্যমে ভারত তার পারমাণবিক জ্বালানির প্রয়োজনীয় প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করতে পারবে এবং তার অর্থনৈতিক খাতকেও আরো বিকশিত করতে পারবে। কিন্তু জ্বালানি-বুভুক্ষু ভারতের জ্বালানি তৃষ্ণা শুধু এই পারমাণবিক জ্বালানি থেকে মিটবে না এবং তার জ্বালানি প্রয়োজনের ভবিষ্যত এর দ্বারা নিশ্চিতও হবে না। তাকে তার জ্বালানি প্রয়োজন মেটাতে তাই অন্য উৎসের দিকে নজর দিতে হবে এবং সে জন্যেই তাকে মার্কিন স্বার্থের জালে বাঁধা পড়লে চলবে না।

ইতোমধ্যেই ভারতের এই বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য-অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি ও পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি থাকার পরও ভারত মার্কিন মতামতকে উপেক্ষা করে স্বাধীন জ্বালানি নীতির অনুসরণ করছে। জ্বালানির সহজ ও নিরাপদ সরবহরাহকে নিশ্চিত করাকেই এখন সে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। মার্কিন বিরোধিতা উপেক্ষা করে ইরান থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে তেল আমদানির সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে তার এই মনোভাবের শক্তিশালী প্রকাশ ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণবিক সহযোগিতার দোহাই দিয়ে এবং চাপ প্রয়োগ করেও ভারতকে ইরান থেকে গ্যাস আমদানির সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারছে না। গত বছর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস ভারতকে লোভ দেখিয়ে বলেছিলেন, ভারত যদি ইরান থেকে গ্যাস আনার চিন্তা পরিত্যাগ করে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর আরোপিত পারমাণবিক সংক্রান্ত সকল নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মলফোর্ড ইরান থেকে ভারতের গ্যাস আমদানির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে হুমকি দিয়ে বলেছেন, ভারত এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করলে তাকে মার্কিনী পাল্টা ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে।' কিন্তু এই হুমকি ভারতকে তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়াতে পারেনি। ভারতের তেলমন্ত্রী মনি শংকর আয়ার পরিষ্কার বলেছেন, 'ইরানের সাথে আমাদের সম্পর্ক কোন তৃতীয়পক্ষের উদ্বেগ দ্বারা বাতিল হবে না। দুনিয়ার সকল বন্ধু

www.pathagar.com

দেশের বোঝা উচিত যে, তাদের জাতীয় উদ্বেগ আছে বটে, কিন্তু আমাদেরও জ্বালানি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা রয়েছে, জ্বালানি ছাড়া আমরা আমাদের একান্ত অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারবো না।' এর আগে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিংহ এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইসের পাশে দাঁড়িয়ে তার মুখের উপর বলে দিয়েছিলেন, "ইরানের সাথে আমাদের কোনো ধরনেরই কোনো সমস্যা নেই। আমাদের জ্বালানি খাতের জন্যে নতুন নতুন উৎস আমাদের প্রয়োজন। সুতরাং ইরানের সাথে আমাদের গ্যাস পাইপ লাইনের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।"

এটাই ভারতের রাজনীতি। তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হলে কোন দেশ, কোন চুক্তিরই তারা কোন মূল্য দেয় না। আগাম অনেক তোষণমূলক কথা বলে নিকোলাস বার্নস নয়াদিল্লী এসে দ্বিপাক্ষিক পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি চূড়ান্ত করতে বসেছেন। চুক্তি চূড়ান্ত হবে, স্বাক্ষরও হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কৌশলগত স্বার্থের যে জালে ভারতকে বাঁধতে চাচ্ছে, সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির গোটা ইতিহাস এটাই বলে যে, সে সবার কাছ থেকে স্বার্থ আদায় করেছে, কিন্তু স্বার্থ কারও জন্যে ছাড়েনি। ঠান্ডাযুদ্ধকালে ভারত তার নাম তথাকথিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে যুক্ত রেখে সোভিয়েত ব্লকের নেতা রাশিয়ার কাছ থেকে ষোল আনা স্বার্থ আদায় করেছে। আবার বড় গণতন্ত্রের সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে মার্কিন ব্লকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কোন স্বার্থ আদায়েই পিছপা হয়নি।

আজও ভারতের এটাই পররাষ্ট্রনীতি। আজকের পৃথিবীটা একমাত্রিক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর নেতা। এই হিসেব থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের টোটাল আনুগত্য আশা করছে। কিন্তু ভারতের মাথায় আছে অন্য চিন্তা। সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাটেজিক পার্টনার সাজতে গিয়ে রাশিয়া এবং উদীয়মান এক নতুন এশিয়ার শত্রু সাজতে চায় না। ২০০৫ সালের মধ্য জুলাইয়ে একটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে। সে জুলাই মাসে সাংহাইতে কাজাকস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান ও তাজিকিস্তানসহ রাশিয়া ও চীনের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়। সে বৈঠক থেকেই 'সাংহাই কো'পারেশন অর্গানাইজেশন (SCO)' নামে একটা প্ল্যাটফরমের জন্ম হয়। এই প্ল্যাটফরম জন্মের আগের কাহিনী হলো, ২০০৫ সালের ১লা জুলাই মস্কোতে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও "Declaration on the world order in the 21st Century" নামক এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণাকে "Anti-US Political Manifesto" বলা হয়ে থাকে। সংগঠনের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণায় বলা হয়, এটা 'a new security structure' to promote 'a just and rational world order based on the respect of the right of all countries to equal security' এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বলা যায় 'SCO' পাল্টা একটা world order-এর ঘোষণা দিয়েছে। ইতিমধ্যে 'SCO' সামিট পর্যবেক্ষক হিসেবে ইরান, পাকিস্তান ও ভারতকে সংস্থায় গ্রহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত এতে আহলাদে আটখানা হবার কথা এবং হয়েছেও তাই। কারণ জ্বালানি-বুভুক্ষু ভারতের জন্যে SCO-এর সদস্য হওয়া মার্কিন মৈত্রীর চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয়। কারণ রাশিয়া, মধ্য এশিয়া ও ইরান হতে যাচ্ছে একুশ শতকের জ্বালানির প্রধান উৎস। সুতরাং অন্যান্য দিক বিবেচনায় না আসলেও শুধুমাত্র তেলের কারণেই

www.pathagar.com

ভারত এশীয়মুখী নীতি গ্রহণ করবে, সেটাই স্বাভাবিক। রাশিয়ার তেল ভাণ্ডার সাখালিন তেল ক্ষেত্র থেকে পশ্চিমী কোম্পানিকে সরিয়ে দেবার পর ভারত এই তেল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই সাখালিন-১ তেলক্ষেত্রে ২০ শতাংশ শেয়ার নিয়ে ভারত প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে। এই বিনিয়োগ সাড়ে তিন বিলিয়নে উন্নীত হচ্ছে। সাখালিন-৩ তেলক্ষেত্রেও ভারত এর মধ্যেই দেড় বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে ইরান-পাকিস্তান গ্যাস পাইপলাইন মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ভারত ইতোমধ্যেই কাজাখ এলাকায় কাস্পিয়ান তেল ক্ষেত্রে রাশিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে দেড় বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। সুতরাং ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্টের পেছনে নয়, তেলের পেছনে ছুটছে। এই তেলের পেছনে ছোটার ক্ষেত্রে পুরনো বন্ধু রাশিয়াকে ভারত সাথী হিসেবে গ্রহন করেছে। রাশিয়ার মাধ্যমে চীনের সাথেও একটা ওয়ার্কিং রিলেশন গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই প্রয়াস বন্ধুত্ব পর্যন্ত না গড়ালেও সংঘাতের পরিবেশ থেকে তাদের সরিয়ে আনবে এটা ভারত মনে করছে। চীনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত খুব বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে। ভারতের গোটা অরুনাচল চীন তার ভূখণ্ড বলে দাবি করছে। অন্যান্য দাবির প্রশ্ন তো রয়েছেই। এই অবস্থায় আর্থিক ও পারমানবিক কিছু সহযোগিতা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশীপে টেনে নিতে পারবে, সে আশায় গুড়ে বালি।

সুতরাং নিকোলাস বার্নসের উক্তি 'গাছে কাঁঠাল গোফে তেল' দেয়ার মত ব্যাপার হয়েছে। ভারতকে হাতের মুঠোয় পেয়েই গেছেন ধরে নিয়ে তাকে দক্ষিণ এশিয়ার মনিবত্ব তিনি দিয়েই দিয়েছিলেন। বার্নসরা মনে করেছিলেন, ভারতের কাছে দক্ষিণ এশিয়ার মনিবত্ব বিক্রি করলেই বিনিময়ে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হয়ে যাবে এবং ইরানী গ্যাসমুখী হওয়া থেকেও সরে আসবে। বার্নসদের এই গোঁফে তেল দেয়া সফল হওয়ার মত নয় দু'টি কারণে। এক, আগেই বলেছি ভারত নিজের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কিছুই দেখে না। কোন স্বার্থই সে ছাড়ে না কারও জন্যে। মার্কিনীদের সাথে পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তিও সে চাইবে, ইরানী তেলও চাইবে এবং চাইবে SCO-এর সাথে পুরো সম্পর্ক। কিন্তু পার্টনারদের সকলের ভিন্ন ভিন্ন দাবি পূরণে ভারত সবসময় নিরাপদ দূরত্বেই থেকে যাবে এবং দুই, দক্ষিণ এশিয়ার মনিবত্ব মার্কিনীরা দিলেও ভারত তা পাবে বলে সে মনে করে না। পৃথিবী এখন খুবই ছোট। কারও উপর মনিবত্ব করে চলার সময় এটা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারছে না, ভারতও দক্ষিণ এশিয়ায় পারেনি। মনিবত্ব দূরে, নিরাপদ বন্ধুত্ব দাবি করার মত ভাল অবস্থানেও ভারত নেই। বন্ধুত্ব অন্ততঃ শুভেচ্ছার যে সমতাটুকু দাবি করে তা ভারতের নেই।

৬ জুন, ২০০৭

হিরন্ময়-সুমন সিএনএন'দের আঁতাত

মানবতাবাদী ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টির জন্যই ইসলামকে, ইসলামের পবিত্র জিহাদকে সন্ত্রাসের সাথে এক করে দেখার সুপরিকল্পিত প্রয়াস চলছে গোটা দুনিয়া জুড়ে। এরই সাথে গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনৈতিক দরগুলোকেও সন্ত্রাসী সাজাবার মত জঘন্য মিথ্যাচার চালানো হচ্ছে একই লক্ষ্যে যাতে মাঠ থেকে ইসলামের বাস্তব উপস্থিতির উচ্ছেদ সম্ভব হয়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইসলামী দল জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামীও এই নগ্ন মিথ্যাচারের শিকার। এই মিথ্যাচারে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের কিছু পত্র-পত্রিকা, কিছু মানুষ। এদের মিথ্যাচারের পেছনে রয়েছে দৃশ্যত স্থানীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক বিদ্বেষ। কিন্তু পশ্চিমী অনেক মিডিয়ার মত CNN এই মিথ্যাচারে অংশ নিয়েছে কেন? এই প্রশ্নটা তুলছি 'CNN-IBN SPECIAL' নামের একটি রিপোর্ট দেখে। 'Eye to eye with terror in Bangladesh' শীর্ষক CNN তৈরি কাহিনীতে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসী-চক্রের কেন্দ্র অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামের নামে সন্ত্রাস যারা করছে, তাদের প্রথম সারির ও উল্লেখযোগ্য প্রায় সবাই যে গ্রেফতার হয়েছে, শীর্ষ ছয় নেতার ফাঁসি হয়েছে এবং অন্যদের বিচার চলছে, এ বিষয়ে একটি কথাও বলা হয়নি CNN-IBN রিপোর্টে। এই সত্য গোপন করার সাথে সাথে চূড়ান্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে CNN ইসলামী নামের সন্ত্রাসী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও আফগান ফেরত মুজাহিদদেরকে গণতান্ত্রিক ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামীর অংশ বলে উল্লেখ করেছে। সাক্ষী হিসেবে শাহরিয়ার কবিরকে হাজির করা হয়েছে রিপোর্টে। মন্দ নয়, চোরের সাক্ষী গাইট কাটা CNN-IBN-এর জন্য এই রিপোর্টটি করেছেন Suman K. Chakrabarti মহাশয়। সুমন বাবু নাকি বাংলাদেশে ব্যাপক সফর করে এই রিপোর্ট করেছেন। কিন্তু তার রিপোর্ট নামক কাহিনীটি পড়লে ওয়াকিফহাল যে কেউ বলবেন, তিনি সম্ভবত ঢাকাও দেখেননি কিংবা দেখলেও ঢাকাকে বুঝেননি। তার রিপোর্টে বায়তুল মোকাররমের নাম আছে। কিন্তু বায়তুল মোকাররমের ভুল পরিচয় তিনি লিখেছেন। তিনি বায়তুল মোকাররমকে বলেছেন মাদরাসা এবং এই মাদরাসাকে তিনি চরমপন্থীদের লালনের জন্য অভিযুক্ত করেছেন (Over 2 lackh madrasas are there in Bangladesh, out of which the famous Baitul Mokarram in the heart of capital Dhaka is accused of harbouring radicals). সুমন বাবু যেভাবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমকে মাদরাসা বানিয়েছেন, সেভাবেই তিনি গণতান্ত্রিক দল জামায়াতে ইসলামীকে সন্ত্রাসী হরকাতুল জিহাদের সাথে এক করে দেখেছেন। তিনি যখন মসজিদ ও মাদরাসার পার্থক্য বুঝেন না, তখন তিনি কিভাবে গণতান্ত্রিক দল জামায়াতে ইসলামী ও সন্ত্রাসী সংগঠন হরকাতুল জিহাদের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝবেন! বুঝবেন না অবশ্যই। এইভাবেই গোটা দুনিয়ায় আজ ইসলামী গণতান্ত্রিক দলকে যারা ইসলামের নাম ব্যবহারকারী সন্ত্রাসী সংগঠন হারকাতুল জিহাদ বা আল-কায়েদার সাথে এক করে ফেলছেন, তারাও CNN-এ সুমন বাবুদের মতই ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝেন না বা সত্য গোপন করেন। না বুঝে বা সত্য গোপন করে তারা জামায়াতে ইসলামীর মত ইসলামী গণতান্ত্রিক দলকে সন্ত্রাসী হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে অলীক কাহিনী রচনা করে চলেছে।

এমন অলীক কাহিনী রচয়িতাদেরই আরেকজন হলেন বাবু হিরন্ময় কারলেকার। অতি সম্প্রতি তিনি 'Dhaka fails to curb Islamism' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ বিরোধী, ইসলাম বিদ্বেষী এই লোকটি এর আগে 'Bangladesh : The next Afghanistan' নামে একটি বই লিখেছিলেন। CNN-এর সুমন চক্রবর্তীর মতই এই হিরন্ময় বাবু তার বইতে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের শাহরিয়ার কবির, ভারতপন্থী হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ, আওয়ামী লীগের একশ্রেণীর রাজনীতিক এবং একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকার

www.pathagar.com

অপপ্রচারের উপর ভিত্তি করেই বাবু হিরন্ময় বইটি লিখেছিলেন। এবারের লেখাতেও তিনি পরের মুখে ঝাল খেয়ে, বিশেষ করে ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচারকে সম্বল করে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এক হাত নিয়েছেন। বাংলাদেশের কয়েকটি রেলস্টেশনে বোমা ফাটানো এবং ভারতের মক্কা মসজিদে বোমা হামলার অপরাধে বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের, আরো সবিশেষভাবে ইসলামের কেন গলা টিপে ধরছে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার, এ প্রশ্ন তুলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন বাবু হিরন্ময় কাললেকার। মনে হচ্ছে হিরন্ময় বাবু যেন দু'চোখে দেখেছেন বাংলাদেশের কেউ গিয়ে ভারতের মক্কা মসজিদে বোমা ফেলে এসেছে। ষড়যন্ত্রকারী প্রপাগান্ডিস্টরা গোয়েবলসের মত এভাবেই সত্যের মতে করে মিথ্যা বলে থাকে। এক্ষেত্রে সুমন চক্রবর্তী, হিরন্ময় বাবু ও CNNদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে এবার হিরন্ময় বাবু তার মুখোশ খুলে ষড়যন্ত্রকারীর কুৎসিত মুখ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এবার খোদ ইসলামকেই টার্গেট করেছেন (তার লেখার শিরোনাম : 'Dhaka fails to curb islamism'-ইসলামকে দমন করতে ঢাকা ব্যর্থ)। বাবু হিরন্ময় সন্ত্রাস ও ইসলামকে এক করে ফেলে খোদ ইসলামেরই কণ্ঠরোধ করার কথা বলেছেন। অলীক কাহিনী সাজিয়ে একেই প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে ইসলামকে সন্ত্রাসী বলা হয়েছে। সুমন চক্রবর্তী, বাবু হিরন্ময় কারলেকার ও CNNরা দুনিয়া জুড়ে ইসলাম ও ইসলামের জিহাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে আলো এবং কালোকে এইভাবেই এক করে ফেলার প্রয়াস চালাচ্ছেন।

সোনার পাথর বাটি একটা অলীক কথা। বাটি যদি সোনার হয়, তাহলে একে পাথর-বাটি বলা যায় না। আবার বাটি পাথরের হলে তাকে সোনার বলা যাবে না। ঠিক এই একই অবস্থা জিহাদ ও সন্ত্রাসকে নিয়ে এবং ইসলামী গণতান্ত্রিক দল ও ইসলামের নাম ব্যবহারকারী সন্ত্রাসী সংগঠনকে নিয়ে। ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাস কোনভাবেই, কোন দিক দিয়েই এক জিনিস নয়। ইসলাম মানবতাবাদী ধর্ম, আর সন্ত্রাস মানব হত্যাকরী একটা কাজ। ইসলাম বিশ্বপালক আল্লাহর অসীম করুণার এক নিয়ামত হিসেবে মানুষের শান্তি কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত করতে চায়, অন্যদিকে সন্ত্রাস কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হত্যা ও ধ্বংসলীলার মাধ্যমে মানুষের শান্তি, স্বাধীনতা হরণ করে থাকে। সুতরাং ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাস এই দুইয়ের এক হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু ইতিহাসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে দেখা হয়েছে। ইসলামকে সন্ত্রাস এবং মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিন্দুদের বাপুজী গান্ধীর মত ব্যক্তিত্বও বলেছেন "ইসলাম এমন পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যে, তার চূড়ান্ত শক্তির উৎস আগেও তরবারী ছিল, এখনও তরবারীই আছে।" এটা অতীতের কথা। কিন্তু অতীতের চেয়েও সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসের সাথে ইসলামকে সংযুক্ত করার বহুমুখী প্রয়াস আজ ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেছে। নাইন-ইলেভেনের পর গত ২০০৫ সালের ১৭ই আগস্ট দেশব্যাপী প্রায় ৫ শত বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বাংলাদেশেও তা ছোবল হেনেছে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশের উপর আপতিত এই সন্ত্রাসের সাথেও ইসলামকে যুক্ত করা হয়েছে। আজ পৃথিবীকে যে জিনিসটি অশান্ত করে তুলেছে সেটা হলো সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আর এই সন্ত্রাসের উৎস এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো

www.pathagar.com

হয়েছে ইসলামকে। এইভাবে সোনার পাথর-বাটি অলীক কল্পনা হলেও প্রচারের জোরে তাকেই সত্য বলা হচ্ছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ একেবারেই সত্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চরম অজ্ঞতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত দুরভিসন্ধি ইসলামকে বিকৃত করে তুলে ধরার মূলে কাজ করছে। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য সন্ত্রাস কি, ইসলামের জিহাদ কি তা সকলের সামনে আসা দরকার। এর সাথে আজ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে ঝড় উঠেছে, তার উৎস কি, লক্ষ্য কি এবং বাংলাদেশেও আজ হঠাৎ করে ভয়াবহ যে সন্ত্রাস মাথা তুলেছে তার মূলে আসলে কি আছে, কি তারা চাচ্ছে তাও অন্ধকার থেকে আলোতে বের হয়ে আসা উচিত।

প্রথমেই আসে সন্ত্রাসের কথা। সন্ত্রাসকে ইংরেজিতে বলা হয় 'টেররিজম' (Terrorism)। সন্ত্রাস বা টেররিজম এর সর্বসম্মত সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে না। আজকের দুনিয়ায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যোদ্ধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় একমত হতে রাজি নয়। রাজি না হওয়ার কারণ যাকে ইচ্ছা তাকে সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী সাজাবার সুযোগ উন্মুক্ত রাখা। একজন সমীক্ষক লিখেছেন, "United States reluctance to come up with a working definition for terrorism out of fears that a clear-cut definition would change the fight against terrorism from a political issue into an ethical one ... in its capacity as superpower, America does not need ethical laws restricting its ambition and targets. Rather, it wants to have spacious room for movement and maneuvering and as such keeping the definition ambiguous fits perfectly with this strategy" অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের কোন কার্যকর সংজ্ঞা নির্ধারণে গররাজী। কারণ সন্ত্রাসের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের পথে নৈতিক প্রশ্নকে বাধা হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। বৃহৎ শক্তি হিসেবে লক্ষ্য অর্জনের পথে নীতি-নৈতিকতার বেড়াজাল তার কাম্য নয়। বরং তার দরকার অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ সংজ্ঞা যাকে বারবার কৌশলের সাথে যথেচ্ছা ফিট করা যাবে।

কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা সন্ত্রাসের না থাকলেও সন্ত্রাসের সংজ্ঞা আছে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'World Book' encyclopaedia সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Terrorism is the use of threat of violence to create fear and alarm. Terrorists murder, kidnap people, set off bombs, hijack airplanes, set fires and commit other serious crimes. Common victims of terrorist kidnappings and assassinations include diplomats, business executives, political leaders, judges and police"

অর্থাৎ সন্ত্রাস হলো ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যে হিংসাত্মক কাজ সংঘটিত করা অথবা এর হুমকি প্রদান করা। সন্ত্রাসীরা হত্যা, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, বিমান হাইজ্যাক, বোমা হামলা ইত্যাদিসহ মারাত্মক অপরাধের কাজ করে। কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ও বিচারকরা সন্ত্রাসীদের হত্যা ও অপহরণের শিকার হয়। সন্ত্রাসীদের এ কাজগুলোর সবই সাংঘাতিক ধরনের অপরাধ। এই অপরাধগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়। উদ্দেশের দিক দিয়ে সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন পরিচয়ের হয়ে থাকে। World

www.pathagar.com

Bookএর মতে "লক্ষ্যের দিক থেকে সন্ত্রাসীরা (Terrorists) সাধারণ অপরাধীদের চেয়ে আলাদা হয়ে থাকে। সন্ত্রাসীরা কেউ কেউ বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী হয়, আবার অনেকে স্বাধীনতাকামী কোন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হতে পারে।" সন্ত্রাসের এই উদ্দেশ্যগত পরিচয় থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও তাদের সংগ্রামের একটা পন্থা হিসেব সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়তে পারে। একে সন্ত্রাস না বলে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ দুনিয়ার সবদেশের সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই ধরনের কর্মকাণ্ডে কমবেশি জড়িত হতে দেখা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার আজকের পশ্চিমী সহযোগীরা সন্ত্রাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের দিকটা মানতে রাজি নয়। কারণ ফিলিস্তিন, কাশ্মীরের মত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নির্বিচারে তাহলে টেররিস্ট বলা যাবে না। একটি দেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে রাজনৈতিক বা মতবাদিক কোন গ্রুপের হত্যা, অপহরণ, বোমাবাজি ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজের যে যোজন পার্থক্য রয়েছে তা মার্কিন পক্ষ মানতে চাচ্ছে না।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগী পাশ্চাত্য দেশগুলো সন্ত্রাসের নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় রাজি না হলেও সন্ত্রাসের ইতিহাসের মধ্যে এর স্বীকৃত সংজ্ঞার সুস্পষ্ট অবয়ব আমরা দেখতে পাই। Terrorism-এর প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ফরাসী বিপ্লবের সময় (১৭৮৯-১৭৯৯)। ক্ষমতা দখলকারী কিছু বিপ্লবী তখন তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আচরণের নীতি গ্রহণ করে। এই শাসনকালকে বলা হয় 'Reign of Terror'. এটা ঘটেছিল একটা 'শাসন অথরিটির' অধীনে। কিন্তু 'শাসন-অথরিটি'র বাইরে বেসরকারি পর্যায়ে রাজনৈতিক বা মতবাদিক গ্রুপের দ্বারা সন্ত্রাসের প্রথম যাত্রা শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে ১৮৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের পর এবং পুনরায় উনিশ শতকে 'কুক্ল্যাক্স ক্ল্যান' নামক একটা শ্বেতাঙ্গ গ্রুপ কৃষ্ণাঙ্গ ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী সন্ত্রাস চালায়। বিশ শতকের তিরিশের দশকে হিটলার জার্মানীতে, মুসোলিনী ইটালিতে এবং জোসেফ স্টালিন সোভিয়েট ইউনিয়নে বিরোধী পক্ষকে দমনের জন্যে হত্যা-নির্যাতন চলায়। কুক্ল্যাক্স ক্ল্যান ছিল প্রাইভেট গ্রুপ, কিন্তু এসব সন্ত্রাস চলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে বেআইনীভাবে। বিশ শতকের ষাটের দশকে সন্ত্রাসী প্রাইভেট বাহিনী 'রেড ব্রিগেড' এর উত্থান ঘটে ইটালিতে এবং 'রেড আর্মি' উত্থান ঘটে পশ্চিম জার্মানীতে। এরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। তবে সবচেয়ে জঘন্য সন্ত্রাস শুরু করে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন বিভক্তির আগে। তাদের লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিন থেকে ফিলিস্তিনীদের তাড়িয়ে দেয়া। নিজেদের স্বাধীনতা ও ভূখণ্ড রক্ষার জন্যে ফিলিস্তিনীরাও তখন বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপে সংঘবদ্ধ হয় এবং তারা এখনও লড়াই করছে। প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেদের আত্মরক্ষাকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী। এমন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্ভব ঘটে উত্তর আয়ারল্যান্ডে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে (I.R.A-Irish Republican Army)। ঠিক এমনিভাবে সত্তরের দশকে ক্যারিবিয়ান সাগরের পোর্টোরিকোতে FALN নামের স্বাধীনতা সংগ্রামী গ্রুপের উদ্ভব ঘটে আমেরিকান শাসনের বিরুদ্ধে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য বোমা হামলার ঘটনা ঘটায়।

www.pathagar.com

উপরে সন্ত্রাসের ইতিহাসে আমরা তিনটি গ্রুপের মুখোমুখি হচ্ছি। এক. রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাস যা হিটলার, মুসোলিনী ও স্ট্যালিনদের মধ্যে দেখা গেছে, দুই. আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম, যদি তার সাথে কোন সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও যুক্ত হয় এবং তিন. রাজনৈতিক ও মতবাদিক গ্রুপের বা কোন ক্রিমিনাল গ্রুপের সন্ত্রাস। পরিচয়ের দিক দিয়ে সন্ত্রাস এখানে তিনভাগে বিভক্ত হলেও অপরাধ বিচারে সন্ত্রাসের এই তিন গ্রুপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অন্যদিকে ইসলাম ও ইসলামের জিহাদ এই অপরাধমূলক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। আকৃতি, প্রকৃতি উদ্দেশ্য কোন দিক থেকেই সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের জিহাদের কোন মিল নেই।

ইসলামের জিহাদ সামনে আনার আগে ইসলাম মানুষের জীবন ও তার সমাজ-সভ্যতাকে যে দৃষ্টিতে দেখে সেটা জানা দরকার। মানব সভ্যতার ভিত্তি যা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার সর্বপ্রথম ধারা হলো এই যে, "প্রত্যেক মানুষের প্রাণ ও রক্ত পরম পবিত্র। মানুষের নাগরিক অধিকারসমূহের মধ্যে প্রথম অধিকার বেঁচে থাকার অধিকার, আর অপরাধ থেকে বাঁচতে দেয়া হলো নাগরিক কর্তব্যসমূহের মধ্যে প্রথম কর্তব্য।" আর এটাই ইসলামের প্রথম কথা মানুষের অধিকার সম্পর্কে। এরই বিধান দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কুরআনে। তাঁর বাণী, "...যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কোন একটি মানুষেরও প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই রক্ষা করলো।..." (সুরা মায়েদা, আয়াত ৩২) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কোরআনের আরেক জায়গায় বলেছেন, 'হে মুহাম্মদ, আপনি এইরূপ আহ্বান জানান যে, এসো তোমাদের প্রতিপালক কি কি বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন তা জানিয়ে দেই। তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে না। নিজেদের সন্তানদেরকে অভাব-দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করবে না। কেননা তোমাদের জীবিকা যেমন আমিই দিয়ে থাকি, তেমনি ওদের জীবিকাও আমিই দেবো। আর তোমরা অশ্লীলতার ধারেকাছেও যাবে না। মানুষের প্রাণ-সত্তাকে আল্লাহ সম্মানার্হ্য বলে ঘোষণা করেছেন। সেই প্রাণ বিনা অধিকারে হনন করবে না। তোমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্যেই আল্লাহ এসব তোমাদের দিয়েছেন।" (সুরা আনাম, ১৫১)

শুধু মানুষের জীবন রক্ষা নয়, মানুষের সহায়-সম্পদ ও সমাজকেও ইসলাম পবিত্র ঘোষণা করেছে। সমাজে, দুনিয়ায় ফেৎনা-ফাসাদ (গোলযোগ) সৃষ্টিকে হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ বলে অভিহিত করেছে আল-কুরআন। ইসলামের লক্ষ্য মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। মানুষের ইহকালীন কল্যাণের মধ্যে আইনানুগ, ন্যায়ানুগ সকল শান্তি ও স্বস্তির বিষয় শামিল রয়েছে। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর বান্দাহদের জন্যে এমন শান্তির সমাজ কায়েমের জন্যেই দুনিয়ায় এসেছিলেন। সে সমাজ তিনি কায়েমও করেছিলেন। আরবের কাসেদিয়া থেকে সানআ পর্যন্ত একটি মেয়ে একাকী ভ্রমণ করেছে, কেউ তার জান-মাল ও ইজ্জতের ওপর হামলা চালায়নি। অথচ এর ২৫ বছর আগে ইসলাম-পূর্ব যুগে বড় বড় কাফেলাও এই অঞ্চলে নির্ভয়ে চলতে পারতো না। তারপর সভ্য জগতের অর্ধেকেরও বেশি অংশ ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হলো এবং ইসলামের নৈতিক প্রভাব বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন ইসলাম মানব জাতির অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির ন্যায় হিংস্রতা ও নৃশংসতার মূলোৎপাটন করে।

মানব সমাজে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠার জন্যেই প্রয়োজন জিহাদের। জিহাদের অর্থ যুদ্ধ মাত্র নয়। মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যে লক্ষ্য তা অর্জনের জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো অর্থে জিহাদ শব্দের ব্যবহার। লেখা, কথাবার্তা ও বিভিন্ন রকম কাজের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনের সকল কর্মপ্রচেষ্টা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ জিহাদের একটি পর্যায় মাত্র। যুদ্ধ যখন আপতিত হয়, জুলুম-নির্যাতনের যখন সয়লাব নামে এবং বিপর্যয় মানুষকে, মানব-সমাজকে যখন গ্রাস করে, তখন অপরিহার্য হিসেবে মানুষকে, সমাজকে বাঁচাবার জন্যে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "যাদের উপর যুদ্ধ আপতিত হয়েছে, তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা নির্যাতিত। আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এরা সে লোক, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। ... আল্লাহ অবশ্যই সে লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ... এরা সে সব লোক, তাদেরকে আমরা যদি জমীনে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং মন্দের নিষেধ করবে।" (সুরা হজ্জ, আয়াত ৩১, ৪০, ৪১) যুদ্ধের নির্দেশ দিতে গিয়ে আল-কুরআনের আরেক জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না।..." (সুরা বাকারা, আয়াত-১৯০)

যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার উপরোক্ত আয়াতগুলোতে দেখা যাচ্ছে, তিনটি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রথম, আক্রমণের শিকার হওয়া, দ্বিতীয়, নিজ স্থান থেকে বহিষ্কৃত হওয়া, উচ্ছেদ হওয়া এবং তৃতীয়, কারও দ্বারা যদি ফেৎনা-ফাসাদের (সন্ত্রাস-গোলযোগের) সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার এই তিনটি কারণের প্রথম দুইটি আপতিত যুদ্ধকে যুদ্ধ দিয়ে মোকাবিলার নির্দেশ। আর তৃতীয়টি আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ। এই তৃতীয় কারণটি বুঝাতে আল-কুরআনে 'ফেৎনা', 'ফাসাদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরানিক পরিভাষা হিসাবে এর অর্থ বিরাট, ব্যাপক। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবেও ফেৎনার অর্থ হলো অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে দুঃখ ও অশান্তির আগুনে নিক্ষেপ করা। আর এ দিক দিয়ে ফাসাদের অর্থ ন্যায়-নীতি ও মধ্যপন্থার পরিপন্থী কাজের মাধ্যমে সামাজিক বিকৃতি ও বিপর্যয় সাধন। সুতরাং 'ফেৎনা'-'ফাসাদ' সমাজে ও মানুষের জীবনে যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে, সেটাই আজকের পরিভাষায় 'সন্ত্রাস'। ইসলামের জিহাদ এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও। সুতরাং ইসলামের জেহাদ সন্ত্রাস নয়, বরং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রকৃতি ও পরিসীমার দিক থেকে আধুনিক যুদ্ধের সাথে রয়েছে ইসলামের যুদ্ধের যোজন পার্থক্য। হিটলার মুসোলিনীর যুদ্ধ-প্রয়াস ও যুদ্ধকে সন্ত্রাস বলা হয়েছে। এদিক থেকে আধুনিক সব যুদ্ধই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে। ছোট ছোট আন্তঃরাষ্ট্র যুদ্ধ বাদ দিয়ে গ্লোবাল যুদ্ধের কথা যদি ধরি, তাহলেও দেখা যাবে এ যুদ্ধগুলোও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে যায়। ১৪৯৪ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ৬টি গ্লোবাল যুদ্ধমালা সংঘটিত হয়। ১৪৯৪ থেকে

www.pathagar.com

১৫১৬ পর্যন্ত ইটালিয়ান ও ইন্ডিয়ান ওস্যান ওয়ার, ১৫৮০ থেকে ১৬০৯ পর্যন্ত স্প্যানিশ ওয়ারস, ১৬৮৮ থেকে ১৭১৩ পর্যন্ত চতুর্দশ লুই ওয়ারস, ১৭৯২ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত ওয়ারস অব নেপোলিয়ান এবং ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ ও ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দুই বিশ্বযুদ্ধ এর মধ্যে রয়েছে। ফেৎনা, ফাসাদ থেকে মানুষকে মুক্ত করার, সমাজকে রক্ষার মত কোন মহৎ উদ্দেশ্য এই যুদ্ধগুলোর পেছনে ছিল না। ধ্বংস ও হত্যালীলার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সীমা বাড়ানো, সম্পদ লুট করা ও মানুষকে দাস বানানোই ছিল এসব যুদ্ধের লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসমূলক এসব যুদ্ধে ৮ কোটি ৫৫ লাখ লোক মারা যায়। সাড়ে ৮ কোটি মানুষের এই কুরবানী রাষ্ট্র-সন্ত্রাসের সাম্রাজ্য ও সম্পদ লালসাপূর্ণ করে, আর হরণ করে মানুষের শান্তি ও স্বাধীনতা। ১৯৪৫ সালের পরেও রাষ্ট্র সন্ত্রাসের এই যুদ্ধ এখনও চলছে। ভিয়েতনাম, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, আফগানিস্তান ও ইরাকের লাখ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে এই যুদ্ধে।

প্রকৃতি ও পরিসীমা– উভয় দিক দিয়ে এই আধুনিক যুদ্ধ থেকে ইসলামের জিহাদ সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী জিহাদের কোন আগ্রাসী লক্ষ্য থাকে না, ইসলামী জিহাদ থেকে আসা বিজয় মানুষকে দাস বানায় না। ইসলামের জিহাদ যে তিনটি ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুমতি পেয়েছে, এর দুইটা আত্মরক্ষা ও আত্মসাহায্যমূলক এবং তৃতীয়টি ফেৎনা-ফাসাদ তথ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধকালীন নীতি ও যুদ্ধ পরবর্তী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামের যুদ্ধ আধুনিক যুদ্ধ থেকে আলাদা। ইসলামের যুদ্ধ মানবিক। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তা মানুষকে রক্ষার জন্যেই। খৃষ্টান বাহিনী যখন জেরুসালেম নগরী দখল করে, তখন তারা ৭০ হাজার নারী-পুরুষকে হত্যা করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী যখন এই নগরীতে প্রবেশ করে তখন একজন নাগরিকও নিহত হয়নি। ইসলামের যুদ্ধ দেশ দখল করে না, সেখানকার মানুষকে মুক্ত করে। তাইতো মুসলমানদের সিরিয়া বিজয়ের পর একজন যাজক তার ইউরোপীয় বন্ধুকে লিখেছিলেন, "এইসব আরব যাদেরকে আল্লাহ এ যুগে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তারা আমাদের প্রভু হয়েছে। কিন্তু তারা খৃষ্টধর্মের সাথে আদৌ কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না, বরং তারা আমাদের ধর্ম রক্ষা করে, আমাদের ধর্মযাজক-সাধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আমাদের গীর্জা ও মঠে চাঁদা প্রদান করে।" ইসলাম বিজয়োত্তর মুক্ত দেশে ভেতরের কিংবা বাইরের শত্রুর হাত থেকে নাগরিকদের জীবন ও শান্তি-স্বাধীনতা হেফাজতের নির্দেশ দেয়। প্রতিরক্ষার এ দায়িত্ব পালনের জন্যে অমুসলিম নাগরিকদের (যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না) কাছ থেকে প্রতিরক্ষা ট্যাক্স বা যিযিয়া নেয়া হয়। রক্ষার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা ঘটলে ট্যাক্স অর্থ ফেরত দেয়া হয়। তদানীন্তন ইসলামী দুনিয়ার হেমস প্রদেশে মুসলিম শাসক এক অপরিহার্য পরিস্থিতিতে হেমস ত্যাগ করার সময় এই কথা বলে অমুসলিমদের যিযিয়া করের টাকা ফেরত দিয়েছিলেন, "আমরা তোমাদের হেফাজত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। যেহেতু আমরা তা পারছি না, তাই তোমাদের দেয়া ট্যাক্সের উপর আমাদের কোন অধিকার নেই।"

এমনকি যুদ্ধকালীন সময়েও মানুষের জীবন শুধু নয়, গাছ-গাছড়া ও মন্দির-গীর্জা এবং নারী-বৃদ্ধ-নাবালককেও বিশেষভাবে রক্ষার এবং সম্পদ আত্মসাৎ-অপহরণ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তার বাহিনীকে যুদ্ধযাত্রায় বলেন, "অর্থ অপহরণ করো না, তসরুপ করো না, প্রতারণা করো না। শিশুকে কিংবা বয়ঃবৃদ্ধকে কিংবা স্ত্রীলোককে হত্যা করো না। খেজুর গাছ কাটবে না বা দগ্ধ করবে না। কোন ফলের গাছ কাটবে না। গীর্জা ধ্বংস করো না, ফসল পোড়াবে না।"

আর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর যুদ্ধযাত্রাকালে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন, "যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করো না। তোমার শক্তি থাকলেও কারো অঙ্গচ্ছেদ করো না। বিজয়ী হলে বাড়াবাড়ি করো না। বৃদ্ধ ও নাবালককে হত্যা করো না, যুদ্ধের সময়ও তাদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো।"

ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে এই কিঞ্চিত আলোচনাতেও পরিষ্কার যে, ইসলামের জিহাদ সন্ত্রাস নয়, বরং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইসলামী জিহাদের একটা বড় অংশ। ইসলামের যে জিহাদ যুদ্ধ চলা অবস্থাতেও নারী, শিশু, বৃদ্ধদের হত্যা নিষিদ্ধ করেছে, মন্দির-গীর্জা ধ্বংস করতে নিষেধ করেছে, গাছ-গাছড়া পোড়ানো থেকে বিরত থাকতে বলছে, এমনকি যুদ্ধের মধ্যেও মানুষের অঙ্গচ্ছেদ সমর্থন করেনি ইসলামের যে জিহাদ– সে জিহাদকে সন্ত্রাস বলা পাগলের প্রলাপ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সে জিহাদের নাম ব্যবহার করা চরম প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই প্রতারণাই হয়েছে নাইন-ইলেভেনের ঘটনায় এবং এই প্রতারণারই পুনরাবৃত্তি ঘটনো হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার বালি, লন্ডনের সিরিজ বোমা হামলার ঘটনাবলিতে। বাংলাদেশের জেএমবিরা তাদের বোমা সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের নাম জুড়ে দিয়ে দেশের মানুষের সাথে এই প্রতারণাই করেছে এবং পৃথিবী জুড়ে করেছে ইসলামের বদনাম।

প্রশ্ন হলো, 'সোনার বাটিকে 'পাথর-বাটি' বলার এই অব্যাহত প্রতারণা কেন? সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যার যুদ্ধ, সেই ইসলামকে কেন সন্ত্রাসী সাজানো হচ্ছে, ইসলামের পবিত্র যুদ্ধকে কেন সন্ত্রাস বলা হচ্ছে। অথচ শুধু যুদ্ধ নয়, ইসলাম সব রকম চরমপন্থা পরিহার করতে বলে, সব ক্ষেত্রেই ইসলাম মধ্যমপন্থা অনুসরণ করে। কাজ-কর্ম, মামলা-মুয়ামেলাত সবক্ষেত্রে সুবিচার ও নীতিবোধকে প্রাধান্য দিতে বলে। এমনকি শত্রু কিংবা শত্রু-জাতির ক্ষেত্রেও সুবিচারকেই সিদ্ধান্তের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহার ওয়াস্তে ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনে অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।" (আল কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত-২) এই একই কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও এক জায়গায় বলছেন, "কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (আল কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত-৮) এই দুই আয়াতে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেউ বা কোন জাতি শত্রু হলেও, তার বা তাদের প্রতি বিদ্বেষ-শত্রুতা থাকলেও তার বা তাদের প্রতি অবিচার করা যাবে না, ন্যায়ের সীমালংঘন করা যাবে না। এই যদি হয় অবস্থা যে, শত্রুতা থাকলেও শত্রুর প্রতিও অবিচার করা যাবে না, তাহলে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে কিংবা বোমা মেরে যারা

www.pathagar.com

চেনা নয়, যারা শত্রু নয়, যাদের প্রতি বিদ্বেষও নেই, শত্রুতা নেই, এমন নারী, পুরুষ, শিশু, বিচারক, উকিল, পথচারীদের হত্যা কি করে সম্ভব? সম্ভব নয়। কোন মুসলমান এটা পারে না। কেউ যদি এটা পারে, তাহলে সে আল্লাহর কোন স্বাধীন বান্দাহ নয়। সে হতে পারে কারও বেতনভুক পুতুল। এদেরকে আল্লাহ সুবিচার বর্জনকারী, সীমালংঘনকারী বলেছেন। এদের জন্যে আল্লাহর কাছে শাস্তি বরাদ্দ আছে। সুতরাং কোন দিক দিয়েই ইসলামকে, মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসের উৎস বলা যেতে পারে না। তাহলে ঘুরে ফিরে সেই প্রশ্ন আবার আসে, ইসলামের পবিত্র জিহাদ বা খোদ সন্ত্রাসেরও বিরুদ্ধে, তাকে সন্ত্রাস, সন্ত্রাসের উৎস বলা হচ্ছে কেন?

এই প্রশ্নের জবাব গ্লোবাল পলিটিক্স এবং আধুনিক বিশ্ব রাজনীতির যুদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে পাওয়া যাবে। আজকের এই বিশ্ব রাজনীতি এক বা একাধিক বিশ্বশক্তির জন্ম দিয়েছে যার 'ওয়ার মেশিন' চালু রাখার জন্যে বিশ্বের সব জায়গায় তাদের উপস্থিতি অপরিহার্য করে তোলার জন্যে এবং বিশ্বের চারদিকে তার প্রভুত্বের ছড়ি ঘুরানোকে যৌক্তিক করার জন্যে সবসময় তার জন্যে একটি ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ দরকার। 'ভয়ঙ্কর' কম্যুনিজম-এর পতন এবং ভয়ংকর প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর আজকের বিশ্বশক্তির সামনে ভয়ঙ্কর কোন প্রতিপক্ষ থাকে না। এর ফলে তার 'ওয়ার মেশিন' অপ্রয়োজনীয় ও সংকুচিত হয়ে পড়ার উদ্বেগ দেখা দেয় এবং বিশ্বের সব জায়গায় তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা হুমকির সম্মুখীন হয়। এই অবস্থার নিরসনের জন্যেই 'ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ' হিসাবে ইসলামকে বাছাই করা হয়। বার্লিন ওয়াল ধসে পড়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিশ্ব শক্তি থেকে সাধারণ পর্যায়ে যখন নেমে আসে, সেই সময় মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যাকনামারা সিনেটের বাজেট কমিটিকে দেয়া এক অফিসিয়াল বক্তব্যে বলেছিলেন, "U.S. defense spending could safely be cut in half. It became clear the U.S. had to either undergo massive shifts in spending, a painful and unwelcome prospect for the defense establishment; or find new justification for continuing high levels of military expenditure." (The War on Islam, Envar Masud) অর্থাৎ মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট এখন খুব সহজেই অর্ধেকে কমিয়ে আনা যায়। এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, এখন হয় মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট বিপুলভাবে কমিয়ে আনতে হবে যা হবে খুবই বেদনাদায়ক ও অগ্রহণযোগ্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্যে, অন্যথায় আমাদের বিরাট রকম সামরিক ব্যয় অব্যাহত রাখার পক্ষে নতুন যুক্তি দাঁড় করতে হবে।' এই নতুন যুক্তিই হলো নতুন শত্রু, নতুন প্রতিপক্ষ। তারা নতুন প্রতিপক্ষ খুঁজতে গিয়ে বাছাই করে ইসলামকে। এনভার মাসুদ লিখেছেন, "The magnitude of U.S. defense spending fuels the search for enemies. With the collapse of the Soviet Union, the choice was between the Yellow Peril (East Asia) and the Green Peril (Islam). Islam was chosen." (The War on Islam, Envar Masud, Page-207) অর্থাৎ মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বিশাল বপুর দায়ই তাদেরকে শত্রু খুঁজতে বাধ্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দুইটি বিকল্পের দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ে। একটি হলো 'হলুদ বিপদ' মানে পূর্ব এশিয়া' অন্যটি হলো 'সবুজ বিপদ' অর্থাৎ ইসলাম। এই দুই বিপদের মধ্যে ইসলামকেই তারা প্রথম শত্রু হিসেবে বেছে নেয়।

www.pathagar.com

ইসলামকে শত্রু হিসাবে বাছাইয়ের পর প্রয়োজন দেখা দিল শত্রু হিসাবে তাকে দাঁড় করানোর। শুধু দাঁড় করানো নয়, দাঁড় করাতে হবে শত্রুর ভয়ঙ্কর রকমের ইমেজ দিয়ে। কিন্তু তখন ইসলামের ইমেজে ভয়ঙ্কর কিছু ছিল না। সন্ত্রাসের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে তারা হুমকি হওয়া তো দূরে থাক মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনার বিষয়ও ছিল না। ফিলিস্তিনের মত কিছু দেশে সন্ত্রাস বলার মত যেটুকু কাজ ছিল তা ছিল মূলতঃ পশ্চিমা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অমুসলিমদের দ্বারা যে সন্ত্রাস হতো সেটুকু সন্ত্রাসও মুসলমানদের মধ্যে সেখানে ছিল না। মৌলবাদ বা চরম পন্থা কাউকে শত্রু সাজাবার ইস্যু হতে পারে। কিন্তু এদিক থেকে মুসলমানরা এমনকি খৃস্টানদেরও পেছনে ছিল। বলা হয়েছে, "As for fundamentalism, Islam has no parallel to the U.S. Protestant Christian movement which opposed modern scientific theory. Rather, Islam has, from its birth, stressed the use of reason and logic." অর্থাৎ মৌলবাদিতার দিক থেকে ইসলাম এমনকি প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টানদের মতও গোঁড়া নয়। মার্কিন খৃস্টান প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন বিজ্ঞানের তথ্য তত্ত্বের বিরোধিতা করে। অথচ ইসলাম শুরু থেকেই রিজনিং ও লজিকের পক্ষে।

'ভয়ঙ্কর ইমেজ' তৈরির উপকরণ হিসেবেই সম্ভবত এই সময় মুসলিম দেশে কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল উইপনস (CBW) থাকার অভিযোগ উঠে। সুদান হয় প্রথম টার্গেট। তখন পর্যন্ত অবয়বহীন-অজ্ঞাত 'আল-কায়েদা এবং তার নেতা হিসাবে মার্কিনীদের সহযোগী 'বিন লাদেন'-এর কথা প্রচারিত হয়। অভিযোগ উঠে লাদেনের তত্ত্বাবধানে সুদানের 'আল শিফা' ফ্যাক্টরীতে বায়োলজিক্যাল উইপনস তৈরী হচ্ছে। অভিযোগ তুলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে সে ফ্যাক্টরী ধ্বংস করে দেয়। এই ধরনেরই অভিযোগ তোলা হয় লিবিয়ার 'তারহুনা' পাম্প স্টেশন সম্পর্কে। বলা হয় ওটা বায়োলজিক্যাল অস্ত্র উৎপাদনক্ষম একটি কেমিক্যাল প্ল্যান্ট। বলা হলো, প্রয়োজন হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে প্ল্যান্ট আণবিক বোমা মেরে ধ্বংস করে দেবে। আসলে ওটা ছিল একটা সেচ প্রকল্প। অনুরূপভাবে প্রমাণ হয় যে, সুদানের আল-শিফা ফ্যাক্টরী নিছকই একটা ওষুধ ফ্যাক্টরী ছিল। New York Times-এর বরাত দিয়ে লিখা হয়, "Hours after they launched cruise missile at the factory on August 20, senior national security advisers described Al-Shifa as a secret chemical weapons factory financed by Bin Laden. But now, says the New York Times, State Department and CIA officials argue that the government cannot justify its actions." ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ৮ দিন পর New York Times লিখে "The plant made both medicine and... drugs according to U.S. and European engineers and consultants who helped build, design and supply the plant."

এসব ঘটনায় 'ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ' দাঁড় করাতে ব্যর্থ হবার পর নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ঘটে। অকল্পনীয় ও ভয়ঙ্কর এই ঘটনার দায় 'আল-কায়েদা' ও 'লাদেন'-এর উপর চাপানো হয় এবং তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। অথচ আল-কায়েদা ও লাদেনকে না মুসলিম দুনিয়ার কেউ চেনে, তা তারা

www.pathagar.com

ইসলামের কেউ। কিন্তু এদেরকেই ইসলাম ও মুসলমানদের সিম্বল হিসেবে সামনে রেখে নাইন-ইলেভেনের ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য আকাঙ্ক্ষিত 'ভয়ঙ্কর শত্রু বা প্রতিপক্ষ' রূপে ইসলাম ও মুসলমানদের দাঁড় করানো হয়। শুরু হয় 'War on Terror'.

এবার বাংলাদেশের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে আসা যায়। সুমন চক্রবর্তী বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি বলেছেন। দেখা যাক এই উক্তির পেছনের ইতিহাস কি। বলা যায়, বাংলাদেশের ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলা এবং তার পরবর্তী আত্মঘাতী ও রক্তাক্ত বোমা হামলার ঘটনাসমূহ নাই-ইলেভেন ঘটনারই অনুরূপ। নাইন-ইলেভেনের মতই একটা অপরিচিত, অদৃশ্য, অজ্ঞাত ইসলাম নামের সংগঠনের দ্বারা এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং একইভাবে ইসলামকে খুনি ও বর্বর ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করা এবং ইসলাম শিক্ষার প্রধান উৎস মাদরাসাকে সন্ত্রাসের ক্ষেত্র হিসাবে অভিহিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এক শ্রেণীর পত্রপত্রিকা এবং সুমন চক্রবর্তী ও হিরন্ময় বাবুদের মত বাংলাদেশেরও এক শ্রেণীর মানুষ অব্যাহতভাবে এই অভিযোগ তুলছে। অথচ উপরে ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাস-এর আলোচনায় আমরা দেখেছি ইসলামী কোন সংগঠন এবং ইসলামপন্থী কোন ব্যক্তি বা শক্তিরা এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে না। এই ধরনের ঘটনা তারাই ঘটাতে পারে যারা রাষ্ট্র ও সরকারকে ব্যর্থ করে দেশকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে চায়, যারা বিকাশমান গণতন্ত্রকে ব্যর্থ করতে চায়, যারা দেশ ও জনগণের আদর্শিক প্রতিরক্ষা ধ্বংস করার জন্য ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের খুনি, সন্ত্রাসী হিসাবে দেখাতে চায়। তারাই কিছু অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত ও বেকার কিছু অল্প বয়স্ক ছেলেকে ও বিপথগামী কিছু মানুষকে ইসলামের পোশাক পরিয়ে দেশে একই দিনে একই সময়ে প্রায় ৫ শতাধিক বোমা ফাটায় এবং এরাই দেশের বিচারক ও বিচারালয়ের উপর বোমা হামলা করে। ভারতের আধ্যাত্মিক নেতা মিঃ গান্ধী বলেছেন, "The spirit of democracy cannot be established in the midst terrorism, whether governmental or popular'. অর্থাৎ সন্ত্রাসের মাঝে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন, 'The administration of justice is the firment pillar of the government.' অর্থাৎ বিচার বিভাগই হচ্ছে সরকারের সবচেয়ে সুদৃঢ় স্তম্ভ।' বাংলাদেশে এই গণতন্ত্র এবং এই বিচারবিভাগকেই টার্গেট করা হয়। দেশকে বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করাই এদের টার্গেট। কোন ইসলামী চরিত্রের মানুষের পক্ষে তার দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে এই অপরাধ করা সম্ভব নয়। এই সন্ত্রাসীরা ইসলামের তো কেউ নয়ই, দেশেরও কেউ নয়। কলামিস্ট ফরহাদ মাজহার সত্যিই লিখেছেন, বিদেশী হাত এর সাথে জড়িত। তার ভাষায়, "যারাই নিরাপত্তা, যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধ কৌশল নিয়ে পড়াশোনা করেন ও খোঁজ-খবর রাখেন, তারা জানেন যে, নাম না জানা যে সব ইসলামী দল, যাদের আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, তাদের হাতে যখন বোমা-বারুদ চলে আসে, তখন সাধারণভাবে বুঝতে হবে এটা ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কাজ। এটা সাধারণ প্যাটার্ন। ইসলামী জঙ্গীদের সাথে ইসরাইল-ভারত-মার্কিন নিরাপত্তা আঁতাতের কারণে উপমহাদেশে নব্বই দশকের শেষ বছরগুলো থেকে এ ধরনের তৎপরতা আমরা বাংলাদেশে লক্ষ্য করছি। ইসরাইল জানে যে, আরবদের মধ্যে ইসরাইলকে টিকিয়ে রাখা ও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে আরব ও ইসলাম সম্পর্কে

www.pathagar.com

বিশ্বে ভাবমূর্তি নষ্ট করার উপর। অর্থাৎ প্রমাণ করতে হবে, ইসলাম মাত্রই একটি বর্বর ধর্ম, এরা নির্বিচারে বোমাবাজি করে, নিরীহ মানুষ হত্যা করে।' মুসলমান সন্তানরা শিশু বয়স থেকেই অন্যদের ঘৃণা করতে শেখে এবং মাদরাসায় গিয়ে তারা জিহাদী হয়ে বেরিয়ে আসে।' এবারের বোমা হামলার পরপরই গণমাধ্যমগুলোর উৎকট চিৎকারের মধ্যে আমরা এই ইসরাইলী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের প্রচারণাই মূলতঃ আমরা দেখেছি।"

ফরহাদ মাজহার ঘটনার প্যাটার্ন এবং টার্গেট প্যাটার্ন দেখে এই অনুমান করেছেন। কিন্তু এটা অনুমান নয়, এটাই সত্য। একই ধরনের ঘটনা ও টার্গেট প্যাটার্নে সংঘটিত নাইন-ইলেভেনের ঘটনার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। কিন্তু হিমালয় সমান প্রচার-প্রপাগাণ্ডার আড়ালে আসল সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছে, তবু এটাই সত্য হয়ে থাকবে যে, নাইন-ইলেভেনের ঘটনাও ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ও তার সহযোগীদেরই কাজ। এ সম্পর্কে Enver Masud মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া থেকে প্রকাশিত তার গ্রন্থ "The War on Islam"-এ লিখেছেন, "On the day of the attack on America, the Washington Times quoted a paper by the Army School of Advanced Military Studies which said that the MOSSAD, the Israeli Intelligence Service, 'has the capability to target U.S. forces and make it a Palestinian/Arab act.' This, coupled with arrest in the U.S. of dozens of suspected Israeli spies and reports that several of the alleged hijackers that struck the World Trade Center were still alive, fuelled alternative theories."

অর্থাৎ যেদিন আমেরিকা আক্রান্ত হয়েছিল ঐদিন 'ওয়াশিংটন টাইমস' পত্রিকা 'আর্মি স্কুল অব এ্যাডভান্সড মিলিটারী স্টাডিজ'-এর বরাত দিয়ে ছাপা একটি নিউজে বলেছিল, ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-এর শুধু মার্কিন সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করা এবং একে ফিলিস্তিনী অথবা আরবদের কাজ বলে চালিয়ে দেয়ার যোগ্যতা রয়েছে। এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক ডজন ইসরাইলী গোয়েন্দা গ্রেফতার হওয়ারও খবর রয়েছে। কিন্তু এ খবর এবং খবর প্রকাশের কণ্ঠ মার্কিন ও বিশ্ব মিডিয়ার পরিকল্পিত কোরামের মধ্যে সকলের কানে পৌঁছেনি। কিন্তু এই সত্য চর্চা বন্ধ হয়নি। একদিন এই সত্যই সকল মিথ্যার উপর মাথা তুলে দাঁড়াবে।

ফরহাদ মাজহার ইসরাইলী-ভারতীয় উদ্দেশ্যের পক্ষে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উৎকট চিৎকারের কথা বলেছেন। এই উৎকট চিৎকার শুধু আমাদের গণমাধ্যম নয়, গোটা বিশ্বের গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই চিৎকার। ভারতের গণমাধ্যম ও জননেতারা এইভাবে চিৎকার শুরু করে যে জিহাদীরা যেন বাংলাদেশ গিলে ফেলেছে এবং ভারতকেও গিলে ফেলতে অগ্রসর হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাংলাদেশ পরিস্থিতিকে ভারতের জন্য 'থ্রেট' হিসাবে অভিহিত করে। গোটা এই প্রচারণা অপরিকল্পিত নয়, ঘটনার মতই পরিকল্পিত। এই ঘটনার সাথে উপমহাদেশের আরেকটা ঘটনার হুবহু মিল পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর দয়ানন্দ সরাস্বতি প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ-এর একজন নেতা এবং ভারতের 'শুদ্ধি আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। একজন মুসলমান এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেফতার হয়। শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে ইসলাম বিরোধীরা এ ঘটনার জন্যে গোটা মুসলিম জাতিকে এবং ইসলামের মূল আদর্শকেই দায়ী করতে আরম্ভ করে।

www.pathagar.com

তারা এমনকি আল-কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, কুরআনের শিক্ষাই মুসলমানদের হিংস্র করে তোলে এবং তা সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সহাবস্থানের পরিপন্থী। এমনও প্রচার চলে যে, পৃথিবীতে যতদিন কুরআনের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সে সময়ের পত্র-পত্রিকাগুলোই এই অপপ্রচারের সূচনা এবং মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। তারা মানুষকে উস্কে দেবার জন্য বলে, ঘাতক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আপন ধর্মের শত্রু মনে করেই হত্যা করেছে এবং উক্ত সৎ কাজ দ্বারা সে বেহেশত পাওয়ার আশা করে। আজ আমাদের গণমাধ্যমের একটা বড় অংশ উৎসাহের সাথে কমবেশি এই প্রচারণাই চালায়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তখন পত্র-পত্রিকা ছিল হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে, আর এখানে গণমাধ্যম মুসলমানদের নিজেদেরই। ফরহাদ মাজহারের কথাই ঠিক, বাংলাদেশে অব্যাহত বোমা হামলার ঘটনা যে ষড়যন্ত্রের ফল, আমাদের গণমাধ্যমের ঐ অংশটি সে ষড়যন্ত্রেরই শিকার।

এই ষড়যন্ত্র অনেকদিনের এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল। বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী মৌলবাদী রাষ্ট্র অভিহিত করে অব্যাহত প্রচার চালিয়ে আসা হয়েছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সফর উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সরকার 'Democracy versus Religious Fundamentalism' নামে একটি বই প্রকাশ করে। এতে বিএনপির সাথে তালেবানদের সম্পর্ক ও বাংলাদেশে তালেবানরা সক্রিয়া থাকার কথা বলা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হবার পর আওয়ামী মহলের এই প্রচারণা তুঙ্গে উঠে। তারা কলকাতা, লন্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে সংঘবদ্ধ ও অব্যাহত অপপ্রচার চালায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। এই অপপ্রচারের মূল কথা ছিল, বাংলাদেশ জঙ্গি মুসলমানদের দেশ। এদেশ তালেবান ও আল-কায়েদাদের চারণভূমি। বাংলাদেশে মানবাধিকার বলতে কিছু নেই। এদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কচুকাটা করা হচ্ছে, উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সম্ভ্রম কেড়ে নেয়া হচ্ছে নারীদের আর তাদের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে দেশ। একটা অদৃশ্য শক্তির ব্যবস্থাপনায় এই অপপ্রচারে অংশ নেন বৃটেনের চ্যানেল-৪ টেলিভিশন, টাইমস ম্যাগাজিন, ফারইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ এবং আওয়ামী লীগও। যারা ইকনমিক রিভিউতে বার্টিল লিন্টনারের রিপোর্ট 'Bangladesh : A Cocoon of Terror', টাইম ম্যাগাজিনে আলেক্স পেরীর 'Deadly Cargo' চ্যানেল-৪-এর জাইবা মারিক ও লিও পোল্ড-এর সাজানো রিপোর্ট তৈরির কাহিনী এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের 'বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ২০০১' ও বাংলাদেশ প্রোট্রেইট অব কভার্ট জেনোসাইড' পড়েছেন, তারা জানেন, এই অপপ্রচার কত জঘন্য, কত ষড়যন্ত্রমূলক। হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ২০০১' শীর্ষক ১৫৬ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিনে যে প্রচ্ছদ আঁকা হয়েছে তাতেই পরিষ্কার বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে তারা কি জঘন্য দৃষ্টিতে দেখে। প্রচ্ছদে উপরের এক পাশে একটি ধর্ষিতা হিন্দু মেয়ের ছবি এবং ডানপাশে এক বৌদ্ধের মৃতদেহ। প্রচ্ছদের ঠিক মাঝখানে দাড়ি-টুপিসহ কয়েকজন বাংলাদেশী মুসলিমের ছবি এবং নিচে লিখা রয়েছে 'বি অয়ার অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশের ব্যাপারে সাবধান)। এর বামে লেখা রয়েছে 'এ কোকুন অব টেরর' (সন্ত্রাসের আবাসস্থল)। প্রচ্ছদের নিচের অংশে রয়েছে একটি মিছিলের ছবি যার মাঝখানে লাদেনের ছবি জুড়ে দিয়ে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে 'প্রো বিন লাদেন র‍্যালি ইন ঢাকা'। এই প্রচ্ছদে বাংলাদেশের এমন ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যার দাবি ছিল

www.pathagar.com

আমেরিকা ঠিক আফগানিস্তানের মত বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড় ক। কিন্তু তা হয়নি। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যেমন সে সময় বাংলাদেশকে 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি' বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট বুশও তাই বলছেন।

এই পরিস্থিতিতেই অজানা-অচেনা জামায়াতুল মুজাহেদীনের আবির্ভাব এবং ১৭ই আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ জুড়ে প্রায় ৫শ বোমার বিস্ফোরণ। বলা যায়, বাংলাদেশ বিরোধী সব প্রচার ব্যর্থ হবার পর খোদ ষড়যন্ত্রকারীরাই বাংলাদেশে তালেবানী কর্মকাণ্ড শুরু করেছে যাতে হাতে-কলমে তাদের এতদিন ধরে তোলা অভিযোগের প্রমাণ হাজির করা যায় বিশ্ববাসীর কাছে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা কারা, সেটা বলার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হলো সরকার। তবে সাদা চোখে যেটা দেখা যাচ্ছে এবং সাধারণভাবেই যেটা বলা যায়, সেটা হলো, বাংলাদেশে সন্ত্রাসী ঘটনাবলীসহ বাংলাদেশ বিরোধী উপরোক্ত সব প্রচারের বেনিফিসিয়ারী হলো আওয়ামী লীগ এবং তাদের মিত্রশক্তি। কারণ, সরকারকে বিব্রত করতে পারাতেই ছিল আওয়ামী লীগের লাভ, সরকারকে দুর্বল করতে পারাই ছিল আওয়ামী লীগের লাভ, জোট ভাঙতে পারাতেও ছিল আওয়ামী লীগের লাভ এবং 'মৌলবাদী', 'সন্ত্রাসী', 'জিহাদী' নামের মোড়কে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দল, আলেম-ওলামা, মাদরাসা-মক্তব ইত্যাদি যদি নির্মূল করা যায়, কমপক্ষে যদি মাটিতে শুইয়ে দেয়া যায়, তাহলে আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্রশক্তি উভয়েরই মহালাভ। তাদের এই মহালাভের বলি হচ্ছে কিছু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত ও বেকার কিশোর এবং বিপথগামী ও পুতুল কিছু মানুষ। কম্যুনিস্টরাও একদিন এই 'এজ গ্রুপ'কে টার্গেট করে তাদের সর্বনাশ করেছিল। তারই পুনরাবৃত্তি আজ ঘটছে। তবে কম্যুনিস্টদের বিভ্রান্তি কাটতে দেরি হয়েছিল। এদের দেরি হবে না। শীঘ্রই ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে পড়ে যাবে।

এটা ঘটছে। প্রায় সহস্রের মত সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে, তাদের আড্ডাসমূহ ধ্বংস হয়েছে, শীর্ষ ৬ জন সন্ত্রাসীর ফাঁসিও হয়েছে। অনেকের কারাদণ্ড হয়েছে। অন্যদের বিচার চলছে। পাকড়াও অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু নাটের গুরু ষড়যন্ত্রকারীরা চিহ্নিত না হলে বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। সুমন চক্রবর্তী, সিএনএন'দের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। এরাই বাংলাদেশে জেএমবি, হুজি সন্ত্রাসীদের স্রষ্টা। এরাই কোটি কোটি টাকা খরচ করে দুনিয়াব্যাপী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এদের অবশ্যই চিহ্নিত করা এবং জাতিকে তা অবহিত করা প্রয়োজন। এই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা জনগণকে সাথে নিয়েই করতে হবে। এ জন্যে জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, "I am a firm believer in the people. If given the truth, they can be depended upon to meet any national crisis. The great point is to bring the real fact." অর্থাৎ আমি জনগণে বিশ্বাসী। যদি সত্য তাদের জানানো হয়, তাহলে যে কোন সংকট মোকাবিলায় তাদের উপর নির্ভর করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আসল ঘটনা তাদের জানতে হবে।' আব্রাহাম লিংকন যেটা বলেছেন, জনগণকে আস্থায় নেয়ার সেই কাজটা কিন্তু আমাদের মত দেশে কম হয়। ছোট দেশগুলো নানা কারণে অনেক কথা প্রকাশ করে না, করতে পারে না, এটা একটা বড় সত্য। কিন্তু অস্তিত্বেই যখন আঘাত এসে যায়, তখন কোন কিছুকে আর ভয় করার, সমীহ করার অবকাশ থাকে না। মনে হয় আমরা সে অবস্থায় পৌঁছে গেছি। সব প্রকাশ করে জাতিকে আস্থায় নেয়া এখন উচিত। Edmund Burks-এর একটি

www.pathagar.com

বিখ্যাত উক্তি : The people never give their liberties, but under some elusion. অর্থাৎ একমাত্র চরম বিভ্রান্তির মধ্যেই কেবল জনগণ তাদের স্বাধীনতা পরিত্যাগ করতে পারে। সত্য জানার অভাবেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সত্য গোপন করে ও মিথ্যাচার চালিয়ে সুমন চক্রবর্তী ও CNN-রা আমাদের জনগণের মধ্যে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই চেষ্টা করছে। জনগণের মধ্যে কিছুতেই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে দেয়া যাবে না।

৯ জুন, ২০০৭

ওরা বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দেখতে চায়

দেশের একজন শীর্ষ রাজনীতিক ও আইনজীবী ড. কামাল হোসেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বরিশালের আগলঝড়া উপজেলার আস্কারা গ্রামে গিয়েছিলেন একজন ধর্ষিতা হিন্দু কিশোরীকে দেখার জন্যে। অনেক পত্রিকায় নিউজটি সচিত্র ছাপা হয়েছে। প্রথম আলোর হেডিং 'বরিশালে ধর্ষিতার বাড়িতে ড. কামাল হোসেন ও সুলতানা কামাল।' আর ইত্তেফাকের হেডিংটা হলো 'আগলঝড়ায় নিরাপত্তাহীন মানুষের মাঝে ড. কামাল ও সুলতানা কামাল।' ঘটনা হিসেবে এটা নতুন কিছু নয়। নিউজ হিসেবেও এ ধরনের খবরের এটা প্রথম প্রকাশ নয়, সেই কারণে নতুনও নয়। নতুন হলো আড়াইশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ঢাকা থেকে ড. কামাল হোসেন ও সুলতানা কামাল এবং বরিশাল থেকে বরিশাল আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মানবেন্দ্র বটব্যাল, বরিশাল আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি দীলিপ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক মাসউদ বাবলু, দৈনিক সমকালের সিনিয়ার সহকারী সম্পাদক অজয়দাস গুপ্ত, যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক সোহরাব হাসান প্রমুখের বরিশালের অজপাড়া গ্রাম আস্কারায় গমন। গমনটা নতুন এই কারণে যে, ঢাকা মহানগরীতে এবং এর অতি কাছের জেলাগুলোতেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ড. কামাল হোসেনকে এইভাবে সদলবলে বা এককভাবে সেখানে যেতে দেখা যায়নি। তবে যাওয়াটায় দোষ নেই। অতি সহানুভূতিপ্রবণ হয়েই তিনি দলবল নিয়ে সেখানে গেছেন। সহানুভূতি যখন জাগ্রত হয়েছে, তখন তা প্রদর্শনের জন্যে তিনি অতঃপর সকল জায়গাতেই যাবেন। এইখানে কথা শেষ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু শেষ করা যাচ্ছে না। কারণ তিনি শুধু সহানুভূতি প্রকাশ, অপরাধীর পাকড়াও ও বিচারের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। ঘটনাকে তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। শুধু দেখেননি, বলেছেনও যে, ২০০১ সাল থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সব ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন।' অর্থাৎ তিনি আস্কারা গ্রামের ঘটনাকে সংখ্যালঘু নির্যাতন হিসেবে ধরে নিয়েছেন। অথচ ইত্তেফাকের খবর বলছে, ড. কামাল হোসেন যাওয়ার খবর পেয়ে ঐ গ্রামের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ড. কামালকে ঘিরে ধরে বলেন, 'ঘটনা কোন সংখ্যালঘু নির্যাতন নয়। পারিবারিক দ্বন্দ্বের ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে যেন ব্যবহার করা না হয়।' কিন্তু ড. কামাল হোসেন গ্রামবাসীর এ কথার প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেছেন বলে মনে হয়নি। কর্ণপাত করতে পারেননি সম্ভবতঃ এই কারণেই যে, ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে না পারলে আড়াইশ' কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে নৌকা চড়ে, পায়ে হেঁটে আস্কারা গ্রামে যাওয়ার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়ে যায়। তার এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব না থাকলে তিনি দেখতে পেতেন গ্রামের শীর্ষ কয়েকজন ব্যক্তি যা বলেছিলেন, সেটাই সত্য। ঘটনার উপর ইত্তেফাক যে রিপোর্ট করেছে, তা থেকে গ্রামবাসীর কথারই সত্যতা মিলে। গ্রামের ২০ ঘর হিন্দুর মধ্যে একজন মুসলমান ঘর তোলে এটা নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত। এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও হয়। এরই পরিণতিতে ঘটনাটি ঘটে। বিরোধ জমি-জমা নিয়ে, কিন্তু সেটাকেই অবশেষে সাম্প্রদায়িক বিরোধে রূপ দেয়া হয়েছে এবং একেই ষোলকলায় পূর্ণ করার জন্য ড. কামালরা ঢাকা থেকে ছুটে গেছেন বরিশালের গ্রামটিতে।

পারিবারিক ও জমি-জমা ঘটিত বিরোধকে এইভাবে সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার প্রয়াস তীব্রতর হয়েছে ২০০১ সালের পর থেকে ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ বিজয়ী চারদলীয় জোট সরকারের উপর প্রতিশোধ হিসেবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্লোগানকে একটা ট্রাম-কার্ড হিসেবে সামনে নিয়ে আসে। এই অস্ত্র প্রয়োগের প্রধান বাহন হিসেবে এগিয়ে আসে তথাকথিত হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান পরিষদ। প্রতি মাসে তারা বুলেটিন জাতীয় একটা বিবরণী বের করত। তাতে গোটা দেশে হিন্দুদের বাড়িতে চুরি-ডাকাতির যে ঘটনা ঘটত, হিন্দুদের সাথে মুসলিম প্রতিবেশীদের ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, মামলা-মোকদ্দমার যে ঘটনা সংঘটিত হতো, সে সবকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা হিসেবে মাসিক বুলেটিনটিতে সন্নিবেশিত করা হতো। এই বুলেটিনগুলোকেই গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হতো বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রমাণ হিসেবে। আস্কারা গ্রামে ড. কামাল হোসেনদের যাওয়া এবং সেখানে তাদের তৎপরতার অনেক ছবি তোলা হয়েছে, কিছু ছবি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। এই সব ছবি সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পাঠিয়ে দেয়া হবে ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী ভারতীয় প্রপাগাণ্ডা মিশনের খোরাক হিসেবে। তার মানে এই সাথে প্রেরিত হবে ড. কামাল হোসেনের দেয়া সার্টিফিকেট যে, ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন সাংঘাতিক বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ে যে ভিত্তিহীন প্রপাগাণ্ডা ভারত অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, ড. কামাল হোসেনরা তারই অংশ হিসেবে কাজ করছেন, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিষয়ে ড. কামালরা যা বলেন, সীমান্তের ওপারে তা প্রতিধ্বনিত হয়, আবার ওপারে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে যা বলা হয় ড. কামাল হোসেনরা তার প্রতিধ্বনি করেন। এই সেদিন গত ৫ই জুন ভারতের জনৈক ডঃ আনন্দ কুমার তার নিবন্ধে লিখলেন, 'Minorities in Bangladesh have been under the attack of Islamic forces ... Unfortunately, this does not appear to be on the agenda of the care-taker government. As a result of this, a systematic disossesion and eviction of minorities has been going in Bangladesh." (Paper No. 2262, e-mail: anandkrai@yahoo.com.in) অর্থাৎ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা ইসলামপন্থীদের আক্রমণের শিকার হয়ে আসছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এজেন্ডায় এই বিষয়টা নেই। ফলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা অব্যাহতভাবে তাদের সম্পদ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ও উচ্ছেদের শিকার হয়ে আসছে।' এই কথা ভারত থেকে আনন্দ কুমার বলেছিলেন ৫ই জুন তারিখে, আর ড. কামালরা আনন্দ কুমারের এই কথা প্রমাণ করার জন্যে আড়াইশ' কিলোমিটার অতিক্রম করে বরিশালের এক হিন্দু

www.pathagar.com

পরিবারের বাড়ি গেলেন সদলবলে সাংবাদিকদের নিয়ে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের কতবড় ঘটনা ঘটলে ড. কামাল হোসেনের মত লোক, যার এক ঘণ্টার মূল্য হাজার হাজার টাকা, বরিশালের অজপাড়া গাঁয়ে ছুটে যেতে পারেন– ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রপাগান্ডিস্টদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া ছোট ঘটনা নয়।

এই রকমের আরেক ড. কামাল হোসেন হলেন প্রফেসর আবুল বারাকাত। আবুল বারাকাত 'Deprivation of Affected Million Families : Living with Vested Property in Bangladesh' শীর্ষক একটি পেপার তৈরি করেছেন। এই পেপারে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের রেখে যাওয়া 'শত্রু সম্পত্তি', পরে 'অর্পিত সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ, কারা, কিভাবে লুট করেছে, এসব বিষয়ে কল্পকথা রচনা করেছেন। কল্পকথা হলে কি হবে, যে উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন, সে উদ্দেশ্য খুবই সার্থক হয়েছে। তার পেপারটি বাংলাদেশে এখনও প্রকাশ না হলেও সীমান্তের ওপারে কিন্তু পৌঁছে গেছে। তারা এ কল্পকথাকে সত্যের মুখোশ পরিয়ে ব্যবহারও করছে। আনন্দ কুমার তার ৫ই জুনের নিবন্ধে লিখেছেন, 'Professor Barakat in his research paper says that nearly two lack Hindu families lost 1.22 lack bighass of land, including their houses in past six years. The study has found that the land of minority Hindus during the reign of the BNP led alliance government between 2001 and 2006 has been 'grabbed' by politically powerful people." অর্থাৎ প্রফেসর বারাকাত গবেষণাপত্রে বলছেন, প্রায় দুই লাখ হিন্দু পরিবার তাদের বাড়িঘর সমেত প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার বিঘা জমি হারিয়েছে গত ছয় বছরে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে ২০০১ থেকে ২০০৬-এর মধ্যে হিন্দুদের ঐ জমি-জমা রাজনৈতিক ক্ষমতাবানরা দখল করে নিয়েছে।' আনন্দ কুমার বাবুর এই বক্তব্য প্রফেসর আবুল বারাকাতেরই কথা। ড. কামালের কথারও প্রতিধ্বনি আনন্দ কুমারের কথা। ড. কামাল বলেন, ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার শাসনের শুরু থেকেই সংখ্যালঘু নির্যাতন শুরু হয়। আনন্দ কুমারও এই কথা বলছেন তার নিবন্ধে এই ভাষায়, "Hindu families met with more incidents of violence and repression in the immediate past five years of the BNP-Jamaat coalition government than in the previous five years of Awami League government." অর্থাৎ অতি সম্প্রতি শেষ হওয়া বিএনপি-জামায়াত সরকারের পাঁচ বছরে আগের আওয়ামী সরকারের পাঁচ বছরের চাইতে অনেক বেশী সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়েছে। আনন্দ কুমারের এই বক্তব্য আসলে ড. কামালদেরই বক্তব্য। ড. কামাল হোসেন ও আবুল বারাকাতরা এ দেশের নাগরিক হয়ে, এ দেশের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে এ দেশের যে বদনাম করছেন এবং আনন্দ কুমারদের মত প্রপাগান্ডিস্টদের হাতে দেশকে সংকটে ফেলবার যে তথ্য তুলে দিচ্ছেন, সে বদনাম ও সে তথ্যকে নিরপেক্ষ ও অনুসন্ধানী বিদেশীরাও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন। ২০০১ সালের অক্টোবরে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ড. কামালদের তরফ থেকেই বাংলাদেশে ব্যাপক সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। এরই প্রেক্ষিতে মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে নিউইয়র্কস্থ জন জে কলেজ অব ক্রিমিনাল জাস্টিসের অধ্যাপক ও মার্কিন অপরাধ ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ম্যাকেল গোমেজ সরেজমিন তদন্তের জন্য বাংলাদেশে আসেন।

www.pathagar.com

২৫ দিন ধরে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে বিশেষ করে অভিযোগের স্পটগুলোতে ব্যাপক সফর করেন এবং তার ভিত্তিতে গবেষণা রিপোর্ট তিনি তৈরি করেন। তিনি রিপোর্টের সার সংক্ষেপ হিসেবে লিখেন, "২৫ দিন অবস্থানকালে আমি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের সাথে কথা বলি। আমি বরিশাল, পটুয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, ঋষিপুর, খুলনা, যশোর, কুমিল্লা, চান্দিনা, ইকরাশি, হাসনাবাদ, দোহার, কালিগঞ্জ, আড়িখোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম– ওইসব শহর এবং গ্রামে গিয়েছি। নির্যাতিত হিসেবে প্রচারিত হিন্দু, খৃস্টান এবং বৌদ্ধ পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছে এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য উদ্ধারই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি আদৌ সত্য কিনা, না কি তা অতিরঞ্জিত– সেটাই ছিল মুখ্য। তাদের বেশিরভাগ কথোপকথনই আমি ভিডিও টেপে ধারণ করি। ছবিও তুলি অনেকের। তাদের কেউই খুন, ধর্ষণ, আঘাত, বাড়িঘরে আগুন দেয়া কিংবা লুটতরাজের মত বড় কোন ঘটনার কথা বলেননি, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে। তাদের বক্তব্য থেকে আমার যা মনে হয়েছে তা হলো নাম ধরে ডেকে বাড়িতে ঢিল-পাটকেল ছোঁড়া, জমি সংক্রান্ত বিবাদ, ব্যক্তিগত বিরোধ, ব্যবসায়িক কোন্দল, আগে থেকে চলে আসা বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি (যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনও লোকের মধ্যে সংঘটনযোগ্য) ঘটনাকেই সংখ্যালঘু নির্যাতন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। বিশেষ করে এ জাতীয় ঘটনা যখন কোনও মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, তখনই এটাকে ধর্মীয় নির্যাতন এবং সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের নামে অতিরঞ্জন করা হয়েছে।" (মানবজমিন, ২ সেপ্টেম্বর, ০২) একজন বিদেশীর এই সরেজমিন রিপোর্ট আমাদের স্বদেশী ড. কামাল হোসেনরা পড়েছেন বলে মনে হয় না। পড়লে তাদের মধ্যে নিশ্চিতই লজ্জাবোধের সৃষ্টি হতো এবং আড়াইশ' কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে তিনি নাটক করার জন্যে বরিশালের আস্কারা গ্রাম পর্যন্ত যেতেন না। সম্ভবত বছর খানেক আগে, একজন মার্কিন কংগ্রেসম্যান বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের শত্রু বাংলাদেশীরাই।' তার মতে বাংলাদেশীরাই বাংলাদেশের বদনাম করে। বাংলাদেশীরাই যে বাংলাদেশের বদনাম করে, তার আরও দু'একটা বেদনাদায়ক উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি।

১৯৯২ সালের ১৮ই এপ্রিল হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধ ঐক্যপরিষদের নরসিংদী জনসভা, পরে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন হলে তারা বলেন, "অত্যাচারের মুখে তিন কোটি সংখ্যালঘু প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পালিয়ে গেছেন।" শেখ হাসিনা কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে বলেন, "অত্যাচারের মুখে হিন্দুরা ভারতে চলে আসছেন। যশোর, ফরিদপুর, খুলনা ও গোপালগঞ্জে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চলছে।" (আনন্দবাজার, ১১ আগস্ট, '৮৮)। ১৯৮৯ সালে পুনরায় শেখ হাসিনা বলেন, "বাংলাদেশে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম করার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধছে।" (আনন্দবাজার, ১১ আগস্ট, '৮৮) আমাদের এই স্বদেশীদের স্বদেশের বদনামের বিপরীতে খোদ কলকাতার দায়িত্বশীলতরা কি বলেন, শোনা যাক। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন আইজি শংকর সেন বলেন, "বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ায় সংখ্যালঘুদের অনুপ্রবেশ বাড়েনি।" (আনন্দবাজার, ৫ জুলাই, '৮৮) ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটাসিং বলেন, "জন্মহার বাড়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে জনসংখ্যা বাড়তে পারে।" (আনন্দবাজার, ২১ মে, '৮৭) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে কিছু লোক আসে বটে, তবে তা তেমন মারাত্মক কিছু নয়।' (আনন্দবাজার, ২১ মে, '৮৭) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

www.pathagar.com

জ্যোতিবসু ১৯৯১ সালে পুনরায় এ প্রসঙ্গে বলেন, "ঢালাও অনুপ্রবেশের ঘটনা সত্য নয়। বাংলাদেশ থেকে কিছু লোক আসে যা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের। এদের মধ্যে অবাঙ্গালীরাও আছেন। তারা আসেন কাজের সন্ধানে। আবার অনেকে ফিরেও যান। ... পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের মধ্যে যেখানে অভিন্ন সীমান্ত আছে, সেখানেও এ ধরনের ঘটনা স্বাভাবিক।" (দৈনিক বাংলা, ১৮ জুন, ১৯৯১)। উপরের কয়েকটা দৃষ্টান্তে বাংলাদেশীরা বাংলাদেশের কতখানি শত্রু তা পরিষ্কার। বাংলাদেশী হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধ ঐক্যপরিষদ বলছে ৩ কোটি বাংলাদেশী গেছে ভারতে, অন্যদিকে ভারতীয় ব্যক্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গের আইজি ও মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যদিকে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বলেছেন, অথচ পশ্চিমবঙ্গের আইজি বলছেন, বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার পর বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশ বাড়েনি। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলাদেশে নেই। এ থেকে প্রমাণ হয়, হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধ ঐক্যপরিষদের কর্মকর্তারা এবং ড. কামালরা ভারতীয়দের চেয়েও যেন বেশি ভারতপ্রেমিক। আশঙ্কার বিষয় হলো, এই ড. কামালরাই এখন দেশের বিবেক সাজার চেষ্টা করছেন। মহা সুযোগ মনে করছেন বর্তমান পরিস্থিতিকে। ভাবছেন, 'ভেড়ার মধ্যে বাছুর পরামাণিক' হতে পারবেন তাঁরা। ভারতীয়দের চেয়ে বেশি ভারতপ্রেমিক এই 'বাছুররা' দেশের 'পরামাণিক' যদি সেজেই বসেন, তাহলে দেশের কি হবে, সেটাই আশঙ্কার।' আশার কথা, আশঙ্কার বিষয়টা দেখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পেছনে আমাদের সেনাবাহিনী আছেন।

আনন্দ কুমার তার নিবন্ধে দুইটি খুব মজার কথা বলেছেন। তার মতে, সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে বৈষম্যের শিকার। সুপরিকল্পিতভাবে সরকার সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে অসম চাকরি নীতি অনুসরণ করছেন। (Minorities have been facing a number of negative discrimination in Bangladesh. The state has been following a deliberate policy to creat unequal opportunities for them)। দ্বিতীয়ত: তিনি বলেছেন, ভারতের মত দেশে সংখ্যালঘুরা বিশেষ মর্যাদা পায়। তারা অন্য নাগরিকদের মতোই সকল সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। (In countries like India, minorities get special treatment. They get all facilities at per with other citizen).

'ভারতের সংখ্যালঘুরা অন্য নাগরিকদের মত সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা পায়' –আনন্দ কুমারের একই কথা শুধু মিথ্যা নয়, সত্যকে গলাটিপে মারার মতোই জঘন্য শুনাচ্ছে। এই বিষয়ে ভারতের প্রকৃত অবস্থা যদি তুলে ধরতে যাওয়া হয়, তাহলে বঞ্চনার এক মহাকাব্য রচনা করা যাবে। সেই ধরনের কোন আলোচনায় না গিয়ে ভারতের সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে ভারতের দায়িত্বশীল একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'হাই লেবেল কমিটি'র কিছু কথা তুলে ধরবো। ভারতের সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা তার 'যারে তুমি নিচে ফেলো' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলে, "ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘুগোষ্ঠী মুসলিমরা, দেশের জনসংখ্যার ১২ শতাংশেরও বেশি। তাহার পরেই শিখ ও খৃস্টানরা। উপরন্তু আছেন বৌদ্ধ, জৈন ও পার্সিরা। অধিকাংশ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই সাধারণত একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বা মহল্লায় কেন্দ্রীয়ভূত হয়ে বসবাস করেন। এ ধরনের মহল্লা পরিদর্শন করলেই বুঝা যায়, এগুলো আর্থিক বৈষম্য, অনগ্রসরতা ও

www.pathagar.com

সুযোগহীনতার এক একটি পুঞ্জিভূত বারুদ স্তূপ। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের রূপায়ন প্রায়শ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই মহল্লাগুলিকে পাশ কেটে যায়। সংখ্যালঘু ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাসের এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, অন্যান্য সরকারি পরিসেবা, দোকানপাট কিছুই উচ্চাঙ্গের নয়, বহু ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরিকাঠামোও নেই। ফলে অনগ্রসরতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে কুরিয়া কুরিয়া খায়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপুষ্টি, কর্মহীনতা প্রায়শ সংখ্যালঘুদের একাংশকে চোরাচালান ও দুর্বৃত্তির অন্ধকার জগতে আকৃষ্ট করে। উন্নয়ন বাবদ সরকার যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, তাহার স্পর্শ হইতে সংখ্যালঘুরা বঞ্চিত থাকে।" (সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ জুন, ২০০৬)

ভারতীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো বিচারপতি রাজিন্দর সাচ্চারের নেতৃত্বাধীন 'হাই লেবেল কমিটি'র রিপোর্ট। এই কমিটি নিয়োগ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটা মূল্যায়নের জন্য। এই কমিটি ভারতব্যাপী ব্যাপক সফরের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্ট গত বছর এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেন। এ সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্যে রিপোর্টটি বলেছে, "মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য তাদের একপাশে ঠেলে রেখেছে। সরকারি কল্যাণমূলক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, শিক্ষা অর্জনের সুযোগ, কর্মসংস্থান এবং ব্যাংক ঋণসহ ঋণ পাওয়ার সুযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের মুসলমানরা সর্বনিম্ন তলায় পড়ে রয়েছে।" রিপোর্ট-এর তথ্য ও পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

(ক) ভারতের গ্রামীণ এলাকায় ৯৪.৯ শতাংশ মুসলিম দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে।

(খ) মুসলিমরা মাত্র ৩.২ শতাংশ ভর্তুকিসম্পন্ন ঋণ পেয়ে তাকে।

(গ) দরিদ্রদের মধ্যে অনাহার রোধ করতে ভর্তুকিতে খাদ্যশস্য দেয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তা থেকে মাত্র ১.৯ শতাংশ মুসলমান সুবিধা পায়।

(ঘ) মাত্র ১ শতাংশ মুসলিম চাষীর হ্যান্ড পাম্প আছে।

(ঙ) গ্রাম এলাকায় ৫৪.৬ শতাংশ এবং শহর এলাকায় ৬০ শতাংশ মুসলিম কখনই কোন স্কুলে যায়নি।" (কলম, কলকাতা, এপ্রিল ২৯, ২০০৬)

ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার হার ১৬ শতাংশের নিচে নয়, অথচ সরকারি চাকরিতে তাদের অংশ ২ শতাংশের নিচে। আনন্দ কুমার বাবু ভারতীয় সংখ্যালঘুদের এই অবস্থার কথা অবশ্যই জানেন। জানার পরেও এই মিথ্যাচার কিভাবে করতে পারলেন আনন্দ কুমার বাবু, সেটাই প্রশ্ন। এর চেয়েও বড় মিথ্যাচার তিনি করেছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার হার ৯ শতাংশের মত। কিন্তু বিভিন্ন চাকরি ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান তাদের জনসংখ্যা-হারের দ্বিগুণ হবে। কোন কোন চাকরিতে তাদের অংশ তিরিশ-চল্লিশ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এদিক থেকে বাংলাদেশে সংখ্যাগুরুরাই বঞ্চনার শিকার। অবিরাম সাম্প্রদায়িকতার স্লোগান তুলে সংখ্যালঘুরাই বাংলাদেশে তাদের প্রাপ্য সুবিধার চেয়ে বেশি আদায় করে নিচ্ছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সংখ্যালঘু হিসেবে দেখা হয় না, এজন্য সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলাদা কোন সমীক্ষা হয়নি। এ দাবী সংখ্যালঘুদের তরফ থেকেও কোন সময় উঠেনি। এ কারণেই সীমান্তের ওপার থেকে আনন্দ কুমার বাবুরা বড় বড় কথা বলতে পারছেন। আনন্দ কুমার বাবুর সহযোগী ড. কামালরাও এই কারণে সংখ্যালঘু কার্ড খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। এই সুযোগ যাতে তারা আর না পায় এজন্য আমার প্রস্তাব হলো : বিভিন্ন

www.pathagar.com

চাকরি-বাকরি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ও হার বিষয়ে একটা সমীক্ষা তৈরি করা হোক, দুই. সংখ্যালঘুদের শিক্ষার হার, তাদের দারিদ্র্য সীমাগত অবস্থান, তাদের পাওয়া স্কলারশীপের বার্ষিক পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে পরিসংখ্যান তৈরি করা হোক এবং তিন. জাতীয় আয়ে তাদের অবস্থান, ঋণ বিতরণের জাতীয় অংকে তাদের শেয়ারের পরিমাণ, জাতীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ে তাদের অংশ এবং জাতীয় ব্যাংক ডিপোজিটে তাদের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ক মূল্যায়ন করা হোক। দেশে এখন সংস্কার চলছে। এটাও সংস্কারমূলক একটা কাজই হবে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদাযিক ভেদ-নীতি নেই বলেই উপরোক্ত বিষয়াবলিকে কোন সময়ই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়নি। কিন্তু আমরা সাম্প্রদায়িক না হলেও আনন্দ কুমার বাবু ও ড. কামালরা সাম্প্রদায়িকতা ভুলতে পারছেন না এবং আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক বানাতে চাচ্ছেন। বারবারই তারা আমাদের ওপর সাম্প্রদায়িক হওয়ার দায় চাপাচ্ছেন। এই অবস্থায় ওপারের আনন্দ কুমার বাবু ও এপারের ড. কামালদের সাম্প্রদায়িক প্রপাগান্ডার মোকাবিলা করার জন্যই রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সম্প্রদায়গত অবস্থানের একটা সমীক্ষা হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

১৬ জুন, ২০০৭

ডায়ালগ বিষয়ক মক্কা সম্মেলন একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

মক্কায় অনুষ্ঠিতব্য 'World Islamic conference for dialogue'-এর ফ্যাক্স বার্তা যখন হাতে পেলাম, তখন কনফারেন্সের বিষয় আমাকে বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ করেছিল। 'ডায়ালগ' শব্দটার সাথে অনেকদিন থেকে পরিচিত। 'ইন্টার রেলিজাস', 'ইন্টার ফেইথ', 'ইন্টার কালচার' ইত্যাদি ডায়ালগের কথা অনেকদিন থেকে শুনছি। বিশেষ করে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত খৃস্টানদের মধ্যে ডায়ালগ চলছে অনেকদিন ধরে। আন্তঃধর্ম ও আন্তঃকালচার ডায়ালগের প্রয়োজনের কথাও শোনা যাচ্ছিল। হান্টিংটনের কুখ্যাত 'Clash if civilizations' প্রকাশিত হবার পর, বিশেষ করে নাইন-ইলেভেনের পর যখন পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী ও সর্বশেষ ধর্ম ইসলামের উপর অজ্ঞতা প্রসূত ও উদ্দেশ্যমূলক যে আক্রমণ শুরু হয়, তার প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের সুস্থবুদ্ধি অনেকেও ইসলামের সাথে সংলাপের প্রয়োজন অনুভব করে। ইসলাম, খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্ন পর্যায়ে কিছু সংলাপও শুরু হয়। বিশেষ করে 'World council of churchis'-এর মত কিছু সংগঠন আন্তঃধর্ম ডায়ালগ নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করে আসছে। কিন্তু কোন মুসলিম দেশ কিংবা পরিচিত বা উপযুক্ত কোন মুসলিম সংগঠন এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে আমার জানা ছিল না। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন কিং আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান ২০০৭ সালের নবেম্বরে ভ্যাটিকান সফর করেন এবং সেখানে পোপের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এই উপলক্ষে শান্তি ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে আন্তঃধর্ম সংলাপের আহ্বান জানান। এই কথা মনে পড়ায় মক্কায় অনুষ্ঠিতব্য সংলাপের জন্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের একটা ব্যাক গ্রাউন্ড খুঁজে পেলাম। বাদশাহ তার আহ্বানের ফলো

www.pathagar.com

আপ হিসাবেই রাবেতাত আল আলম আল ইসলামীর মাধ্যমে এই বিশ্ব সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন। আর মনে হলো, রাবেতাই এর জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সংগঠন। রাবেতার ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই আছে। রাবেতা জাতিসংঘ স্বীকৃত একটি সংস্থা। ইউনেস্কো, ইউনিসেফেরও সদস্য রাবেতা। ১৯৬২ সালে সৌদী সরকার কর্তৃক গঠিত হবার পর রাবেতা পৃথিবীর সব প্রান্তে ইসলাম প্রচার, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির উজ্জীবন, ইসলাম বিরোধী প্রচার-প্রপাগান্ডার মোকাবিলা ইত্যাদি দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছে। 'ওয়ার্ল্ড সুপ্রীম কাউন্সিল ফর মস্ক', ইসলামিক ফিকহ্ কাউন্সিল, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল কমিশন ফর মেমোরাইজেশন অব দি হোলি কুরআন, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর মিডিয়া, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর এডুকেশন, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর কনভার্ট টু ইসলাম, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর ইনট্রোডাকশন অব ইসলাম, ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম ফর ইনট্রিডিউসিং দি প্রোফেট অব মারসি, ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর মুসলিম উইমেন এন্ড ফ্যামিলি, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমি এন্ড ফাইন্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর কনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভলপমেন্ট প্রভৃতি সংস্থা রাবেতার স্বীকৃত, মঞ্জুরিকৃত বা রাবেতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়াও গোটা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে আছে রাবেতার সাথে সম্পর্কিত শত শত ইসলামী ও মুসলিম সংগঠন। সুতরাং ডায়ালগ ব্যবস্থাপনার জন্যে রাবেতা উপযুক্ত সংগঠন। বাদশাহ আবদুল আজিজের সৌদী সরকার ডায়ালগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাবেতাকে দেয়া উপযুক্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স অন ডায়ালগ' সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে মক্কায় পৌঁছা পর্যন্ত এই ধারণাই আমার ছিল যে, ডায়ালগ ব্যাপারে সৌদী সরকারের এটাই প্রথম উদ্যোগ। কিন্তু সৌদি আরবে যাওয়ার পর, ডায়ালগ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র পাবার পর আমার এ ভুল ভেঙে যায়। দেখলাম সৌদি আরবে ডায়ালগ কর্মসূচির যাত্রার শুরু সেই ২০০৩ সালে। এ জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান 'কিং আবদুল আজিজ সেন্টার ফর ন্যাশনাল ডায়ালগ (King Abdul Aziz Center for National Dialogue)। এই সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তদানীন্তন ক্রাউন প্রিন্স, বর্তমানে সৌদি আরবের বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ। উদ্যোগকে আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি দিতে গিয়ে ২০০৩ সালের ২৩শে জুলাই এক চিঠিতে বাদশাহ ফাহদ বলেন যে, 'ক্রাউন প্রিন্স' ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ আপনি দেশের সংহতি বিধানকারী বাদশাহ আবদুল আজিজ-এর দৃষ্টান্ত এবং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ঐক্য সামনে রেখে চরমপন্থার বদলে মধ্যম পন্থার কাঠামোতে ইসলামী বিশ্বের সাথে সম্পর্ক সংহত করা ও আমাদের জাতীয় ঐক্য জোরদার করার লক্ষ্যাভিসারী যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তা আমরা দেখেছি। আমরা একে অনুমোদন করেছি। কাজ শুরু করুন।' কাজ শুরু হয়ে যায়। 'King Abdul Aziz center for National Dialogue'-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে তদানীন্তন ক্রাউন প্রিন্স আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ বলেন, "The etiqustte of dialogue must spring from the traditions of the right eours predessors (may god be pleased with them) who practiced constructive argumentation in full

www.pathagar.com

accordance with the guidance of the Prophet (Peace be upon him) who said : 'He who believes in Allah and the final days should say something good or else remain silent.' They also considered cursing a Muslim to be diviation, and fighting him to be a disbelief. This is the proper way of dialogue ..... . This country, which takes pride in the service of the two holy mosque, when the hearts of The Muslims turn, cannot embrace a thought that deviates from the Islamic principles, nor can it sustain thoughts that manipulate the teachings of Islam by means of adapting treacherous slogans for the Passage of the evil goals of calling Muslims non believers and terrorising them. Our Saudi People do not accept any substitute for the moderate middle way which refuses extremism and fanaticism, just as the refuse dessolution and immorality" কিং আব্দুল আজিজ ডায়ালগ সেন্টারের কাজ সউদি আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেন্টারের লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বাসের কাঠামোর অধীনে জাতীয় ঐক্য গভীর ও সুদৃঢ় করা; ইসলামের শিক্ষা মধ্যমপন্থার অনুসরণে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সউদি আরবের ভেতর ও বাইরেও ইসলামী সংলাপের গোড়াপত্তনে অংশ নেয়া; বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা এবং এতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে আলোচনা করাকে সেন্টারের লক্ষ্যের মধ্যে ধরা হয়েছে। সেন্টারের লক্ষ্য হিসেবে ৮টি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যটি হলো জাতীয় সংলাপে কৌশলগত লক্ষ্যকে বিমূর্ত করা এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন করা। কিং আব্দুল আজিজ ডায়ালগ সেন্টার শুধু ডায়ালগ সেন্টার নয়, রীতিমত এটা একটি ইনস্টিটিউশন। যার এমন কতগুলো বিভাগ রয়েছে যা সেন্টারকে জাতীয় সংস্কার, সমৃদ্ধি, উন্নয়নের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত করেছে। বিভাগগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেনিং এন্ড ওয়ার্কশপ, ডিপার্টমেন্ট অব স্টাডিজ, রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক রিলেশন্স এন্ড মিডিয়া, ডিপার্টমেন্ট অব ডায়ালগ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স, ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক রিলেশন্স এন্ড মিডিয়া, ডিপার্টমেন্ট অব ডায়ালগ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স, ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন সেন্টার এন্ড আরকাইভস এবং ডিপার্টমেন্ট অব মিটিংস, সেমিনারস এন্ড কনফারেন্সেস। এছাড়াও সেন্টারের রয়েছে 'ইনটেলেকচুয়াল গাইড প্রজেক্ট'। সেন্টারটি ৫ বছর ধরে কাজ করছে। ৫ বছরে চারটি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমি কিং আব্দুল আজিজ ডায়ালগ সেন্টার নিয়ে এতোটা আলোচনা করলাম এই জন্যে যে, আমি বলতে চাই বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজের তত্ত্বাবধানে রাবেতার উদ্যোগে যে 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স ফর ডায়ালগ' অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা হঠাৎ করে হয়নি। এর পেছনে রয়েছে কিং আব্দুল আজিজ ডায়ালগ সেন্টারের অভিজ্ঞতা। 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স ফর ডায়ালগ'কে বলা যায় 'কিং আব্দুল আজিজ ডায়ালগ সেন্টারে'র বৃহত্তর ফলোআপ। সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মূলত

www.pathagar.com

সউদি আরবের ন্যাশনাল ডায়ালগের জন্যে এবং এর আওতা ইসলামিক ওয়ার্ল্ডে সম্প্রসারিত করা। অন্যদিকে 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স ফর ডায়ালগ-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর ডায়ালগ' এর লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলিম উম্মার মধ্যে ডায়ালগ এবং তার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করা। এর দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও কালচারের সাথে ডায়ালগ করা, যা ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে ভ্রান্তধারণার অবসান ঘটাবে এবং পারস্পরিক জানাজানি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আন্ত:ধর্ম ও আন্ত:কালচার সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। অন্য জাতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে যাই হোক, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে এটা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে সময়ের অপরিহার্য দাবি হিসেবেই মক্কা মুকাররমায় 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স অব ডায়ালগ' অনুষ্ঠিত হলো।

সম্মেলনের যে বিষয়টি প্রথমেই আমাকে চমৎকৃত করে সেটা হলো, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা। এর আগেও কতগুলো আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আমি গিয়েছি। তার মধ্যে রয়েছে ওআইসি'র শীর্ষ সম্মেলন, ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথের কয়েকটি শীর্ষ সম্মেলন, মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন। এসব সম্মেলনে সব মুসলিম দেশ এবং অমুসলিম দেশের মুসলিম মাইনরিটিদের প্রতিনিধি এসেছে। কিন্তু এবার যা দেখলাম, কোন সময়ই তা দেখিনি। এবার মুসলিম দেশের প্রধান সব ধর্মীয় ও সংস্থা এবং অনুরূপভাবে অমুসলিম দেশের সব মুসলিম গ্রুপকে সম্মেলনে হাজির করা হয়েছে। সম্মেলনে ল্যাটিন আমেরিকার সুদূর ও দুর্গম এলাকার মুসলিম প্রতিনিধিদের যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রের মুসলিম প্রতিনিধিদেরকেও। দেখেছি আফ্রিকার চাঁদ-এর মতো গহীন, গভীর বনাঞ্চলের মানুষকে। তার সাথেই দেখেছি মঙ্গোলিয়া, তাইওয়ানের মানুষকেও। দুনিয়ার সবদেশের সব মতের মানুষের এ এক অপরূপ মিলন মেলা। এদের সকলের উপস্থিতিতে মুসলিম উম্মার মধ্যেকার ধর্মীয় মত ও মতাদর্শগত বিরোধের অবসান ঘটাবার ঘোষণা সফল ও তাৎপর্য পূর্ণ হয়েছে। সম্মেলনে নিজেদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং আন্ত:ধর্ম সম্প্রীতি সংলাপের যে আপীল পেশ করা হয়েছিল, তার প্রতি সকলেই অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

সম্মেলন শুরুর কয়েকদিন আগে থেকেই রাবেতাত আল আলম আল ইসলামীর (Muslim World League-MWL) সেক্রেটারি জেনারেল তার বিভিন্ন বক্তব্য, সাক্ষাৎকার ও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচির বিষয় দুনিয়ার মানুষকে অবহিত করছিলেন। উত্থাপিত নানা প্রশ্নের তিনি জবাবও দিচ্ছিলেন। ২ জুন সউদী গেজেটে প্রকাশিত এক বক্তব্যে তিনি বলেন, "আন্ত:জাতি, আন্ত:ধর্ম, ডায়ালগের মূল বিষয় হবে বিভিন্ন মহল থেকে যে জঘন্য অপপ্রচার চলছে তা থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা। .... মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (রাবেতা) এর তার সহযোগী ইসলামী সংস্থাগুলো ভালো করেই জানে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোকেই সভ্যতার দ্বন্দ্ব আখ্যা দেয়া হচ্ছে। .....

www.pathagar.com

কম্যুনিজমের পতনের পর কয়েকটি মহল পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইসলামকেই তাদের এক নাম্বারের শত্রু হিসেবে ধরে নেয় এবং এর প্রচার শুরু করে। অথচ ইসলাম তাদের এই অপপ্রচারের একেবারেই বিপরীত। ইসলাম মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে। ইসলাম সমাজের সকল মতের সহাবস্থানে বিশ্বাস করে।.... নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও অমুসলিমদের সাথে সংলাপের ক্ষেত্রে আল কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতই হবে অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশক। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (MWL) দেশে দেশে সংলাপ। সেমিনার করে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর মোকাবিলা করবে। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদেরকে সতর্ক করেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে, তাদের ধর্ম তাদের রাসূল ও তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার না চালাবার জন্যে।" রাবেতা অর্থাৎ মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারি জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোহসিন আল তুর্কির এই বক্তব্য আল জাজিরা টেলিভিশন ১লা জুন (০৮) তার সাক্ষাৎকার হিসাবে প্রচার করে।

সম্মেলনের ১ দিন আগে আব্দুল্লাহ আল তুর্কি একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন সউদি আরব দৈনিক ওকাজ পত্রিকাকে। এই সাক্ষাৎকারে তিনি আসন্ন সম্মেলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কথা বলেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, "মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ সম্মেলনে অন্যান্য ধর্মের সাথে সংলাপের একটা ঐক্যবদ্ধ কর্মকৌশল তৈরি করবে যা ইসলামকে ডায়ালগের সনদ হিসেবে কাজ করবে।' কালচারাল ও আন্তঃধর্ম ডায়ালগে অমুসলিম দেশের মুসলিম মাইনরিটি সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আবদুল্লাহ আল তুর্কি বলেন, "অমুসলিম দেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবী, মুফতি ও সংস্থা সংগঠনের প্রতিনিধিদের ব্যাপকভাবে সম্মেলনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্মেলনের তারিখ ৪ দিন পেছানো হয়েছে তাদেরই সুবিধার জন্যে। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ বিশ্বাস করে মুসলিম সংখ্যালঘুরা মুসলিম উম্মার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। তাদের সমস্যা ও দাবি দাওয়া সমাধানে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে যাতে তারা তাদের অস্তিত্বও পরিচয় নিয়ে টিকে থাকতে পারে। তারা তাদের এলাকায় যাতে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, এজন্যে তাদের শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ মুসলিম সংখ্যালঘুদের সংস্থা সংগঠনকে প্ল্যান প্রোগ্রামসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করছে।" ডায়ালগের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ আল তুর্কিকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "সংলাপে সমসাময়িক বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়া ইসলামেরও পদ্ধতি, কুরআন- সুন্নাহর এটাই নির্দেশ। সংলাপে বৈচিত্র্য বহুমুখিতার স্বীকৃতি থাকবে এবং থাকতে হবে অংশগ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে সহযোগিতা। ইসলামের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আমাদের সংলাপের ভিত্তি হবে কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিকোণ এবং আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা।' সংলাপে সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ আল তুর্কি বলেন, "বিভিন্ন ইস্যুর সংলাপে বিভিন্ন মত ও মতাদর্শের লোকদের মধ্যে সংহতি প্রয়োজন। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন মতাদর্শ, সংস্কৃতি, জাতীয়তার সংলাপে সব মানুষের আগ্রহ প্রয়োজন। গভীর সংলাপের জন্যে অংশগ্রহণকারী বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহনশীল

www.pathagar.com

এক কমন গ্রাউন্ড প্রয়োজন। দুনিয়ায় শান্তি-নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে সংলাপের সামনে কি কঠিন থাকা উচিত- এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি বলেন, 'অনিশ্চয়তা এবং চাপিয়ে দেয়া অন্যায় যুদ্ধ মানবতার জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হুমকি। আল কুরআন বিভিন্নভাবে মানুষের নিরাপত্তা, বিশ্বের শান্তির কথা বলেছে। শান্তি ভঙ্গ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায় এবং মানবাধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘন, যে অধিকার আল্লাহ্ মানুষকে দিয়েছেন।' সাক্ষাৎকারটির শেষ বক্তব্যে ড. আব্দুল্লাহ আব্দুল মোহসিন আল তুর্কি বলেন, 'আন্তরিক ডায়ালগ অন্যান্য ধর্মকে স্বর্গীয় আলোর পরশ লাভে সাহায্য করতে পারে, যা বিশ্বব্যাপী মন্দ ও অসুস্থতার অবসান ঘটিয়ে গ্লোবালাইজেশনের শক্তিমান স্রোতকে মঙ্গলের দিক-নির্দেশনা দিতে পারে।"

মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারি জেনারেলের উপরোক্ত বক্তব্য এবং সাক্ষাৎকার 'আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অব ডায়ালগ'-এর উদ্দেশ্য ও কার্যসূচি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তুলে ধরে। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

সম্মেলন শুরু হয় জুনের ৪ তারিখে।

সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র কা'বা সংলগ্ন 'রাফা প্রাসাদে'।

বাদশাহ মক্কা শরীফে এলে এই প্রাসাদেই থাকেন।

তিনদিনের সম্মেলনটি এই প্রাসাদেই অনুষ্ঠিত হয়।

সৌদী সরকার সম্মেলনকে যে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে, এটা তারও একটা প্রমাণ। সম্মেলনের সময় আমরা প্রাসাদের মসজিদে যা কা'বার অংশ, নামায পড়েছি। জুমআর নামাযও আমরা এখানেই আদায় করেছি।

৪ জুন সকালে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হলো।

মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের (রাবেতার) সভাপতি সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতি শেখ আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুল্লাহ আল শেখ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। মঞ্চে বসেছিলেন পাঁচজন। মাঝখানে বসেছিলেন তিনদিনের কনফারেন্স যিনি উদ্বোধন করবেন এবং কনফারেন্স যার আগ্রহ ও উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ। তার ডান পাশে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সভাপতি সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতি শেখ আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুল্লাহ আল শেখ। আর বামদিকে বসেছিলেন, ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং ইরানের প্রভাবশালী রাজনীতিক আলী আকবর হাশেমী রাফসানজানি। মঞ্চের অপর দু'জন স্বনামধন্য ব্যক্তি হলেন- ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের সেক্রেটারি জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোহসিন আল তুর্কি এবং গ্রান্ড শেখ অব আল আজহার সাইয়েদ তানতাবি।

কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধনী অধিবেশনের কাজ শুরু হলো। এর পরই উদ্বোধনী বক্তৃতার পালা। উদ্বোধনী বক্তৃতা শুরু করলেন বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ। তার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার শুরুতেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুসলিম চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন মুসলিম সংস্থা-সংগঠনের প্রধানদের তিনি প্রাণঢালা অভিনন্দন জানালেন এবং ডায়ালগ আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, 'অন্যান্য জাতির কাছে ইসলাম এবং ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ডায়ালগ একটা শক্তিশালী মাধ্যম। তিনি বললেন, 'এই সম্মেলনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সম্মেলনটি পবিত্র কা'বার ছায়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা মুসলমানদেরকে বিশ্বের সব মানুষের প্রতি তাদের বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সম্মেলনে অন্যান্য জাতির সাথে সংলাপের কৌশল-পদ্ধতি নির্ধারণের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালনের পথ সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, 'সহযোগিতা, সহাবস্থান, সুবিচার এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি-অবস্থান সম্পর্কে পৃথিবীকে অবহিত করতে হবে। মুসলিম স্কলারস ও বুদ্ধিজীবীদেরকে পৃথিবীর জাতিসমূহ ও মানুষের সাথে সংলাপ ও তথ্য-বিনিময় অব্যাহত রাখতে হবে।' বাদশাহ আব্দুল্লাহ তার বক্তৃতায় বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ ও অন্যান্য মুসলিম সংস্থা-সংগঠনকে এই সব সংলাপের সমন্বয় সাধন ও সম্মিলিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন, সৌদী আরবের গ্রান্ড মুফতি, ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি, গ্রান্ড শেখ অব আল-আজহার এবং মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ আল তুর্কি। সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতি মুসলিম উম্মার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে সর্বশেষ ঐশী বাণী সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে মানবজাতির জন্যে এসেছে, তা দুনিয়ার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া মুসলমানদের দায়িত্ব। সংলাপ হলো মানুষের পারস্পরিক জানাজানি ও সহযোগিতার মাধ্যম এবং মতপার্থক্যের বিষয়টাকে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে।" উদ্বোধনী অধিবেশনে ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের আয়োজনের জন্যে সৌদি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন সেকশনের মধ্যে সংলাপ আজ প্রথম প্রয়োজন। এ ধরনের সংলাপ অব্যাহত রাখতে হবে এবং এটা মুসলিম বিশ্বের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বোধনী অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণ দেন, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ আল-তুর্কি। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই মুসলিম জনগণ এবং মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের তরফ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের

সেবায় অব্যাহত অবদান রাখার জন্যে বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ আল সৌদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইসলামী স্কলার, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা-সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মক্কার এই সম্মেলনে সম্মিলিত হওয়াকে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, নৈতিক নীতিমালা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিভিন্ন সভ্যতা ও ঐশী ধর্মসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতা দুনিয়ার সংঘাত-সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে এবং মানুষের মধ্যে সুবিচার, সহযোগিতা, সহনশীলতার অবস্থাকে সংহত করতে পারে- এই বিষয়টিকে বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। আজ তাঁরই অভিভাবকত্বে অন্যান্য ধর্মের সাথে সংলাপ অনুষ্ঠান ও একটি লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের নিয়ে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে। সংলাপ আল কুরআন নির্দেশিত এবং রাসূল (সাঃ) অনুসৃত একটা পদ্ধতি। মুসলিম উম্মার সংস্কৃতিতে এটা একটা গভীর প্রোথিত বিষয়। ইসলামের শুরু থেকে অন্যান্যের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংলাপ একটি মাধ্যম। আজকের যুগে ইসলামের

www.pathagar.com

সুরক্ষা এবং ইসলামের মূল্যবোধ প্রচারের ক্ষেত্রে সংলাপের সেতুবন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা প্রয়োজনীয় যে, সংলাপের সাথে যারা জড়িত হবেন, তারা অতিতের অভিজ্ঞতা, সংলাপে অতিতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেবেন। এর মাধ্যমে তারা ভবিষ্যত সংলাপের জন্যে নতুন কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে পারবেন। যাতে সংলাপের প্রতিটি ক্ষেত্র, প্রতিটি বিষয় এমনভাবে ঢেলে সাজানো হবে যা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালি এবং বিশ্বাসীদের যোগ্যতাকে বিকশিত করবে যাতে মানবতার সাথে হৃদয়ের বিনিময় সম্ভব হয়। অধিকন্তু, এই পরিকল্পনা বা কর্মকৌশল অবশ্যই একক ও এক ছত্রছায়ার অধীনে সবকাজের সমন্বয় ও উদ্দেশ্যের অধিষ্ঠানকে নিশ্চিত করবে এবং নির্দ্ধারিত করবে বাস্তবায়নের বিধি-নিয়ম, পদ্ধতি ও লক্ষ্য।" তিনি আরও বলেন যে, আজ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কারণ ইসলামের পরিমণ্ডলে বর্তমানে বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদের মত বিষয়ের যে অনুপ্রবেশ ঘটছে, তাতে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ উদ্বিগ্ন।' তিনি উল্লেখ করেন, "আমরা মুসলমানরা আজ আনন্দিত। আনন্দিত শুধু এই কারণে নয় যে, এই সম্মেলন পবিত্র মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বরং এই কারণেও যে এই সম্মেলন ইসলামী দুনিয়ার কেন্দ্র সৌদি আরবের খোদ শাসক এবং হারামাইন শরিফাইনের খাদেম বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।"

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের এইসব কথার মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের দিক নির্দেশনা পরিষ্কার হয়ে যায়। অথবা বলা যায়, সম্মেলনের ওয়ার্কিং সেশনকে যে বিষয়াবলি দিয়ে সাজানো হয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্বোধনী সম্মেলনের বক্তব্যে। সম্মেলনের ওয়ার্কিং সেশনে পেশকৃত প্রবন্ধগুলো চমৎকার। আর বিষয়গুলো বিভিন্ন প্রবন্ধে পরিকল্পিতভাবে বিভক্ত। সম্মেলনে বিষয় হিসেবে ডায়ালগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ধরা হয়েছে। সম্মেলনের চার সেশনে ১৩টি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। এই তেরটি প্রবন্ধের মধ্যে শেষ দু'টি প্রবন্ধ 'ফ্যামিলি এন্ড ইথিক্স' ও 'ডেঞ্জারস অব এনভায়রনমেন্ট' ছাড়া বাকি ১১টি প্রবন্ধই ডায়ালগের বিভিন্ন দিক নিয়ে। সবদিক থেকে 'ডায়ালগ' বিষয়টির আলোচনা করে একদিকে 'ডায়ালগ'-এর প্রকার, পদ্ধতি, পক্ষ, বিষয় ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামের ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে 'ডায়ালগ' এর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। 'ডায়ালগ' নিয়ে এই বিষদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। মুসলিম উম্মার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঐক্যের জন্যেও এটা প্রয়োজন। আধুনিক আঙ্গিকের আন্তঃ ধর্ম 'ডায়ালগ' বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে একেবারেই নতুন একটি বিষয়, যার পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত থাকতেই পারে। নেতিবাচক কোনো মনোভাব থাকলে তা দূরীকরণের জন্যেই ডায়ালগ-এর ইসলামী দৃষ্টিকোণ নিয়ে সম্মেলনের প্রবন্ধগুলোতে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। আমি নিশ্চিত এই ব্যাপক আলোচনার বিষয়টি সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হবে এবং জাতির মধ্যে ঐকমত্যের সৃষ্টি হবে। আমার এই আশাবাদ অমূলক নয়। অন্ততঃ প্রবন্ধগুলোর শিরোনামের দিকে দৃষ্টি দিলেও এ বিষয়টা বুঝা যাবে। বিশেষ লেখকদের লেখা প্রবন্ধগুলো একটা করে দলিল। প্রবন্ধগুলোর দিকে একবার নজর বুলানো দরকার। প্রথম অধিবেশনে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রথম প্রবন্ধটি 'Dialogue in the Holy Qur'an and Sunnah-Concept and Objectives (ডায়ালগ ইন দ্য হোলি কোরআন এন্ড সুন্নাহ, কনসেপ্ট এন্ড অবজেকটিভ্স)। প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন সউদি আরবের আল ক্বাসিম

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আহমদ আব্দুর রহমান আল ক্বাজী। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম 'Dialogue in the Holy Qur'an and Sunnah- Bases and Tendencies' (ডায়ালগ ইন দ্যা হোলি কুরআন এন্ড সুন্নাহ, বেজেস এন্ড টেনডেনসিজ)। এ প্রবন্ধের লেখক ড. আসাদ আল সাহমারী। ইনি লেবাননের পিপ্‌লস কংগ্রেসের ধর্ম বিষয়ক কর্মকর্তা। প্রথম অধিবেশনের শেষ প্রবন্ধটির শিরোনাম 'Experiences of Cultural Dialogue Throughout History (এক্সপেরিয়েন্সেস অব কালচারাল ডায়ালগ থ্রুআউট হিস্টোরি) ইরাকের আল খালিসিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. জাওয়াদ আল খালিমি।

দ্বিতীয় ওয়ার্কিং সেশনের 'থীম' বা মূল প্রসঙ্গ ছিল 'মেথোডলোজি এন্ড রুলস অব ডায়ালগ (র্ণদমঢমফমথহ টভঢ লৈফণ্ড্র মত উধঢফমথলণ)। উল্লেখ্য, প্রথম ওয়ার্কিং সেশনের মূল বিষয়টা ছিল 'বেসিস অব ডায়ালগ ইন ইসলাম' (Basis of Dialogue in Islam)। দ্বিতীয় ওয়ার্কিং সেশনে Methodology and Rules of Dialogue'-এর উপর তিনটি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। প্রবন্ধগুলোর নাম হলো, 'মেকানিকস অব ডায়ালগ' (Mechanics of Dialogue), 'ইথিকস এন্ড রুলস অব ডায়ালগ (Ethics and Rules of Dialogue) এবং 'ডায়ালগ : কমপ্লেক্সিটিজ এন্ড প্রোহিবিশনস (Dialogue : complexities and Prohibitions)। এই প্রবন্ধগুলো উপস্থাপিত করেন যথাক্রমে জর্দানের চীফ জাস্টিস এবং হাশেমী কোর্টের ইমাম ড: আহমাদ মোহাম্মাদ হুলাইল, সউদি আরবের কিং সউদ ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের প্রফেসর ড: মাজিদ মোহাম্মদ আল মাজিদ এবং সউদি আরবের মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের গবেষক ড: মাকিদ মাহমুদ আস-সাকার।

তৃতীয় ওয়ার্কিং সেশনে আলোচনা হয় 'কার সাথে আমরা ডায়ালগ করব' With whom we Hold Diagogue)-এই বিষয়ের উপর। এই বিষয়ের উপর চারটি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। পেশকৃত প্রবন্ধগুলো ছিল : এক. 'কো-অর্ডিনেশন অ্যামোং ইসলামিক অর্গানাইজেশন কনসারন্ড উইথ ডায়ালগ (Co-ordination among Islamic organizations concerned with Dialogue), প্রবন্ধের উপস্থাপক 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কাউন্সিল ফর দা'ওয়া এন্ড রিলিফ, মিসর,-এর সাধারণ সম্পাদক ড: আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ, দুই. 'ডায়ালগ উইথ ফলোয়ারস অব ডিভাইন মেসেজেস' (Dialogue with Followers of Divine Messages), এ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেবাননের 'ইসলামিক স্পিরিচুয়াল সামিট' এর সেক্রেটারী জেনারেল ড: মুহাম্মাদ আল-সামাক, তিন. 'ডায়ালগ উইথ ভেরিয়াস ফিলোসফিস' (উধঢফমথলণ শটরধমল্র দেধফস্রম-যদধণ্ড), এ প্রবন্ধ পেশ করেন ভারতের ইসলামিক ফিকাহ একাডেমির ভাইস চেয়ারম্যান শেখ বাদরুল হাসান আল-কাসামি এবং চতুর্থ. প্রবন্ধের শিরোনাম : 'ফিউচার অব ডায়ালগ ইন দ্য শ্যাডো অব রিপিটেড ইনসাল্টস টু ইসলাম' (Future of Dialogue in the shadow of Repeated Insults to Islam), এই প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মিসরের আল-আজহারের ডেপুটি ডাইরেক্টর শেখ ফউজি আল জাকজাক।

শেষ ওয়ার্কিং সেশনটি অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনের শেষ দিবসের (৬/৬/০৮) সকালের অধিবেশন হিসাবে। এ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'এরিয়াস অব ডায়ালগ' বা 'সংলাপের ক্ষেত্র'। এ বিষয়ের উপর অধিবেশনে তিনটি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। প্রথম

www.pathagar.com

প্রবন্ধটির নাম ছিল 'উফট্রদ মত উধশধফধড়র্টধমভ টভচ ঘমরফচ ণেটডণ'. দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ছিল 'Dangers of Environment' এবং তৃতীয় প্রবন্ধটির নাম, Family and ঋদধদ্র-উমববমভ ঔলবটভ ট্রযণর্দ্র'. প্রবন্ধগুলোর উপস্থাপক ছিলেন যথাক্রমে কাতারের 'কলেজ অব ইসলামিক স্টাডিজ'-এর প্রফেসর ড: মাহমুদ আহমদ গাজী, ইসলামিক এ্যাসোসিয়েশনস-এর ডাইরেক্টর জেনারেল ড: মোস্তফা আল জাব্বাখ এবং তুরস্কের 'ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক সাইন্সের প্রেসিডেন্ট ড: আলী ওজাক।

চারটি ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতিত্ব করেন ইসলামী দুনিয়ার বিখ্যাত সব ব্যক্তি। সউদি আরবের 'শূরা কাউন্সিল'-এর প্রেসিডেন্ট ড: সালেহ আব্দুল্লাহ আল-হুমাইদ প্রথম ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতিত্ব করেন। দ্বিতীয় ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতি ছিলেন ইরানের 'একাডেমী ফর ইসলামিক স্কুলস অব থট'-এর সেক্রেটারী জেনারেল শেখ মোহাম্মদ আলী তাসখেরী। বসনিয়া-হার্জেগোভিনার হেড অব ওলামা ও মুফতি ড: মোস্তফা ইবরাহীম সেরিক তৃতীয় ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতিত্ব করেন। শেষ ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতি ছিলেন সুদানের আল-দাও'য়া আল ইসলামিয়ার চেয়ারম্যান ফিল্ড মার্শাল আব্দুর রহমান এম. সিওয়ার আল-দাহাব।

ওয়ার্কিং সেশনগুলোতে পেশকৃত প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই পরিস্কার যে, ডায়ালগ-এর ইসলামী দৃষ্টিকোণসহ ডায়ালগ সম্পর্কিত সবদিকই সম্মেলনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপনার পর এর উপর মন্তব্য ও আলোচনা হয়েছে। তার ফলে প্রবন্ধের বিষয়গুলো আরও পরিস্কার হয়েছে। চার. ওয়ার্কিং সেশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধের উপর আলোচনা ও মন্তব্যকে ভিত্তি করেই সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে 'মক্কা আপীল ফর ইন্টার-ফেইথ ডায়ালগ' নামে সম্মেলনের একটা ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছে।

এই ঘোষণা ইসলামী উম্মার পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর কাছে একটা ঐতিহাসিক দলিল। যারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বহুমাত্রিক সহাব্যস্থানের বিরোধী বলেন এবং ইসলামী আদর্শকে যারা যুক্তি, বুদ্ধি ও মুক্ত আলোচনার বিরোধী বলেন, তাদের একটা বড় জবাব সম্মেলনের এই দলিল। দলিলটির ইংরেজি ভার্সন ১৯ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। এর প্রথম ছয় পৃষ্ঠায় সম্মেলনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য ও মন্তব্যকে স্মরণ করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা হিসেবে। তারপর সম্মেলনের মূল বিষয়কে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হলো:

(ক) ডায়ালগের ইসলাম-সিদ্ধতা (Islamic legitimacy for Dialogue)

(খ) ডায়ালগের পদ্ধতি, আইন-বিধি ও মাধ্যম (Methodology, Rules, Regulations and means of Dialogue),

(গ) কার সাথে আমরা ডায়ালগে বসব (With whom we will engage in dialogue) এবং

(ঘ) ডায়ালগের ভিত্তি ও বিষয় (The Basis and themes of Dialogue)

দলিলটিতে সম্মেলনে আলোচিত এই চারটি বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ পয়েন্টভিত্তিক সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের আকিদা, বিশ্বাস, ইসলামের ইতিহাস সর্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়গুলোকে সামনে আনা হয়েছে, যা

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহর সমসাময়িক মৌল প্রয়োজনের সাথে সংগতিশীল এবং মানবজাতির শান্তি ও সংহতির জন্যেও যা অপরিহার্য।

সবশেষে দলিলটি উপসংহারে তার উদাত্ত ঘোষণায় বলেছে :

"মানবতা আজ যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন, তার মূল্যায়ন করে মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন ধর্ম, সংস্কৃতি নির্বিশেষে বিশ্বের সকল সরকার, সংস্থার সংগঠন এবং মানুষের উদ্দেশে এই আহ্বান জানাচ্ছে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে :

(এক) আপনারা এবং আমরা আসুন এই সমঝোতায় পৌঁছি যে, স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করি, একমাত্র তারই আমরা উপসানা করি এবং প্রফেটস ও মেসেনজারদের মাধ্যমে তার প্রেরিত বাণী থেকে পথ-নির্দেশ গ্রহণ করি।

(দুই) সবধরনের অবিচার, নিপীড়ন, স্বৈরাচার ও আধিপত্যবাদের- আসুন আমরা মোকাবিলা করি এবং যুদ্ধ, সংঘাত ও আন্তর্জাতিক সমস্যার অবসান ঘটাতে একে অপরকে সহযোগিতা করি। সংলাপ ও সহনশীলতার সংস্কৃতি শক্তিশালী করতে এবং সংলাপ-প্রমোটকারী প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন যোগাতে আমরা আসুন এক সাথে কাজ করি। আসুন সংলাপকে ব্যবহার করি বিশ্বশান্তি, সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যম হিসাবে। আমরা সবাই মিলে প্রতিরোধ করি মানব সম্পদের অপচয় এবং পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্যে হুমকি গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণে ব্যক্তি প্রতিভার অপব্যবহারকে।

(তিন) নৈতিক মূল্যবোধ বর্ধিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক নৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণে আসুন পরস্পরকে সযোগিতা করি, যা নৈতিক অবক্ষয়ের আগ্রাসন প্রতিরোধ করবে, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের সয়লাব প্রতিহত করবে এবং আজ পরিবার ব্যবস্থা ঘিরে যে বিপদের সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান দেবে, যাতে করে সুখি পরিবারে বাস করার সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়।

(চার) স্রষ্টা আমাদের পিতা আদম (আঃ) ও তার উত্তরাধিকারীদের সুন্দর পৃথিবী গড়ার দায়িত্ব দিয়েছেন, পৃথিবীর এই বাসিন্দাদের তাদের উত্তরাধিকারীদের প্রতিবেশীক দূষণের আগ্রাসন থেকে যে সংগ্রাম তাতে আসুন সকলে এক সাথে কাজ করি। সকলের সম্মিলিত কাজের মাধ্যমে প্রতিবেশিক ক্ষতিকে সর্বনিম্নে নিয়ে আসি যাতে তার কুফল কমানো এবং শিল্প-প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে আমরা পথনির্দেশ করতে পারি।

(পাঁচ) দুর্নীতি ও অসুখিতা দূরীকরণে আসুন বিশ্ব সমাজকে আমরা সকলে মিলে সহযোগিতা করি। আল্লাহর করুণা লাভের মাধ্যমেই এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া যায়। স্রষ্টার তরফ থেকে যে বাণী আসে রাসূল মুহাম্মদ (সা:)-এর কাছে, তার মূল কথা এটাই। যেমন বলা হয়েছে : "তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি সৃষ্টি জগতের দয়া হিসেবে। (২১ : ১০৭)।"

দলিলটিতে সব শেষে বলা হয়, "সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা সংলাপ-সংস্কৃতি এগিয়ে নেয়া এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে বিকৃত প্রচারণার সংশোধনে ইতিবাচক ফল দেয় এমন সব ইতিবাচক মিটিং, আলোচনা, সিমপোজিয়াম অব্যাহত রাখার দৃঢ় সিদ্ধান্তে একমত হয়েছে।

১০ জুলাই, ২০০৮

www.pathagar.com

মক্কা সম্মেলন এবং মাদ্রিদ সম্মেলন শুধু স্থান নয়, সবদিক থেকেই আলাদা। মক্কা সম্মেলনে সমাবেশ ঘটেছিল বিশ্বের ইসলামী সংস্থার প্রতিনিধি ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের। আর মাদ্রিদ সম্মেলনে এসেছিলেন বিশ্বের সব ধর্মের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। মক্কা সম্মেলনের বিষয় ছিল সংলাপ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা এবং শান্তি ও সহযোগিতার বিশ্ব গড়ার জন্যে ধর্ম ও নৈতিকতার দিকে বিশ্ববাসিকে আহ্বান জানানো। মাদ্রিদ সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল মানব সমাজের শান্তি ও স্থিতির জন্যে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে সংলাপের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা এবং কার্যকর সংলাপের পথ উন্মুক্ত করা। মাদ্রিদ সম্মেলনের আরেকটা লক্ষ্যও ছিল। সেটা হলো, সম্প্রীতির মাধ্যমে সহযোগিতার বিশ্ব গড়ে তোলার জন্যে আন্ত:ধর্ম ও আন্ত:সভ্যতা সম্পর্ক ও সংলাপ বিষয়ে মুসলমানদের আগ্রহ বিশ্ববাসির সামনে তুলে ধরা। ইসলামের কেন্দ্রভূমি হারামাইন শরিফাইনের খাদেম সৌদি আরবের বাদশা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ সম্মেলন আয়োজনে যে অপরিসীম আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যদিয়েই এ আগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে। আমরা বলতে পারি, মক্কা শরীফ কা'বার ছায়ায় অনুষ্ঠিত আন্তজার্তিক ইসলামী সম্মেলন ছিল মুসলমানদের আত্মপ্রস্তুতির সম্মেলন এবং মাদ্রিদ সম্মেলন ছিল নিজস্ব উদ্যোগে বহিরাঙ্গণে মুসলমানদের প্রথম পদক্ষেপ, যেখানে জমায়েত হয়েছিল সব ধর্ম, সব সংস্কৃতি এবং সব সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা। তৃতীয় মিলেনিয়ামের প্রথম শতকের শুরুতে সৌদি আরবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাদ্রিদ সম্মেলনকে আমি তাই ইসলাম ও মুসলমানদের বড় সাফল্য হিসেবে অভিহিত করতে চাই।

মাদ্রিদ সম্মেলনে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ার মত ছিল, সেটা সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতি। পরিচিত প্রায় সকল ধর্মের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব সম্মেলনে ছিল। কোন কোন ধর্ম বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। দেখা গেছে, উল্লেখযোগ্য গ্রুপগুলোকেও সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। খৃস্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দুনিয়াতে এখন সবচেয়ে বেশি। তারা বিভক্ত বহু গ্রুপে। সম্মেলনে মনে হয়েছে তাদের সবারই উপস্থিতি ছিল। সুদূর ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন ভেনেজুয়েলার বেভারেন্ট স্যামুয়েল অলসন। পরিচয় থেকে যতোটা বুঝেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন কমপক্ষে ছয়জন খৃস্টান ধর্মীয় নেতা। তাদের মধ্যে রয়েছেন রেক্টর অব অল সেইন্টস চার্চ বেভারেন্ট জর্জ এফ রেস্যান, রেইনবো পুশ কোয়ালিশনের বেভারেন্ট জেসি জ্যাকসন, ক্যাথলিক থিয়োলজিক্যাল ইউনিয়নের ড. স্কট আলেকজান্ডার। রাশিয়ান অরথডক্স চার্চের পক্ষে এসেছিলেন জর্জি রাবেক, সম্ভবত গ্রীক অরথডক্স চার্চের পক্ষে এসেছিলেন রুমানিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. এমিল কনস্টানটাইনেস্কু, তুরস্ক ও ইইউ থেকে এসেছিলেন যথাক্রমে মেট্রোপলিটান ইমানুয়েল এবং মেট্রোপলিটান ইমানুয়েল অব ফ্রান্স। বৃটেনের প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ থেকে এসেছিলেন দু'জন। তাদের রয়েছেন আর্কবিশপ অব ক্যান্টারবারি বেভারেন্ট ক্যাসন এ্যানথনি বল। আফ্রিকান চার্চ থেকে এসেছিলেন কয়েকজন। তার মধ্যে ইথিওপিয়ার অর্থডক্স চার্চের হোলিনেস আবুন পাওলো। স্পেন থেকে যোগ দেন ৪ জন খৃস্টান প্রতিনিধি। সব মিলিয়ে সম্মেলনে ৬০ জনেরও বেশি খৃস্টান প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনে ইহুদী ধর্মীয় নেতা ও প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ জন। এদের মধ্যে রয়েছেন ল্যাটিন আমেরিকার ইহুদী

www.pathagar.com

কংগ্রেসের ক্লাউডিও ইপেলম্যান, আমেরিকান ইহুদী কমিটির ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক পরিচালক চীফ রাব্বির ডেভিড রোজেন, ওয়ার্ল্ড জুইয়িশ কংগ্রেসের মিঃ মেকাইন স্লেইডার 'এলি' ওয়াইজেল সেন্টার ফর জুডাইক স্টাডিজের পরিচালক ড. স্টিভেন টি. কার্টজ, ইউনিয়ন ফর রিফরম জুদাইজম-এর পরিচালক রাব্বি স্কট পার্লিংসহ গুরুত্বপূর্ণ ইহুদী ধর্মীয় নেতাগণ। হিন্দু ধর্মেরও শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব সম্মেলনে ছিল। হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে হাজির ছিলেন শঙ্করাচার্য ওঙ্কার আনন্দ, সরস্বতীজী মহারাজ, হিন্দু আর্য সমাজের নেতা স্বামী অগ্নি ভেশজী এবং ড. এমএম ভারমা। শিখ ধর্ম নেতাদের মধ্যে হাজির ছিলেন দিল্লী গুরুদুয়ারা রাকাব গঞ্জ সাহিব এর প্রধান প্রেমজিত সিং সারনা এবং প্রফেসর মানজিত সিং। বৌদ্ধ ধর্মনেতারাও হাজির ছিলেন সম্মেলনে। তাদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধিষ্ট সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার সহসভাপতি শ্রীরাম পাল সিং গৌতম, চীনের বৌদ্ধ সমিতির সহসভাপতি জে চেং এবং আন্তর্জাতিক বুদ্ধিষ্ট কনগ্রেগেশনের সভাপতি ফাদার ক্রিশ্চিয়ান ভ্যান নিসপেন। চীনের 'তাও' ধর্মমতের নেতা 'চায়না তাওইজম এ্যাসোসিয়েশন' সহ-সভাপতি ঝাং জু এবং 'শিং তাও শিন' সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। জাপানের ধর্মীয় নেতা কুনিহিকো শিমামতো এবং হিবোমী ইয়ানু তাদের ধর্মমতের প্রতিনিধিত্ব করেন সম্মেলনে। মাদ্রিদের আন্তঃধর্ম সংলাপ-সম্মেলনের উদ্যোক্তা সৌদি আরবের বাদশাহ, মানে মুসলমানরা। সেই হিসাবে সম্মেলনে মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। গোটা দুনিয়া থেকে এসেছিলেন মুসলিম প্রতিনিধিরা। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে এসেছিলেন ল্যাটিন আমেরিকার 'অর্গানাইজেশন অব দি ইসলামিক ফেইথ'-এর জেনারেল সেক্রেটারি মুহাম্মদ ইউসুফ হাল্লার। স্পেন থেকে এসেছিলেন তিনজন। তাদের মধ্যে রয়েছেন মাদ্রিস ইসলামিক সেন্টারের ডাইরেক্টর ড. ইব্রাহিম আব্দুল আজিজ আল-জায়েদ এবং মালাগা ইসলামিক সেন্টারের ডাইরেক্টর ড. সালেহ মোহাম্মদ আল-সেনেডি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেসন্সের নিহাদ আওয়াদ হামাদ, ওয়াশিংটন ডিসি'র 'সেন্টার ফর ফেইথ ইন পাবলিক পলিসি' ড. নাজির খাজা, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা' এর সাঈদ এম সাঈদ প্রমুখসহ কয়েকজন। দু'জন এসেছিলেন জার্মানী থেকে। তারা ড. আইয়ুব এ্যাকসেল কোহলোর এবং ড. নাদিম ইলিয়াস। দু'জনেই 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব মুসলিমস ইন জার্মানী'-এর নেতা। ডেনমার্ক থেকে এসেছিলেন ইসলামিক কাউন্সিল ডেনমার্কের আব্দুল ওয়াহিদ পেডারসন। বৃটেন থেকে এসেছিলেন চার পাঁচজন মুসলিম প্রতিনিধি। সম্মেলনে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিলো প্রায় ৮০ জনের মতো। এদের অধিকাংশই এসেছিলেন মুসলিম দেশগুলো থেকে। এদের মধ্যে ছিলেন, মুসলিম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের সেক্রেটারি জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ আল-তুর্কি, সৌদি শূরা কাউন্সিলের ড. সালেহ আব্দুল্লাহ বিন হামিদ, ড. আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফসহ মুসলিম বিশ্বের ইসলাম-বিশেষজ্ঞ ও ইসলামী চিন্তাবিদরা।

ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন ডায়ালগ-এর উদ্বোধনী অধিবেশন বসে কনফারেন্সের প্রথম দিন ১৬ই জুলাইয়ের বেলা দুইটায়। কনফারেন্সের ভেন্যু ছিল মাদ্রিদের' হোটেল অডিটোরিয়াম। হোটেলটি যেমন বিশাল, তেমনি তার লাউঞ্জগুলো এবং হলগুলোও বড় বড়। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্যে উপযুক্ত জায়গা। কিন্তু উদ্বোধনী অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের উপকণ্ঠে স্পেনের 'এলপারদো' প্যালেসে। উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরবের বাদশাহ এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তা

www.pathagar.com

বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ, স্পেনের রাজা জোয়ান কার্লোস, মুসলিম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের ড. আব্দুল্লাহ আল তুর্কি এবং স্পেনের প্রধানমন্ত্রী জোস লুইস রডরিগেজ জাপাটেরো। এছাড়াও ছিলেন বৃটিশ সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার নেতা এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেসি জ্যাকসন। সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে বাদশাহ আব্দুল্লাহ ছোট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দেন; যা বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের পক্ষ থেকে একটা ঐতিহাসিক একটা মেসেজ। তিনি বিসমিল্লাহ পাঠ করার পর পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত পাঠ এবং মহানবী (সাঃ) ও নবীদের প্রতি সালাম প্রেরণের মাধ্যমে তার বক্তৃতা শুরু করেন। আয়াতটি হলো : "হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজোড়া নারী-পুরুষ থেকে এবং তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে-অপরের সাথে পরিচিত হও। শোন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই বেশি সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ।" আয়াতটি তেলাওয়াতের পর তিনি বলেন, 'শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সকল নবী-রাসূলদের উপর।' তিনি বক্তৃতায় বলেন :

"আমার দাওয়াতে আপনারা সাড়া দিয়েছেন, সে জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং অভিনন্দিত করছি। আপনারা মানবতার সেবায় যা করছেন তাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি। আমি স্পেনের রাজা জোয়ান কার্লোস ও তার জনগণকে এই সম্মেলনের আয়োজনকে তাদের দেশে স্বাগত জানানোর জন্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্পেনের এই গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্য রয়েছে যে, খৃস্টান, মুসলমান, ইহুদী ও অন্যান্য ধর্মের লোক এখানে সহাবস্থান ও শান্তির মধ্যদিয়ে বাস করেছে এবং মানবতার অগ্রগতিতে অপরিসীম অবদান রেখেছে।

দুই পবিত্র মসজিদের দেশ এবং প্রতিটি মুসলমানের প্রিয়তম জায়গা থেকে সদ্য সমাপ্ত মক্কা সম্মেলনের স্কলারস ও থিঙ্কারসসহ ইসলামী বিশ্ব (উম্মাহ)-এর পক্ষে মেসেজ নিয়ে এসেছি আমি। এই মেসেজের ঘোষণা এই যে, ইসলাম সহনশীলতা ও মধ্যমপন্থার ধর্ম। এই মেসেজ সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপের আহ্বান জানায় এবং আল্লাহ চাহে 'সংঘাতের বদলে সংহতি'র এক নতুন পৃষ্ঠার উন্মোচন এই মেসেজের প্রতিশ্রুতি।

আমরা এক আল্লায় বিশ্বাসী। তিনি মানবতার ইহজাগতিক ও পরজাগতিক কল্যাণের জন্যে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর। মানুষ বিভিন্ন বিশ্বাস ও জাতিতে বিভক্ত থাকবে, এটা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি অন্যরকম চাইতেন, তাহলে গোটা মানবজাতি একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো। আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এটাই নিশ্চিত করতে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের যে সুখ চেয়েছেন তা ধর্মই এনে দিতে পারে। সুতরাং মানুষের সুখ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ধর্মই নিশ্চিত মাধ্যম হওয়া উচিত।

সুতরাং এটা আমাদের দায়িত্ব একথা বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করা যে, মতদ্বৈততা যেন সংঘাত-সংঘর্ষের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে না যায়, একথাও বিশ্বকে বলা যে, মানব ইতিহাসে যেসব বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটেছে, তার জন্যে ধর্মের উপর দোষ চাপানো ঠিক নয়। এর জন্যে দায়ী চরম পন্থা, যা প্রতিটি ঈশ্বরিক ধর্ম ও প্রতিটি রাজনৈতিক মতবাদের কিছু অনুসারীর উপর বর্তায়।

www.pathagar.com

মানবতা আজ মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আদর্শিক বিভ্রান্তিতে ভুগছে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষ সংকটজনক পর্যায় আজ অতিক্রম করছে। মানুষ আজ দেখছে অপরাধের মারাত্মক বিস্তৃতি, সন্ত্রাসের বিস্তার, পরিবার ব্যবস্থার খণ্ড-বিখণ্ড দশা, মাদকজনিত কারণে যুবমনের বিকৃতি এবং সবলের দ্বারা দুর্বলের শোষণ ও অবাঞ্ছিত বর্ণবাদ প্রবণতা। এ সবই মানুষের আধ্যাত্মিক বিচ্যুতির ফল। এই বিচ্যুতি ঘটে যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। আর মানুষ আল্লাহকে ভুলে গেলে মানুষ নিজেদেরকেও ভুলে যেতে বাধ্য হয়। সংলাপের মাধ্যমে ধর্ম ও সভ্যতাসমূহের মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ছাড়া মানবতার এই সংকটের কোন সমাধান নেই।

আগের অধিকাংশ সংলাপ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অস্থিরতা অবসানের বদলে বিতর্ক বাড়ানো এবং বিভেদ উস্কে দেয়ার অর্থহীন পদক্ষেপ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অথবা অনেক ক্ষেত্রে তা ধর্মগুলোকে ঘনিষ্ঠ করতে গিয়ে ধর্ম ও আদর্শের বিরোধটাকেই মুখ্য করে তুলেছে। এ ধরনের প্রচেষ্টা আসলেই অর্থহীন। কারণ প্রত্যেক অনুসারীই তার ধর্মকে সত্য বলে মনে করে এবং বিকল্প কিছু গ্রহণ করতে সাধারণভাবে রাজি হয় না। আমরা যদি এই ঐতিহাসিক সম্মেলনকে সফল করতে চাই, তাহলে স্রষ্টার উপর গভীর বিশ্বাস, মহৎ নীতি-নিয়ম এবং নৈতিক মূল্যবোধের মত সব ধর্মের মূল বিষয়গুলোর উপর জোর দিতে হবে, যা আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

এই গ্রহ এবং এই গ্রহের সবকিছু ধ্বংসের নিমিত্ত মানুষ হতে পারে। আবার মানুষই এই পৃথিবীকে শান্তি ও স্বস্তির মরুদ্যানে পরিণত করতে পারে, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, আদর্শ ও দর্শনের অনুসারীরা সহাবস্থান করতে পারবে, যেখানে মানুষ একে অপরকে সসম্মানে সহযোগিতা করবে এবং সন্ত্রাসের বদলে সংলাপের মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর দয়ায় মানুষ আরও সক্ষম ভালোবাসার দ্বারা ঘৃণার এবং সহনশীলতার মাধ্যমে গোঁড়ামীর অবসান ঘটাতে যা মানুষকে সেই মর্যাদায় সমাসীন করবে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের দান করছেন।

আসুন আমাদের সংলাপ অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাসকে, পাপের উপর পুণ্যকে বৈষম্যের উপর সুবিচারকে, যুদ্ধ ও সংঘাতের উপর শান্তিকে এবং বর্ণবাদের উপর ভ্রাতৃত্বকে বিজয়ী করতে সফল হোক।

আমি আল্লাহর নামে কথা শুরু করেছিলাম, তারই কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে আমি কথা শেষ করছি। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।"

বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজের উদ্বোধনী বক্তব্যের পুরোটাই আমি এখানে তুলে ধরলাম এই কারণে যে, এই বক্তব্যে শুধু সম্মেলন নয়, আমাদের সমসাময়িক পৃথিবীর জন্যে একটা সুস্পষ্ট মেসেজ আছে ইসলামের পক্ষ থেকে। বাদশাহ আব্দুল্লাহ সম্মেলনে নিজেকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মার পক্ষ থেকেই নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন। সুতরাং তাঁর কথাগুলো সত্যিই এক ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। তাঁর বক্তব্যের কয়েকটি দিক ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা-পীড়িত আজকের বিশ্বের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন :

(ক) শুরুতেই সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের তিন শতাধিক নেতার সামনে এবং বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফের যে আয়াতে কারিমা তিনি পাঠ করেছেন, তা প্রমাণ করে

www.pathagar.com

কুরআন এবং মুসলমানরা অন্যান্য ধর্ম ও জাতির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নয়, তাই সহাবস্থানেরও বিরোধী নয়।

(খ) দুনিয়া জুড়ে আজ প্রপাগান্ডা চালানো হচ্ছে, ধর্মই যুদ্ধ-সংঘাতের উৎস। যুদ্ধ-সংঘাত সব ধর্মের কারণেই সংঘটিত হয়েছে। বাদশাহ এই অপপ্রচার প্রত্যাখ্যান করে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, যুদ্ধ-সংঘাতের ধর্মের উপর চাপানো যায় না। বিভিন্ন ধর্মসহ দুনিয়ার ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের চরমপন্থী কিছু লোকের কারণেই যুদ্ধ-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে।

(গ) দুনিয়ার মানুষ আজ বিভিন্ন অপরাধের বিস্তারসহ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত। মানুষ আজ তার মানবিক মর্যাদা ভুলে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের আত্মহনন করছে। বাদশাহ আব্দুল্লাহ মানুষের এই অবস্থাকে স্রষ্টাকে ভুলে যাবার ফল বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, স্রষ্টাকে ভুলে গেলে মানুষ নিজের পরিচয়-মর্যাদাকেও ভুলে যায় এবং তারই ফলে সীমাহীন সব অপরাধ ও সংকটে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

(ঘ) সংলাপ ব্যাপারে বাদশাহ আব্দুল্লাহ সহমর্মীতা ও সহযোগিতার পথ হিসাবে একটা মৌলিক বিষয়ের দিকে সকলকে আহ্বান করেছেন। তিনি বলেছেন, অতীতে ব্যর্থতা এড়াতে হলে প্রথমেই বিরোধ নিরসনের আলোচনায় না গিয়ে বিভিন্ন ধর্মের ঐকমত্যের দিক যেমন স্রষ্টায় গভীর বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতার প্রতি নিষ্ঠা এবং আদর্শিক মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

আজকের করণীয় বিষয় সম্পর্কে বাদশাহ আব্দুল্লাহ তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে আরও অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। তবে উপরোক্ত কয়েকটি বিষয় আজকের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে তিনি বাদশাহ আব্দুল্লাহকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মার পক্ষ থেকে এই সত্যগুলো বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার তৌফিক দিয়েছেন। (চলবে)

বাদশাহ আবদুল্লাহ তার উদ্বোধনী ভাষণে যে কথাগুলো বলেছেন, উদ্বোধনী অধিবেশনের অন্যান্য বক্তার কণ্ঠেও তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। স্পেনের রাজা জোয়ান কার্লোস বলেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, সংলাপ ও সহযোগিতা জোরদার করতে আমরা সব সময়ই আগ্রহী। আশার আশা, মাদ্রিদ সম্মেলন সফল হবে।" সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেন, "বাদশাহ আবদুল্লাহর উদ্যোগে পৃথিবীর সব ধর্মের ধর্ম নেতাদের অংগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন সত্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার নেতা এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেসি জ্যাকসন বলেন, "এটা খুব বড় একটা পদক্ষেপ। বাদশাহ আবদুল্লাহ তার নৈতিক শক্তি ও অধিকার বলে এ সম্মেলন আহ্বান করেছেন, যা সকলের জন্যে কাজ করার একটা কমন গ্রাউন্ড। এটা একটা খুব বড় ঘটনা।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর সম্মেলনের ওয়ার্কিং সেশন শুরু হয়। ওয়ার্কিং সেশন ছিল চারটি। সম্মেলনের বিষয়গুলোকে চারটি সেশনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। সম্মেলনের বিষয়গুলো ছিল ঃ

(ক) বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় সংলাপ

(খ) মানব সমাজের জন্যে সংলাপের গুরুত্ব

www.pathagar.com

(গ) সংলাপের ক্ষেত্রে সাধারণ মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব

(ঘ) সংলাপের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি

(ঙ) সহাবস্থান ও সংলাপ-সংস্কৃতির বিকাশ-বিস্তার

সম্মেলনের উপরোক্ত মূল বিষয়কে চারটি ওয়ার্কিং সেশনের আলোচনায় বিভিন্ন শিরোনামে নিয়ে আসা হয়। প্রথম ওয়ার্কিং সেশনের শিরোনাম ছিল, 'সংলাপের ধর্মীয় ও সভ্যতাগত ভিত্তি (ঊধটফমথলণ ধ্র্র রণফধথধমভ্র টভঢ ডধশধফধড়র্টধমভ তমলভ-ঢর্টধমভ)'। দ্বিতীয় ওয়ার্কিং সেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'মানব সমাজে সংলাপের গুরুত্ব (Dialogue : its importance in Human society)'। 'সংলাপের সাধারণ মানবিক দিক' ছিল তৃতীয় ওয়ার্কিং সেশনের বিষয়। চতুর্থ সেশনে আলোচনা করা হয় 'সংলাপের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি' শীর্ষক বিষয়ের ওপর। আর ৫ম সেশনের বিষয় ছিল 'সহাবস্থান ও সংলাপ-সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার।' সমাপ্তি অধিবেশনে মাদ্রিদ সম্মেলনের ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। এই ঘোষণা ছিল তিন দিনের মাদ্রিদ সম্মেলনের একটা রেজাল্ট। ঘোষণা হিসাবে এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক দলিল।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনটি শুরু হয় ১৬ই জুলাই সন্ধ্যা ৭টা তিরিশ মিনিটে। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাদের জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ওয়ার্ল্ড পিস সামিট-এর সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ বাবা জেইন। বিভিন্ন ধর্মে সংলাপের অবস্থার উপর সম্মেলনে চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। 'ইসলামে সংলাপ'— এই বিষয়ের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন ডঃ হোসাইন হামিদ হাসান। তিনি বলেন, " ইসলামের অনুসারী হিসাবে মুসলমানরা অমুসলিমদেরকে মানব প্রজাতি ও তার উদ্ভবের দিক থেকে সমান দৃষ্টিতে দেখে থাকে। মহত্ত্ব ও নিরপেক্ষতা সুবিচারের ভিত্তি এবং কুরআনের নির্দেশ অনুসারে মুসলমানরা এই সুবিচারের অনুসারী। মুসলমানরা শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এবং কখনই সংঘাত শুরু করে না। মুসলিম দেশগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার যে শুধু সদস্য তাই নয়, এই মানবাধিকার ঘোষণার সাথে ইসলাম মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকেও যুক্ত করে।" পোপ দ্বিতীয় সেনুডা—এর উপদেষ্টা এবং মিসরের হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের খৃস্টান নেতা নাজিব জিব্রাইল 'খৃস্টধর্মে ডায়ালগ' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "আমাদেরকে সংঘাত এড়িয়ে, অন্যের উপর বিশ্বাস চাপিয়ে দেবার বদলে কমন প্ল্যাটফরমের সন্ধান করতে হবে। পরার্থে কাজ, সহযোগিতা, অভাবীদের সাহায্য করা ইত্যাদি প্রত্যেক ও প্রতিটি ধর্মের লক্ষ্য। এগুলো আমাদেরকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ করে। আর সংলাপের লক্ষ্য আমাদের জন্যে একটা সাধারণ ভিত্তি তৈরি করা যা আমাদেরকে ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করবে। যাতে আমরা একে অপরের আয়না হতে পারি। আমরা বিভিন্ন পন্থায় একই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হিসাবে ধর্মকে দেখবো। আমাদের মত-পার্থক্য আসলে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ। আমাদেরকে অবশ্যই পথ বের করতে হবে যা আমাদের শিক্ষা দেবে কি করে একই কথা বিভিন্ন পন্থায় বলা যায়। মিসরে আমরা খৃস্টানরা মুসলিম ভাইদের সাথে সুখে-শান্তিতে বাস করছি। এক সঙ্গে চলার এ এক দৃষ্টান্ত। যখন নেতিবাচকতা ও হতাশার উদ্ভব ঘটানো হয়, তখন ধর্মের উগ্র ব্যবহার হতে পারে। এটা যাতে না হয় এ জন্যে সংলাপ ও সম্পর্ক খুবই জরুরি। এই বিষয়টির দিকে চোখ রাখার জন্যে ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের অধীনে একটা 'হিউম্যান রাইটস

www.pathagar.com

সেন্টার' প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।" প্রথম অধিবেশনে এরপর 'ডায়ালগ ইন জুদাইজম' (ইহুদী ধর্মে সংলাপ) বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ইহুদী নেতা 'আপীল কনসাইন্স ফাউন্ডেশনের' প্রতিষ্ঠাতা রাব্বি আর্থার স্নেইডার। তিনি বলেন, "মাদ্রিদের এই আন্তঃধর্ম সংলাপ-সম্মেলন অতীতের সব ধর্মীয় সংলাপ থেকে আলাদা একটি বিশেষ কারণে। সেটা হলো, হিজ ম্যাজেস্টি কিং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ তার ব্যক্তিগত উপস্থিতি দ্বারা এই সম্মেলনকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর প্রভাব সম্মেলনকে অধিকতর কার্যকরী রূপ দিয়েছে।" ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "ঈশ্বরের সব সন্তানের প্রতি ভালোবাসা'- এটা ইহুদী নীতিবোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অস্থির এক সময়ের মধ্যে বাস করছি যা এক ভুল বুঝাবুঝি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে এই ব্যবধান দূর করা যায়? এক বাক্যে আমরা সভ্যতার দ্বন্দ্ব (Clash of civilization) তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এই ব্যবধান দূর করতে পারি। এন্টি সেমেটিজম ও ইসলাম-ফোবিয়া একটা ঝড়। আরব-ইসরাইল সংঘাতের অবসান ঘটাতে হলে পরস্পরের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি প্রয়োজন।" তিনি সিনাগগ ধ্বংসের পরবর্তী তাঁর তিক্ত দিনগুলোর কথা স্মরণ করে বলেন, "২০০১ সালে জাতিসংঘ সর্বসম্মতভাবে ধর্মীয় স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধানের বিষয়কে অনুমোদন করেছে। ধর্মীয় সংস্থা-সংগঠনকে মানবাধিকার রক্ষায় সামনের সারিতে থাকতে হবে।"

প্রথম অধিবেশনে আরও বক্তব্য রাখেন ভারতের 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর ডায়ালগ'-এর চেয়ারম্যান ড. এমএম ভারমা। 'হিন্দু, বৌদ্ধ, শিনটো, কনফুসিয়ানসহ ওরিয়েন্টাল ধর্মসমূহে ডায়ালগ' বিষয়ে তিনি বক্তব্য পেশ করেন। ড. ভারমা তার বক্তব্যের শুরুতেই সহাবস্থানের মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "সবার কথা শোনা একটা ভালো কালচার।" তিনি ধর্মসমূহের সাজুয্যপূর্ণ দিকের প্রতি জোর দেয়ার বিষয় সামনে এনে বলেন, কোন ধর্মই অন্য ধর্মের সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ, শিক্ষা-সংস্কৃতির দাবিই হলো মৌলিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি স্বীকৃতি যার মধ্যে রয়েছে সহনশীলতা, সম্মান ও সংলাপের মতো বিষয়। হিন্দু নেতা ড. ভারমা বলেন, "এক স্রষ্টায় বিশ্বাসের বিষয় ছাড়াও ধর্মসমূহের মধ্যে সাজুয্যপূর্ণ বিষয় অনেক আছে। ধর্মসমূহ আধ্যাত্মিকতার উজ্জীবন ছাড়াও সুস্বাস্থ্যপূর্ণ ও সামাজিক পরিবেশ গঠনের জন্যে কাজ করে।" তিনি বলেন, "সংলাপের ভিত্তি সমতার শিক্ষা। কারণ পয়গম্বর বলেছেন যে, 'ইহুদীরাও মুসলমান।" তিনি উল্লেখ করেন, "পয়গম্বর, বার্তা বাহকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, ইহুদী সকলেই তাদের ঈশ্বর-স্তুতির মাধ্যমে ভক্তিরই উত্থান ঘটায়।" উপসংহারে তিনি বলেন, "সংলাপের প্রতিটি উদ্যোগই নতুন যাত্রা। শান্তি ও মূল্যবোধের উজ্জীবন দ্বারা বিশ্বকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।" প্রথম অধিবেশনের চেয়ারম্যান ড. বাবা জেইন তার সভাপতির মন্তব্যে বলেন, "সম্মেলনের এই বড় ঘটনা সৌদি আরবের চমৎকার একটি অবদান।" তিনি বলেন, "পৃথিবীর সব সমাজই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়- এই তিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক নেতারা ধর্মীয় নেতাদের সমর্থন চান, কারণ এদের উপর আছে জনগণের সমর্থন।" ড. জেইন বলেন, সংলাপ এবং মনোযোগ সহকারে ও সক্রিয়ভাবে অন্যের কথা শোনা খুবই জরুরি। অন্যকে অনুধাবন করা ও জ্ঞানার্জন এই অভ্যাসের মাধ্যমেই সম্ভব।"

www.pathagar.com

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ১৭ই জুলাই বেলা দশটায় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় সৌদি আরবের 'শুরা কাউন্সিল'-এর প্রেসিডেন্ট ড. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদের সভাপতিত্বে। এ অধিবেশনের আলোচনার বিষয় ছিল: মানব সমাজের জন্যে সংলাপের গুরুত্ব (The Importance of Dialogue in Human society)। অধিবেশনের এই মূল বিষয়কে চারটি শিরোনামে ভাগ করা হয় এবং চারজন উপস্থাপক চার বিষয়ে তাদের বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তব্যের চার বিষয়ের উপর আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। এই দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রথম বক্তব্য রাখেন 'World Parliamentary Council for Religion and Peace'-এর জাপান কমিটির প্রেসিডেন্ট মিঃ Nichico Niwano (নিচিকো নিউওয়ানো)। 'ডায়ালগ এন্ড ইন্টার‍্যাকশন অব সিভিলাইজেশনস এন্ড কালচারস (Dialogue and Interaction of civilization and cultures) বিষয়ের উপর তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সংঘাত মোকাবিলার ক্ষেত্রে ডায়ালগের কোন বিকল্প নেই। তিনি উল্লেখ করেন, "আমরা সব মানুষরা পৃথিবী নামক এক তরীতে সফর করছি। আবহাওয়ার পরিবর্তন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দুই-ই আমাদের গ্রহকে আহত করে এবং এই দুই আঘাতকে আলাদা করে দেখার অবকাশ নেই। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নিচিকো নিউওয়ানো বলেন, "সম্প্রতি আমাদের (জাপানের) প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, 'পৃথিবীর সমস্যা কোন একক দেশ একা মোকাবিলা করার সামর্থ্য রাখে না।' ইন্ডিভিজুয়াল এই অক্ষমতা প্রমাণ করে জনগণ অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপ অপরিহার্য।" অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন রয়্যাল মরক্কান একাডেমি'র মেম্বার ড. আবদেল হাদী আল-তাজী। তার উপস্থাপনার বিষয় ছিল : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংলাপের গুরুত্ব (The impact of Dialogue on International Relations). তিনি বলেন, "আল-কুরআন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত সংলাপ সম্পর্কে বলেছে। আমাদের পূর্বসূরিরা ছিলেন আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান। তারা সংলাপের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতেন। ডায়ালগ আমাদের হাতের এমন একটা সম্পদ যার ব্যবহার আমরা এখনও করিনি।"

ড. আবদেল আল তাজী অতীতের আন্তঃধর্ম সহযোগিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, "দশম শতাব্দীতে স্পেনের রাজা আল-ফনসোর শাসনকালে তিনি তার সন্তান সানসোর আকস্মিক বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। রাজা আল-ফনসো মরক্কোর সুলতান আল-ইউসুফের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই সুলতান ইউসুফ একদল সৈন্যকে স্পেনে পাঠান এবং স্পেন-রাজার কর্তৃত্ব স্পেনে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।" ড. আল-তাজী আরেকটি দৃষ্টান্তে সুলতান জলিল ও স্পেনের রাজা জোয়ান দ্বিতীয়-এর বন্ধুত্বের কথা তুলে ধরে একে পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক হিসেবে উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের তৃতীয় উপস্থাপক ফিলিপাইনের কংগ্রেসম্যান ও পার্লামেন্টের সাবেক প্রেসিডেন্ট Pr. Jose De Venecia 'নৈতিকতাবোধের উন্নয়নে ডায়ালগের গুরুত্ব' (The Impact of Dialogue in the Promotion of Ethics) বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "বিশ্বে নৈতিকতার উজ্জীবন ছাড়া বিশ্ব-ব্যবস্থা টেকসই হতে পারে না।" ড. জোস ভানেসিয়া সমঝোতায় পৌঁছার ক্ষেত্রে দুই প্রধান নীতি বোধকে অপরিহার্য হিসেবে তুলে ধরেন। সে দু'টি নীতিবোধ হলো, 'তুমি যে ধরনের ব্যবহার চাও, সে ধরনের ব্যবহার তুমি অন্যের সাথে কর' এবং 'আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান।' তিনি মন্তব্য করেন, "বিশ্ব-

www.pathagar.com

নৈতিকতা কিন্তু বিশ্বাসের বিকল্প নয়।" তিনি বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিকে আমাদের বর্তমান জীবনের অস্থিরতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "ধর্ম আমাদের প্রয়োজন এবং প্রয়োজন ধর্ম ও নৈতিকতাভিত্তিক শক্তিশালী মূল্যবোধ।" ফিলিপাইনের কংগ্রেসম্যান তার বক্তব্যে জাতিসংঘের অধীনে 'ইন্টার-ফেইথ কাউন্সিল' গঠনের এবং সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ এবং স্পেনের রাজা জোয়ান প্রথম কার্লোসকে নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। এ অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ইসলামিক স্টাডিজ'-এর প্রেসিডেন্ট ড. রিজওয়ান নায়েফ আল-সাঈদ। 'Dialogue in the face of advocacy of clash of civilization ('সভ্যতার-সংঘাত' শীর্ষক প্রপাগান্ডার প্রেক্ষাপটে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা) বিষয়ের উপর তিনি বক্তব্য রাখেন। তিনি 'সংঘাত' ও 'এন্ড অব হিস্ট্রি' শীর্ষক শ্লোগানের মোকাবিলায় ডায়ালগকে প্রতিবিধান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "ডায়ালগ বা সংলাপে একমুখীতা তখনই আসবে, যখন বিভিন্ন মতের মানুষ ও ধর্মসমূহের মধ্যেকার সাধারণ সাজুয্যের দিকটা সংলাপের বিষয় হয়ে উঠবে।" তিনি বলেন, "অধিকাংশ মুসলমান সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের বিরোধিতা করেছে। মুসলমানরা আজকের দুনিয়ার একমাত্রিক নীতির প্রধান শিকারে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ যুদ্ধ-সংঘাত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু কারণটা ধর্মীয় নয় বরং স্ট্র্যাটেজিক ও রাজনৈতিক। এটা প্রমাণ হয়েছে যে, ধ্বংসাত্মক সব তত্ত্ব সামনে আনা হয়েছে কাল্পনিক শত্রুকে লক্ষ্য করে, যাতে যুদ্ধকে যৌক্তিক করা যায়। এখন সমস্যা হলো এ থেকে উত্তরণ কিভাবে। এর উত্তর সংলাপে নিহিত। মাত্র সংলাপের দ্বারাই ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির একমাত্রিক পলিসির আমরা অবসান ঘটাতে পারি।"

দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয় ১২টায়। আধা ঘণ্টা বিরতির পর সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় 'সংলাপ মানবতার সাধারণ সম্পদ' বিষয়ের উপর। এই অধিবেশনে বলা হয়, সংলাপের মাধ্যমে মানুষের সাধারণ মূল্যবোধের উজ্জীবন সম্ভব। এ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ভারতের 'সনাতন ধরম এসোসিয়েশনের নেতা শংকরাচার্য ওঙ্কার আনন্দ স্বরস্বতি, 'কাউন্সিল ফর আমেরিকান ইসলামিক বিলেশন্স'-এর ডাইরেক্টর ড. নিহাদ আওয়াদ হামাদ, 'ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর দি রিঅ্যাপ্রোসমেন্ট বিটউইন ইসলামিক স্কুলস অব থট'-এর জেনারেল সেক্রেটারী ইরানের শেখ মোহাম্মদ আলী তাশখেরী এবং ভ্যাটিক্যানের 'পনটিফিসিয়াল ফর এরাবিক স্টাডিজ'-এর বেক্টর মিগেল এ্যাঞ্জেল আয়ুসু গুক্জট। ভারতের সনাতন ধর্মের নেতা শংকরাচার্য ওঙ্কার আনন্দ 'Religion and family and their role in social stability' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'এই সম্মেলনের মত বড় ঘটনা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের পক্ষ থেকে শান্তির আহ্বান।' এই বিষয়টিকে সামনে এনে তিনি বলেন, "ধর্মই আমাদের মধ্যে অহিংস মনোভাবের সৃষ্টি করে। আমাদের এটা শিক্ষা দিতে হবে যে, আমরা সব মানুষরা সবাই সমান। শংকরাচার্যের মতে, যে কেউ কিছু লোকের আদর্শ হতে পারে। তবে সমাজের আসল ভিত্তি হলো নারীরা। একইভাবে পরিবার হলো সহাবস্থানের মূর্তিমান নমুনা।' এ অধিবেশনে 'আধুনিক মানব-সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতা' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন 'কাউন্সিল ফর আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন্স'-এর ডাইরেক্টর ড. নিহাদ আওয়াদ হামাদ। তিনি বলেন, "আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সাথে যা সংশ্লিষ্ট এমন নৈতিক বিধি তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু নৈতিকতার সংজ্ঞায়ন খুব সহজ নয়।

www.pathagar.com

নীতি ও নৈতিকতার সরল অর্থ হলো- নীতি-নৈতিকতা আপনাকে বলে, তুমি তাই কর যা তুমি চাও অন্যেরা তোমার জন্যে করুক।" ইরানের শেখ মোহাম্মদ আলী আল-তাশখেরী 'অপরাধ প্রতিরোধে ধর্ম ও মূল্যবোধের গুরুত্ব' বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, "নিরীশ্বরবাদিতা হলো বিশ্বাসের অভাব। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া মানুষের প্রাকৃতিক অভ্যাস, কিন্তু ভিত্তি হিসেবে কিছু মূল্যবোধের প্রতি আমাদের বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। ভ্যাটিক্যানের 'পনটিফিসিয়াল ইনস্টিটিউটের এরাবিক স্টাডিজ-এর বেষ্টর মিগেল অ্যাঞ্জেল আয়ুসু গুক্‌জট পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণের প্রশ্নে মানব সমাজ-রক্ষার চেষ্টার সাথে সাথে প্রতিবেশ-পরিবেশ রক্ষার উপর জোর দেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের শেষ অধিবেশন হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ অধিবেশন। শুরু হয় রাত সাড়ে ৭টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও আর্জেন্টিনা অঞ্চলের জুইস কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি রাবিব ক্লাউডিও ইপেলম্যান। এ অধিবেশনের বিষয় ছিল 'ডায়ালগ-এর অগ্রগতি ও মূল্যায়ন' (Evaluation and Promotion of the dialogue)। ইউনাইটেড আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের কালচারাল এ্যাফেয়ার্সের কাউন্সিলর ড. ইজ্জেলদীন ইবরাহিম মোস্তফা 'ইসলাম, খৃস্ট ও ইহুদী ধর্মের সংলাপে নতুন দিগন্ত' (The Dialogue between Islam, Christianity and Judaisn : future and Horizons) বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি ৪০ বছর বিভিন্ন আন্তঃধর্ম সংলাপে যোগ দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'প্রথম পর্যায়ের অতি আশাবাদের পর সন্দেহ-প্রবণতার পর্যায় আসে, যা আলোচনাকে হতাশার দিকে নিয়ে যায়। এই অতীত সত্ত্বেও আমি আজ আশাবাদী যে রোম, বৈরুত ও মক্কা এই তিন নগরী আজ নতুন উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দু।' অধিবেশনের অন্য বক্তা চীনের বুদ্ধিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর জু চেং বক্তব্য রাখেন 'প্রাচ্য দেশীয় ধর্ম বিশ্বাসের সংলাপের নতুন দিগন্ত (The Dialogue with Oriental beliefs : future and horizons) শীর্ষক বিষয়ের উপর। তিনি বলেন, 'সকল ধর্মের মধ্যেকার সাদৃশ্যপূর্ণ মূল্যবোধ সকলকে শান্তিতে বসবাস করতে শেখায়। আমরা যুদ্ধ, প্রতিবেশীক বিপর্যয়, অতি জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার মত যে সব বিপদ আমরা মোকাবিলা করি, তার বিরুদ্ধে বিশ্বভিত্তিক উদ্যোগ প্রয়োজন যার ভিত্তি হতে পারে আমাদের 'কমন গ্লোবাল ইথিকস'। অধিবেশনের তৃতীয় বক্তা 'জর্দানিয়ান সেন্টার ফর রিসার্চ অন ইন্টার ফেইথ কো-একজিস্‌টেন্স'-এর নির্বাহী ডাইরেক্টর ফাদার ইকোনোস নাবেল হাদ্দাদ 'ডায়ালগকে শক্তিশালি করা এবং বাধাসমূহ দূর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের চেষ্টা' (The efforts of States and International Organisation to Reinforce dialogue and overcoming obstacles) বিষয়ের উপর বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "সহনশীলতার মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুশীলন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কার্যকর সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যকে জানা সবচেয়ে বড় কথা। সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে এই জানাজানির বিস্তার সম্ভব।" এই ক্ষেত্রে ফাদার ইকোনো বর্তমান উন্নত গণ-মাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন। অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন, কালচার অব পীস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মি. ফেডেরিকো মেয়র জারাগোজা 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সংলাপ এবং এর প্রভাব' বিষয়ের উপর তার বক্তব্য পেশ করেন। মি. জারাগোজা ইউনেস্কোর সাবেক ডাইরেক্টর

www.pathagar.com

জেনারেল। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য পরস্পরকে বোঝা দরকার, পরস্পর পরস্পরকে জানা দরকার, দরকার পারস্পরিক সমঝোতা। এখন আমাদেরকে কথা বাদ দিয়ে বাস্তবতার দিকে ধাবিত হতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা একে অন্যের জ্ঞান শেয়ার করা ছাড়া বাঁচতেই পারি না। আমরা মার্কেট ল'র জন্য মানব প্রজাতির মূল্যবোধ পরিবর্তন করে মারাত্মক ভুল করেছি।" তিনি মন্তব্য করেন, "শুধু আন্তঃধর্ম ডায়ালগ যে প্রয়োজন তা-ই নয়, সমঝোতায় পৌঁছার জন্যে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেও ডায়ালগ দরকার। আমরা যদি সব মানুষকে সমান হিসাবে গ্রহণ করি, আমরা যদি অন্যকে ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে যে সব সমস্যায় ভুগছি, তার সমাধান হয়ে যাবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং গণমাধ্যমের অংগীকার দরকার।"

এদিন সব শেষে অধিবেশনের সভাপতি ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও আর্জেন্টিনার জুইস কংগ্রেসের ডাইরেক্টর রাবিব ক্লাউডিও ইপেলম্যান তার বক্তব্যে বলেন, "পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছার যে জ্ঞান, তার চেয়ে অনেক বড় সংলাপ। সংলাপ সম্পর্কের সৃষ্টি করে, বৃদ্ধি করে জানাজানি ও যোগাযোগ।" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর মাছ, পাখি, গাছ সৃষ্টি করেছেন নানা রকমের, কিন্তু তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন মাত্র একজনই যাতে 'মানুষরা পরস্পর ভাই হয়।"

সম্মেলনের শেষ দিন ১৮ই জুলাই সংক্ষিপ্ত আকারে ৫ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মিসরের 'ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ আহমদ কামাল আবুল মুগিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে 'সহাবস্থান ও ডায়ালগ-কালচারের সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের গুরুত্ব', 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে ডায়ালগের গুরুত্ব' এবং 'সহাবস্থান', 'শান্তি ও ডায়ালগ'- এই বিষয়সমূহের ওপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মিসরের কনসালটেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ডঃ নাবিল লুকা বিবাবী, বৃটেনের 'কো-এক্সিসটেন্স ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর ডঃ জেমস কিডনার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'খৃস্টান-মুসলিম ফর 'পিস'-এর প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম বেকার। ডঃ জেমস কিডনার একটা সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে তার দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করেন। তিনি বলেন, "জ্ঞান ও জানা-জানি থেকে সৃষ্টি হয় 'সম্মানবোধ' এবং এই সম্মানবোধ নিশ্চিতভাবেই একান্ত হৃদয়ের বিষয়। এটা আমাদের ধর্মসমূহ ও সংস্কৃতিরও অন্তরের বস্তু যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ দেখছি। এই সম্মেলনের জন্যে যারা চেষ্টা ও কষ্ট করেছেন, তারা মহৎ। এই সম্মেলন সম্মানের বৃহত্তর ক্ষেত্র তৈরির জন্যে একটা বড় পদক্ষেপ।"

সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন বসে ১৮ জুলাই বেলা ১২টায়। তিনদিন সম্মেলন শেষে প্রণীত ঘোষণা প্রকাশ করা ছিল এই অধিবেশনের মুখ্য বিষয়। ঘোষণা পাঠ করেন ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ আবদুল রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-জায়েদ। ঘোষণা প্রকাশের পর বক্তৃতা করেন অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে 'পনটিফিসিয়াল কাউন্সিল ফর ইন্টাররেলিজাস ডায়ালগ'-এর প্রেসিডেন্ট খৃস্টান নেতা কার্ডিনাল জেন লুইস পিয়েরী তুরাস। সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণ দেন মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ আবদুল্লাহ আল-তুর্কী। তিনি তার বক্তৃতায় স্পেনের রাজা জোয়ান কার্লোস প্রথম ও প্রধানমন্ত্রী জোস লুইস রড্রিগেজ জাপাতেরোকে সম্মেলন সফল করায় তাদের মূল্যবান সহযোগিতার জন্যে প্রশংসা করেন ও তাদের

www.pathagar.com

ধন্যবাদ জানান। তিনি ধন্যবাদ জানান বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দের যারা সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সম্মেলনকে সফল করেছেন। তিনি বলেন, "বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, তারা ভবিষ্যতে পূর্ণ সহযোগিতার সাথে কার্যকরী সব সংলাপে অংশ নেবেন। সকলের এই মনোভাব আজকের বিশ্ব যে সংকটে ভুগছে, তার অবসানে সাহায্য করবে এবং সভ্যতার-সংঘাত-স্লোগানের প্রতিবাদ হিসেবে কাজ করবে। এইভাবেই বিশ্বজনীন সুখ আমরা অর্জন করতে পারবো।"

সমাপ্তি অধিবেশনে তিন পৃষ্ঠার একটা নাতিদীর্ঘ ঘোষণা পাঠ করেন মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সহকারী সেক্রেটারি ডঃ আবদুল রহমান আল জায়েদ। ঘোষণা পত্র সম্মেলনের তিন দিনের আলোচনার সারাংশ নিয়েই তৈরি হয়েছে। এই আলোচনার মধ্যে ছিলো বিভিন্ন ধর্মের নেতা ও বিশেষজ্ঞদের দুই ডজনের মতো মূল্যবান উপস্থাপনা এবং এই উপস্থাপনার উপর ছিলো বহুজনের আলোচনা ও মন্তব্য।

তিন দিনের আলোচনার মূল বিষয় ছিলো দুইটি : মানবজীবনে ধর্মের অপরিহার্যতা এবং পৃথিবীর শান্তি ও সুস্থিতির জন্যে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা। নানাভাবেই বক্তা ও আলোচকরা এ কথা বলেছেন যে, পৃথিবীর আজকের সকল যুদ্ধ-সংঘাতের কারণ নৈতিকতার অভাব ও মূল্যবোধহীনতা। নৈতিকতার অভাব ও মূল্যবোধহীনতা মানব-মনে যে হিংসা-বিদ্বেষ এবং ভোগ-লিপ্সার জন্ম দিয়েছে, তারই বিস্ময় ফল যুদ্ধ-সংঘাত। ধর্মীয় নৈতিক বিধানাবলীর আন্তরিক অনুসরণ ও স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসাই শুধু পারে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সৃষ্টি করতে এবং মানুষের উপর আপাতত যুদ্ধ-সংঘাত বন্ধ করতে। এই লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবেই প্রয়োজন সংলাপের। বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেকার ভুল বুঝাবুঝি ও জানা-শোনার অভাবজনিত অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর মানুষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যুদ্ধ-সংঘাত বাধায়। সংলাপ ধর্মসমূহের মধ্যে জানা-শোনা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে কাছে আনতে পারে এবং এইভাবে স্বার্থবাজদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা যেতে পারে। সংলাপকে সম্মেলনে মানব-জাতির ঐক্যের একটি মাধ্যম হিসেবেও গ্রহণ করা হয়েছে এবং মানবজাতির ঐক্যকে সুন্দর পৃথিবী গঠন এবং মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছে। এদিক থেকে মাদ্রিদ সম্মেলনের মূল সুরকে আমরা তিনটি শিরোনামেও ভাগ করতে পারি : এক, ধর্মের অপরিহার্যতা, দুই, সংলাপের প্রয়োজনীয়তা এবং তিন, মানব-জাতির ঐক্য বিধান। বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজের উদ্বোধনী বক্তব্যেও আমরা এই তিনটি দিককেই প্রধান বিষয় হিসেবে দেখেছি। আর পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামও এই শিক্ষাই দেয়।

মাদ্রিদ ডিক্লারেশন বা মাদ্রিদ ঘোষণাতেও এই কথাগুলোই বলা হয়েছে। মাদ্রিদ ঘোষণার তিন পাতার ইংরেজি সংস্করণে শুরুতেই আট অনুচ্ছেদের একটি ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকায় সম্মেলনের পটভূমি, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সেন্টিমেন্ট, জাতিসংঘ সনদের সাথে সম্মেলনের বক্তব্যের সাজুয্যতা ইত্যাদি বিষয় সামনে আনা হয়েছে। তারপর ১০টি সর্বসম্মত নীতিগত ঘোষণা রয়েছে। এই নীতিগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ৫ দফা সুপারিশ বা লক্ষ্য প্রণয়ন করা হয়েছে। আর এই সুপারিশ বা লক্ষ্যের বাস্তবায়নের জন্যে ৫ দফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মাদ্রিদ ঘোষণার নীতিগত ঘোষণাগুলো এই :

(ক) মূল সৃষ্টিগতভাবেই মানবজাতি একটি একক এবং বর্ণ, জাত, সংস্কৃতি নির্বিশেষে মানুষ সকলেই সমান।

(খ) প্রকৃতিগতভাবে মানুষ ভালো। তাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভালোকে পছন্দ, খারাপকে অপছন্দ করা, সুবিচারের পক্ষ হওয়া ও অবিচারকে প্রত্যাখ্যান করার মতো প্রবণতা দিয়ে। মানুষের এই ভাল প্রকৃতি মানুষকে দয়া ও ধর্ম-বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে।

(গ) খোদায়ী বাণী বা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের লক্ষ মানুষকে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যশীল করা এবং মানুষের জন্য সুখ, সুবিচার, নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা। খোদায়ী এই বাণী চায় মানুষের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা এবং দূর করতে চায় জাত, বর্ণ, ভাষাগত বৈষম্য। এই বাণীরই উদ্দেশ্য জ্ঞান ও বিনয়ের মাধ্যমে সত্যের প্রচার এবং চরমপন্থা ও সন্ত্রাসের প্রত্যাখ্যান।

(ঘ) ঐশ্বরিক ধর্মসমূহকে সম্মান করা, তাদের মর্যাদা রক্ষা করা, সেগুলোর প্রতীকের অবমাননার প্রতিবাদ করা এবং জাতিগত বৈষম্যের প্ররোচক হিসাবে ধর্মের ব্যবহারকে প্রতিরোধ করা।

(ঙ) শান্তি রক্ষা করা, চুক্তি-সমঝোতাকে সম্মান করা এবং মানুষের অধিকার, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারকে মানুষের মধ্যে সুসম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা। এই লক্ষ্য অর্জন সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান লক্ষ্য।

(চ) সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিভাগ এবং মানুষ এসবের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়া স্রষ্টারই ইচ্ছা এবং মানুষের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির একটা মাধ্যম।

(ছ) অপরাধ, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং পরিবার ব্যবস্থা ও সমাজকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা এবং মানুষকে স্রষ্টামুখী করতে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা অপরিহার্য।

(জ) পরিবার সমাজের কেন্দ্রবিন্দু এবং মানব সমাজের মৌলিক একক। নিরাপদ ও স্থিতিশীল সমাজের জন্যে পরিবারকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা জরুরি।

(ঝ) সংলাপ মানব জীবনের একটা অপরিহার্য বিষয়। সংলাপ একে অপরকে জানা, সহযোগিতা, সত্যের উপলব্ধি, পারস্পরিক প্রয়োজনের বিনিময়ের জন্য অপরিহার্য।

(ঞ) পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অন্যান্য বিপদ ও দূষণ থেকে প্রতিবেশকে রক্ষা ধর্ম ও সংস্কৃতির একটা লক্ষ্য। মাদ্রিদ ঘোষণা এই নীতিগত ভিত্তির উপর ৫টি সুপারিশ বা উদ্দেশ্যকে দাঁড় করিয়েছে। সুপারিশ বা উদ্দেশ্যগুলো হলো :

(ক) সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও সংঘাত সৃষ্টির এই আহ্বানের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করা।

(খ) সাধারণ মানবিক মূল্যবোধকে বৃদ্ধি করা, সমাজে এর প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করা এবং একে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন সমস্যাবলির সমাধান করা।

(গ) সহনশীলতা-সংস্কৃতির বিস্তার এবং সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা সৃষ্টি করা যাতে সম্মেলন, সেমিনারসহ সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও গণমাধ্যম বিষয়ক প্রোগ্রামের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটা শক্ত অবকাঠামো গড়া সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

(ঘ) আদর্শিক নীতিমালা ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে ধর্ম ও সংস্কৃতিসমূহের অনুসারিরা সংলাপের একটা আন্তর্জাতিক গাইড লাইনের ব্যাপারে একমত হওয়া, যা বিশ্ব সমাজের স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালি করবে এবং সব মানুষের সমৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক হবে।

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর (এনজিও) প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য কাজ করা, যাতে তারা এমন একটা দলিল প্রণয়ন করে যা ধর্মসমূহ, তাদের প্রতীকের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করে, অসম্মান নিষিদ্ধ করে এবং যারা অসম্মান প্রদর্শনের মত কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়।

মাদ্রিদ ঘোষণার উপরোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নলিখিত ৫টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে :

(ক) সংলাপের বাধা হতে পারে এমন সমস্যা সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং সংলাপের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করার অন্তরায় হতে পারে এমন বিষয়সমূহ দূর করার পথ বের করতে একটি টিম গঠন। এই টিম সংলাপ সংক্রান্ত অন্যান্য বডির সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

(খ) আদর্শিক মূল্যবোধের উজ্জীবন, মহৎ সামাজিক কাজসমূহকে উৎসাহ দান এবং যৌন-বিপথগামিতা ও পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা ও এ ধরনের অন্যান্য অপরাধের প্রতিরোধ-লক্ষ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা বিষয়ক ও গণমাধ্যম সংক্রান্ত সংস্থা-সংগঠনের মধ্যে সহযোগিতা।

(গ) আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসংস্কৃতি মিটিং অনুষ্ঠান, গবেষণা পরিচালনা, গণমাধ্যম সংক্রান্ত কর্মসূচি তৈরি এবং শান্তি, সমঝোতা ও সহাবস্থান-অভ্যাসের বিস্তারের জন্য ইন্টারনেট ও অন্যান্য মাধ্যমের ব্যবহার।

(ঘ) গণমাধ্যম কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিষয়ক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ও যুবকদের মধ্যে ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি বিষয়ে সংলাপে সাহায্য-সহযোগিতা।

(ঙ) মাদ্রিদ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত-সুপারিশের প্রতি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সমর্থন দানের আবেদন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটা বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে এই সম্মেলনের সুপারিশ-সিদ্ধান্তসমূহকে গ্রহণকরতঃ আন্তঃধর্ম, আন্তঃসভ্যতা ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপকে অগ্রসর করানোর জন্য জোর আহ্বান। হারামাইন শরিফাইনের খাদেম বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজের প্রতি এ সম্মেলনের অনুরোধ তিনি যেন তার প্রভাব কাজে লাগিয়ে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট 'বডি'সমূহের সাথে যোগাযোগ করে এই অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করেন। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সদস্যের মাধ্যমে জাতিসংঘের সেই সম্মেলনে যোগ দিতে পারলে এই সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীগণ খুশী হবেন।

মক্কা সম্মেলনের ঘোষণার মত মাদ্রিদ সম্মেলনের ঘোষণাও ঐতিহাসিক। এই ঘোষণা পৃথিবীর সব ধর্মের, সব ধর্মীয় দর্শনের একটা সম্মিলিত আহ্বান। পৃথিবীর যুদ্ধ-সংঘাত, অশান্তি-অনাচার, বিপদ-বিপর্যয় সবকিছু মোকাবিলায় ধর্মের সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা, পৃথিবীর মানব-প্রজাতির ঐক্য-সংহতি, সহযোগিতা-সমঝোতার দুরূহ কাজ একমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই সম্ভব, এই বিষয়টি মাদ্রিদ সম্মেলন তার ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে উদাত্ত কণ্ঠে তুলে ধরেছে। এটা মাদ্রিদ সম্মেলনের ঐতিহাসিক সাফল্য।

www.pathagar.com

এমন সফল সম্মেলন অনুষ্ঠানে মাদ্রিদ সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীগণ সউদি আরবের বাদশাহ আব্দুল্লাহ এবং তার দেশ সউদি আরবের প্রতি অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। এর সাথে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তির ধর্ম ইসলামও অংশগ্রহণকারী ও বিশ্বমিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। একশ্রেণীর বৈরী মিডিয়া সউদি আরব ও সউদি আরবের বাদশাহ আব্দুল্লাহর আন্তরিকতার মধ্যে ছিদ্র খোঁজার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। বাদশাহ আব্দুল্লাহর অত্যন্ত বাস্তবমুখী উদ্বোধনী বক্তৃতা তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে সহায়ক হয়েছে। ইউরোপের কোন কোন মিডিয়া বাদশাহ আব্দুল্লাহ এই সম্মেলন কেন স্পেনে করলেন তার উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করেছে। এর একটা সুন্দর জবাব দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থা 'The Associated Press' তার ১৬ জুলাই-এর রিপোর্টে লিখেছে, " স্পেনকে সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত করা হয় ঐতিহাসিক একটা প্রতীক বা মেসেজকে সামনে রেখে। এই মেসেজ হলো, স্পেন এমন একটি দেশ যেখানে অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম, ইহুদী ও খৃস্টানরা ইসলামী শাসনের অধীনে শান্তির সাথে বসবাস করেছে (Spain was chosen as the conference site, because of its historical symbolism as a place where Muslims, Jews and Christians lived in relative peace under Islamic rule from 8th to the 13th Centuries)। এটাই যদি কারণ হয়, তাহলে এর চেয়ে সত্য কথা, এর চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কিছু নেই। আন্তঃধর্ম সংলাপের সম্মেলন এমন দেশেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। সম্মেলনের পর আমি যখন কর্ডোভা ও গ্রানাডা সফর করি, তখন এই অতীতের কথাই আমার বারবার মনে পড়েছে। সউদি আরব এবং সউদি আরবের মহান বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তাঁরা সম্মেলনটি স্পেনে অনুষ্ঠান করে পৃথিবীর মানুষকে ইসলামী শাসনের একটি সোনালী অতীতকে স্মরণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই স্মরণ আমার জন্য কষ্টের হয়েছে। কর্ডোভার বিপদগ্রস্ত মসজিদ এবং গ্রানাডার শূন্য প্রাসাদ আল হামরার দিকে তাকাবার সময় এই কষ্ট আমাকে অশ্রুসিক্ত করেছে।

৮, ৯, ১০ আগস্ট, ২০০৮

ওয়ান-ইলেভেনের পূর্বাপর দৃশ্যপট

তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সরকারের মত আচরণ করছে। সেদিন সকালে উঠেই একটা খবরের উপর চোখ পড়ার পর নতুন করে এই কথাটা মনে পড়ল। শিক্ষা সচিব ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশনের চারজন সদস্যকে পদত্যাগ করতে বলেছেন। খবরটি পড়েই বুঝা গেল, শিক্ষা সচিবের কথা আসলে শিক্ষা সচিবের নয়। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন উপদেষ্টা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথাই উচ্চারণ করেছেন। এই খবর পড়ে মনে যে কথাটা সর্বপ্রথম এল, তাহলো দুর্নীতি দমনে নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দ্বারা মনে হয় একটা দুর্নীতি বা অনৈতিক কাজ সংঘটিত হলো। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশন একটা সম্মানিত সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মত ক্যালিবারের ব্যক্তিবর্গ এর সদস্য হন এবং সরকারই তাদেরকে একটা মেয়াদের

www.pathagar.com

জন্য নিয়োগ করেন। কোন ধরনের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার মত অপরিহার্য কারণ সৃষ্টি না হলে এই সম্মানিত লোকরা তাদের স্বপদে বহাল থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিকতাকে পদপিষ্ট করেই শিক্ষা সচিব তাদেরকে পদত্যাগ করতে বলেছেন। (পরবর্তী খবর হলো তাঁরা পদত্যাগ করেছেন)। এই বলাটা অনৈতিক হয়েছে এবং যাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তাদের উপর বিনা দোষে অপরাধ আরোপ করা হয়েছে। আনন্দের বিষয় এই অপরাধ আরোপের ব্যাপারটা ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশনের উক্ত চার সদস্যের সকলেই বুঝেছেন এবং তাদের অন্ততঃ দুইজন অনৈতিক ও অপরাধ আরোপমূলক কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের একজন ড. মাহবুব উল্লাহ এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে কতকগুলো মূল্যবান কথা বলেছেন, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবগতি পর্যন্ত পৌছা দরকার। ড. মাহবুব উল্লাহ এক সাংবাদিক সাক্ষাতকারে বলেছেন, "আমাদের জানা মতে আমরা কোন দোষ, অন্যায়, অনিয়ম বা দুর্নীতি করিনি। একটাই দোষ হতে পারে তাহলো পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে যে, আমরা জোট সরকারের আমলে নিয়োগ প্রাপ্ত। এই দোষে যদি পদত্যাগ করতে হয়, তাহলে তো ঐ সরকারের আমলে নিযোগ প্রাপ্ত সকলকেই বিদায় করা উচিত। ... আমরা মনে করি, এ সরকার কোন দলের নয়, সৎ লোকদের রক্ষা করা সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকায় দুর্নীতির কথা লিখলেই দুর্নীতি হবে না। জোট সরকার নিয়োগ দিলেই দলীয় লোক হবে না। যখন যে সরকার আসে, সেই সরকারই নিয়োগ দেয়। ... আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। সমাজে আমাদের একটা ইমেজ ও পরিচয় আছে। তাই কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে শোনা উচিত ছিল।" কতকগুলো সংগত ও সত্য কথা এখানে বলেছেন ড. মাহবুব উল্লাহ। ড. মাহবুব উল্লাহর কথাগুলো প্রমাণ করছে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দলীয় প্রপাগান্ডার শিকার হয়েছে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখারও প্রয়োজন মনে করে নি। এইভাবে সংবাদপত্রবিশেষের দলীয় প্রপাগান্ডার কাছে আত্মসমর্পণ করে দলীয় সরকারের মতই অনেক কাজ করা হয়েছে।

এ ধরনের নিয়োগ বাতিল ও পদত্যাগ করানোর ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে। এমনকি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পিএসসির সদস্যদেরও পদত্যাগ করানো হয়েছে। ড. মাহবুব উল্লাহর মত স্পষ্ট কথা বলার সাহস তাদের নেই বলে তাদের কোন কথা শোনা যায়নি। তবে তাদের না বলা কথা ড. মাহবুব উল্লাহর কথার অনুরূপই হবে। স্বায়ত্বশাসিত অন্য যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সে সব প্রতিষ্ঠানেও পদত্যাগের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এমনকি প্রেস কাউন্সিলের মত প্রতিষ্ঠান যেখানে একজন সম্মানিত বিচারপতি দায়িত্বে রয়েছেন, সেখানেও পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে, পদত্যাগের চেষ্টা করানো হয়েছে বিচারপতিকে।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে সংবাদপত্রকে অথবা একশ্রেণীর সংবাদপত্র প্রভাবিত করছে প্রশাসনকে। যাই হোক, এই শ্রেণীর সংবাদপত্র যে এই কাজে অগ্রবাহিনীর কাজ করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো, বলা হয়, খৃস্টান মিশনারীদেরকে অগ্রবাহিনী হিসেবে কাজে লাগাত। কোন দেশ দখল করতে চাইলে সেখানে তারা খৃস্টান মিশনারীদেরকে পাঠাত। খৃস্টান মিশনারীরা গিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতো এবং সেই অজুহাতে ঔপনিবেশিক সৈন্যরা দেশটির উপর আগ্রাসন চালাত। এইভাবেই এখানে স্বার্থবাদী মহল টার্গেট ঠিক করে

www.pathagar.com

তার বিরুদ্ধে একশ্রেণীর পত্রিকার মাধ্যমে প্রপাগান্ডা শুরু করে এবং এই প্রপাগান্ডাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে টার্গেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এমন ব্যবস্থা গ্রহণের এত দৃষ্টান্ত রয়েছে যে সব স্টোরি মিলিয়ে এক মহাকাব্য রচনা হতে পারে। দেখা যাবে এমনকি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদেরও মিডিয়ার মাধ্যমে চরিত্র হনন করা হয়েছে, নিয়োজিত লোকদের দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের মত হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটানো হয়েছে এবং তারপর দায়িত্ব থেকে কিংবা দায়িত্ব নেয়া থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিক থেকে কেয়ারকেটার সরকার গঠনকে ঘিরে যে প্রপাগান্ডা ও আন্দোলন হয়েছে জানুয়ারির ১১ তারিখ পর্যন্ত, সে সময়ে এক শ্রেণীর মিডিয়ার যে ভূমিকা তা সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভিডিও ফুটেজ পরীক্ষা করলেই বুঝা যাবে। কোন কোন পত্রিকার কর্মকর্তারা পরে গর্ব করে বলেছে, আমরাই জরুরি অবস্থা এনেছি। কোন কোন দলও একথা বলেছে। কারও ভুলে যাবার কথা নয়, সার্বিক এক নৈরাজ্যের পটভূমিতেই জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে সেনাবাহিনীকে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে নামতে হয়েছে। সুতরাং নৈরাজ্য সৃষ্টি ছিল দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে এক জঘন্য অপরাধ। কিন্তু একশ্রেণীর মিডিয়া ও কোন কোন রাজনৈতিক দল এই অপরাধকেই গৌরব হিসেবে সরবে প্রচার করছে। আজ দুর্নীতিবাজ, দুরাচারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে, কিন্তু এই নৈরাজ্য সৃষ্টির অপরাধকে শাস্তিযোগ্য মনে করা হচ্ছে না। তাদের অপরাধ গৌরবের বিষয়ে পরিনত হয়েছে এই কারণেই। তার ফলে তারা মানুষের চরিত্র হননের কাজ আগের মতই পুরোদমে চালাতে উৎসাহিত হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত যারা তাদের পছন্দনীয় নয় কিংবা কোন কাজ যা তাদের ইচ্ছা পূরণ করেনি, তার বিরুদ্ধে তারা উঠে-পড়ে লাগছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহু ক্ষেত্রেই এই প্রপাগান্ডার ফাঁদে পড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত নিতেও বাধ্য হয়েছেন। উচ্চ পদের কিছু আমলাসহ বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, পিআইবি, পিএসসি, ইউজিসি এবং এ ধরনের আরও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলরা কিভাবে পদচ্যুত বা পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন, সেদিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি বুঝা যাবে। এখানে আমি ব্যক্তি বড় করে দেখছি না। বড় করে দেখতে চাচ্ছি আমি সিস্টেমকে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা এ ধরনের সংস্থায় সম্মানিত নাগরিক যারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে নিয়োজিত হবেন, কোন অনিয়ম-অন্যায়-অপরাধ না করলে তাদেরকে মেয়াদপূর্ণ করতে দেয়া দরকার। তাদের অসম্মান, অপমান করা উচিত নয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ আমাদের দেশে হয়ে আসছে। কিন্তু এই কাজ চলতেই থাকবে এটা পীড়াদায়ক। বর্তমান অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এই পীড়াদায়ক কাজ কিছু করেছেন এবং করছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমরা চলে আসা খারাপ দৃষ্টান্তের ব্যতিক্রম আশা করেছিলাম।

আবারও বলছি, এই ক্ষেত্রে সরকার একশ্রেণীর পত্রিকার উদ্দেশ্যমূলক প্রপাগান্ডার শিকার হয়েছেন। হতে পারে পার্লামেন্টের অভাবে, রাজনীতিক ও অন্যদের বিভিন্ন মতামত প্রকাশের অনুপস্থিতিতে, সভা-সমিতি বন্ধ থাকার কারণে সরকার পত্র-পত্রিকাকে পার্লামেন্টের মর্যাদা দিয়েছে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতকে খুবই মূল্য দিচ্ছেন। সরকারের এই মনোভাব খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু পত্র-পত্রিকাকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, সেই মর্যাদার মান অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পত্রিকাঅলারা রাখছি না।

www.pathagar.com

অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থ, নীতি ও আইনের স্বার্থের চেয়ে হঠকারী স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এক শ্রেণীর পত্রিকার এই ভূমিকা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাভাবিক অগ্রসরতাকে বাধাগ্রস্ত করছে, প্রভাবিতও করছে। একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি বহুল আলোচিত সাংবিধানিক একটি প্রতিষ্ঠান পিএসসি'কে সামনে আনতে চাই। পিএসসি'কে সরকার পুনর্গঠিত করেছেন। পিএসসি'র কোন কোন সাবেক সদস্যের বিরুদ্ধে আর্থিক অনাচারের গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। অপরাধীরা কঠোর শাস্তি পাক, এটা আমরা চাই। কিন্তু পিএসসি এবং বিসিএস-২৭ নিয়ে এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা যতটা হৈ চৈ করেছে, একে যতটা রাজনৈতিক রং দেয়া হয়েছে, তা সদিচ্ছা প্রণোদিত নয়। তাদের কথা-বার্তা শুনে মনে হয়েছে, পিএসসি'তে অবাক হওয়ার মত নতুন কিছু ঘটেছে। কিন্তু তারা তো ভালো করে জানেন, বিসিএস-২৭ নিয়ে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা অতীতেরই ধারাবাহিকতা। এই নিন্দনীয় ধারাবাহিকতার কুৎসিত যাত্রা শুরু হয় স্বাধীনতার পর বিসিএস-এর বহুল কথিত তোফায়েল ক্যাডার দিয়ে। যোগ্যতা নয়, রাজনৈতিক বিচারে এই ক্যাডার গঠিত হয়। তারপর বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেনি এমন সৌভাগ্য কি আমাদের খুব বেশি হয়েছে? সেশন জটের মত অনেক বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে জট সৃষ্টি হয়। শেখ হাসিনার শাসনামলের বিসিএস-২৩-এর কিছু সমস্যার গ্রন্থিমোচন এখনও হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এক সরকারের আমলের বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী সরকার প্রশ্ন তুলে আসছে, ঠিক পাল্টাপাল্টি ব্যাপারের মত? বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বর্তমান নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারও একই কাজ করলেন। নিন্দনীয় ধারাবাহিকতার ছেদ ঘটবে আশা করা হয়েছিল, তা আর হলো না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়তো এমনটা চাননি। কিন্তু এক শ্রেণীর পত্রিকার কোটারী স্বার্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিসিএস-২৭-এর ব্যাপারে নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেও পারেনি। পত্র-পত্রিকার অপপ্রচারের মধ্যেও সরকার বিসিএস-২৭ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন। জনকণ্ঠ ১৫ই জানুয়ারী-০৭ সংখ্যায় লিখে যে, ছাত্রদল ও শিবিরপন্থীদের ঢালাও নিয়োগ দেয়ার তোড়জোর চলছে বিসিএস-২৭-এর মাধ্যমে। এমন অপপ্রচার উপেক্ষা করেই ২২শে জানুয়ারী, ০৭ তারিখে বিসিএস-২৭-এর ফল প্রকাশ করা হয়। বিসিএস-২৭ বাতিলের প্রোপাগান্ডা চলতেই থাকে। ৪ঠা মার্চ, ০৭ সংখ্যা সমকাল হতাশ হয়ে লিখে যে, বহাল থাকছে বিতর্কিত ২৭ বিসিএস। ২৫শে মার্চ (০৭) আরেকটি পত্রিকা লিখলো, বিসিএস-২৭ বাতিল করুন। ৪ঠা এপ্রিল একটা পত্রিকা কর্তৃপক্ষীয় সূত্রের বরাত দিয়ে জানাল, ২৭ বিসিএস বাতিল হচ্ছে না। কিন্তু সরকার ঝড়ের মুখে তার অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। এপ্রিলের ৮ তারিখে (০৭) বিএিস-২৭ বিষয়ে তদন্তাদেশের খবর প্রকাশিত হলো। আর এর ১১ দিনের মাথায় জানা গেল (১৯/০৪/০৭) সরকার বিসিএস স্বাথ্য পরীক্ষা স্থগিত করেছেন এবং এর কয়েকদিন পর বিসিএস-২৭ মৌখিক পরীক্ষাও বাতিল করা হলো। এর মাধ্যমে সরকার বিসিএস-২৭ বাতিল দাবির আংশিক পূরণ করলেন। এইভাবেই সরকারের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ পত্রিকার রিপোর্টের দ্বারা। গত ৫ বছরে জামায়াত লক্ষাধিক একর অর্পিত সম্পত্তি গ্রাস করে বলে অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাতের গবেষণাপত্রের একটি নিউজ ছাপে জনকণ্ঠ। দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়টি

www.pathagar.com

টেকআপ করার কথা। কিন্তু তার আগেই খোদ প্রধান উপদেষ্টার অফিস থেকে তড়িঘড়ি করে জেলা ও উপজেলায় চিঠি পাঠিয়ে এ বিষয়ে সরকারী প্রতিবেদন চাওয়া হলো। পত্রিকার রিপোর্টকে এই গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টা খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু প্রধান উপদেষ্টার মত সর্বোচ্চ অফিসের উচিত ছিল বিষয়টি জেলা-উপজেলায় ছড়িয়ে দেয়ার আগে আবুল বারাকাতের গবেষণাপত্রটি একবার দেখার। একটু যাচাই না করে দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী অফিস বিষয়টি নিয়ে তড়িঘড়ি এ্যাকশনে যাওয়ায় কিছুটা হলেও অপমানবোধ করেছে জামায়াতে ইসলামী। পত্রিকা বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অনেক ক্ষেত্রে এভাবেই অনাকাঙ্খিত পথে পরিচালিত করেছে।

এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টার একটি বক্তব্যকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলতে চাই। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একটি চ্যানেলে একজন উপদেষ্টার বলা সেই বক্তব্যের সারকথা হলো, আমরা এত কাজে জড়াতে চাইনি। বড় বড় কিছু দুর্নীতিবাজকে শক্তি দেয়ার মত কিছু কাজ করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পত্র-পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীদের নানা পরামর্শ ও মতামত আমাদের কাজের আওতা বাড়িয়ে দিয়েছে। উপদেষ্টা মহোদয় যা উপলব্ধি করেছেন, সে ধরনের উপলব্ধি আমাদেরও। টেলিভিশন চ্যানেলের একটা টক শো'তে একজন আলোচক বলেছিলেন, দুর্নীতিবাজ ধরার, কালো টাকা উদ্ধারের যে চালুনী তার ফুটো কত বড় হবে, কিংবা কত ছোট থাকবে, তা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। অনুরূপ কথা বলেছেন নতুন রাজনৈতিক দল পিডিপি'র নেতা ফেরদৌস আহমদ কোরেশিও। চালুনীর এই ফুটো নির্ধারণের ব্যাপারটা আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিক বহু প্রকারের রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 'কোটিপতি' থেকে 'হাজারপতি' সকলেই। দুর্নীতি ও কালো টাকার অভিযোগে যদি এদের সকলকেই ধরা হয়, তাহলে খুব কম ব্যবসায়ী এবং খুব কম লোকই অক্ষত থাকবে। গত ৭ এপ্রিলের একটা লেখায় আমি বলেছিলাম, "দুর্নীতির শেকড় সমাজের আপাদমস্তক বিস্তার লাভ করেছে। রাজধানীর সর্বোচ্চ বিল্ডিং-এর মালিক থেকে গ্রামের ক্ষুদে মাতব্বর পর্যন্ত এর বিস্তার রয়েছে। অবৈধ স্থাপনা ভাঙতে গিয়ে আজ যেমন রাজধানীর র‍্যাংগস বিল্ডিং থেকে গ্রামের রাস্তার পাশের কাঁচা স্থাপনা পর্যন্ত হাত দিতে হয়েছে, তেমনি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত ও আত্মসাৎকৃত টাকায় হাত দিতে গেলে সমাজ-কাঠামোতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হবে। বিলিয়ন টাকার পুঁজি থেকে গ্রামের পেটি ফ্যাক্টরির পুঁজিতেও কালো টাকা পাওয়া যাবে। দেশে যে হাজারো মিলিওনিয়ারের সৃষ্টি হয়েছে তার সিংহভাগই কালো টাকার ফল। দেখা যাবে গত আড়াই দশকে বেসরকারী বিনিয়োগ খাতে অর্থনৈতিক বাস্তবতার চেয়ে বেশি অর্থের আগমন ঘটেছে। ১৯৮০-৮১ সালে স্থাবর সম্পদসহ বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৪ হাজার ৫শ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯০-৯১ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৪৭ হাজার মিলিয়ন টাকা। আর এর সাত বছর পর ১৯৯৮-৯৯ সালে এই অংক গিয়ে দাঁড়ায় ৪৪ লাখ ৬৬ হাজার মিলিয়ন টাকায়। হতে পারে এর বৃহত্তর অংশই কালো টাকা। আমাদের বিনিয়োগ অবয়ব, শিল্প অবয়ব ও ব্যবসায় অবয়বকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসতে এই কালো টাকার বড় অবদান রয়েছে। এই অবস্থায় দুর্নীতি ও কালো টাকার বিরুদ্ধে যুক্তির বাইরে অভিযান পরিচালিত হলে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের ক্ষেত্রে যেমন র‍্যাংগস বিল্ডিং থেকে গ্রামের রাস্তা-ঘাটের পাশের কাঁচা

www.pathagar.com

স্থাপনা ধসে পড়ছে, তেমনি দুর্নীতি ও কালো টাকা ধরে টান দিলে রাজধানী থেকে গ্রাম্যবাজার পর্যন্ত বর্তমান বিনিয়োগ অবয়ব, শিল্প অবয়ব ও ব্যবসায় অবয়ব ভেঙ্গে পড়বে। দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের গায়ে হাত দিতে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্প্রতি এর কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জেনারেল (অবঃ) মতিন কয়েকদিন আগে এক ব্রিফিং-এ বলেছেন, দুর্নীতি ও অর্থনীতি এক জিনিস নয়। দুর্নীতি দমন অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। তাঁর কথা ঠিক দুর্নীতি অর্থনীতির অংশ নয়। কিন্তু দুর্নীতিজাত অর্থ যখন অর্থনীতির টপ টু বটম বিনিয়োগ, শিল্প ও ব্যবসায় অবয়বের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, তখন অর্থরূপে রূপান্তরিত দুর্নীতি অর্থনীতি থেকে আর বিচ্ছিন্ন থাকে না।

এক কথায় আমি বলতে চাচ্ছি দুর্নীতি উচ্ছেদ ও কালো টাকা উদ্ধারের ক্ষেত্রে চালুনির ফুটো কত বড় হবে কিংবা কত ছোট হবে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেই দেখা যাচ্ছে। নেই বলেই সরকারের যাত্রা অনির্দিষ্ট এবং এই কারণেই একজন উপদেষ্টাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, তারা যতদূর যেতে চাননি, পত্র-পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীরা তাদেরকে ততদূর নিয়ে গেছে। বড় বড় যে ইস্যু আজ সরকারকে বিব্রত করছে বেশি, দেশের পরিস্থিতিকে অস্থির করেছে বেশি, তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাইরে থেকে আমদানি হয়েছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসেছে ১১ জানুয়ারি '০৭ তারিখে। আর লন্ডনের ফাইনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকায় ১৭ জানুয়ারিই লেখা হয় বাংলাদেশের দুই শীর্ষ রাজনৈতিক নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে দল রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে বিদেশ পাঠানো হচ্ছে। লন্ডনের ফাইনান্সিয়াল টাইমসের পর এ দেশেরও একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা এই ইস্যুকে সামনে এগিয়ে নেবার জন্য নানারকম উস্কানি শুরু করে। গোপনে এক শ্রেণীর রাজনীতিকরাও এতে ইন্ধন যোগায় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের লক্ষ্য ও কার্যক্রমকেও তারা প্রভাবিত করে। একজন উপদেষ্টা পরবর্তীকালে এ কথা পরিষ্কার জানান যে, একশ্রেণীর রাজনীতিকই চেয়েছিল দুই শীর্ষ নেত্রীকে দেশের বাইরে পাঠানো হোক। টিআইবি যেমন করে সংবাদপত্রের নিউজের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে অভিহিত করেছে, ঠিক তেমনি একশ্রেণীর পত্রিকা ওয়ান-ইলেভেন-উত্তরকালে পাল্টা-পাল্টিভাবে দুর্নীতি চিহ্নিতকরণের যে অভিযান শুরু করে, তার প্রবল ঢেউ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতকে অব্যাহতভাবে লম্বা হতে বাধ্য করেছে। এই কারণেই চালুনির ফুটো নির্ধারণের উপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি।

এই সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা কারা? দেখা যাবে এরা সেই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী, যাদের সৃষ্ট নৈরাজ্য থেকে দেশকে রক্ষার জন্য দেশে জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়। এরা বিচারপতি কে এম হাসানকে অপমান করেছে, তাকে অবরোধ করেছে এবং এরাই বিচারপতি আজিকের চরিত্র হনন করেছে। এরা সম্মানিত প্রেসিডেন্টকেও অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করেছে। এরাই হাইকোর্টের রায়ের ভাষায় বিচারপতি ফয়জীর 'সিভিল ডেথ'-এর জন্য দায়ী। এদের আরও পরিচয় হলো, এরা দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে। একটা জাতির আত্মবিশ্বাস নির্ভর করে জাতীয় নেতৃত্বের ঐতিহ্য ও শক্তিমত্তা এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ওপর। একটি দেশের

www.pathagar.com

রাজনীতিকরা যদি ব্যর্থ ও অযোগ্য আখ্যা পান, ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি যদি রাজধানী থেকে গ্রামের হাট পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়, আমলাদের যদি অবিশ্বস্ত ও সুযোগ-সন্ধানীরূপে পরিচিত করানো হয়, তাহলে সে জাতির আত্মবিশ্বাস কিভাবে থাকতে পারে? এ ধরনের রাষ্ট্রকেই আজ ব্যর্থ রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হচ্ছে। ঐ শ্রেণীর সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা এই লক্ষ্যেই বিভেদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং দেশের সম্মানী মানুষদের পাইকারীহারে চরিত্র হননের নীতি অনুসরণ করছে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই নৈরাজ্য চিন্তার বিরুদ্ধেই এক মূর্ত প্রতিবাদ। অবস্থানগত প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নানা কাজে হাত দিতে হয়েছে, বিস্তৃততর করতে হয়েছে তার প্রতিষেধক থাবাকে। কিন্তু সরকার তাদের লক্ষ্য সীমা সম্পর্কে আমি মনে করি অবশ্যই সচেতন আছেন। একজন উপদেষ্টা সম্প্রতি বলেছেন যে, গোটা দেশের দুর্নীতি দূর করা তাদের কাজ নয়। তারা বড় বড় কিছু কাজ করবেন এবং কাজ করার পথ করে যাবেন। পরবর্তী রাজনৈতিক সরকার এই কাজ অব্যাহত রাখবেন। এটাই গণতান্ত্রিক রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়ম। দুর্নীতি দমন ও কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারটা কোন টাইম ফ্রেমের মধ্যে আটকানোর মত নয়। এটা একটা চলমান প্রসেস। দেশ চালাবেন যে রাজনীতিকরা তাদেরই এটা কাজ। এ কাজ তাদেরই করতে হবে। এ কাজ তারা করতে পারবেন। আমি মনে করি, ওয়ান-ইলেভেনের আগের রাজনীতি এবং ওয়ান-ইলেভেনের পরের রাজনীতি অবশ্যই এক হবে না। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর প্রেসিডেন্ট বুশ যেমন বলেছিলেন, টুইন টাওয়ারের আগের পৃথিবী এবং টুইন পরের পৃথিবী কোন দিনই আর এক হবে না। সেই অর্থেই আমাদের ওয়ান-ইলেভেনের পরের রাজনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন আসবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে ২০০৬ সালের শেষ অর্ধে যে আন্দোলন হয়েছে এবং ২৮ অক্টোবর, ২০০৬ থেকে সে আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা গণতান্ত্রিক রাজনীতির সকল নর্মস পদদলিত করে সন্ত্রাসে রূপ নিয়েছিল। যেসব রাজনীতিক এই সন্ত্রাসে অংশ নিয়েছিল, যেসব সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী একে উস্কে দিয়েছিল এবং যেসব আমলা এতে বিভীষণের ভূমিকা পালন করেছিল, তারা রাজনীতি নয় সন্ত্রাস করেছে। ওয়ান-ইলেভেন যদি নাও আসত, তাহলেও পরবর্তী রাজনীতি অনেকখানিই পাল্টে যেত, পাল্টাতে হতো। এই কাজ দলীয় রাজনীতির জন্য কঠিন হতো বটে কিন্তু একটা কিছু না করে উপায় ছিল না। যে কাজটা রাজনীতিকদের করতে হতো, সেই কাজ ওয়ান-ইলেভেন করছে আরও সুন্দর, আরও কার্যকর ও আরও সর্বাত্মকভাবে। রাজনৈতিক সরকারের আমলে র‍্যাবের অভিযান যে রূপ দক্ষতার সাথে সন্ত্রাস নির্মূল করেছিল, সেভাবেই হয়তো র‍্যাব কিংবা অনুরূপ কোন বাহিনীকে রাজনৈতিক সরকার দুর্নীতির মূলোচ্ছেদেও নিয়োগ করতো (যার ইঙ্গিত বেগম জিয়া তার ক্ষমতা ত্যাগকালিন বিদায় ভাষণে দিয়েছিলেন)। র‍্যাংগস, বসুন্ধরা গ্রুপের মত রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের কাঁধে সওয়ার 'অল-পাওয়ারফুল' ব্যবসায়ীদের শোষণের সৌধকে ধুলিসাৎ করা হয়তো এর দ্বারা সম্ভব হতো না। এই মহাকাজ ওয়ান-ইলেভেন করেছে। এদিক থেকে ওয়ান-ইলেভেন শুধু সময়ের দাবি নয়, রাজনীতি ও রাজনীতিকদের সজ্ঞানে ফিরিয়ে আনার শক-ওয়েভই শুধু নয়, আল্লাহর প্রবল একটা হস্তক্ষেপ হিসেবেই এটা এসেছে। আমি মনে করি ওয়ান-ইলেভেনের শক ওয়েভ দেশবাসীকে জাগিয়ে দিয়েছে, দেশের

www.pathagar.com

রাজনীতির চলমান অবয়বে একটা ভূমিকম্প এনেছে এবং রাজনীতিকদের চিন্তা-চেতনাকে দিয়েছে প্রবল এক আছাড়। রাজনীতিকরা অবশ্যই এ থেকে শিক্ষা নেবেন এবং পরিশুদ্ধ হবেন। রাজনীতিকদের মধ্যে সংস্কারের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ এরই একটা প্রমাণ। আমি আবারও বলতে চাই, ওয়ান-ইলেভেনের আগের রাজনীতি এবং পরের রাজনীতি এক হবে না। সংস্কারের যে ঢেউ আজ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মী, সমর্থক ও জনগণের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে, তা দেশের রাজনীতিকে অবশেষে নেতা-নির্ভর নয়, নীতি-নির্ভর করেই গড়ে তুলবে। ওয়ান-ইলেভেন থেকে এর যাত্রা শুরু হয়েছে। তবে রাতারাতি আমরা একটা আইডিয়াল কন্ডিশনে যেতে পারবো না। কোন দেশই তা যায়নি। মার্কিন গণতন্ত্রের বয়স দু'শ বছর এবং বৃটিশ গণতন্ত্রের বয়স তিনশ বছর হলেও নির্বাচনে কালো টাকার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এখনও তাদের লড়াই করতে হচ্ছে। গণতন্ত্র আসলে চর্চার মাধ্যমেই বিকশিত হয়, পরিণত হয়ে ওঠে। এই সুযোগ আমাদের গণতন্ত্রে পাওয়া উচিত। আমাদের দেশের মানুষ বৃটিশ ও মার্কিন জনতার চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। দেশের মানুষের প্রতি যদি আমরা নির্ভর করি, তাহলে তাদের কাছ থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গণতন্ত্র আমরা উপহার পেতে পারি। আমি বলতে চাই, ১৯৪৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত কোন নির্বাচনেই আমাদের জনগণ ভুল করেনি। সময়ের প্রেক্ষিতে তারা সব সময় সঠিক রায়ই দিয়ে এসেছে।

আমাদের সেনাপ্রধান যেটা বলেছেন, লাইনচ্যুত ট্রেনকে আবার লাইনে তুলে দিতে হবে। ওয়ান-ইলেভেনের এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। একশ্রেণীর রাজনীতিকের সীমাহীন অর্থ লোভ ও ক্ষমতা লোভ (আওয়ামী লীগ এ পর্যন্ত নির্বাচনে পরাজয় মেনে নেয়ার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিল না) রাজনীতিকে লাইনচ্যুত করেছিল, সে রাজনীতিকে লাইনে তুলে দেয়ার মধ্যেই ওয়ান-ইলেভেনের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। ওয়ান-ইলেভেন নিজেই যেন এক রাজনীতি না হয়ে দাঁড়ায়। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র পাহারাদার সেনাবাহিনী এবার জনগণের শান্তি-স্বস্তি ও গণতন্ত্রেরও পাহারাদারী করেছে। জাতি কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি। দেশ রক্ষায়, দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় সেনাবাহিনীর এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাই জাতির সব সময়ের প্রত্যাশা।

১১ আগস্ট, ২০০৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ওয়ান ইলেভেনের পূর্বাপর দৃশ্যপট

আবুল আসাদ

লেখাপ্রকাশ

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৯
প্রথম প্রকাশ
ঢাকা বইমেলা ২০০৮
সত্ত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
ফেরদৌস খান ০১৭১২ ৫৬১৯১৯
মূল্য : ১৮০ টাকা $ 10
প্রকাশক
বিপ্লব ফারুক

লেখাপ্রকাশ
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুঠোফোন
০১৭১৮ ১১৭৭৫৫/০১৭১৫ ৪৫৭২৩৪
শব্দপ্রয়োগ
মাইক্রোসফট কম্পিউটার
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০
বাঁধাই
নজরুল এন্ড ব্রাদার্স
ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

One Elevener Purbapor Drishyapot By Abul Asad
Published By Biplob Faruque, Lekhaprokash
33 North Brook Hall Road Banglabazar Dhaka 1100
Printed By : Moumita Printers
25 Pyaridas Road Dhaka 1100

www.pathagar.com

উ/ ৎ/ স/ র্গ

ওয়ান-ইলেভেনের
ভিকটিম
রাজনীতি ও রাজনীতিকদের
উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ/ চি/ প/ ত্র

ক্রিমিনালদের স্বাধীনতা বিপদজনক ৯
বিশ-বাইশে আগস্টের পটভূমি ১৪
সাপ মারতে হবে লাঠি না ভেঙেই ১৮
এক আটাশ এবং তার কাহিনী ২৪
রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার ৩৬
রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল ৪২
বিদ্যুৎ খাতে কালো হাত ৪৯
এরদোগানের তুরস্ক ৫৫
দুর্নীতি দমনের ফর্মুলা তালাশ ৬২
চালুনি সূচেরে বলে ৬৮
বাংলাদেশ-ভারত রেল চলাচল ৭৪
রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশন ৮০
দক্ষিণ এশিয়ার মনিবত্ব ৮৬
হিরন্ময়-সুমন সিএএন'দের আঁতাত ৯১
ওরা বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দেখতে চায় ১০৬
ডায়ালগ বিষয়ক মক্কা সম্মেলন : একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ১১২
মাদ্রিদ সম্মেলন : নতুন দিগন্তের দুয়ার উন্মোচন ১২৩
ওয়ান-ইলেভেনের পূর্বাপর দৃশ্যপট ১৩৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ক্রিমিনালদের স্বাধীনতা বিপজ্জনক

আমাদের সময়ের সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে তার পত্রিকায় ভালো কভারেজ দেয়ার সমালোচনার জবাবে যা বলেছেন, তার সার কথা হলো, নিউজ মেকার যারা তারা কভারেজ পাবেনই। তার ভালোটাও নিউজ, খারাপটাও নিউজ। নাইমুল ইসলাম সাংবাদিক নীতিবোধের কথা বলেছেন। এ নীতিবোধের সবটাই আমরা জানি, কিন্তু মানি খুব কম। নীতিবোধের মাথা খেয়ে অনেকে দুর্নীতিও করে। নিউজ মেকারদের আমরা বিকৃতভাবে উপস্থিত করি। তাদের যেটা নিউজ নয়, তাকে নিউজ বানিয়ে আমরা তাদের ছোট করতে, অপমান করতে চেষ্টা করি, আবার তাদের যেটা নিউজ তাকে আমরা হাইড করি, গোপন করি। আবেদ খান দেশের প্রবীণ সাংবাদিকদের একজন। তিনি এখন সমকালের সম্পাদক। সাংবাদিকতার বহুপথ পাড়ি দিয়ে এই পর্যায়ে এসেছেন। সাংবাদিক নীতিমালা তিনিই সকলকে শেখাবেন, তাকে শেখাবার দরকার নেই। দরকার নেই একথা কিন্তু অনেক সময় মনে হয় না এই প্রবীণের প্রবণতা দেখলে। বরং মনে হয় তিনি নিউজ মেকারদের নিউজ করেন না, তিনি নিজে নিউজ 'মেক' করে নিউজমেকারদের বিকৃত করেন। খুব তাজা একটা দৃষ্টান্ত। তিন দিনি আগে তার পত্রিকায় ৫ কলামব্যাপী প্রধান শিরোনাম ছিল ঃ 'নিজামী মুজাহিদ পুরস্কৃত।' এই শিরোনামের 'নিজামী' হলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর এবং জোট সরকারের সাবেক কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী এবং শিরোনামের 'মুজাহিদ' জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল ও জোট সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। শিরোনামে কথিত 'পুরস্কৃত' হবার ঘটানটি হলো, নিজামী ও মুজাহিদ সাহেব ঢাকার উত্তরায় ৫ কাঠার দুইটি প্লট কিনেছেন। আরও অনেকে কিনেছেন, তাদের দু'জন হলেন নিজামী ও মুজাহিদ সাহেব। তারা দীর্ঘদিন ঢাকায় বাস করছেন। কোন জমি, বাড়ি তাদের ঢাকায় নেই। হাজারো মানুষ যেভাবে ঢাকায় সরকারি প্লট কিনেছেন, সেভাবেই যথাযথ আইন ও বিধি-নিয়মের মাধ্যমে তারা প্লট কিনেছেন। একজন খান তার পত্রিকার যে স্থানে 'নিজামী-মুজাহিদ'-এর খবর ছেপেছেন, তার মাথার উপরে 'একটা বাড়ির জন্ম কথা' ছবিসহ ছেপেছেন। বাড়িটা বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের। ধানমন্ডির বাড়ির এই জমিটা শেখ মুজিব একজন রাজনীতিক হিসাবে পেয়েছিলেন পাকিস্তান আমলে। উক্ত খান সাহেব জানেন, শুধু শেখ মুজিব নন পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, আমলা, সিনিয়র সাংবাদিক (যাদের মধ্যে তিনি খানও আছেন) সরকারি প্লট কিনেছেন ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, বারিধারায়। অনেকে দশ কাঠা এবং তারও বেশি বিঘা পরিমাণের জমি পেয়েছেন ধানমন্ডি-গুলশানে। সেই হিসাবে সর্বনিম্ন পরিমাণের ১টি করে প্লট উপযুক্ত দামে কিনেছেন নিজামী ও মুজাহিদ সাহেব। তাহলে এই খবর আবেদ খানের পত্রিকায় ৫ কলামব্যাপী প্রধান শিরোনাম হলো কি করে? তাদের প্লট কেনার অন্য একটা বিষয় এ ধরনের শিরোনাম হতে পারতো। সেটা হলো, ৫ কাঠা পরিমাণের সরকারি প্লটের দাম দেবার মত টাকা নিজামী ও মুজাহিদ সাহেবের না

www.pathagar.com

থাকায় আংশিক মালিকানা ছাড় দেয়ার মত ক্ষতি স্বীকার করে ডেভেলপারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে জমির দাম পরিশোধ করেছেন। ৫ বছর ক্যাবিনেট মন্ত্রী থাকার পর ৫ কাঠার একটা প্লট তাদেরকে কিনতে হয়েছে ঋণ করে, এটা শুধু আমাদের দেশ নয়, বহু দেশের জন্যই খুব বড় খবর। উক্ত খান যখন নিজামী ও মুজাহিদ সাহেবদের প্লট কেনাকে শিরোনামে এনেছেন, তখন ৫ বছর ক্যাবিনেট মন্ত্রী থাকার পর ঋণ করে ৫ কাঠার প্লট কেনার অবাক হওয়ার মত বিষয়টিই শিরোনামে আসা উচিত ছিল। কিন্তু আবেদ খান সৎ-রাজনীতি বা সৎ-জীবনের এই দৃষ্টান্তকে বরং সাবোটাজ করে নিজামী ও মুজাহিদ সাহেবের প্লট কেনাকে তাদের জন্য সরকারের 'পুরস্কার' আখ্যা দিয়ে তাদেরকে উল্টো অভিযুক্তই করেছেন। একেই বলে 'সতীনের ভাতের থালায় বিষ্ঠা খাওয়া।'

এই খানরা সাংবাদিকতাকে অন্ধ বিদ্বেষের এই পর্যায়েই নামিয়ে এনেছেন। তারা ইনফরমেশন মিডিয়াকে 'ডিসইনফরমেশন মিডিয়া'তে পরিণত করছেন। এখন দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। তারাও এ অভিযানকে সমর্থন করছেন, অন্তত তাদের বহিরাঙ্গ দেখে তাই মনে হয়। তাহলে তো নিজামী ও মুজাহিদ সাহেবদেরকে উক্ত খানরা ধন্যবাদ ও প্রশংসা করাই উচিত ছিল। কারণ তারা ছিলেন দুর্নীতির সয়লাবে দুর্নীতির স্পর্শহীন দুই উন্নতশীর দ্বীপের মতো। দুর্নীতিমুক্ত থেকে মন্ত্রণালয় যে চালানো যায়, দেশ চালানো যায়, তার একটা মডেল তারা সেট করেছেন। তাদের মন্ত্রণালয়ের আমলারা এটা দেখেছেন। তাদের মধ্যে ইতিবাচক প্রবণতা কিছুটা হলেও উৎসাহিত হয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে। এই প্রবণতা যদি সবার মধ্যে সার্বিক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে দুর্নীতি দেশে থাকতো না। একটা দৃষ্টান্ত হাজারো উপদেশের চেয়ে অধিক কার্যকর। এই দৃষ্টান্তেরই অভাব আজ দেশে। শুধু আমাদের দেশে কেন, গোটা দুনিয়ায় এই অভাবটা আজ সার্বিক হয়ে উঠছে। ওয়াশিংটন কি এ থেকে মুক্ত? মুক্ত নয়। লন্ডন-প্যারিস কি মুক্ত? মুক্ত নয়। মুক্ত হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের রাজনীতিকে যারা প্রমোট করেছে, তাকে নির্বাচনকালে যারা অর্থ সাহায্য করেছে, তারা ইরাকে অর্থকরী ঠিকাদারী পেল কি করে একেবারেই অনৈতিকভাবে? আমাদের দেশে আজ যারা দুর্নীতির অভিযোগে জেলে গেছেন, তাদের চেয়ে বুশ কি তাহলে নৈতিকতার বিচারে খুব বেশি ভাল? রাজনীতিক বা শক্তিমানদের এই ঘুষ, চাঁদা দেয়া, চাঁদা নেয়া, লালসা-লিপ্সাই আজ দুনিয়াব্যাপী দৃশ্যমান। এটা আজ মানব জাতির একটা বড় ক্রাইসিস। জাপানের দার্শনিক দাইসাকু ইকেদা বলছেন, "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের যতবেশি উন্নতি হয়েছে একালে, ইতিহাসে তার নজির নেই। প্রযুক্তি বিজ্ঞান বর্তমান যুগে অসামান্য দ্রুততার সাথে অগ্রসর হয়েছে, অথচ মানুষের নৈতিক বোধের উন্নতি হয়নি, বরং অবনতি ঘটেছে। তাতে যে অসম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের বিপদ বাড়িয়েছে।" ইকেদা কথিত এই 'বিপদ'টা কিসের বিপদ? এই বিপদটা হলো, ভালোর অভাব সম্পর্কে সার্বিক হতাশার বিপদ, অনিয়ন্ত্রিত জীবন অনিয়ন্ত্রিত শক্তির বিপদ, সমাজ-সভ্যতা এক অনিয়ন্ত্রিত লোভ-লালসার শিকার হওয়ার বিপদ। এই বিপদের স্বরূপ সম্পর্কে আর্নল্ড টয়েনবী বলছেন, "আধুনিক মানুষ, প্রাচীন মানুষের মতই, নিজেদের পরিবেশের নিজেরা নিয়ন্ত্রক নয়। নিয়ন্ত্রণে তাদের এই ব্যর্থতার কারণ মানুষ তার নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। আত্মনিয়ন্ত্রণই একমাত্র অস্ত্র যা দিয়ে আত্ম-নৈরাজ্য এড়ানো যায়।" এটা সত্য যে, বুশের

www.pathagar.com

আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাবই তার শক্তিকে অনিয়ন্ত্রিত করেছে। যার ফলে তার আপন লোকরা ইরাকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ঠিকাদারী পেয়েছে এবং ইরাক-আফগানিস্তান ধ্বংস হচ্ছে। আবার এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণেই আমাদের দেশে দুর্নীতির অভিযোগে কিছু রাজনীতিক জেলে গেছেন। আর্নল্ড টয়েনবী মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণকে 'মানব-পরিচয়' বা 'মানব-মর্যাদা'র সমার্থক হিসাবে দেখেছেন। তার মতে 'মানব-মর্যাদা' বা 'মানব-মিশন'কে ধারণ করার মাধ্যমেই শুধু মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণে সফল হতে পারে এবং এইভাবে নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটালেই মানুষ লোভী ও আগ্রাসী হওয়ার বদলে বালবাসা ও সৎ ভাবাবেগ দ্বারা উজ্জীবিত হতে পারে। আর্নল্ড টয়েনবী বলছেন, "মানুষরা আজ যে বিষয়ে দক্ষ, সেই টেকনোলজি দিয়ে মানব-মর্যাদা অর্জন করা যাবে না, নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমেই শুধু মানব-মর্যাদা অর্জন সম্ভব এবং মানুষ নৈতিকতা অর্জনে কতটা সফল হলো তার পরিমাপক হলো মানুষ কতটা লোভ ও আগ্রাসী আচরণ পরিহার করে ভালবাসা ও সহমর্মিতার নীতি গ্রহণ করলো। উক্ত খানদের মত সাংবাদিকদের কাছে মানব-মর্যাদার কোন মূল্য নেই, নেই নীতি-নৈতিকতার বালাই, যা তাদের আগ্রাসী করে তুলেছে। এ জন্যই দু'জন মন্ত্রীর বৈধভাবে উপযুক্ত টাকা দিয়ে কেনা ৫ কাঠার প্লট আবেদ খানের পত্রিকায় ৫ কলাম শিরোনাম পেয়েছে। অথচ এই দু'জন সিটিং মন্ত্রীকে আর্থিক দৈন্যতার কারণে প্লটের আংশিক মালিকানা ডেভলপারদের দিয়ে প্লট কেনার জন্য তাদের অর্থ যোগাড় করতে হয়। আজকের দুর্নীতি দমন অভিযানের প্রেক্ষাপটে এই খবরটাই শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে আবেদ খানরা উল্টো দু'জন মন্ত্রীকেই অভিযুক্ত করেছেন। এক শ্রেণীর সাংবাদিকরা এভাবেই আমাদের সাংবাদিকতাকে দায়িত্বহীনতা ও অবিশ্বস্ততার প্রায় শেষ তলে এনে ঠেকিয়েছেন। সংবাদ এখন মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, দিশেহারা করছে, অসুস্থ করছে।সত্য কি তা জানাকে তাদের জন্য অসম্ভব করে তুলছে। সমাজের একটা বিকৃত ছবিই ফুটে উঠছে সংবাদপত্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান এই অবস্থারই প্রতিধ্বনি করে লিকেছেন, "সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সমাজের ভালো-মন্দ, সঙ্কট, সম্ভাবনা, ব্যত্যয়-ব্যঞ্জনা– এসব কিছুই সংবাদপত্রের পাতায় আমরা দেখতে চাই। কিন্তু সমাজের এ দর্পণে আমাদের সমাজ-চিত্র কতোটুকু প্রতিফলিত হয়? অনেকেই তাই বলে থাকেন, আমাদের এ দর্পণটি ভাঙ্গা বিবর্ণ। ভাঙ্গা আয়নায় তাই সমাজের সব প্রতিচ্ছবি ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেখায়। ...কেন পাঠক একাধিক পত্রিকা পড়ে তথ্যের গভীরতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তথ্যের বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে? একটি প্রসঙ্গ একটি সংবাদপত্রে পরিবেশনের ধরন-ধারণ কিংবা আঙ্গিক ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু পৃথক দু'টি পত্রিকা পড়ে পাঠক এতোই বিভ্রান্ত হচ্ছেন যে, তিনি পত্রিকা পাঠ থেকে বিরত থাকতে পারলে নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে করতেন। সংবাদের তথ্য বিভ্রান্তি শুধু সংখ্যাগত কিংবা পরিমাণগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকছে না। লেখকের (সাংবাদিকের) ইচ্ছা ও আচরণের খেয়ার-খুশীতে পর্যবসিত হচ্ছে। ...সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠতার ওপরই বিদ্যমান। এক্ষেত্রে সত্য সব সময় সত্য, যার কোন আংশিক বাস্তবতা নেই, অর্ধ সত্য বলে কিছু নেই। অর্ধ সত্য মিথ্যারই নামান্তর' এবং তা ভয়ঙ্কর।" (লেখকের 'দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা : কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মাত্রা' শীর্ষক

www.pathagar.com

প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এক শ্রেণীর সাংবাদিকের এই মিথ্যাচার ও ভয়ঙ্কর সাংবাদিকতা সম্পর্কে প্রবীণ সাংবাদিক সিরাজুর রহমান তার "সংবাদপত্রে নৈরাজ্য অবসানের জন্য তদন্ত কমিশন প্রয়োজন" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, বিগত কিছু বছরে সাংবাদিকতার নামে বাংলাদেশে যা ঘটছে সেটা রীতিমত এক কেলেঙ্কারী। তাতে দেশের জনমত প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হচ্ছে, সমাজ জীবন তাতে বিষাক্ত হয়ে পড়ছে।" সংবাদপত্র যেখানে সমাজের দর্পণ, সমাজকে সুস্থ রাখার মাধ্যম সেখানে আমাদের একশ্রেণীর সংবাদপত্র জনগণকে প্রতারিত করছে, বিভ্রান্ত করছে এবং এইভাবে সমাজ জীবনকে করছে বিষাক্ত। আশির দশকের শেষ দিক থেকে যখন নতুন কিছু সংবাদপত্র ব্যবসায়-পণ্য হিসাবে মাঠে এলো, তখন থেকেই এই প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্র ব্যবসায়-পণ্য হওয়ার পর 'মুনাফা-প্রবণতা' এর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশাল পুঁজি প্রবেশ করেছে সংবাদপত্রে। তার সাথে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন স্বার্থের। এই স্বার্থই অস্ত্র হিসাবে সংবাদপত্রকে ভাঙা দর্পণে পরিণত করেছে, সমাজকে করে তুলেছে বিষাক্ত। এখন সংবাদপত্র কোন আদর্শ নয়, মিশন নয়, এক শ্রেনীর সংবাদপত্র এখন 'মুনাফা' নামক স্বার্থের হাতে পণবন্দী এবং বিভিন্ন স্বার্থ শিকারী মহলের হাতের পুতুল। প্রবীণ সাংবাদিক সিরাজুর রহমান সংবাদপত্রে নৈরাজ্য অবসানের জন্যে তদন্ত কমিশন দাবি করেছেন। এটা ঠিক সময়ের সঙ্গত দাবি। এক শ্রেণীর পত্রিকার এক শ্রেণীর সাবাদিক প্রতিযোগিতা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যাচাইহীন খবরের মাধ্যমে দেশকে পৃথিবীর শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বানিয়েছে, যেমন সমকাল দুর্নীতিমুক্ত একটা ঘটনাকে পাঁচ কলামে বিকৃত করে ছাপিয়ে নিজামী ও মুজাহিদ সাহেবকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করেছে। এ থেকে একটা কথা পরিষ্কার বলা যায়, এক শ্রেণীর পত্রিকার অভ্যন্তরে টাকার খেলা এবং স্বার্থের কালো হাত দেশের বর্তমান দুর্গত দুরবস্থার জন্যে বহুলাংশে দায়ী। যায় যায় দিনের একজন পাঠক যায় যায় দিনে লিখেছিলেন, "বাংলাদেশ আর সাধু মানুষের দেশ নয়। এখানে কোন দুর্নীতি নেই এমন দাবি কেউ করবে না। একই সঙ্গে বাংলাদেশই পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ এটা মেনে নেয়া যায় না। ...টিআইবি'র কর্মপদ্ধতিতে কিছুটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। কারণ, যে সংবাদপত্রের রিপোর্টিং এর ওপর ভিত্তি কের তারা সূচক নির্ধারণ করে, সেই সবাদপত্র নিজে কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত তা টিআইবি জানে না। জানার প্রয়োজনও বোধ করে না। পৃথিবীর তাবৎ পেশার জবাবদিহিতা থাকলেও সাংবাদিকদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। স্বাধীন সংবাদপত্র এই অধিকারকে পুঁজি করে নব্বই দশকে বাংলাদেশে ফুলে ফেঁপে উঠা সংবাদপত্র শিল্প এখন প্রায়ই তার অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকরা পরিণত হচ্ছে মহীরূহে, ফ্রাংকেনস্টাইনে। তারা সব বোঝেন, সব জানেন। বাকি সবাই বেকুব, কেউ কিছু জানে না, বোঝে না। এমনকি দাম্ভিক আচরণ সাংবাদিক ও সম্পাদকদের মাঝে ক্রমেই স্থায়ী হচ্ছে। সাইফুর রহমান-এর সংবাদপত্র বিষয়ক উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'টিআইবি ছয়টি আন্তর্জাতিক রিপোর্টের সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই দুর্নীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা সূচক তৈরি করেছে। এই রিপোর্টগুলো তৈরি করেছে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, ইকনোমিষ্ট পত্রিকা এবং ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম'এর মত নামকরা সব প্রতিষ্ঠান। সেখানে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের কোন উল্লেখ নেই। এ রকম

www.pathagar.com

চাতুর্যপূর্ণভাবে নিজেদের দোষ সাফাই শুধু সম্পাদক ও সাংবাদিকদের দ্বারাই সম্ভব। এরা একাই জ্ঞানী ও জ্ঞানপাপী। টিআইবি'র উচিত কোন দেশ সর্বাধক দুর্নীতিগ্রস্ত তা নির্ধারণের পাশাপাশি কোন দেশের সংবাদপত্র সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত তাও নির্ধারণ করা এবং সমস্ত পৃথিবীব্যাপী তা প্রকাশ করা।" (৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৫)।

যায়যায়দিনের পাঠকের এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত। কিছু ফুলে ফেঁপে ওঠা সংবাদপত্র শিল্প এখন তার অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কিছু সম্পাদক ফ্রাংকেনস্টাইল সেজেছেন, তার এ কথায় এক নগ্ন সত্যতা আছে। একশ্রেণীর পত্রিকা সাংবাদিক স্বাধীনতাকে তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করে যথেচ্ছা ব্যবহার করছে। খবর ছাপিয়ে কারও চরিত্রহননকে তারা তাদের অধিকার মনে করে। প্রতিবাদ ছাপা প্রয়োজন মনে করে না। ছাপলেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এমন জায়গায় ছাপে এবং এমন আকারে ছাপে, যা কারুনের কৃপণতাকেও হার মানায়। দেশের সব খারাপ খবরে তারা দারুণ উৎসাহী, দেশকে অকার্যকর দেখানোতো তাদের আনন্দ। এসব কিছুর পেছনে, আমি আগেই বলেছি, থাকতে পারে কোন কালো হাতের কালো স্বার্থ। এই কালোকে দিনের আলোতে আনা প্রয়োজন। সবল সিদ্ধান্তই এটা পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, কোন দুর্বল তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না এবং ক্রিমিনালরা স্বাধীনতা পেলে তারা অন্যের স্বাধীনতা হরণ করে। সেই অন্যে'টা দেশও হতে পারে।

অপরাধের স্বাধীনতা নয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিন্তু প্রয়োজন। এ স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে খোদ সংবাদপত্রকেই উদ্যোগী হতে হবে। আজকের প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই এই কথা বলে যে, সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা সেলফ কনট্রোলে এগিয়ে না এলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে এক সময় নৈরাজ্যের প্রতিষেধকের রূপ নিয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থ কিংবা যে নামেই হোক বাইরের কনট্রোল তাদের ওপর আসতে পারে। বাইরের এই কনট্রোলের যৌক্তিকতা ও ভাল দিক একটা সীমিত পর্যায়ের জন্য অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু সংবাদপত্রের জন্য এটা মৃত্যু স্বরূপ। অনেকের মতো ভারতের মহাত্মা গান্ধীও তাই সাংবাদিকদের সেলফ কনট্রোলের ওপর জোর দিয়েছেন এবং একেই কল্যাণকর বলেছেন। তিনি বলেন, "The sole aim of Journalism should be service. The Press is a great power, but just as an unchained torrent submerges the whole countryside and devastates crops, even so an uncontrolled pen serves but to destroy...if the control from without, it proves more poisonous than want of control. it can be profitable only when exercised from with in." মিঃ গান্ধীর এই উক্তিকে আমরা এক বাক্যে এইভাবে বলতে পারি, সাংবাদিকদের অপরিমেয় শক্তির আধার তাদের অনিয়ন্ত্রিত কলম যদি ধ্বংসের সয়লাব নিয়ে আসে, তাহলে বাইরের নিয়ন্ত্রণ আসবেই, যা হবে সাংবাদিক-স্বাধীনতার জন্য এক বিষাক্ত মৃত্যু। সাংবাদিকদের আত্মনিয়ন্ত্রণই এর একমাত্র বিকল্প। মিঃ গান্ধীর এই কথা আবেদ খানরা খুব ভালো করে জানেন, কিন্তু মানেন না।

১৮ আগষ্ট, ২০০৮

www.pathagar.com

ঘরের শত্রু বিভীষণের কারণেই সোনার লংকা পুড়ে ছাই হয়েছিল। আমাদের দেশেও বিভীষনরা খুবই সক্রিয়। বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র কি না এই প্রশ্ন এই বিভীষণরা তুলেছেন। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তারা বলতে চেয়েছেন বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র। অথচ ব্যর্থ রাষ্ট্রের যে সব সূচক নিরুপিত হয়েছে (যেমন জনসংখ্যার আধিক্য, উদ্বাস্তু ও আশ্রয়হীন জনসংখ্যার আধিক্য, গোষ্ঠীগত শ্রেণীর দুর্দশা, জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগ, অসম উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবনতি, রাষ্ট্রের অবৈধ কাজে সম্পৃক্ততা), তার যে কোন একটির দিক থেকেও বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্রের পর্যায়ে পড়ে না। বাংলাদেশে জনসংখ্যা অধিক বটে, কিন্তু এটা কোন সমস্যা নয়। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বহু দেশের তুলনায় ভাল। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার বড় বড় দেশের চেয়ে ভাল। বাংলাদেশে উদ্বাস্তু নেই, গোষ্ঠীগত কোন দুর্দশা নেই, মানুষের দেশত্যাগ নেই, অসম উন্নয়ন নেই এবং অর্থনৈতিক অবনতিও নেই। এসব নেতিবাচক সূচকের অধিকাংশই ভারতে বর্তমান। কিন্তু কেউ ভারতকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বলছে না এবং ভারতের মিডিয়াও এটা বলেনি, বলছে না। কিন্তু আমাদের বিভীষণরা এটা বলে।

ঠিক এভাবেই এই বিভীষণরা বাংলাদেশকে জঙ্গীরাষ্ট্র ও মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য গলদঘর্ম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার সময় থেকে বিভীষণী এই কাণ্ড পালে হাওয়া পায়। সরকারিভাবে বই ছাপিয়ে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশ সফররত ক্লিনটনকে জানান বাংলাদেশ আফগানিস্তান হওয়ার সম্ভাবনার কথা। তারপর বিভীষণরা গত ৭ বছর ধরে এই অপপ্রচার চালাচ্ছে। বর্তমান অবস্থায় সর্বশেষ এই অপপ্রচারে যোগ দিয়েছেন জনকণ্ঠের হারুন অর রশিদ। তিনি নাইন ইলেভেনের স্মরণে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের কথা বলতে গিয়ে নিশ্চিতই ধরে নিয়েছেন মৌলবাদী জঙ্গীরা টুইনটাওয়ার ধ্বংস করেছে। অথচ তার লিখাতেও অভিযুক্ত মুসলিম জংগীদের অভিযুক্ত লিখেছেন,প্রমাণিত অপরাধী লিখতে পারেননি। লিখতে পারবেন না। কারণ, অধিকাংশ মার্কিনীও আজ একথা বিশ্বাস করে না। গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিভেন্স জোন্সের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ৭৫ জন বুদ্ধিজীবীর একটি দল নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এ সম্পর্কে বলেছেন, 'তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন দখলদারিত্বকে যৌক্তিক প্রমাণ করতেই হোয়াইট হাউজের রণোন্মাদকরা এ জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে।' এরা তাদের অনুসন্ধান থেকে আরও জানায়, টুইনটাওয়ার ধ্বসিয়ে দিতে এ বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে তার নিশ্চিত প্রমাণ তারা টাওয়ারে ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে পেয়েছেন। এর চেয়েও বড় কথা নাইন ইলেভেনের অভিযুক্তের তালিকা থেকে লাদেনকে বাদ দেয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এটর্নি কোন রাখঢাক না করে সরাসরি বলেছেন, যার বিরুদ্ধে সরাসরি কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, তাকে আসামী করে বিচার চালানো সম্ভব নয়। এ খবর জনকণ্ঠেই ৩০ আগস্ট ২০০৬ সালে ছাপা হয়েছে। অন্যদিকে তার সাথে আরও ১৯ জন যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল ঘটনার সাথে তাদেরও সম্পৃক্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এসব কথা

www.pathagar.com

জনকণ্ঠের অজানা নয়, তবু তারা পুরানো গীতই গেয়েছেন। তা গাইতে থাকুন আপত্তি নেই। কিন্তু জনকণ্ঠ যখন ঐ জঙ্গীদের বাংলাদেশে দেখতে পান, আপত্তি উঠে তখনই। বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা ও জঙ্গীপনার ঘটনা অনেক ঘটেছে। এর মধ্যে জেএমবি'র জঙ্গী তৎপরতা সবচেয়ে বড়। জোট সরকারের আমলে এই জঙ্গীবাদীদের সফলভাবে দমন করা হয়েছে। তাদের প্রায় সব নেতাকেই গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। তাদের মধ্যে ৬ জনের ইতোমধ্যে ফাঁসিও হয়েছে। অন্যান্য সন্ত্রাসী তৎপরতারও অনুসন্ধান ও বিচার চলছে। কিন্তু এই জঙ্গী বা সন্ত্রাসীদের সাথে লাদেন-জঙ্গীদের কোন সম্পর্ক আছে একথা এযাবত কোনভাবেই প্রমাণ হয়নি। কিন্তু এরপরও আমাদের বিভীষণরা দেশের সন্ত্রাস ও জঙ্গীপনাকে বাইরের সাথে যুক্ত করে দেশে বাইরের হস্তক্ষেপকে ডেকে আনতে চায়।

এই বিভীষণী চরিত্রই হলো একশ্রেণীর সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সুশীলদের। বাইরের বিশেষজ্ঞেরাও বলছেন, বাংলাদেশের সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে বাইরের কোন যোগসূত্র পাওয়া যায়নি। ২১ আগস্ট শাহজালালের (রহঃ) মাজার, জেএমবি'র সিরিজ বোমা ইত্যাদির মত বড় ঘটনার পর্যবেক্ষন কিংবা তদন্ত কাজে সহায়তার জন্য এপবিআই, ইন্টারপোল ইত্যাদির মত বাইরের বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এসেছে। তারাও বাংলাদেশের সন্ত্রাসের সাথে বাইরের কোন যোগসূত্র পায়নি। ২০০৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন বাংলাদেশে জঙ্গী তৎপরতা, জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা, বাংলাদেশের রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সরেজমিনে রিপোর্ট করেছিল, তাতেও বাংলাদেশের সন্ত্রাসকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং জামায়াতকে গণতান্ত্রিক সরকারের অংশীদার দুর্নীতিমুক্ত দল হিসাবে দেখানো হয়েছে। ঐ রিপোর্টে হেরাল্ড ট্রিবিউন বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সন্ত্রাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছে, "It is all too easy, however, to overemphasize the dangers of political islam here. As in India, here is little history of islamic violence, more of leftist violence and general political thuggery. The bedrock identity of Bangladesh is being Bengali first, Muslim second. Surrounded by non-Muslim states and far from the middle East, Bangladesh is closer in spirit to south-east Asia that to Pakistan or Arab world. Instances of intolerance are the exception, not the rule and have been widely condemned by the news media." অর্থাৎ বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইসলাম সম্পর্কে অতিরঞ্জন খুবই সস্তা একটা শ্লোগান। যেমন ভারতে ইসলামিক সন্ত্রাসের তেমন একটা ইতিহাস নেই, বরং সেখানে বেশি পরিমাণে আছে বামপন্থী সন্ত্রাস এবং সাধারণ রাজনৈতিক সংঘাত। অনুরূপভাবে বাংলাদেশে মানুষের পরিচয় তারা প্রথমে বাংলাদেশ, তারপরে মুসলিম। অমুসলিম রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত মধ্যপ্রাচ্য থেকে বহুদূরের বাংলাদেশ আবেগের দিক দিয়ে পাকিস্তান ও আরব বিশ্বের চাইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে অধিক ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশে অসহনশীলতার দৃষ্টান্ত খুবই ব্যতিক্রম একটা বিষয়, নিয়মিত কোন বিষয় নয়। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমও অসহিষ্ণুতার ঘোর সমালোচক। অন্যদিকে জামায়াত তার দলীয় শক্তির চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে এমন কথা বলার সাথে সাথে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন লিখে, "The Jamaat has not pressed an Islamic agenda too over-

www.pathagar.com

lly, but its ministers have aquired a reputation for being competent and uncorrupt, which could serve it well if disillusion with the major parties spreads" অর্থাৎ জামায়াত সরকারে থেকেও তার ইসলামী এজেন্ডা বাস্তবায়নে কোন দৃষ্টিগোচর বাড়াবাড়ি করেনি। কিন্তু তার মন্ত্রীরা যোগ্য ও দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার সুখ্যাতি অর্জন করেছে, যা জামায়াতের খুবই উপকারে আসবে। (Philip Bowring, International Herald Tribune, April 16, 2005).

এখানে হেরাল্ড ট্রিবিউন কয়েকটা সত্য কথা খুব স্পষ্ট করে বলেছে। এক. বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদ উত্থানের শ্লোগানটি বাস্তবতা নয়, ঘটনার অতিরঞ্জন, দুই. বাংলাদেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত একটা ব্যতিক্রম, চলমান কোনো বিষয় নয় এবং তিন. বাংলাদেশ দূরত্বের কারণে পাকিস্তান বা আরব বিশ্বের চাইতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে 'অধিকতর' ঘনিষ্ঠতাবোধ করে।

ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনকে ধন্যবাদ। দূর থেকে এসে সরেজমিনে তদন্তে বাংলাদশকে তারা চিনেছে, কিন্তু বাংলাদেশের খেয়ে পরে, বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে, বাংলাদেশের আলো-বাতাসে বড় হয়ে জনকণ্ঠ ও প্রথম আলোর মত সংবাদ মাধ্যমের কিছু বিভীষণরা এবং তাদের কিছু 'সুশীল' দোস্তরা বাংলাদেশকে চেনেনি। অবশ্য আমার এ কথার সাথে দ্বিমত করে অনেকেই বলেন যে, তারা চেনেনি নয়, তারা চিনতে চায়না বাংলাদেশকে। চিনতে চায় না কারণ তারা নিজের চোখে নয়, অন্যের চোখে বাংলাদেশকে দেখে। এই 'অন্য'রা কারা? এরা হলেন, তাদের মতে, সিএনএন-আইবিএন এর তথাকথিত সংবাদদাতা সুমন চক্রবর্তী এবং Bangladesh : next Afghanistan গ্রন্থের লেখক হিরন্ময় কারলেকাররা। দিল্লীর আধিপত্যবাদী স্বার্থের অস্ত্র সুমিত চক্রবর্তী বাংলাদেশকে 'দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসের উদীয়মান ভাগাড়' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর দিল্লী-স্বার্থের আরেক ক্রীড়নক কারলেকার 'মৌলবাদী ইসলামিস্টরা বাংলাদেশে ক্ষমতা দখল করতে পারে', 'বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকারকে মৌলবাদী ইসলামিস্টরা ডিকটেট করতে পারে', 'মৌলবাদী ইসলামিস্টরা বাংলাদশকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের হেড কোয়ার্টার না হলেও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বানাতে পারে' ইত্যাদি কথা বলে বাংলাদেশকে আরেক আফগানিস্তান বানিয়েই ফেরেছেন। হিরন্ময় বাবুরা বাংলাদেশ সম্পর্কে যে কল্পকথা ভয়ঙ্কর রূপ দিয়ে প্রচার করছেন, তাদের সে কল্পকথার উৎস আমাদের বিভীষণরা। বাংলাদেশ সম্পর্কে এই সব ভুয়া তথ্য যারা হিরন্ময় কারলেকারকে দিয়েছে, তাদের মধ্যে বিভীষণ নাম্বার ওয়ান হলেন শাহরিয়ার কবির। প্রথম আলোর দিল্লী সংবাদদাতা দিপাঞ্জন রায় হলেন তথ্য সরবরাহের আরেকজন ব্যক্তি। আরও তিন ব্যক্তির নাম হিরন্ময় বাবু লিখেননি যাদের কাছ থেকে তিনি মূল্যবান সহযোগিতা নিয়েছেন। হিরন্ময় বাবুকে বাংলাদেশবিরোধী তথ্য সরবরাহকারী এই কয়জন হলেন আমাদের বিভীষণদের আইসবার্গ মাত্র। এই বিষীষণরা ছড়িয়ে আছেন তথাকথিত সিভিল সোসাইটি, একশ্রেণীর সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের মধ্যেও।

www.pathagar.com

এই বিভীষণরা চেয়েছিল বাংলাদেশকে 'মৌলবাদী ইসলামিস্টদের সন্ত্রাসের ভাগাড়' হিসেবে প্রচার চালিয়ে পশ্চিমীদের 'War on Terror' বাংলাদেশও আমদানি করতে, যাতে বাংলাদেশ আর এক আফগানিস্তানে পরিণত হয়। কিন্তু 'War on Terror'-এর নায়করা বাংলাদেশের বিভীষণ ও দিল্লীর প্রপাগান্ডাকে বিশ্বাস করেনি। ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের সরেজমিন রিপোর্টার ফিলিপ বোরিংদের কথাই অবশেষে সত্য হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমী দেশগুলো যারা 'War on Terror'-এর নায়ক, তারা বাংলাদশকে মডারেট মুসলিম দেশ হিসেবে অভিহিত করেছে, মৌলবাদী ইসলামিস্টদের 'Terror-hub' নয়।

বিভীষণরা বাংলাদেশকে 'Terror-hub' প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবার পর তারা আরেক বিপজ্জনক লক্ষ্যে মেতে উঠেছে। সেটা হলো বাংলাদেশের জাতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশী জনগণের প্রতিপক্ষ বানিয়ে দেশ ধ্বংসের শেষ সংঘাত সৃষ্টি করা। সবাই আমরা জানি, জরুরি অবস্থায় দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকা এবং দুর্নীতির অভিযোগে অনেক রাজনীতিক জেলে যাওয়া ও পালিয়ে থাকা এবং অবশিষ্টরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার কারণে রাজনৈতিক দলগুলো শক্তি হিসেবে সক্রিয় না থাকার ফলে দেশে শক্তি হিসেবে বর্তমানে জনগণ ও জাতীয় সেনাবাহিনীই মাত্র অবশিষ্ট আছে। বিভীষণরা মনে করছে জাতীয় সেনাবাহিনীকে জনগনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ষোল আনা সফলতা লাভের এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। জননেতাদের অভাবে জনগণ এখন সুতা ছেঁড়া মালার মত বিশৃঙ্খল ও অসংগঠিত। অসংগঠিত জনগণকে সংগঠিত উস্কানির মাধ্যমে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যদি দাঁড় করানো যায় প্রতিপক্ষ হিসেবে, তাহলে দেশের অবশিষ্ট দুই শক্তিকে সংঘাতে জড়ানো সম্ভব হবে। এই সংঘাত হবে প্রথম আলো'দের কাঙ্ক্ষিত ব্যর্থ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সূচক। এই সূচকের ওপর ভর করে তখন ব্যর্থ রাষ্ট্র বাংলাদেশে শান্তি রক্ষার জন্যে ভারতীয় সৈন্যদের আমন্ত্রণ জানাবে বিভীষণ সুশীলরা। ষোলকলা পূর্ণ হবে তাদের ষড়ঙন্ত্রের। আটঘাট বেঁধে এই ষড়যন্ত্রেরই যাত্রা তারা শুরু করেছিল ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোট একটা ঘটনা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত একটা ছাত্র বিক্ষোভকে তারা হাতে নিয়েছিল জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির একটা মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রও তাদের ব্যর্থ হয়েছে।

এখন দেখার বিষয় বিভীষণদের পরবর্তী টার্গেট কি? টার্গেট যাই হোক, মাত্র গণতন্ত্রই তার মোকাবিলা করতে পারে। লক্ষণীয়, জোট সরকারের পাঁচ বছরে ষড়যন্ত্রকারীরা বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সূত্রপাত ঘটা ২০-২২ আগস্টের মত ঘটনা ষড়যন্ত্রকারীরা সৃষ্টি করতে পারেনি। এর কারণ দেশে গণতন্ত্র ও জননেতাদের উপস্থিতি। তাই দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবিলার জন্য যতো শীঘ্র সম্ভব দেশে নির্বাচন দিয়ে গণতন্ত্র ও জননেতাদের দেশ শাসনে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিভীষণদের কালো হাত ভেঙে দেয়ার এটাই একমাত্র পথ।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রায়ত্তখাতের ৮টি পাটকল লীজ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারের পাটকল ছিল মাত্র ১৮টি। এই ৮টি পাটকল লীজ দেয়ার পর অবশিষ্ট থাকবে ১০টি। সাতাত্তরটি থেকে মাত্র দশটি। অর্থাৎ পাট খাতে গত পঁয়ত্রিশ বছরে আমাদের অধোগতির হার দাঁড়াবে প্রায় আটশত ভাগ। এই অধোগতির ব্যাখ্যা কি? সরকারি উত্তর হলো, পাট শিল্পখাতের লোকসান। লোকসান বাঁচাবার জন্যই পাটকল বন্ধ করা, পাটকল লীজ দেয়া, পাটকল বেসরকারি হাতে তুলে দেয়া। প্রশ্ন দাঁড়ায় এই লোকসান কেন? সরকারি জবাব হবে দুনিয়ায় পাটজাত পণ্যের বাজার নেই, পাটজাত পণ্য বিক্রি হয় না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে ভারতের পাটজাত পণ্যের বাজার কোত্থেকে আসছে? ভারতে পাটকল বন্ধ হবার বদলে নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে কেন? ভারতের এক পশ্চিমবঙ্গেই ৫৯টি পাটকল রয়েছে। তারপরও পাটকল বন্ধ না করে তারা দশ হাজার কোটি রুপি খরচ করে তিনটি পাটকল স্থাপন করছে কেন? কেন পাটজাত পণ্যের রফতানি ১ হাজার কোটি রুপি থেকে আগামী ২০১০ সাল নাগাদ ৫ হাজার কোটি রুপিতে উন্নীত করার টার্গেট নিয়েছে ভারত? তাদের পাটের রফতানি খাত অর্থকরী ও অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ না হলে কেন তারা পাটখাতে ভর্তুকি ৩০ শতাংশে উন্নীত করেছে? এই প্রশ্নগুলো বিভিন্নজন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তুলেছেন। কিন্তু সরকারি তরফের কোন জবাব আসেনি। আসার কথা নয়। কারণ এসব জিজ্ঞাসার কোন জবাব নেই, আসবে কিভাবে? পাট শিল্পখাতকে তো আমরা নিজেদের অযোগ্যতা বা বাইরের কোন স্বার্থে ধ্বংস করছি। একজন পাট বিশেষজ্ঞ কিছুদিন আগে লিখেছিলেন, "ইংরেজ, পাকিস্তানীরা ব্যবসায়িক স্বার্থে পাটের গুরুত্ব বুঝেছিল, আমরা তা বুঝিনি। স্বর্ণসূত্র পাট তার সোনালী জীবন হারিয়েছে তা আমরা মনে করি না। আসল কথা হচ্ছে, পাট শিল্পের প্রতি আমরা যথাযথ মনোযোগ দিতে পারিনি। এখনো পারছি না। এ শিল্পের উন্নয়নে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এখনো সময় আছে পাটের সোনালী জীবন ফিরে পাবার। পাটের দিকে কারো নজর নেই। এ শিল্পের ওপর জাতীয়ভাবে টোটাল সাপোর্ট দরকার। কিন্তু কোথাও কেউ নেই তা নিয়ে ভাববার।" ভাববার নেই বলেই সহজ যে কাজ, পাটকল বন্ধ করা, লীজ দেয়া, সেই কাজই এখন হচ্ছে। উদ্যোগী হলে, আন্তরিক হলে, চেষ্টা করলে যে পাট শিল্পখাতকে অবশেষে লোকসান থেকে বাঁচানো যাবে, লাভজনক করে তোলাও সম্ভব হবে, তার একটা ঝলক দেখা গেছে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে। ২০০০-২০০১ সালে পাট শিল্প সংস্থার লোকসানের পরিমাণ ছিল ৩৮০ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী শিল্পমন্ত্রী হবার পর সরকার উদ্যোগী হলে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পাট শিল্প সংস্থার লোকসান ১৬২ কোটি ২৮ লাখ টাকায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। এটা স্বল্প সময়ের একটা ছোট দৃষ্টান্ত, কিন্তু বড় ভবিষ্যতের একটা বড় স্মারক বটে। এসবের তোয়াক্কা করা হয়নি, হচ্ছে না। পাট শিল্পের নিধনযজ্ঞ শুরু হয় ১৯৭২ সালে। ভারতকে অনুমতি দেয়া হয় বাংলাদেশের পাট ভারতে নিয়ে সে বিদেশে রফতানি করতে পারবে। ৭২-৭৫ সময়ে বাংলাদেশে প্রতিদিন দু'তিনটি পাটকলে আগুন লাগত। খুলনায় একদিনে ২৯টি পাট গুদামে আগুন

www.pathagar.com

লাগে (ইত্তেফাক, ১৬ নভেম্বর, ৭২) পাট শিল্প নিয়ে আমাদের আরেকটা পাপের কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের পাটকে আমরাই মর্যাদা দেইনি, নিজেদের পাট আমরা নিজেরাই ব্যবহার করিনি। পাটের বিকল্প কৃত্রিম আঁশজাত পণ্যকে আমরাই ব্যবহার করছি পাট বাদ দিয়ে। পাাট উৎপাদনকারী কোন দেশেই এমনটা নেই। যেমন, ভারতে প্রয়োজনের ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার হয়, আর বাংলাদেশে ব্যবহার হয়মাত্র প্রয়োজনের ৮ শতাংশ। আমরা যারা বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে পাটের প্রতিযোগীকে পাটের দেশে টেনে আনি, তারা কিভাবে বিদেশে পাটের বাজার রক্ষা করবে? এটাই আমাদের পাটের ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডিই পাটের বিলয় ঘটাচ্ছে।

আমাদের গার্মেন্টিস শিল্পকে পাটের রোগই ধরতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। পাট উৎপাদন ও পাটশিল্পে আমরা যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলাম, গামেন্টস শিল্পের উন্নয়ন বিকাশেও আমরা তেমনি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছি। ২০০৪ সালের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের গার্মেন্টিস রফতানির বিশেষ সুবিধা কোটা প্রথা বাতিল হচ্ছিল, তখন প্রথম আলোর মত কিছু পত্রিকা মহানন্দে হৈ চৈ তুলেছিল যে, বাংলাদেশের গার্মেন্টিস শেষ হয়ে যাচ্ছে। নানা হিসেব কষে তারা দেখিয়েছিল, কোটা সিস্টেম উঠে যাবার পর আমাদের গার্মেন্টিস শিল্প প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে অকাল মৃত্যু বরণ করবে। কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা এই অকাল মৃত্যুর দিনও গুণছিল। কিন্তু সবার মুখে ছাই দিয়ে সব অংক মিথ্যা প্রমাণ করে আমাদের গার্মেন্টিস শিল্প কোটা প্রথা উঠে যাবার পরও এশিয়ার শ্রেষ্ঠ হিসেবে মাথা উঁচু করে থাকে। ২০০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গার্মেন্টিস রফতানির শেয়ার ছিল ভারতের ৩ দশমিক ১ ভাগ, পাকিস্তানের ২ দশমিক ৬ ভাগ, শ্রীলংকার ২ দশমিক ১ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ার ৩ দশমিক ৫ বাগ, ভিয়েতনামের ৩ দশমিক ৯ ভাগ এবং কম্বোডিয়ার ৩ দশমিক ২ ভাগ। আর বাংলাদেশের ছিল ৪ দশমিক ৭ ভাগ। ২০০৫ সালে বাংলাদেশের কোটা সুযোগ উঠে যাবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গার্মেন্টিস রফতানিতে বাংলাদেশের শেয়ার ছিল ৫ দশমিক ১ ভাগ। আর ভারতের ছিল ৩ দশমিক ৬ ভাগ, পাকিস্তানের ছিল ২ দশমিক ৬ ভাগ, শ্রীলংকার ২ দশমিক ১ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ার ৩ দশমিক ৭ ভাগ, ভিয়েতনামের ৩ দশমিক ৬ ভাগ এবং কম্বোডিয়ার ৩ দশমিক ২ ভাগ। ২০০৪-২০০৫ সালে কোটা উঠে যাবার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের গার্মেন্টিস রফতানির মোট পরিমাণ ছিল ৮৬৫৪ দশমিক ৫২ মিলিয়ন ডলার, আর কোটা প্রথা উঠে যাবার পর ২০০৫-২০০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের গার্মেন্টিস রফতানির মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫২৬ দশমিক ১৬ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ কোটা সিস্টেম উঠে যাবার পর বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের গার্মেন্টিস বেশি রফতানি করে। এটা বাংলাদেশের গার্মেন্টিস শিল্পের শক্তিমত্তার প্রমাণ। মনে করা হচ্ছে এই শক্তিমত্তাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন হয়েছিল পাটের ক্ষেত্রে। গত অক্টোবরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সময় থেকেই আমাদের গার্মেন্টিস শিল্পে বড় ধরনের দুর্যোগ শুরু হয়। গত কয়েকমাসে গার্মেন্টিস খাতে রফতানি কমেছে ৩০ শতাংশ। ইতোমধ্যেই আরও গার্মেন্টিস বন্ধ হয়েছে। অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গে, ভারত ইপিজেড গড়ে তুলতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ মন্থর হয়েছে। আমাদের ইপিজেডের কোন কোন বিদেশী

www.pathagar.com

বিনিয়োগকারী তাদের কারবার বন্ধ করেছে, আরও বন্ধ হবে কিনা কে জানে! অনেকেরই আশঙ্কা এসব বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গের ইপিজেডে যাচ্ছে কিনা?

পাট ও গার্মেন্টস শিল্পের মত আমাদের সার্বিক অর্থনীতিও আজ সংকটে। গত ৬ মাসে গার্মেন্টস খাতের আয় ৩০ শতাংশ কমে যাওয়াই শুধু নয়, বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়া, গত দেড় দশকের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়া, ব্যবসায়ে মন্দা, বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি দেশের সার্বিক অর্থনীতিকে পেছন দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মনে করা হচ্ছে চলতি অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি গত ১০ বছরের ঐতিহ্য ভঙ্গ করে ২ শতাংশ কমে যাবে। তারচেয়েও বড় কথা হলো, জনগণের আর্থিক দুর্ভোগ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, গত জুনে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ২০ শতাংশ। কিন্তু এটা দুর্ভোগের প্রকৃত চিত্র নয়। 'সমুন্নয়' নামক একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতে নিম্ন-আয়ের বিভিন্ন গ্রুপের উপর মূল্যস্ফীতির প্রকৃত চাপ অনেক বেশি। তারা দেখিয়েছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ২১ দশমিক ৬০ শতাংশ, গার্মেন্টস শ্রমিকরা ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ, রিকশাচালকরা ২৩ দশমিক ১১ শতাংশ, দিন মজুরেরা ২২ দশমিক ৫৪ শতাংশ মূল্যস্ফীতির শিকার। ব্যবসায়ে মন্দা ও বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বকে যদি এর সাথে যুক্ত করা হয়, তাহলে মানুষের অর্থনৈতিক দুর্ভোগের আসল চিত্র আরও উদ্বেগজনক হবে। এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে পারে বলে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন। বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক সম্প্রতি এক পত্রিকাকে জানিয়েছেন, সামষ্টিক অর্থনীতি গত অর্থ বছরে চাপের মধ্যে ছিল, বর্তমানে ঐ চাপ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। বেসরকারি খাতের তৎপরতা নেই বললেই চলে। বিনিয়োগকারীরা শঙ্কিত। তাদের মধ্যে ওয়েট এন্ড সি মনোভাব রয়েছে।' এ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স-এর চেয়ারম্যানও এমন কথাই বলেছেন। তার মতে বেসরকারি খাতে উদ্যোক্তাদের মাঝে আস্থার অভাব দেখা যাচ্ছে। এ কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধীরগতির সৃষ্টি হয়েছে। লোকজন ব্যাংক থেকে টাকা নিতে চাইছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও স্বীকার করেছেন, গত অর্থ বছরের সার্বিক হিসাবে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৫ দশমিক ১২ শতাংশ হলেও গত ছয় মাসে এই প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কিন্তু এই হাল হবার কথা ছিল না। বাংলাদেশ অর্থনীতিতে হয়ে উঠছিল এক ইমার্জিং টাইগার। গত ১০ বছরে পৃথিবীর যেসব দেশ দ্রুত উন্নতি করেছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে ছিল এক বিশিষ্ট আসনে। জিডিপি'র ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে প্রবৃদ্ধি করে, তা ছিল অন্যের জন্য অনুকরণীয়। পৃথিবীর ৫০টি বড় অর্থনীতির দেশের মধ্যে মাত্র ৪টি দেশ ছিল বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে, অন্য ৪৫টি দেশ বাংলাদেশের পেছনে পড়েছিল। এর স্বীকৃতি বিদেশী বিশষজ্ঞরাও দিয়েছে। ২০০৬ সালের শেষে বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেয়া বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এ দেশ থেকে যাবার সময় বাংলাদেশের অর্থনীতির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেন, "১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশ স্থিতিশীলভাবে বছরে ৫-৬ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। এখানে মূল্যস্ফীতি ও ঋণের হার নিচু অংকের। সুদের ও মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল। মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে

www.pathagar.com

গেছে সব কম আয়ের দেশকে। এই সাফল্যের প্রতিফলন রয়েছে ছাপ ফেলার মতো দারিদ্র্য কমানোর হারেও। ২০০০ তেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সময়ে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর ২ শতাংশ হারে দারিদ্র্য কমেছে, যা আগের ৫ বছরের হারের তুলনায় দ্বিগুণ। ২০০০ সালে যখন মোট জনসংখ্যার ৪৯ শতাংশই ছিল গরীব, ২০০৫ সালে তা নেমে আসে ৪০ শতাংশে। আমরা আরও দেখেছি এ সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে, এমনকি প্রতিটি গরীব মানুষের জন্যেও।

অনেক সামাজিক সূচকের উন্নয়ন ঘটেছে একই ধরনের উল্লেখযোগ্যভাবে। শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে প্রায় সার্বজনীন সুযোগে এগিয়েছে বাংলাদেশ। জন্মের সময় মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুরোধে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়ন ঘটেছে বাংলাদেশে।" (যায়যায়দিন, ২০ নভেম্বর, ২০০৬)

বলা যায়, বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৪ দলীয় জোট সরকারের আমলে এসে সবচেয়ে দ্রুত হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা বড় ধরনের উল্লম্ফন ঘটে এ সময়। ২০০১ সালে মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৩৬২ ডলার, ২০০৬ সালের দিকে তা প্রায় ৫০০ ডলারে উন্নীত হয়। জোট সরকারের পাঁচ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ১৩০ কোটি ডলার থেকে ৩৬০ কোটি ডলারে পৌছে। মোট বার্ষিক রফতানি ৬৪০ কোটি ডলার থেকে ১০৫২ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোট ও খামার-শিল্পের বিকাশ মানুষের প্রধান অর্থকরী মাধ্যমে পরিণত হয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতসহ সামাজিক খাতের উন্নয়ন এই সময়ই অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যায়।

এমন অর্থনীতি হঠাৎ আজ সংকটে পড়লো কেন? এই 'কেন'র উত্তরে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া, গার্মেন্টস খাতে আয় হ্রাস পাওয়া, অর্থনৈতিক স্থবিরতা, মূল্যস্ফীতির উচ্চ চাপ, ব্যবসায়ীদের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, বন্যা ইত্যাদি কারণেই বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন দাঁড়ায় অর্থনীতিতে বিপর্যয়কারী এ ঘটনাগুলো ঘটলো কেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে যে জবাব আসছে তা হলো, "দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কড়াকড়ির সূত্র ধরে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এখন মন্দায় আক্রান্ত। অর্থনীতিতে পড়ছে যার বিরূপ প্রভাব। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কেউ জেলে, কেউ পলাতক, কেউবা দেশান্তরী। বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে বিজিএমএইএ'র সাবেক প্রেসিডেন্ট আনিসুল হক বলেছেন, 'কি হয়, কোথায় যাচ্ছি, কি দাঁড়ায়– এসব ভাবনাতেই ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা।' দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মীর নাসির হোসেন বলেছেন, 'দুর্নীতি দমন অভিযান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কড়াকড়ির কারণে ব্যবসায়ীরা এখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত। সবাই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে ইত্যাদি।' (জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর, ২০০৭)

অর্থনীতির বর্তমান বিপর্যয়ের উপরোক্ত কারণগুলো যে সত্য, এ কথা আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারও উপলব্ধি করেছেন। এ উপলব্ধির ফল হিসেবেই ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গত ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ব্যবসায়ীদের নিয়ে এক বৈঠকের আয়োজন হয়। এতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ও সেনাপ্রধান ব্যবসায়ীদের সাথে

www.pathagar.com

কথা বলেন। তাঁরা নির্ভয়ে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার আহ্বান জানান এবং ব্যবসায়ীদের ভীতিমুক্ত করার জন্য বলা হয়, 'সেপ্টেম্বরের পর দুর্নীতিবাজদের আর কোন তালিকা প্রকাশ করা হবে না। নতুন করে দুর্নীতি না করলে তার তালিকায় আসার আর ভয় নেই।'

এই মিটিং-এর পর এক মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের ভয় কাটেনি, তারা স্বাভাবিক হননি। কেন তাদের ভয় কাটেনি, কেন তারা স্বাভাবিক হতে পারেননি? এর পিছনে খুবই সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিছুদিন আগে আমি এই কলামে যে কথাটা লিখেছিলাম, সে কথাই আবার বলতে চাই। দুর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয় ও ব্যয়ের যে অসঙ্গতিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে ধর-পাকড় চালাচ্ছে, সে অসঙ্গতি ব্যবসায়ীদের শতকরা নব্বই জনের মধ্যেই রয়েছে। এদের দেখা যাবে রাজধানীর র‍্যাংস বিল্ডিং থেকে গ্রাম্য বাজারের কাচা ঘরের কারখানা পর্যন্ত। এদের সবার মধ্যেই দুদক ও এনবিআর ভয় ও অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। এই সাথে প্রতিদিন বিভিন্ন চ্যানেল ও মাধ্যমের খবর এবং চারদিকের আলোচনা তাদের ভীতি ও অস্থিরতা আরও বাড়াচ্ছে। এসব কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ এবং সেনাপ্রধান মইন উ আহমদের অভয়দান এবং নতুন তালিকা প্রকাশ না করার আশ্বাস বাণী তাদের ভীতি ও অস্থিরতা দূর করতে পারেনি।

প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাদের কি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভীতি ও অস্থিরতা সৃষ্টি না হোক, এ জন্যে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান না চালানো উচিত ছিল? দুর্নীতিবিরোধী অভিযান কি ঠিক হয়নি? সবার কাছ থেকেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর আসবে, দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অবশ্যই উচিত হয়েছে, ঠিক হয়েছে। কিন্তু এর সাথে এও বলতে হবে, এই উচিত ও ঠিক কাজের ফলাফল ভালো হয়নি। তাহলে এই দুই বৈপরীত্যের সমন্বয় হবে কিভাবে? ভীতি ও অস্থিরতা সৃষ্টি না করেও দুর্নীতি দমন কিভাবে সম্ভব?

লাঠি না ভেঙ্গে সাপ মারার এই কাজ সম্ভব ছিল। দুর্নীতি একটি অপরাধ। একে দমন করার আইনী বিধান আছে। কোন সরকার আন্তরিক হলে এবং সিদ্ধান্তে অনড় হলে আইনের মাধ্যমেই এক এক করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া যায়। এবার মামলা দায়ের হবে, বিচার শুরু হবে, বিচার চলবে, রায় হবে এবং অপরাধী শাস্তি পাবে, এটাই আইনের পথ। ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে, গ্রেফতারের মহোৎসব না করেও এই কাজ করা যায়। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো এটা করে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই কাজ এইভাবেই হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই কাজ শুরু হয়েছিল ঝড়ের মত। একদিকে তদন্ত নাই, মামলা নেই কিন্তু গ্রেফতারের হিড়িক, অন্যদিকে দেশজুড়ে অবৈধ স্থাপনা ভাঙ্গার তীব্র-গতি সয়লাব, এই সাথে রাস্তার হকার, বস্তি উচ্ছেদের টর্নেডো– সব মিলে ভীতির এক কাল চাদর ঢেকে দেয় দেশের মানুষকে, বিশেষ করে ব্যবসায় ও রাজনীতিকদেরকে। আমি মনে করি অনড় সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনী পন্থায় দুর্নীতি দমনে এগুলে এই ঝড় সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন যে ছিল না একথা পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও উপলব্ধি করেছেন, করছেন। বস্তি উচ্ছেদ এখন তারাই বন্ধ করেন, তারাই আবার এখন ঘোষণা দিচ্ছেন হকাররা রাস্তায় আবার আগের মতই বসতে পারে। সবশেষে ব্যবসায়ীদের আতঙ্ক তারা নিজেরাই দূর করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। তদন্তের

www.pathagar.com

আগে ধরা হবে না। আশ্বাসও এখন তারা দিয়েছেন। দুর্নীতিবাজদের তালিকাও আর প্রকাশ করবেন না, এ কথা তারাই বলছেন। ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে এসব কথা বলার পর তারা রাজনীতিকদের ব্যাপারে কি করেন, এটাও দেখা অপেক্ষায় এখন মানুষ। কারণ, ব্যবসায়ী রাজনীতিক অথবা ব্যবসায়ী-প্রযোজিত রাজনীতিকদের সংখ্যাই এখন বেশি। যা হোক, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এসব পেছন-হটাই প্রমাণ করে দুর্নীতি দমনের নামে 'গ্রেফতার ও ভাঙ্গা'র ঝড় তোলা ঠিক পদ্ধতি ছিল না। এই পদ্ধতি দেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র ও সংবিধানের কি ক্ষতি করেছে তার মূল্যায়নের সময় এখনও আসেনি, কিন্তু অর্থনীতির কি করেছে তা খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে।

আরেকটা কথা, দেশের উন্নয়নের জন্যেও ঝড়ো-পদ্ধতির দুর্নীতি দমন অভিযান আশু হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না। কারণ দেশের লাখো ব্যবসায়ী-রাজনীতিকদের আয়-ব্যয়ের অসঙ্গতি, কথিত চাঁদাবাজি, অনিয়ম, আত্মসাতের মধ্যেই বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইমার্জিং টাইগারে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অস্থিরতা এবং দুই বড় দলের মধ্যে হানাহানি না থাকলে দেশের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হতো অবশ্যই। কিন্তু এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত-অস্থিরতা দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি, অধোগতির দিকে ঠেলে দেয়নি, বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নই এর প্রমাণ। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের তদানীন্তন (২০০৬) কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিনা ওয়ালিকও এই বাস্তবতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার এক বিদায়ী বক্তব্যে বলেন,

"বাংলাদেশ এসব (দ্রুত উন্নয়ন) অর্জন করেছে, যদিও ব্যাপকভাবে ধারণা রয়েছে যে, এ দেশে সুশাসনের অভাব আছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নেই জবাবদিহির নিশ্চয়তা এবং এ দেশের প্রধান দু'টি দলের তিক্ত শত্রুতা যেখানে ব্যাপক অনিষ্টের কারণ। এই অগ্রগতি ঘটেছে এমন এক পরিস্থিতিতে যখন দেশটি লড়ে চলেছে এর রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্যে এবং দেশটি দেশের নাগরিকদের প্রয়োজনীয় জনসেবা যোগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটাই বাংলাদেশী প্যারাডক্স। যেখানে ধরে নেয়া হয় এখানে সুশাসনের অভাব, সেখানে এ ধরনের ছাপ ফেলার মত সাফল্য অর্জন কি করে সম্ভব হলো? এর চাবিকাঠি হচ্ছে শাসন প্রক্রিয়ায় এসব সাফল্য ও ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নেয়া।" (যায়যায়দিন, ২০ নভেম্বর, ২০০৬)

ক্রিস্টিনা ওয়ালিক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শক্তিমত্তার প্রশংসা করার সাথে রাজনৈতিক দুর্বলতার দিকেও অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, এই দুর্বলতা নিয়েই বাংলাদেশের রাজনীতিকরা বাংলাদেশের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছেন।

দুর্নীতি নামক কালসাপ মারা দরকার অবশ্যই। কিন্তু সে সাপ মারতে হবে লাঠি না ভেঙ্গেই। আমাদের রাজনীতি ও রাজনীতিকদের দুর্বলতা ও দুর্নীতি অবশ্যই দূর করতে হবে, কিন্তু তা রাজনীতি ও রাজনীতিকদের মাথা ভেঙ্গে নয়। অপরাধ করে ব্যক্তি। দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিকে পাকড়াও করবে আইন। এ জন্যে সাজগোজ করে ঝড় তোলার প্রয়োজন নেই। সকলেরই জানা, ঝড় নির্বিচারে আগাছা, গাছ দুইয়েরই ক্ষতি করে। আমাদের অর্থনীতিতে আজ এটাই ঘটেছে।

২০ অক্টোবর, ২০০৭

www.pathagar.com

আমাদের সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার এক বক্তব্যে বলেছেন, শুধু বৈদেশিক শত্রু নয়, দেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্যও ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়।' দেশকে দেশের শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য শুধু জরুরি অবস্থা ঘোষণা নয়, ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনও স্থগিত করতে হয়।

যে কারণে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন হতে পারেনি, যে অপরিহার্য কারণে দেশে জরুরি আইন ঘোষণা করতে হয়েছে, সেটা অবশ্যই খুব বড় কারণ এবং যে শত্রুরা এই কারণ সৃষ্টি করেছে, তারা খুবই বড় শত্রু। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই শত্রুরা দেশের ভেতরেও রয়েছে। এদের হাত থেকেই দেশকে রক্ষার জন্য ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়েছিল এবং সেনাবাহিনী এগিয়ে এসেছিল জাতির পাশে দাঁড়াবার জন্য। আমাদের সেনাপ্রধান এই শত্রুর হাত থেকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে দেশকে রক্ষার কথা বলেছেন, কিন্তু শত্রুর পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলেননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের গত ১ বছরের শাসনে এই শত্রুকে চিহ্নিত করেছেন, এমন কথা তাঁরাও বলেননি, কিংবা দেশের বিরুদ্ধে শত্রুসুলভ আচরণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন বলেও জানা যায়নি। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। দেখা যাচ্ছে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাইরে দুর্নীতি দমনকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের প্রধান কর্মসূচি বলে মনে করছে। দেশের শত্রুদের চিহ্নিত করা, শাস্তি দেয়ার কোন চিন্তা, কোন কথা, কোন উদ্যোগই দেখা যায়নি।

অতএব দেশের শত্রু যাদের কারণে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হতে পারেনি, যাদের কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছে বলে সেনা প্রধান বলেছেন, তারা ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলেও তারা বায়বীয় বস্তু নয়। তারা মানুষ। জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগে তারা সক্রিয় ছিল। দেশের শত্রুতামূলক কাজে তারা এতটাই সক্রিয় ছিল যে দেশ রক্ষার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে। সুতরাং এদের খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগের দিনগুলোর ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই এদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয় ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি। ১১ জানুয়ারির পর দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিন ছিল ২৮ অক্টোবর। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় ৩১ অক্টোবর তারিখে। আরেকটি বড় ঘটনা ঘটে ২৮ অক্টোবর তারিখে। এদিন পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লগি-বৈঠা খ্যাত গণহত্যা ও লাশের ওপর উঠে নৃত্য করার ঘটনা ঘটানো হয়। যা জাতিসংঘ অফিসকেও আলোড়িত করে। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান দেশের মানুষকে সংযম ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার আহ্বান জানান।

চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিনে অন্তর্বর্তীকালের সূচনায় একটা 'no-government' সিচুয়েশনে এই নৃশংস গণহত্যা কেন ঘটল? প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেন

www.pathagar.com

জন। ১৪ দলের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন, বলেন খালেদা জিয়া। জাবি ভর্তি পরীক্ষা ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত।

২০ নভেম্বর : সিইসিকে স্বেচ্ছায় ছুটির প্রস্তাব। আবার অবরোধ শুরু : সব অচল, বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ভাংচুর, ১৫ জন গুলীবিদ্ধসহ আহত শতাধিক। ১১ দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ চলবে বলেন শেখ হাসিনা। ১৪ দলের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে জাপা : এরশাদ-জলিল বৈঠক। বাণিজ্য স্থবির। বঙ্গভবনের দক্ষিণ পাশের রাস্তায় বোমা বিস্ফোরণ। আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করুন, প্রেসিডেন্টের প্রতি ১১ শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন।

২১ নভেম্বর : অবরুদ্ধ ঢাকা : রাজপথে ১৪ দলের পাশে জাপা, এলডিপি। সংবিধানের মধ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন মেনে নেবে, বলে বিএনপি। প্রতিদিন সিইসির বাসায় খাদ্য পাঠাতে চায় নিউ মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি।

১৯ নভেম্বর : নির্বাচন কমিশন আস্থা হারিয়েছে, বলেন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। ইসি পুনর্গঠন ও ভোটার তালিকা হালনাগাদ ছাড়া তফসিল ঘোষণা ১৪ দল মানবে না, বলেন জলিল। সব ওসি, এসপি বদলি। সংবিধানের বাইরে গেলে চারদলীয় জোটও মাঠে নামবে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। সময়ক্ষেপণ করলে গণঅভ্যুত্থান হবে, বলেন শেখ হাসিনা। সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব দলের সহযোগিতা চাই, বলেন প্রেসিডেন্ট।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে তুমুল সংঘর্ষ : পটিয়ায় এলডিপির গাড়িবহরের চাপায় ২ ছাত্রদল নেতা নিহত। অবরোধে চট্টগ্রাম-বগুড়াসহ বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আহত দেড় শতাধিক : লক্ষ্মীপুরে নিহত ১ জন। বঙ্গভবনের দক্ষিণ পাশের রাস্তা থেকে বোমাসহ দুইজন গ্রেফতার।

২২ নভেম্বর : আজ থেকে ৯০ দিনের ছুটিতে যান সিইসি আজিজ। নতুন দুই কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে আজকের বৈঠক বাতিল। অবরোধে রাজধানীতে দিনভর উত্তেজনা। রাজধানীতে পিকেটারদের ইটের আঘাতে বাস থেকে পড়ে হেলপারের মৃত্যু। অবরোধে বগুড়ায় যুবদল নেতা নিহত : বিভিন্ন স্থানে হামলা-সংঘর্ষে নিহত ৫০ জন। নির্বাচন কমিশনার কে হলেন তা বড় কথা নয়, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে হবে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। জোট সরকারের তাবেদার ব্যক্তিকে সিইসি করলে মানবো না, বলে ১৪ দল। নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হবে, ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ নয়, জাতীয় স্বার্থকে উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে, জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রেসিডেন্ট। নির্বাচন সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য না হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যাহত হবে, বলেন ঢাকায় বৃটিশ মন্ত্রী। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখনো কিছু করেনি– ৬ মুসলিম কূটনীতিককে আওয়ামী লীগ। তেলবাহী ট্যাঙ্কারকে চট্টগ্রামে সীমা অতিক্রম করতে দেয়া হবে না, বলেন মেয়র মহিউদ্দিন। সোনাগাজীতে যুবদল নেতার বাড়িতে হামলা, ৪ বছরের শিশু নিহত। নির্বাচন হলে বিজয়ী হবে না, বুঝতে পেরে ১৪ দল নৈরাজ্য চালাচ্ছে– বলেন খালেদা জিয়া।

www.pathagar.com

২৩ নভেম্বর : আজকের অবরোধ কর্মসূচি বিজয় উৎসবে পরিনত হবে– বলেন জলিল। অবরোধ স্থগিত। আন্দোলন চলবে। ঘোষণা দেয় ১৪ দল। বিপর্যস্ত শিক্ষাঙ্গন, সব পরীক্ষা এলোমেলো। পোশাক খাত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে রাখুন : অনুরোধ করে বিজিএমইএ।

২৪ নভেম্বর : নির্ভুল ভোটার তালিকা ছাড়া তফসিল প্রত্যাখ্যান করবে, বলে ১৪ দল। বঙ্গভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নিতে লাঠি নিয়ে তৈরি থাকুন, বলেন মেয়র মহিউদ্দিন।

২৫ নভেম্বর : বিভিন্ন স্থানে ১৪ দলের সংঘর্ষ, ভাংচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ। রফতানি কার্যক্রমকে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে রাখুন : এক্সপোর্টার্স অফ বাংলাদেশের আহ্বান। ৫ বছর পর বরিশালে ফিরলেন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ।

২৬ নভেম্বর : চট্টগ্রাম বন্দরে অচল অবস্থা অব্যাহত। ১১ জাহাজ বোঝাই পণ্য আটক।

২৭ নভেম্বর : বঙ্গভবনের চারপাশে ১৪ দলের অবস্থান কর্মসূচি। ২১ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা। নতুন দুই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ। বাংলাদেশে নির্বাচনের বিকল্প নেই, বলে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তফসিল ১৪ দলের প্রত্যাখ্যান। বৃহস্পতিবার বঙ্গভবন ঘেরাও। রোববার থেকে লাগাতার অবরোধ। রাজনৈতিক অস্থিরতায় কক্সবাজারের অর্থনীতিতে ৩০০ কোটি টাকা ক্ষতি। বিভিন্ন স্থানে ৪ ও ১৪ দলের মধ্যে সংঘর্ষ। বাড়ি, দোকানপাট ভাংচুর।

২৮ নভেম্বর : নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করে ১৪ দল। আলোচনা করতে জাতিসংঘ বিশেষ দূতের আগমন। ৬ জেলা নির্বাচন অফিসে আগুন। ৩ দিন ধরে শেয়ার বাজারের সূচক পড়ছে।

২৯ নভেম্বর : প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জাতিসংঘের বিশেষ দূত ক্রেইগ জেনেস-এর বৈঠক। রাজনৈতিক সহিংসতায় জাতিসংঘের উদ্বেগ প্রকাশ। জানুয়ারি নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাতে আমরা উদ্বিগ্ন, বলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র নিকোলাস বার্নস। প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ চ্যালেঞ্জ করে রিট। প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব নিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন, বলেন বাদীপক্ষের আইজীবী। প্রেসিডেন্ট সংবিধান লঙ্ঘন নয়, রক্ষা করেছেন, বলেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

৩০ নভেম্বর : আজ বঙ্গভবন ঘেরাও। শুনানি স্থগিত। প্রধান বিচারপতির কক্ষসহ সুপ্রীম কোর্টে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ। স্থগিতাদেশ দুরভিসন্ধিমূলক, জঘন্য, প্রধান বিচারপতি মানি না, তাকে আর মাননীয় বলবো না– বলেন ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ। ১৪ দল সমর্থক আইনজীবীদের ঘোষণা : পদত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির আদালত বর্জন। প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগ করলেই কেবল অবরোধ প্রত্যাহার : বলেন জলিল। ৪ দলের প্রতিক্রিয়া : সুপ্রীমকোর্টে আওয়ামী আইনজীবীদের তাণ্ডবের নিন্দা। আওয়ামী লীগ স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত, বলেন খালেদা জিয়া। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সঙ্কটের দ্রুত সমাধান সম্ভব, বলেন জাতিসংঘ দূত।

www.pathagar.com

ব্যর্থ হলো? জরুরি অবস্থা কোন পরিস্থিতিতে এল? এসব প্রশ্নের জবাব সামনে এলেই জেনারেল মইন কথিত দেশের 'শত্রুরা' দিনের আলোতে আসতে পারে। শুরুর প্রশ্ন থেকেই শুরু করা যাক।

চারদলীয় সরকারের মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে যে মহাবিতর্ক সৃষ্টি করা হয়, তারই একটা বা পরিণতি নাম্বার ওয়ান হলো ২৮ অক্টোবর হত্যাকাণ্ড। যেদিন এই নৃশংস ও বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেদিন বিচারপতি কে, এম, হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার অপারগতার কথা ঘোষণা করেন। পর্বত প্রমাণ চাপ ও হুমকি ধমকি যে বিচারপতিকে টলাতে পারেনি, সেই বিচারপতি যেন এই হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যে একেবারেই ভেঙে পড়েন।

একটা দলের ব্যানারে এই অপরাধ সংঘটিত হয়। হঠাৎ করেই এটা ঘটেনি। এই অপরাধ-কর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল এই দলের অযৌক্তিক, বেআইনী ও অসাংবিধানিক দাবির ঘাড়ে চড়ে। সংবিধান অনুসারে তত্ত্বাবৃধায়ক সরকার গঠন করতে না দেয়ার এই দাবি উঠে জনপ্রিয় চারদলীয় জোটের কাছে তাদের নির্বাচনী পরাজয়ের ভয় থেকে। দেশ জাতি সংবিধান গোল্লায় যাক চারদলীয় জোটকে আবার নির্বাচিত হতে দেয়া যাবে না, এই দুরভিসন্ধি থেকেই তারা প্রথম টার্গেট করে সংবিধান অনুসারে যিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পাবেন, সেই বিচারপতি কে এম হাসানকে। যাতে তিনি নিজের থেকেই এই দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশে বাধ্য হন। এজন্য তাকে হুমকি, ধমকি থেকে শুরু করে তার বাড়ি পর্যন্ত অবরোধ করা হয়। শেষে ২৮ অক্টোবরের নৃশংস গণহত্যার দৃশ্যে নিরপরাধ মানুষের রক্তস্নাত লাঠি-বৈঠার জিঘাংসা দেখে তিনি দায়িত্ব নেয়া থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন।

অপরাধের এটা প্রথম ও ভয়ঙ্কর সাফল্য। এই সাফল্যে পৌঁছতে শুধু ২৮ অক্টোবরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুধু নয়, সংঘাত সংঘর্ষ এবং সড়ক ও নৌপথ অবরোধের মত অনেক অপরাধ সংঘটিত তারা করে। প্রথম সাফল্য তাদের এই অপরাধের হাত আরও বর্ধিত করে।

২৮ অক্টোবর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রক্তরঞ্জিত লগি-বৈঠার মধ্যে এই ক্রাইমের জন্য বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ জাগ্রত হয়নি, বিচারপতি কে এম হাসানকে জঘন্য পন্থায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়া থেকে বিরত রেখে কিছুমাত্র লজ্জাবোধও করেনি। বরং এই দিনই তারা আলটিমেটাম দিয়ে বলে, ২৯ অক্টোবরের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গটিত হতে হবে। সাংবিধানিক অন্যান্য অপশনের ব্যাপারে অনৈক্য, সময়ের অভাব ইত্যাদি নিরূপায় অবস্থার কারণে ২৯ অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট নিজেই সংবিধানের শেষ অপশন হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং ৩১ অক্টোবর তারিখে পূর্ণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়।

এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাত্র ২ মাস ১১ দিন টিকেছিল। লগি-বৈঠাঅলারা এই সময় যে নীতি গ্রহণ করে তা হলো, তাদের কথামতো সব কিছু চলতে হবে, সবকিছু করতে হবে, না হলে তারা কিছুই মানবে না। তাদের ইচ্ছার কাছে নীতি নিয়ম, আইন, সংবিধান কিছুই নয়। লগি-বৈঠার প্রতাপের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থিতিশীলতা

www.pathagar.com

কখনই আসেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে বিদ্রোহ হয়েছে, গণপদত্যাগ হয়েছে, বিভেদবিতর্ক হয়েছে, সবকিছুর মধ্যেই ছিল লগি-বৈঠার কেরামতী। সাংবিধানিক একটি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-কমিশন লাঠি-বৈঠার ছোবল থেকে বাঁচেনি। লণ্ড-ভণ্ড করা হয় নির্বাচন কমিশনকে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ না করলে তাকে ঠ্যাং ধরে টেনে নামানো হবে, এমন ঘোষণা লাঠি-বৈঠাঅলারা করে। শেষ পর্যন্ত তাকে স্বেচ্ছায় বাধ্যতামূলক ছুটিতে যেতে হয়। আরও একজন নির্বাচন কমিশনারকেও ছুটি নিতে বাধ্য করা হয়। দু'জন নির্বাচন কমিশনারকে নেয়া হয়। এরপরও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আস্ফালন থামেনি। সাংবিধানিক আরেকটি প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীমকোর্টও লাঠি-বৈঠার দ্বারা আক্রান্ত হয়, প্রধান বিচারপতি লাঞ্ছিত হন, তার এজলাশ ভাংচুর হয় এবং আগুনও লাগানো হয় সুপ্রীমকোর্টে। আর লাঠি-বৈঠা অপূরণীয় ক্ষতি করে অর্থনীতির। প্রতিদিন ৪০০ কোট টাকা ক্ষতি হয় নির্মাণ শিল্পে। ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি অংকের বাজার হারায় গার্মেন্টস শিল্প। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয় প্রতিদিন ৭০০ কোটি টাকা। আর অচল চট্টগ্রাম বন্দর প্রতিদিন ৪০০ কোটি টাকা হারায়। ২ মাস ১১ দিনের দিনপঞ্জির দিকে একবার তাকালে লাঠি-বৈঠা কি অপরাধ করেছে তার একটা চিত্র দেখা যাবে। আসুন সে দিনপঞ্জির দিকে তাকাই।

৩১ অক্টোবর ঃ দশজন উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ। শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বিউটেনিসের আশা প্রকাশ–রাজপথে সহিংসতা বন্ধ হবে। সব দল নির্বাচনে অংশ নেবে। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আহত ৪৪ জন। বাংলাদেশের সহিংস ঘটনায় জাতিসংঘ ও বৃটেনের উদ্বেগ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য।

১ নভেম্বর : সংঘাত সহিংসতা এড়াতে ১৪ দলের প্রতি বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও দাতাদের আহ্বান। বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সহিংসতা, হামলা, ভাংচুর অব্যাহত, আহত ১৩০। খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমেরিকান অ্যামবাসাডারের দীর্ঘ বৈঠক।

২ নভেম্বর ঃ শেখ হাসিনার সঙ্গে উপদেষ্টা শফি সামী ও সুলতানা কামালের এক ঘন্টা অনির্ধারিত ও গোপন বৈঠক। বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে আহত ৫০ জন। চিকিৎসাধীন দুইজনের মৃত্যু।

৩ নভেম্বর ঃ প্রেসিডেন্টকে ১৪ দলের সাত দিনের আলটিমেটাম : 'নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ দিন, দাবি না মানলে ১২ নভেম্বর থেকে লাগাতার অবরোধ, পল্টনের সমাবেশে ঘোষণা।

৪ নভেম্বর : আওয়ামী লীগের সংঘর্ষে অন্তর্কোন্দলে বিভিন্ন স্থানে নিহত ১, আহত ৩১। কমনওয়েলথের দুই কর্মকর্তা ৯ দিনের সফরে ঢাকায়।

৫ নভেম্বর : সহিংসতার বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার অবস্থান প্রশংসনীয়, বলেন কানাডিয়ান হাই কমিশনার। নির্বাচনে সহায়তা দেবে ইইউ। সংবিধানের বাইরে কোনো কিছু করার সুযোগ নেই, বলেন প্রেসিডেন্ট। বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে আহত ৩২, ৩ শতাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা, তিনটি স্থানে ১৪৪ ধারা জারি।

৬ নভেম্বর : ছাত্রদল-শিবিরকে রাজপথে কবর দিতে ছাত্র-জনতাকে লগি-বৈঠা নিয়ে প্রস্তুত হতে বলেন মুক্তাঙ্গনের সমাবেশে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ নেতারা।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বর : নয়া পল্টনে ৭ নভেম্বরের জনসভায় খালেদা জিয়া বলেন, উপদেষ্টাদের কাজ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, কারো এজেন্ডা বাস্তবায়ন নয়। শেখ হাসিনা বলেন, আজিজকে রেখে নির্বাচনের চেষ্টা হলে রক্ত ঝরবে।

৮ নভেম্বর : নিরপেক্ষ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্তরিক, সবার সহায়তা দরকার : বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের ১২ নভেম্বর থেকে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি নিয়ে সারাদেশের মানুষের উদ্বেগ। উদ্বেগ দেখা দেয় কূটনৈতিক মহলে। আজিজ সরে দাঁড়ালে অবরোধ হবে না, বলে ১৪ দল।

৯ নভেম্বর : ১৪ দলের নানা কর্মসূচি : সিইসি হটাও। অবাধ নির্বাচনে ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালনে সচিবদের প্রতি প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ। ১৪ দলের কর্মসূচিতে রাজধানীতে যানজট ও যানবাহন সঙ্কটে মানুষের চরম দুর্ভোগ।

১০ নভেম্বর : শেখ হাসিনার হুঁশিয়ারি, সারাদেশে অবরোধের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। সিইসিকে অপসারণ করে কমিশন পুনর্গঠন করলে নির্বাচনে অংশ নেবো : অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারকে শেখ হাসিনা।

১১ নভেম্বর : দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক আমেরিকার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচারের আগমন। বাউচার বলেন, আমেরিকা কোনো সহিংসতা দেখতে চায় না। আশা করি সব দল নির্বাচনে অংশ নেবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সময় দেয়া উচিত।' অবরোধ জনগণের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র বিঘ্নিত হলে ১৪ দল দায়ী থাকবে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। বিএনপি পাল্টা কোনো কর্মসূচি দিচ্ছে না। অবরোধে ৮০০ কোটি ডলারের পোশাক শিল্পের বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবে – হুঁশিয়ারি দেয় বিজিএমইএ। কঠোর হস্তে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ : লগি-বৈঠার সমাবেশ নিষিদ্ধ। ১৪ দল নির্বাচন চায় না বলেই দেশকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, পেশাজীবীদের সঙ্গে খালেদা জিয়ার মতবিনিময়। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ইবলিশের সঙ্গে যেতেও রাজি আছি, বলেন এরশাদ।

১২ নভেম্বর : অনির্দিষ্টকাল অবরোধ শুরু। অবরোধে রাজধানী বিচ্ছিন্ন। টঙ্গীতে ট্রেনে আগুন। কয়েক স্থানে ট্রেন আটকা, গাড়ি ভাংচুর। অবরোধ অব্যাহত থাকবে, নতুন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করুন : বলেন জলিল। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাউচারের বৈঠক : নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে আমেরিকা আস্থাশীল। অবরোধে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা। মান্নান ভূঁইয়া বলেন, অবরোধ চলতে থাকলে বিএনপি বেশিদিন বসে থাকবে না। সেনা মোতায়েন হচ্ছে– ডিসি-এমপিদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ। চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল।

১৩ নভেম্বর : অবরোধ কর্মসূচিতে চট্টগ্রাম বন্দর অচল। অবরোধে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ী মহল– একদিনে ক্ষতি ৭০০ কোটি টাকা। অবরোধে দেশ অচল, ঢাকায় পুলিশের গাড়িচাপায় নিহত একজন। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিন, বিএনপি স্থায়ী কমিটি দাবি করে। পরীক্ষা ও ভর্তির মওসুমে অবরোধ : শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। অবরোধে গফরগাঁয় স্লিপার তুলে নেয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনা, আহত ৫০ জন, যাত্রীদের শ্লীলতাহানি, লুটপাট। অবরোধে অসহনীয় দুর্ভোগ, উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। জগন্নাথ

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। সিলেট ও খুলনায় ডাক পরিবহনে বিঘ্ন, আটকে পড়ে কয়েক হাজার চিঠি। চারদলীয় জোটের নীল নকশার নির্বাচন বরদাশত করা হবে না। সম্মিলিত নাগরিক সম্মেলনে ঘোষণা।

১৪ নভেম্বর : উৎকণ্ঠায় গোটা দেশ। অবরোধে স্থবির জনজীবন। অবরোধে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বন্ধ; অচল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রধান উপদেষ্টার পদ ছাড় ন : প্রেসিডেন্টের প্রতি আব্দুল জলিল। ১১ দফা বাস্তবায়ন করুন– শেখ হাসিনা। চট্টগ্রাম বন্দরে ভয়াবহ জাহাজ কনটেইনার জট, ডেলিভারি বন্ধ। চলমান সঙ্কটের দ্রুত সমাধান চেয়েছে ব্যবসায়ী নেতারা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা স্থগিত, ছুটি বৃদ্ধি। চলমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কূটনীতিক তৎপরতা অব্যাহত।

১৫ নভেম্বর : রোববার পর্যন্ত অবরোধ স্থগিত। চার দিনের আলটিমেটাম : নতুন কর্মসূচি ঘোষণা। নাশকতার আশঙ্কায় নির্বাচন কমিশনে নিরাপত্তা জোরদার। ১৪ দলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার হতে হবে, বলেন খালেদা জিয়া। ১৫ লাখ নির্মাণ শ্রমিকের রুটি-রুজি বন্ধ হওয়ার উপক্রম, অবরোধে নির্মাণ শিল্পে দৈনিক ক্ষতি ৪০০ কোটি টাকা : রিহ্যাব। অবরোধে নগরে চিকিৎসা, চাকরি, পরীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন কাজে আটকে পড়া হাজারো মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ। আইন করে অবরোধ, হরতাল বন্ধের দাবি জানান, বাংলাদেশ দোকান মালিক-ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদ নেতারা।

১৬ নভেম্বর : ব্যক্তি নয়, নির্বাচন প্রক্রিয়াই গুরুত্বপূর্ণ : বলেন বৃটিশ হাই কমিশনার। দেশে গণঅভ্যুত্থান পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে দায়-দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের : বলে আওয়ামী লীগ। যাই করি না কেন সংবিধান মেনে চলতেই হবে : বলেন প্রেসিডেন্ট। অবিলম্বে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করুন : খালেদা জিয়া। অবরোধে প্রতিদিনের ক্ষতি আড়াই হাজার কোটি টাকা। হরতাল-অবরোধ নয়, একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান চান ব্যবসায়ী নেতারা। নির্বাচন কমিশনার হাসান মনসুরের বাসায় গুলিবর্ষণ। আরো রক্ত দিয়ে হলেও ১১ দফা বাস্তবায়ন না করে ঘরে ফিরবো না, স্লোগান ওঠে। ঢাকাসহ সারা দেশে ১৪ দলের শোক মিছিল। ইউএনডিপির আশাবাদ : আসন্ন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে।

১৭ নভেম্বর : তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কাল ভোর থেকেই অবরোধ হবে, বলেন শেখ হাসিনা। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন : ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বাড়ি অবরোধ। সিইসিকে না খেয়ে মরতে দেবে না, জানায় বরিশালবাসী। ভোটার তালিকা প্রকাশ ছাড়া নির্বাচনের তফসিল মানবে না ১৪ দল, বলেন জলিল। সিইসির অপসারণ ছাড়া তফসিল ঘোষণা হবে জাতির জন্য চরম প্রতারণা, বলেন মেনন। অবরোধ কর্মসূচি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকর– এ কথা স্বীকার করলেন মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। সিইসি পদত্যাগ না করলেও জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেবে বলেন এরশাদ।

১৮ নভেম্বর : দুই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব। প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সহিংসতা, হামলা-ভাংচুর, আহত ৩৯

www.pathagar.com

০১ ডিসেম্বর : সামরিক শাসন জারির ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে– সুপ্রীমকোর্টে ভাংচুরে প্রবাসীদের প্রতিক্রিয়া। বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের হুমকি রাজনৈতিক বিরোধ– ক্রেইগ জেনস।

০২ ডিসেম্বর : ৫ বিদেশী কূটনীতিকের সঙ্গে জলিলের বৈঠক। অবরোধের কারণে তৃতীয়বারের মতো ভর্তি পরীক্ষা পেছালো জাবির। অনিশ্চয়তায় খুবি। অনেক হয়েছে এবার ভাংচুর, নৈরাজ্য ছেড়ে নির্বাচনে আসুন, বলেন মান্নান ভূঁইয়া।

০৩ ডিসেম্বর : ১৪ দলের লাগাতার অবরোধ, অবরুদ্ধ ঢাকা। অচল দেশ। বিভিন্ন স্থানে হামলা, সংঘর্ষে আহত ৭৩ জন। রাজনৈতিক সংকট নিরসনে নির্বাচনকালে র‍্যাবের কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হবে, বলেন জলিল। অবরোধ প্রত্যাহার করুন, বলেন প্রেসিডেন্ট। রাজনৈতিক হানাহানির কারণে বিদেশী বিনিয়োগ প্রস্তাব অর্ধেকে নেমে যায়। অবরোধে আবারো অচল চট্টগ্রাম বন্দর। পোশাক শিল্প অবরোধের আওতামুক্ত রাখতে বিকেএমইএর আহ্বান। চট্টগ্রামে সব নির্বাচন অফিস বন্ধ রাখুন, বলেন মেয়র মহিউদ্দিন।

০৪ ডিসেম্বর : নির্বাচন এক মাস পিছিয়ে দিতে বললেন শেখ হাসিনা। অবরোধের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন স্থানে হামলা, সংঘর্ষে আহত শতাধিক। চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা, স্থলবন্দরগুলোতে পঁচনশীল পণ্যবাহী শত শত ট্রাক আটক। বাংলাদেশ কঠিন সময় অতিক্রম করছে, বলেন জাপানিজ অ্যামবাসাডার। অবরোধের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাবেন, বলেন পরিবহন মালিকরা।

০৫ ডিসেম্বর : ২০ লাখ লোক নিয়ে বঙ্গভবন ঘেরাও করা হবে, বলে ১৪ দল। নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে আন্দোলনে যাবে ৪ দল, বলেন মান্নান ভূঁইয়া।

০৬ ডিসেম্বর : ১৪ দলের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচিতে মানুষের দুর্ভোগ। প্রচণ্ড যানজট।

০৭ ডিসেম্বর : নির্বাচন ২ দিন পেছালো, নতুন তফসিল ঘোষণা, ২৩ জানুয়ারি ভোট গ্রহণ। ১৪ দলের সঙ্গে মহাজোট করবে, ঘোষণা দেন এরশাদ।

০৮ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু। খবরে প্রকাশ, নির্বাচন সামনে রেখে সীমান্ত পেরিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্র।

০৯ ডিসেম্বর : সারাদেশে সেনা মোতায়েন। বঙ্গভবনের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি।

১০ ডিসেম্বর : সেনাবাহিনী নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে, আমেরিকা ও বৃটেনের আশাবাদ।

১১ ডিসেম্বর : চার উপদেষ্টার পদত্যাগ। ১৪ দলের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মত প্রকাশ। গণতন্ত্রের জন্য আগামী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বলেন বৃটিশ হাই কমিশনার।

১২ ডিসেম্বর : নতুন চার উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ। চার উপদেষ্টাকে ধাওয়া দিয়ে সমাজচ্যুত করুন, বলেন জলিল। ১৪ দলকে নির্বাচনে আনতে পদক্ষেপ নিন– প্রেসিডেন্টের প্রতি মান্নান ভূঁইয়া।

www.pathagar.com

১৩ ডিসেম্বর : ইয়াজউদ্দিনকে হটিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে হবে, বলেন জলিল।

১৪ ডিসেম্বর : এরশাদের ২ বছরের জেল : নির্বাচনে তার ও জাতীয় পার্টির অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। আমেরিকা চায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিক– বলেন বাউচার। এরশাদের বাসভবনে জলিল, তোফায়েল ও মাহী বি চৌধুরী। বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা আসতে শুরু করে : ইইউ থেকে ১৬০ জন আসতে পারে। বিচারপতি হাসান, আজিজ তো এখন নেই, এবার নির্বাচনে আসুন, ১৪ দলকে বলেন মান্নান ভূঁইয়া। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কমে যাবে– বিশ্বব্যাংকের আশঙ্কা প্রকাশ।

১৬ ডিসেম্বর : ইয়েস উদ্দিনের খপ্পরে পড়ে জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে, বলেন শেখ হাসিনা।

১৭ ডিসেম্বর : এরশাদ নিখোঁজ। ৯ সদস্যের ইইউ পর্যবেক্ষক দল ঢাকায়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আবারো সমঝোতার আহ্বান জানালেন কফি আনান। নির্বাচন ছাড়া অন্য পথে সরকার গঠনে এলডিপি বিশ্বাস করে না, বলেন, ডা. বি চৌধুরী।

১৮ ডিসেম্বর : এরশাদ বি চৌধুরীকে নিয়ে ১৪ দলের মহাঐক্যজোট গঠন। ঘোষিত তফসিলে নির্বাচন নয়, বলেন হাসিনা। ২১ ডিসেম্বর মনোনয়ন দাখিলের দিন হরতাল ঘোষণা। অধ্যাদেশ কিংবা আদালতে নির্বাচনের তারিখ পেছানো যাবে না, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। নিখোঁজ থেকে সোজা পল্টনে জনসভায় যান এরশাদ। দু'দিন ছিলেন শেখ হেলালের বাসায়।

১৯ ডিসেম্বর : ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে, বলেন খালেদা জিয়া। সংকট মোচনে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতে হবে– আমেরিকা ও কানাডার পরামর্শ।

২০ ডিসেম্বর : নির্বাচন কমিশনার স ম জাকারিয়া ছুটিতে যাবার ঘোষণা দেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাপার রাজনৈতিক চুক্তি হয়েছে, বলেন কাজী জাফর। তৃতীয়বারের মতো নির্বাচনী তফসিল পরিবর্তন। ভোট গ্রহণ ২২ জানুয়ারিতেই। রাজনৈতিক লোভ ও ক্ষমতার মোহ জাতীয় কাঠামো ধ্বংস করে দিচ্ছে, বলেন ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি।

২১ ডিসেম্বর : আজ মহাজোটের হরতাল, হরতালে অ্যাকশনে সেনাবাহিনী। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে, বলেন ইইউ পর্যবেক্ষণ দল। নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনপ্রিয়তা যাচাই করুন, বলেন ১৪ দলকে মান্নান ভূঁইয়া।

২২ ডিসেম্বর : আবারো তফসিল পরিবর্তনের দাবি করেছে ১৪ দল। হাসিনা-এরশাদ দীর্ঘ বৈঠক।

২৪ ডিসেম্বর : আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা পুনঃনির্ধারণ করা হয় ২৬ ডিসেম্বর। মহাজোটের নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা। আসন ঘোষণা নিয়ে মহাজোটের টানাপড়েন। আওয়ামী লীগের ঘোষণা বিলম্বিত। ফেলাফত মজলিসের সঙ্গে পাঁচ দফা চুক্তিতে সমালোচনার ঝড়।

www.pathagar.com

২৫ ডিসেম্বর : মহাজোটের আসন বণ্টনে ফয়সালা হয়নি। এলডিপি অসন্তুষ্ট। দলীয় প্রার্থিতা প্রত্যাহারপত্র রেখে দেয় আওয়ামী লীগ।

২৬ ডিসেম্বর : পাঁচ বছর পর বিদেশ থেকে ফিরলেন শামীম ওসমান। রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে শতাধিক আহত, দুই শতাধিক গাড়ি ভাংচুর। নির্বাচনে অংশ নেয়া এরশাদের অনিশ্চিত। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের ৩০০ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল।

২৭ ডিসেম্বর : এরশাদের মনোনয়ন বাতিল। ভোট বর্জনের হুমকি। শেখ হাসিনার সঙ্গে এরশাদের দীর্ঘ বৈঠক : আবার হরতাল, অবরোধ, ঘেরাওয়ের হুমকি।

২৮ ডিসেম্বর : এরশাদ ইস্যুতে সংকটে মহাজোট। মহাজোট নিয়ে আওয়ামী লীগ মহাজটে পড়ে নির্বাচনের বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। নির্বাচন কমিশন থেকে ১০৮ জন বিদেশী পর্যবেক্ষককে ক্লিয়ারেন্স। আল-জাজিরা ও ইনডিয়া থেকে সাংবাদিক এলেন।

২৯ ডিসেম্বর : নো এরশাদ, নো ইলেকশন অবস্থান মহাজোটের নয়, জাতীয় পার্টির, বলেন শেখ হাসিনা। দাবি না মানলে ৭, ৮ জানুয়ারি মহাজোটের অবরোধ হবে। নির্বাচন শেষ পর্যন্ত হবে না, বলেন এরশাদ। সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির জন্য ১৪ দল আবার অবরোধ দিয়েছে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। আঘাত এলে পাল্টা আঘাত হানো, ভোট কারচুপি হলে ভোট কেন্দ্র বন্ধ করে দাও– নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে শামীম ওসমান।

৩০ ডিসেম্বর : জাতীয় পার্টি ছাড়া মহাজোট নির্বাচনে যাবে না, বলেন এরশাদ। অবরোধের নামে ফের অরাজকতা সৃষ্টি করলে জনগণ বসে থাকবে না, বলেন মান্নান ভূঁইয়া।

৩ জানুয়ারি, ২০০৭ : মহাজোটের প্রেস কনফারেন্স : 'নির্বাচন বর্জন, ইয়াজউদ্দিনকে প্রধান উপদেষ্টার পদ ছাড়তে হবে, নতুন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করতে হবে।" জাতি যখন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত, তখন মহাজোটের এ ঘোষণায় হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। অবরোধ কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে, সেনাবাহিনী মাঠে থাকবে। সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার জন্য মহাজোটের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান : যুক্তরাজ্য ও ইসি হতাশ।

৪ জানুয়ারি : এলডিপি ভেঙে বিএলডিপি গঠিত। ১৭ জানুয়ারির মধ্যে এরশাদকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ। ২২ জানুয়ারি নির্বাচন বন্ধ করুন– ১৪ দলের দাবি। ভারপ্রাপ্ত সিইসি'র পদকে চ্যালেঞ্জ করে রিট। হাসান, আজিজ গেছে, এবার ইয়াজউদ্দিনের পালা, বলেন শেখ হাসিনা। গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সব দলের অংশগ্রহণ জরুরি– বিএনপি নেতাদের সঙ্গে ইইউ পর্যবেক্ষণ দলের বৈঠকের মন্তব্য। পরিস্থিতি জটিল হলেও নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হতে হবে, নির্বাচন কমিশনের মন্তব্য।

৫ জানুয়ারি : নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ জয়ের নিশ্চয়তা চায়– ৪ দলের প্রতিক্রিয়া। মহাজোটের বিক্ষোভ সমাবেশে ঘোষণা, "ভোট কেন্দ্রে গেলে জীবন নিয়ে ফিরতে দেয়া হবে না।" এলডিপি'র ১২ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত লাগাতার অবরোধ ঘোষণা। ২২ জানুয়ারি নির্বাচন যেকোন মূল্যেই প্রতিহত করা হবে, বলেন মেয়র মহিউদ্দিন।

www.pathagar.com

৬ জানুয়ারি : ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশনের কার্যক্রম আপাতত স্থগিত। সুধাসদনে মার্কিন ও বৃটিশ রাষ্ট্রদূত। ৯০ দিনের বাইরে নির্বাচন করার সুযোগ নেই, বলেন প্রেসিডেন্ট। এফবিসিসিআই জরুরি অবস্থা চায়। নির্বাচন না করার অধিকার সবার আছে বাধা দেয়ার অধিকার কারও নেই, বলেন মান্নান ভূঁইয়া।

৭ জানুয়ারি : মহাজোটের টানা তিন দিন অবরোধের সূচনা। রাজধানী বিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন স্থান রণক্ষেত্রে পরিণত। দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা, সংঘর্ষ, গাড়ি ভাংচুর, আহত অর্ধশতাধিক। অচল চট্টগ্রাম বন্দর। রাষ্ট্রপতি ভোটারবিহীন সাজানো নির্বাচন করছেন, বলেন জলিল। নির্বাচন হতেই হবে, রেফারেন্সের সুযোগ নেই, বলেন মান্নান ভূঁইয়া। ভোটার সংখ্যা ৯ কোটি ৩০ লাখ ৫১৩ জন যা ২০০১-এ ছিল ৭ কোটি ৪৯ লাখ ৪৬ হাজার ৩৬৪ জন। অবরোধে পিছিয়ে গেল রাজধানীর বেশিরভাগ স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা। রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিপর্যয়ের মুখে তৈরি পোশাকশিল্প। মহাজোট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেলে চট্টগ্রাম বন্দরকে ট্রানজিট সুবিধা দেবে, বলেন মেয়র মহিউদ্দিন। আন্দোলন অবরোধের কারণে ৭৭ দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষাও হয়নি, ক্লাস হয়েছে মাত্র তিন দিন। অবরোধের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা স্থগিত।

৮ জানুয়ারি : অবরোধে স্থবির জনজীবন : রাজধানীর ৭ পয়েন্টে দফায় দফায় সংঘর্ষ, বোমাবাজি, মালিবাগ ও চকবাজার রণক্ষেত্রে পরিণত। চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার জট। পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারবে সেনাবাহিনী।

৯ জানুয়ারি : বঙ্গভবন ঘেরাও। অবরোধে বিভিন্ন স্থানে হামলা-সংঘর্ষ : আহত দেড় শতাধিক। ৫৫টি গাড়ি ভাংচুর, জয়পুরহাটে ট্রেনে হামলা। সংকট নিরসনে বিদেশি কূটনীতিকদের কোন ভূমিকা নেই, বলেন কানাডিয়ান হাইকমিশনার। দেশে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চলছে, বলেন খালেদা জিয়া। অবরোধে সাভার ইপিজেডের কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থবির, কর্মহীন দুই লাখ শ্রমিক। ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে রাজনৈতিক সংকটমুক্ত রাখতে ভিসির আহ্বান।

১০ জানুয়ারি : পল্টনে মহাজোটের বিশাল জনসভা : যারা নির্বাচনে অংশ নেবে তারা গণদুশমন, নির্বাচন প্রতিহত করুন– বলেন শেখ হাসিনা।

১১ জানুয়ারি : জরুরী অবস্থা ঘোষণা। জাতির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের ভাষণ।

৩১ অক্টোবর থেকে ১১ জানুয়ারি '০৭ পর্যন্ত সময়ের যে দিনপঞ্জি সামনে আনা হলো, সে দিনপঞ্জির রঙ্গমঞ্চে প্রধান সক্রিয় নট হলো লাঠি-বৈঠার অবরোধ ও সন্ত্রাস। রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য নটের মধ্যে রয়েছে সদ্য ক্ষমতাত্যাগী ৪ দলীয় জোট, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিরা। এদের মধ্যে ৪ দলীয় জোটের ভূমিকা ছিল সংবিধান, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষে। অবশ্য তারা নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তন মেনে নিয়েছে। সিইসি আবদুল আজিজ ও অন্য একজন নির্বাচন কমিশনারের পরিবর্তনে তাদের মত ছিল না, কিন্তু লাঠি-বৈঠার আওয়ামী লীগের দাবিকে এ্যাকোমোডেড করার জন্য তারা এসব পরিবর্তন মেনে নেয়। দ্বিতীয় নট হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার

www.pathagar.com

সংবিধান মেনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন করার জন্য সব দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের দাবি যথাসাধ্য এ্যাকোমোডেট করার জন্য কসরত চালিয়ে গেছে। তৃতীয় নটরা ছিলেন ঢাকাস্থ বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিরা। তাদের ভূমিকা ছিল দুর্বোধ্য। তারা কখনও বলেছেন, 'আইন ও সংবিধান রক্ষা করতে হবে।' কখনওবা বলেছেন, সবদলের মত নিয়ে, সকলকে সম্মত করে চলতে হবে। এক কথায় সদস্যা তারা বাড়িয়েছেন, কমাননি। ২ মাস ১১ দিনের উপরোক্ত ঘটনাপঞ্জির সময়ে একক নটের ভূমিকায় ছিল লাঠি-বৈঠা। এই লাঠি-বৈঠা যেমন ২৮ অক্টোবরের গণহত্যার জন্য দায়ী, তেমনি প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। তারা যেমন দায়ী বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্যে, তেমনি সিইসি আবদুল আজিজ ও নির্বাচন কমিশনার স ম জাকারিয়াকে সরে যেতে বাধ্য করার জন্যও দায়ী। দুই মাস এগার দিনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যত সন্ত্রাস, যত অবরোধ এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী যত ঘটনা ঘটেছে, তা ঘটিয়েছে লাঠি-বৈঠাধারীরা তাদের কারণেই ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হয়নি এবং ১১ জানুয়ারি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে দেশকে রক্ষার জন্যে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগের কয়েকদিন বঙ্গভবন অবরুদ্ধ ছিল। বঙ্গভবনে এমনকি অক্সিজেন বন্ধেরও হুমকি দেয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

জেনারেল মইন উ আহমেদ যাদেরকে দেশের শত্রু বলেছেন, তারা উপরোক্ত নটদের মধ্যেই রয়েছে। দেশের শত্রুদের পরিচয় হলো তাদের কারণেই দেশকে রক্ষার জন্য জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। এই পরিচয় থেকে পরিষ্কার লাঠি-বৈঠাকেই দেশের শত্রু বলা হয়েছে। লাঠি-বৈঠার কারণেই দেশে জরুরি অবস্থা হয়, যার কারণে ২২ জানুয়ারির নির্বাচনও বাতিল হয়ে যায়।

দেশের শত্রু চিহ্নিত হবার পর যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দাঁড়ায় সেটা হলো দেশের শত্রু লাটি-বৈঠার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। তাদের পাকড়াও করছে, মামলা দিচ্ছে। কিন্তু লাঠি-বৈঠা দেশের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করল, তার বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যারা ২৮ অক্টোবরের গণহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে, যারা বিচারপতি কে এম হাসানের গাড়ি অবরোধ করেছিল, যারা বিচারপতি আবদুল আজিজের বাসভবন অবরোধ করেছিল, যারা সুপ্রিমকোর্ট ভাংচুর করেছিল, যারা বঙ্গভবন ও নির্বাচন কমিশন অবরোধ করেছিল, যারা রাস্তাঘাট, নদীপথ, রেলপথ অবরোধ করে মানুষকে অসীম কষ্ট দিয়েছে, শত মানুষের আহত-নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অপরাধী ও নির্দোষ উভয়ের জন্য লেভেল প্লেইং গ্রাউন্ড তৈরি সুবিচার নয়, অবিচার। আর দুর্নীতি দমন দেশ ও জাতির জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়, কিন্তু দুর্নীতি জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে কোন ইস্যু ছিল না, ইস্যু ছিল লাঠি-বৈঠার সন্ত্রাস। নাম উচ্চারণ না করলেও জেনারেল মইন উ আহমদ জরুরি অবস্থা ঘোষণার কারণ লাঠি-বৈঠাকেই দেশের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অভিযান পরিচালনা করলেও লাঠি-বৈঠার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশনে যায়নি।

www.pathagar.com

সরকার ও প্রশাসনকে ধন্যবাদ যে, ২৮ অক্টোবর গণহত্যার জন্য লাঠি-বৈঠাকে আসামী করে দায়ের করা একটা বড় মামলা সিএমএম আদালতের মামলার তালিকায় রয়েছে। লাঠি-বৈঠার অপরাধের এটাই একমাত্র মামলা। লাঠি-বৈঠা যদি দেশের শত্রু হয়, তাহলে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে এটাই একমাত্র মামলা। কিন্তু এই একটি মাত্রা মামলাও যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি, পাচ্ছে না। এক বছরে এই মামলার চার্জশীট দাখিল হওয়ার মত কাজটাও হয়নি, বিচার তো দূরে!

এই অবহেলা সত্যিই বিস্ময়কর। একদিকে দেশের শত্রু লাঠি-বৈঠা ২ মাস ১১ দিন ধরে একের পর এক যে অপরাধ করেছে, তার কোনটিকেই আমলে এনে মামলা দায়ের হয়নি, একমাত্র ২৮ অক্টোবরের একটি ঘটনা ছাড়া। কিন্তু সেই আটাশ কেন্দ্রিক মামলাগুলোও সীমাহীন অবহেলার শিকার।

এর অর্থ হলো, যে কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলো, যে কারণে দেশে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হতে পারলো না, সেই কারণকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। সে কারণ গুরুত্ব পাচ্ছে না বলেই প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গ্রহণ করেনি। ব্যাপারটা 'টাকা ছেড়ে আঁচলে গেরো'র মতো। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর লাঠি-বৈঠার বিচারই প্রথম হওয়া উচিত ছিল। এটাই হতো দেশের সুস্থ রাজনীতি সুরক্ষার সবচেয়ে বড় কাজ। দেশের লাটি-বৈঠার সাথে বাইরের কালো হাত অবশ্যই ছিল। এই কালো হাতের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফল হতে না দেয়, এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে দুর্বল করা এবং তাদের আধিপত্যবাদী নীলনকশা এই পথে বাস্তবায়ন করে তোলা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার লাটি-বৈঠার অপরাধকে আমলে না এনে বিদেশী কালো হাতকে আড়ালে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে। জেনারেল মইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে নিউইয়র্ক ত্যাগের আগে গত ২৪ অক্টোবর বলেছেন, "রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি হিসেবে জীবন্ত মানুষ হত্যার বিভীষিকার সেই দৃশ্য কেউ কখনো ভুলতে পারবে না।" অন্য কেউ ভুলতে না পারলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভুলে গেছেন, এটাই সত্য। এই সত্য বড় বেদনাদায়ক!

২৮ অক্টোবর, ২০০৭

রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার

আবু সোহায়েল : মার্কিন রাষ্ট্রদূত তার গোটা কার্যকালে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন, যাবার সময়ও বলে গেলেন। সে দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সাথে বিদায়ী সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'সংস্কার চাপিয়ে দেয়া যায় না, রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর থেকেই সংস্কার আনতে হবে।' মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের মধ্যে এই ইঙ্গিত আছে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর সংস্কার চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস এ কথা

www.pathagar.com

বলার পরদিনই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. এ. মতিন পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, সংস্কার কারও ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে না। যোগাযোগ উপদেষ্টা একথা বললেন, আইন ও তথ্য উপদেষ্টা কিন্তু কিছুদিন আগে এ ধরনের কথা বলেছিলেন যে, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার না হলে ঘরোয়া রাজনীতি চালু হবে না। এই কথায় চাপ আছে এই অর্থই দাঁড়ায়। আমি মনে করি, এ বিষয়টা বিতর্কের ইস্যু হওয়া উচিত নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার চাইতে পারেন, যা চাইতে পারেন তার জন্যে চাপও দিতে পারেন। কারন, তাদের এই চাওয়াটা শুধু তাদের নয়, দেশের জনগণও রাজনীতির, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার চাচ্ছেন। আর রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের বলে রাজনৈতিক দলগুলোও সংস্কার চাচ্ছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার এইভাবে সকলের চাওয়া হয়ে উঠল কেন? ১১ই জানুয়ারির জরুরি অবস্থা ঘোষণা তো রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের উদ্দেশ্যে হয়নি। হয়েছে নৈরাজ্যের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য। তাহলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার প্রথম এজেন্ডা হয়ে দাঁড়াল কি করে?

এর উত্তর পেতে হলে পেছনের রাজনীতির দিকে, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব, আমদের রাজনীতি সুস্থ নয়। তার নাম গণতন্ত্র বটে, কিন্তু গণতন্ত্র সেখানে নেই। গণতন্ত্রের নিয়ামক হবেন যে রাজনৈতিক দলগুলো, তা দায়িত্বশীল নয়। বিচার মানি কিন্তু তাল গাছটা আমার, এটাই অনড় নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের। তারা নির্বাচন মানেন, রায় মানেন, যদি সে রায় তাদের ক্ষমতায় পাঠায়। এই প্রবণতা আমাদের রাজনীতিতে উৎকট হয়ে উঠেছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ আওয়ামী লীগ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও প্রথম দিন থেকেই সংসদকে তারা অচল করেনি। পরে মেয়াদের শেষ দিকে তারা সরকার বিরোধী হিংসাত্মক ও জ্বালাও-পোড়াও এবং লাগাতার হরতালের যে রাজনীতি করে, তা কোন মতেই কোন দিক দিয়েই গণতান্ত্রিক দায়িত্ব বোধের মধ্যে পড়ে না। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ বিএনপি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সংসদকে অচল করে দেয়ার মত কার্যক্রম দু'বছর পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। দু'বছর পরে বিএনপি, জামায়াতসহ কতিপয় দল মাঝে মাঝে পার্লামেন্ট বর্জনসহ সরকারকে অচল করে দেয়ার আন্দোলন শুরু করে। এই সময় পার্লামেন্টের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কলংকের একটা কালোদাগ আসন গেড়ে বসে। সেটা হলো 'টেলিভিশন থেরাপি'। 'থেরাপি' চিকিৎসা করার এবং মানুষকে সুস্থ করার একটা পদ্ধতি। কিন্তু পার্লামেন্টের ভেতরের দৃশ্য টেলিকাস্ট করার সুযোগে গণতন্ত্রকে অসুস্থ করার কাজে আওয়ামী সরকার ব্যবহার করে। পার্লামেন্টের টিভি প্রচারে সরকারি সদস্যের ভূমিকাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা এবং বিরোধী পক্ষের ভূমিকাকে বিকৃত করে দেখানো হতে থাকে। বিএনপি-জামায়াতসহ বিরোধীদলীয় সদস্যরা একে তাদের সংসদ বর্জনের একটা ইস্যু হিসাবে কাজে লাগায়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে এই মেয়াদের শেষদিকে সংসদের ভেতরে ও বাইরে তীব্র আন্দোলন করে বিএনপি ও জামায়াত। তবে পার্থক্য এই ছিল যে, বিএনপি-জামায়াতের আন্দোলন আগের আওয়ামী আন্দোলনের মত ধ্বংসাত্মক ছিল না। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নিজেই তখন বলত, হরতাল ডাকে

www.pathagar.com

বিএনপি, জামায়াত, কিন্তু মাঠে থাকে আওয়ামী লীগ। গণতন্ত্রের জন্যে আন্দোলনে শক্তির ব্যবহার করতে চায়নি বিএনপি ও জামায়াত। শক্তির জোরে মাঠে থাকার চ্যালেঞ্জকে তাই বিএনপি-জামায়াত মোকাবিলা করতে চায়নি।

কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে শক্তির ব্যবহার এবং নির্বাচন মানি, তবে বিজয় আমার হতে হবে –এই আওয়ামী অভ্যাস ও মানসিকতা ২০০১ সালের নির্বাচনের পর গণতন্ত্রের সকল নীতি-নিয়ম পদদলিত করে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের রাতে যখন আওয়ামী লীগের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন তারা নির্বাচনের ফল বাতিল করার জন্যে প্রেসিডেন্টের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। প্রেসিডেন্ট তাদের বেআইনি ও অন্যায় দাবি প্রত্যাখ্যান করলে এরপর তারা সংসদ সদস্যরা যাতে শপথ নিতে না পারে, এজন্যে তাদের স্পীকারকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে নিষেধ করে। এ উদ্যোগ তাদের ব্যর্থ হলে আওয়ামী সংসদ সদস্যরা শপথ না নেয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু সংসদ সদস্যপথ হারানোর ভয়ে তারা শপথ নেয় বটে, কিন্তু সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই তারা সংসদ অধিবেশন বর্জন শুরু করে। তারপর ৪ দলীয় জোট সরকারের গোটা ৫ বছর মেয়াদেই তারা সরকার পতনের আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা জোট সরকারের পতন ঘটাতে তারা পারেনি। অবশেষে তারা টার্গেট করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে। যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবে, সেহেতু তাদের জনসম্পৃক্ততা থাকবে না এবং যেহেতু তারা শেকড়হীন দুর্বল হবে, সেহেতু তাদেরকে প্রচণ্ড চাপে ফেলে ও ভয় দেখিয়ে আওয়ামী লীগ সব দাবি আদায় করে এমন এক নির্বাচনে যাবে যে নির্বাচন তাদের বিজয়ী করবে। এই লক্ষ্যেই আওয়ামী লীগ ২৮শে অক্টোবরের গণহত্যার মধ্য দিয়ে যে হিংসাত্মক ঘেরাও অবরোধের আন্দোলন শুরু করে, তা দেশ ও জনগণকে ধ্বংস, বিপর্যয় ও নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়। এই ধ্বংস, বিপর্যয় ও নৈরাজ্য থেকে বাঁচানোর জন্যেই আসে জরুরি অবস্থা।

এই যে ধ্বংসের রাজনীতি, এর জন্যে দেশের গোটা রাজনীতিকে আসামি করা সুবিচার হবে না। কারণ, ২৮শে অক্টোবর থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজনীতির যে ধ্বংসাত্মক চেহারা আমরা দেখি তার সাথে দেশের সব রাজনীতিক ও সব রাজনৈতিক দল জড়িত ছিল না। কিন্তু এই পার্থক্য এখন সামনে রাখা হচ্ছে না। তথাকথিত লেভেল গ্রাউন্ডের নামে দোষী-নির্দোষী সবাইকে একপাল্লায় রাখা হচ্ছে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নকে গালি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু ২৮শে অক্টোবর থেকে ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ের বেনজির রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপনাকে অপরাধ হিসাবে দেখা হচ্ছে না। এই সুবিচারেরই বিকল্প হিসাবে এসেছে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার প্রয়াস। এই সংস্কার প্রয়াসে সবাইকে এক সমতলে দাঁড় করাতে গিয়ে 'ভালো'কে ভালো এবং মন্দকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। অথচ ১৯৯১ সাল থেকে গত ১৫ বছরের রাজনীতির যদি গণতান্ত্রিক মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে গণতন্ত্রমনা কিছু দলের সন্ধান মিলবে, আবার শক্তির কাছে গণতন্ত্রকে পণবন্দী করা দলেরও সন্ধান পাওয়া যাবে। এই মূল্যায়নে ভালোদের যদি ভাল বলা হতো এবং মন্দদের মন্দ বলা যেত, তাহলে রাজনীতিতে আরও স্বচ্ছতা আসত এবং সংস্কারও আরও অর্থবহ হতো। এর অভাবে চোররাই এখন চোর চোর বলে চিৎকার করছে বেশী।

www.pathagar.com

তবু সংস্কারই এখন একমাত্র বিকল্প। কিন্তু সংস্কার বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি, কি চাচ্ছি, তা কিন্তু স্পষ্ট হয়নি। বড় দুই দল, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ, সংস্কার নিয়ে এখন খুব বেশী সোচ্চার। দল দু'টির সংস্কারবাদী কিছু নেতা সংস্কার নিয়ে অবিরাম কথা বলছেন। কিন্তু সংস্কারের কোন রূপরেখা তাদের কারও কাছ থেকেই এখনও আসেনি। তারা বলছেন, তারা দলে গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতা নিয়ে আসবেন। কিন্তু কি সংস্কারের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করবেন, কিভাবে তার বাস্তবায়ন হবে, এসব জিজ্ঞাসার জবাব এখন নেই (অবশ্য এমন বিষয়ে মত প্রকাশ ও মত বিনিময়ের জন্যে যে মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ দরকার তা এখন নেই)। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন যে সংস্কারের একটা রূপরেখা দিয়েছে, তা খুবই অসম্পূর্ণ। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্তাবলী বিবেচনা করতে গিয়ে কিছু সংস্কারের চিন্তা তারা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা, কেন্দ্রীয় বা নির্বাহী কমিটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা, দলীয় ফাণ্ডের অডিট করানো ইত্যাদি ধরনের গঠনতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কিছু সংস্কার কাজ। কিন্তু এতটুকু সংস্কারে সংস্কারের দাবি পূরণ হবে না। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতা আনলে রাজনৈতিক দলের সংস্কার হয়তো কিছু হবে, কিন্তু রাজনীতির সংস্কার তাতে হবে না। আর রাজনীতির সংস্কার না হলে ১৯৯১ সাল থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের পরেও আমাদের রাজনৈতিক অংগনে অগণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থ বিরোধী যা ঘটেছে, ২৮শে অক্টোবর থেকে ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত যা ঘটেছে, তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হবে না। এই ধরনের ঘটনা আন্তঃদল দূষণযুক্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ও স্বৈর মানসিকতার ফল। রাজনৈতিক এই বিরোধ-সংঘাত নিরসনের কার্যকর সংস্কার-চিন্তা দলগুলোর চিন্তা-ভাবনায় দেখা যাচ্ছে না এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কার রূপরেখাতেও নেই। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সংস্কার প্রস্তাবে। নিজামী সাহেব একটি দৈনিকে প্রকাশিত (দৈনিক সংগ্রাম, ২২ মে, ২০০৭) 'রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধে সংস্কার বিষয়ে তার ব্যক্তিগত কিছু মত প্রকাশ করেছেন। দশ দফায় লিখিত তার ব্যক্তিগত অভিমতের মধ্যে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার ছাড়াও সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও দাতাদের সাথে সম্পর্কের বিষয়েও মূল্যবান বক্তব্য রয়েছে যা সংস্কার প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তাঁর প্রস্তাবগুলোর ওপর কিঞ্চিত আলোকপাত করা যাক।

তিনি লিখেছেন, সংস্কার কার্যক্রম আইন করে কিংবা বাইরে থেকে চাপিয়ে দিয়ে নয়, স্ব স্ব দলের উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে হবে। একটি রাজনৈতিক দলের ঐক্য এবং এগিয়ে চলার গাইডিং ফোর্স কি হবে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গাইডিং ফোর্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনাব নিজামী বলেছেন, "দলসমূহের রাজনীতিকে অবশ্যই ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে আদর্শ ও কর্মসূচিভিত্তিক হতে হবে। নিজামীর মতে একটি দল ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার বদলে আদর্শ ও কর্মসূচি-কেন্দ্রিক হলে সে দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তিভিত্তিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকতা বৃদ্ধি পায়, নেতা নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয় এবং দলের কোন পর্যায়েই দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব স্থান করে নিতে পারে না। তৃতীয় দফায় নিজামী আন্তঃদলীয় সম্পর্ক বৈরিতামুক্ত বন্ধুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন এবং দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যান, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় ভূমিকা পালন রাজনীতির মূল দাবি হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি লিখেন, ক্ষমতার মসনদে বসে যেমন দেশ সেবা করা যায়, তেমনি ক্ষমতার বাইরে থেকে এমনকি বিরোধী দলে বসেও এই সেবার দায়িত্ব পালন করা যায়", –এই বোধ দল ও রাজনীতিকদের মধ্যে জাগ্রত হবে। চতুর্থ ও পঞ্চম দফায় নিজামী সাহেব আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে হরতাল, অবরোধ এবং উন্নয়ন-উৎপাদন বাধাগ্রস্ত করার মত রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করে এসব কর্মসূচি থেকে বিরত থাকার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে অংগীকারাবদ্ধ হতে বলেছেন। ষষ্ঠ দফায় তিনি নির্বাচনের আচরণবিধি এবং সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে প্রস্তাব রেখেছেন। তিনি লিখেছেন, নির্বাচনের রায় মেনে না নেয়ার মনোভাব অবশ্যই গণতন্ত্রের পরিপন্থি এবং এই মনোভাব অবশ্যই সকলকে পরিহার করতে হবে। তার মতে, সংসদ সদস্যরা আইনপ্রণেতা। তাদেরকে অবশ্যই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিমন্ডল থেকে দূরে থাকতে হবে এবং দূরে রাখতে হবে। জনাব নিজামীর সাত ও অষ্টম দফা দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ দু' দফায় কূটনীতিক ও দাতাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশীদের জড়িত করার প্রবণতা রুখতে হবে। ... . ছুতানাতা কিছু হলেই বিদেশীদের দ্বারে ধরনা দেয়া, দেশের কোন ইস্যুতে বিদেশী কূটনীতিকদের প্রকাশ্য বিবৃতি দানের খারাপ সংস্কৃতি চলছে, তার অবসান হওয়া দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে। দাতাদের ক্ষেত্রেও তিনি একই বলেছেন যে, দাতাদের সাহায্য-সহযোগিতা আমাদের কাম্য, তবে এই সুযোগে তাদেরকে দেশের রাজনীতিতে নাক গলাতে দেয়া যাবে না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখার কথা তিনি বলেছেন নয় নাম্বার দফায়। দশ নাম্বার দফায় ছাত্র-শ্রমিকদেরকে রাজনৈতিক দলসমূহের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি বানাবার বিরোধিতা করেছেন নিজামী।

জনাব নিজামীকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি প্রথম একজন রাজনীতিক যিনি ইদানিংকালের সবচেয়ে হট ইস্যু সংস্কার ব্যাপারে প্রায় সবদিক মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি বক্তব্য দিয়েছেন।

রাজনীতি ও রাজনৈতিকদলগুলো এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কার চিন্তায় যতগুলো বিষয় এ পর্যন্ত উঠে এসেছে, তা দেশের রাজনৈতিক সংকট দূরীকরণে যথেষ্ট নয়। দেশে এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতন্ত্রের সংকট আমাদের রাজনৈতিক সংকটের সবটুকু নয়। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ ও অসহনশীলতা এবং সংঘাত-সংঘর্ষের একটা বড় কারণ হলো জাতীয় মৌলিক ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের অভাব। জাতীয় এই মৌলিক ইস্যুগুলোর মধ্যে রয়েছে দেশ ও জনগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং আমাদের জাতিগত পরিচয়। জাতীয় এই মৌলিক ইস্যুগুলোর ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুধু ঐকমত্যের অভাবই নয়, প্রচণ্ড মতপার্থক্য ও বিরোধ রয়েছে। আমাদের জাতির ইতিহাসে অনেকগুলো মাইল-স্টোন আছে। ১৯৭১, ১৯৪৭, ১৯৪০, ১৯০৬, ১৯০৫, ১৭৫৭ ইত্যাদি এই মাইল-স্টোনের কয়েকটি। এই মাইল-স্টোনগুলোর ইতিহাস নিয়ে যেমন ঐকমত্য নেই (যেমন ১৯৭১

www.pathagar.com

সালে স্বাধীনতার ঘোষণা, জাতির জনক ইত্যাদি), তেমনি ঐকমত্য নেই জাতির পরিচয় ব্যাপারেও। জাতীয় মৌলিক ইস্যুতে এমন বৈপরিত্য কোন দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের রাজনৈতিক বিভেদ ও সংঘাতের বড় কারণ মৌলিক বিষয়ে এই মতবিরোধ। এই মতবিরোধের নিরসনকে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখতে হবে। জনাব নিজামীও জাতীয় এই বিষয়কে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এই বিষয়কে তাঁর নিবন্ধে নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট হিসেবে আলোচনা করেছেন। জাতীয় মৌলিক বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তিনি লিখেছেন, "বাঙলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং এই ব্যাপারে অবশ্যই ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে।"

আনন্দের বিষয় এই ঐকমত্য গড়ে উঠতে পারে যে ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর নিজামী সাহেব তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "আজকের বাংলাদেশ ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে মুসলিম জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিও এটাই। আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় চার জাতীয় নেতা মরহুম শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মরহুম মাওলানা ভাসানী ও মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক ছিলেন। মরহুম শেক মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মরহুম তাজউদ্দীন ও খোন্দকার মুশতাক আহমদ তাদের তরুণ বয়সে ঐ আন্দোলনে শরীক ছিলেন। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পন করে ১০ই জানুয়ারিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণে মরহুম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে ঘোষণাটি কেন দিয়েছিলেন তার তাৎপর্য ভেবে দেখার দাবি রাখে। এখানেই শেষ নয়। তিনি এর বাস্তবতার উপলব্ধি থেকেই প্রতিবেশী দেশ ও রাশিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওআইসির শীর্ষ সম্মেলনে লাহোরে যোগদানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৫-এর সিপাহী-জনতার মাঝে যে আবেগ-অনুভূতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আস্থাকে সকল কাজের উৎস হবার ঘোষণা দিয়ে। এক পর্যায়ে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে সংবিধানে স্থান দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশকে এখান থেকে পেছনে টানার সুযোগ নেই। কারণ, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এখানে মুসলিম শাসন ছিল দীর্ঘ ছয়শত বছর। দুশ' বছরের বৃটিশ শাসনেরও প্রথম ৫০ বছর আদালতে চালু ছিল ইসলামী শরীয়া আইন। দুশ' বছরের শাসনে তারা এটাকে মেটাতে চেয়েও পুরোপুরি মেটাতে পারেনি। আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তি এটাই। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ভিত্তিমূল হিসেবে এটার প্রতি সকলের স্বীকৃতি অবশ্যই থাকতে হবে।"

নিজামী সাহেব তার বক্তব্যে জাতীয় পরিচয়ের একটা রূপরেখা তুলে ধরেছেন। এই বক্তব্যের মৌলিক বিষয়ে যারা দ্বিমত পোষণ করেন, তাদের এ সংক্রান্ত মত কি তা আসা দরকার। তাছাড়া রাজনীতিকরা কিংবা কেউ যদি কোন নতুন বক্তব্য দিতে চান

www.pathagar.com

তাদের বক্তব্যও আসা দরকার। সবার বক্তব্য সামনে রেখে সত্যটা বের করে আনা দরকার, যে সত্য জনগণ দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করবে এবং যে সত্যের ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ থাকবে না। রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার নিয়ে আজ জাতীয়ভাবে যে আলোচনা চলছে, তার মধ্যে এ বিষয়টিকে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা দরকার। এই মৌলিক বিষয়ের সমাধান ছাড়া আমাদের রাজনৈতিক সংস্কার সম্পূর্ণ হবে না।

২৩ জুন, ২০০৭

রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল

রাজনীতিকদের মহাদুর্দিনের সময় এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব বদিউর রহমান রাজনীতিকদের জন্য আশার কথা বলেছেন। গত ২ জুলাই চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভায় সম্ভবত ব্যবসায়ীদের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "ব্যবসায়ীরা সকালে একজন পলিটিশিয়ান কিনে বিকেলে তাকে বিক্রি করে দিতে পারেন।" এনবিআর চেয়ারম্যান তার এই বিশাল মাপের বক্তব্যের কারণও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পলিটিশিয়ানদের চেয়ে আমলারা অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট। কিন্তু ব্যবসায়ীরা পলিটিশিয়ান ও আমলাদের চেয়েও ইন্টেলিজেন্ট।'

এনবিআর চেয়ারম্যানের উক্তিকে আমি রাজনীতিকদের জন্য আশার কথা বলছি এই জন্য যে, তাদের দুর্দিনের দায় তার কথায় কিছু লাঘব হতে পারে। কারণ অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমানদের চারপাশে যদি বেশি বুদ্ধিমানের বাস হয়, তাহলে কম বুদ্ধিমানদের দুর্নীতি দুরাচারের দায় চারপাশের বুদ্ধিমানদের ওপর বেশিরভাগ না হলেও একটা বড় অংশ অবশ্যই বর্তায়। চারপাশের বেশি বুদ্ধিমানরা সৎ হলে, ন্যায়ের পক্ষে সক্রিয় হলে মাঝের কম বুদ্ধিমানরা, যা বলা হচ্ছে, লুট-আত্মসাতের সয়লাব বহাতে পারতো না।

কথাগুলো এনবিআর চেয়ারম্যানের কথার প্রেক্ষিতে 'মজা' করার জন্য বলছি না। একশ্রেণীর রাজনীতিকের দুর্নীতি-দুরাচারপনার কারণে গোটা রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে এমন সব কথা বলা হচ্ছে, যা দেশের চিন্তাশীল মহলকে হতভম্ব করার মত। গত ৪ জুলাই ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার একটা উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। তার শিরোনাম হলো : Should political parties be banned for wholesale corruption? (সর্বব্যাপী দুর্নীতির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত কিনা) শিরোনামে প্রশ্ন চিহ্ন রাখা হলেও নিবন্ধের বক্তব্যে রাজনীতিকদের যেভাবে মুণ্ডুপাত করা হয়েছে, তাতে সব রাজনৈতিক দলকে কার্যত নিষিদ্ধ করতেই বলা হয়েছে। স্টারের নিবন্ধে রাজনীতিকদের যে ছবি আঁকা হয়েছে তার কিঞ্চিৎ এখানে তুলে ধরা যাক। নিবন্ধকার লিখেছেন, "গত ১৫ বছর রাজনীতিকদের আচরণে মানুষ দারুণ আহত ও বিক্ষুব্ধ। শাসক কিংবা বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলের গোটা রাজনীতিক গোষ্ঠীর (whole lot) দ্বারা মানুষ প্রতারিত, বিভ্রান্ত, বিপথগামী হয়েছে এবং তারা

www.pathagar.com

মাংসাসী জন্তুর মত মানুষকে কুরেকুরে খেয়েছে।" স্টারের নিবন্ধ অনুসারে সব রাজনীতিকরা মিলে এই কাজগুলোই করেছেন। কোনই ভাল কাজ তারা করেননি। তাহলে দেশের উন্নয়ন কিভাবে হলো? সরকার যদি কিছুই না করে থাকে, দেশের উন্নয়ন করল কে? এরও উত্তর দিয়েছেন স্টার পত্রিকার নিবন্ধকার। বলেছেন যে, ব্যবসায়ী, আমলা ও পেশাজীবীরাই এই উন্নয়ন করেছেন। লিখেছেন তিনি, "দেশ উন্নতি করেছে কারণ সাধারণ সৎ মানুষ, কৃষক, মিস্ত্রি, স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার এবং সরকারি আমলারা কঠোরভাবে কাজ করেছেন।"

ডেইলি স্টার পত্রিকার উল্লেখিত নিবন্ধটির উদ্ধৃতি দুইটিতে এ কথা পরিষ্কার যে, দেশের রাজনীতিকরা সবাই মিলে গত ১৫ বছর ধরে দেশজুড়ে শুধুই লুটপাট চালিয়েছে, আর ব্যবসায়ী, আমলা ও পেশাজীবীরা রাজনীতিকদের এই লুটপাটের মধ্যে দিয়েই দেশের বর্তমান বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়েছেন। এই আষাঢ়ে গল্পটি দৈনিক স্টারের সহকারী সম্পাদক শাহনুর ওয়াহিদের। লেখক কেন লিখেছেন, তাঁর গন্তব্য কোন দিকে, এ বিষয়ে আলোচনায় পরে যাব। তার আগে এনবিআর চেয়ারম্যানের কথায় ফিরে যেতে চাই। তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলেছেন ব্যবসায়ীদের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বুদ্ধিমান তার মতে আমলারা। আর সবচেয়ে কম বুদ্ধিমান, তিনি বলেছেন, রাজনীতিকরা, যাদের ব্যবসায়ীরা সকালে কিনে বিকেলে বিক্রি করতে পারে। এখন একটা দেখার বিষয় হলো, অভিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে রাজনীতিকরা সর্বোচ্চে এবং বুদ্ধিমান হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্নে, রাজনীতিকদের এই দুর্দশা কেন?

একবাক্যে এর কারণ হলো, রাজনীতিকরা রাজনীতিক, তারা জনগণের মধ্যে জনগণের জন্য কাজ করেন এবং তারা জনপ্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দায়িত্বে যান বা যেতে চান। এই পরিচয়ের দিক থেকে রাজনীতিকরা আমলা ও ব্যবসায়ীদের থেকে একেবারেই ভিন্ন। আমলাদের সাথে জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। জনগণের সাতে-পাঁচে তারা নেই, জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিতারও কোন প্রশ্ন নেই। ব্রীজ হলো না কেন, রাস্তা নেই কেন, স্কুল ভাঙ্গা কেন, অপরাধ বাড়ছে কেন, বিচার নেই কেন –এমন হাজারো 'কেন'-এর জবাব আমলারা জনগণকে দেয় না, দিতে হয় রাজনীতিকদেরকে, রাজনীতিকদের সরকারকে। অন্যদিকে জনগণের সাথে ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক পক্ষ-প্রতিপক্ষের মত। শিল্প ব্যবসায়ীরা উৎপাদক, আমদানিকারক ও বিক্রেতা আর জনগণ হলো ক্রেতা। শিল্প-ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য হলো পণ্যের বিক্রয় মূল্য বাড়িয়ে তাদের সর্বোচ্চ লাভ নিশ্চিত করা, আর জনগণের চাওয়া হলো সহনীয় মূল্যে পণ্য কিনতে পারা। শিল্প-ব্যবসায়ীদের সাথে জনগণের এই দ্বন্দ্বমান দর কষাকষিতে সব সময় পরাজিত ও প্রতারিত হয় জনগণ। ব্যবসায়ীদেরকে এর জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। এখানেও জবাবদিহি করতে হয় রাজনীতিকদেরকে। পণ্যের মান খারাপ কেন, সরবরাহ কম কেন, মূল্য বেশি কেন– এসব প্রশ্নের জবাব জনগণকে রাজনীতিকদেরই দিতে হয়।

এর অর্থ হলো, আমলারা সরকারের, অন্য অর্থে রাজনীতিকদের কাজের হাত হিসেবে সরকারি অর্থ নাড়াচাড়া করেন, প্রশাসনের শাসক হিসেবে জনগণের ওপর ছড়ি ঘুরান এবং ব্যবসায়ীরা জনগণের মূল্যে কোটি কোটি টাকার মুনাফা গুণেন, কিন্তু

www.pathagar.com

পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয় বেচারা রাজনীতিকদেরকে। তাদেরকে আমলাতন্ত্রের স্বার্থ দেখতে হয়, কারণ তারাই রাজনৈতিক সরকারের হাত-পা। রাজনীতিকদেরকে ব্যবসায়ীদেরও মন যুগিয়ে চলতে হয়, কারণ অর্থ শক্তির মালিক-মোক্তার ব্যবসায়ীরাই। জনগণের সাথে সম্পর্কহীন এই দুইপক্ষকে ম্যানেজ করেই রাজনীতিকদেরকে জনগণের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে হয়, তাদের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হয়।

এই কঠিন ও ব্যাপক কাজ করতে গিয়ে আধুনিক রাজনীতির প্রবণতা অনুসারে রাজনীতিকদের প্রয়োজন হয় প্রচুর পয়সার। এর অর্থ ভোট নেবার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থ, প্রয়োজন হয় জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্যেও। একজন রাজনীতিকের কাছে জনগণের, তার ভোটারদের চাহিদা অনেক। তারা মনে করে তাদের কারও ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে এমপি তাকে খুলে এনে দেবেন, কারও বিরুদ্ধে মামলা হলে তাকে উদ্ধার করে দেবেন, কারও ছেলের চাকরি না থাকলে তা পাইয়ে দেবেন, চাকরিতে কোন সংকট হলে তা দূর করবেন। স্কুল-কলেজ-মাদরাসা মঞ্জুরি পাওয়া-না পাওয়া, সাহায্য পাওয়া-না পাওয়া, বিল্ডিং হওয়া না হওয়া, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট তৈরী হওয়া, না হওয়া, মানুষের অভাব-অভিযোগ-সংকট-সমস্যার সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে পারা, না পারা ইত্যাদির ওপর এলাকার এমপি ও রাজনীতিকদের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে। এছাড়া নির্বাচনের সময়তো বটেই নির্বাচনের পর ও পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত কর্মী-সমর্থকদের দাবি-দাওয়া, অনুযোগ-আবদার শুনতে হয় এবং যথাসাধ্য তাদের পোষণ করতে হয়। শুধু জনপ্রিয়তা ধরে রাখা নয়, ব্যক্তিগত ও দলীয় রাজনীতি-রক্ষার জন্যও এটা করতে হয়। আমাদের মত দেশে এটাই এখনও একটা রাজনৈতিক কালচার। এর বাইরে সাধারণত কোন রাজনীতিক যান না, যেতে পারেন না। এর জন্য প্রচুর পয়সার প্রয়োজন হয় রাজনীতিকদের। রাজনীতিকদের এই প্রয়োজনটাকেই লুফে নেয় আমলা ও ব্যবসায়ীরা। বুদ্ধিমান আমলারা (সবাই নয়, যেমন রাজনীতিকরাও সবাই এটা করেন না) কম বুদ্ধিমান রাজনীতিকদের টাকা কামাইয়ের পথ-ঘাট হাতে-কলমে শিখিয়ে দেন। অন্যদিকে সবার চেয়ে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা টাকার থলে নিয়ে হাজির হন রাজনীতিকদের কাছে। তারা এই অর্থ রাজনীতিকদের দানও (যদিও বলা হয় donation) করেন না, চাঁদাও দেন না। তারা বিনিয়োগ করেন, লক্ষ্য, এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করে একশত কোটি টাকা অর্জন। ব্যবসায়ীদের এই বিনিয়োগ-বুদ্ধির কাছে আমলারাও নস্যি। কারণ আমলারা রাজনীতিকদের টাকা কামাইয়ের পথ দেখিয়ে যে শেয়ার হাত করেন, তা ব্যবসায়ীদের মত অতবড় বিনিয়োগ-বাণিজ্য নয়। এদিক থেকে এনবিআর চেয়ারম্যানের উক্তি খুবই সংগত যে, ব্যবসায়ীরা রাজনীতিকদের চেয়েতো বটেই, আমলাদের চেয়েও বুদ্ধিমান। এই 'বুদ্ধি'র সংজ্ঞা এনবিআর চেয়ারম্যান কি দেবেন জানি না, তবে আমার মতে এই বুদ্ধিটা হলো টাকার শক্তি। এই বুদ্ধিটার নাম বলা যায় 'ব্যবসায়-বুদ্ধি'। ব্যবসায়-বুদ্ধি চরিত্রগতভাবে আত্মকেন্দ্রীক এবং তাকে সৎ ও সাধু বলা যায় না। এই ব্যবসায়ীদেরকেই দৈনিক 'স্টার'-এর নিবন্ধকার দেশের সব উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নিয়ামক বলেছেন। আরও নিয়ামক বলেছেন আমলা ও পেশাজীবীদের। আর উন্নয়ন নাশকারী ধরেছেন রাজনীতিকদের, মানে রাজনীতিকদের সরকারকে। বলেছি, এটা একেবারেই একটা আষাঢ়ে গল্প। ব্যবসায়ী, আমলা, পেশাজীবী সবারই অবদান

www.pathagar.com

আছে উন্নয়নে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবদান আছে রাজনীতিকদের, রাজনীতিকদের সরকারের। কারণ, তারা ব্যবসায়ী, আমলা ও পেশাজীবীদের চালক শুধু নয়, উন্নয়নের পরিকল্পক এবং পরিচালকও। ব্যবসায়ী, আমলা, পেশাজীবী সকলেই উন্নয়নের হাত-পা, কিন্তু উন্নয়নের মাথা হলো রাজনীতিকদের সরকার। মাথা বাদ দিয়ে হাত-পায়ের কোন মূল্য নেই। এখন দেশে রাজনৈতিক সরকার নেই, কিন্তু তাদের জায়গায় আছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এরা রাজনীতিকদের আসনে বসেই দেশ চালাচ্ছেন। এদের মাথাটাও রাজনৈতিক মাথা।

রাজনীতিকরা যে অর্থলিপ্সা বা তাদের টাকার যে প্রয়োজনের কারণে তারা ব্যবসায়ীদের 'বাণিজ্য-বুদ্ধি'র শিকার হন, সে ব্যাপারে আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজনীতিকদের টাকার যে প্রয়োজনের কথা উপরে বলা হলো তা যৌক্তিক কিনা। রাজনীতিকরা সৎ, সজ্জন হলে, জনদরদী হলে রাজনীতি করার জন্য, ভোট যোগাড়ের জন্য, দল রক্ষার জন্য, কর্মী-সমর্থকদের পোষণের জন্য টাকার প্রয়োজন পড়বে কেন? পড়বে না, নীতিগতভাবে একথাই ঠিক। রাজনীতিক, ভোটার এবং দেশের মানুষ সবাই সৎ, সচেতন ও দায়িত্বশীল হলে রাজনীতি করার জন্য ঐ রকম টাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের চাওয়া এমন আইডিয়াল সিচুয়েশন বাংলাদেশে নেই। বাংলাদেশে কেন দৃশ্যমান কোন দেশেই এই আইডিয়াল সিচুয়েশন নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের শিরোমণি দেশ। সেখানে গণতন্ত্রের বয়স দুশ' বছরের বেশি। সেখানে মানুষের আমাদের দেশের মতো অভাব-অনটনও নেই। তারা ধনেও সেরা, শক্তিতেও সেরা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দিক দিয়েও সেরা। এই সব সেরাদের দেশের রাজনীতিতে কিন্তু টাকারই সেরা ভূমিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন শীর্ষ রাজনীতিবিদ বলেছেন, "Money is the mother's milk of politics. (টাকা হলো রাজনীতির মায়ের দুধ)" নির্বাচনে টাকার সয়লাব হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে খরচ হওয়া সরকারিভাবে জ্ঞাত টাকার পরিমাণই হলো ৬০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নির্বাচনে বিজয়ী প্রত্যেক সিনেট সদস্যের সরকারিভাবে জ্ঞাত খরচের গড় পরিমাণ ৭ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার। এই জ্ঞাত খরচের বাইরে রয়েছে বিশাল খরচের অংক, যার হদিস সরকারের পক্ষে নেয়া সম্ভব হয় না। 'The State of Campaign Finance' শীর্ষক প্রবন্ধে Josehp E. Cantor লিখেছেন, "In contemporary elections, political parties and interest groups both contribute to favored candidates and spend money more directly to maximize their own influence on the election outcome. This phenomenon makes it harder to monitor the flow of money in election." (Election 2001, US Department of State, Bureau of International Information Programs, page-31) অর্থাৎ সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্টমহল উভয় পক্ষ তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীদের টাকা দেয় এবং নির্বাচন বিজয়ে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে সরাসরি খরচ করে থাকে। এই অবস্থার কারণে নির্বাচনে কি পরিমাণ টাকা ঢুকে পড়ছে তা মনিটর কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলো প্রধান চারটি উৎস থেকে টাকা পায়। এক– ব্যক্তি নাগরিকদের

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ চাঁদা, দুই– রাজনৈতিক দলগুলোর স্ব স্ব তহবিল, তিন– স্বার্থ সংশ্লিষ্টমহল এবং চার– প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎস। আমাদের দেশেও রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিলের উৎস এই ধরনেরই। তবে আমাদের দেশে ব্যক্তি নাগরিকদের কাছ থেকে রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলো আমেরিকান রাজনীতিকদের মত চাঁদা তোলে না। আমেরিকার রাজনীতিকদের তহবিলের তৃতীয় উৎস 'স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল'ই কার্যত বাংলাদেশী রাজনীতিকদের তহবিলের প্রধান উৎস। বাংলাদেশে এই 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল'-এর প্রধান অঙ্গ হলো ব্যবসায়ীরা। অর্থ লিপ্সা ও টাকার প্রয়োজনের দিক দিয়ে মার্কিন রাজনীতিক ও বাংলাদেশী রাজনীতিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের বিনিয়োগ-বাণিজ্যের শিকার হয়ে যে দুর্নীতি করতে বাধ্য হয় বাংলাদেশের রাজনীতিকরা, সেই একই ধরনের দুর্নীতি করে থাকে মার্কিন রাজনীতিকরা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের প্রভাবে। Joseph E. Cantor তার প্রবন্ধে এরও স্বীকৃতি দিয়েছেন। লিখেছেন, "... ... high spending in US elections, combined with the reliance for funds on private sources, raises concerns about undue influence over public policy by wealthy donors and interests." (ঐ) অর্থাৎ মার্কিন নির্বাচনসমূহে বিশাল মাপের খরচ এবং তহবিলের জন্য প্রাইভেট উৎসের প্রতি নির্ভরতা রাষ্ট্রীয় নীতি কর্মে দাতা ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

সুতরাং গণতন্ত্রের পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলের তুলনায় বাংলাদেমের রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলসমূহ মৌলিক ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে না, এক আচরণগত অসহনশীলতা ও ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে মরিয়া হওয়া ছাড়া। তবে এই নেতিবাচকতাও বাংলাদেশের সব দল ও সব রাজনীতিকের জন্যে প্রযোজ্য নয়।

'ডেইলি স্টার'-এর নিবন্ধ কেন সব দোষ রাজনীতিকদের ওপর চাপাল এবং কেন নিবন্ধটি কার্যত রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করতে বললা, এখন সে আলোচনায় আসা যায়। যেসব 'কেন'র উল্লেখ এখানে করলাম, তার উত্তর ডেইলি স্টার-এর নিবন্ধটিই তার পরবর্তী প্যারাগ্রাফে দিয়েছে। উত্তরটা আঁতকে উঠার মত। নিবন্ধটি 'মিলিটারি ডিক্টেটরশীপ'কে উৎকৃষ্টতর অপশন হিসাবে সামনে এনেছে। তার মতে 'তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসকদের চেয়ে অতীতের মিলিটারী বা স্বৈরাশাসকরাই ভাল ছিল। নিবন্ধে লেখা হয়েছে, "... The 'so called democratic' rulers were no better than the military or autocratic rulers." নিবন্ধের এই উক্তিটা খুব বড় নয়, সরাসরি-শক্ত কোন পরামর্শও নয়, কিন্তু ছোট এই কথা আমাদের সামনে বড় একটা দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে।

ডেইলি স্টার-এর নিবন্ধ যে 'মিলিটারী ডিক্টেটরশীপ'কে ভাল মনে করেছে, আমাদের প্রতিবেশী একটি দেশেরও কিন্তু গোপন অভিলাষ এটাই। সে দেশটি বড় ভাইগিরীর অভিভাবকত্ব নিয়ে বাংলাদেশের মাথায় চেপে বসতে চায়। এই চেপে বসার ক্ষেত্রে তার প্রধান বাধা হলো বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী রাজনৈতিক শক্তি এবং সেনাবাহিনী। তারা জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ধ্বংস চায় এবং সেনাবাহিনীকে

www.pathagar.com

করতে চায় বিতর্কিত। বিতর্কিত করার জন্যেই তারা চায় আমাদের সেনাবাহিনী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড় ক। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী রাজনৈতিক দল শুধু নয়, দেশের গোটা রাজনৈতিক শক্তি বলা যায় আজ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। অটুট একমাত্র সেনাবাহিনী। এখন সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িয়ে বিতর্কিত করতে পারলেই বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যাকবন ভেঙ্গে দেয়া সম্ভব। এটাই চাচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী দেশটি। দু'দিন আগে দেশের দু'জন খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এ দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করে সকলকে সাবধান হওয়ার জন্যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। দেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং জাতীয় অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান সাম্প্রতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে 'দৈনিক আমার দেশ'-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "বর্তমান দৃশ্যপটে আমরা চারটি শক্তি দেখতে পাচ্ছি। এগুলো হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সেনাবাহিনী, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষণস্থায়ী।

বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এ দুটি রাজনৈতিক শক্তিকে যদি সংস্কারের নামে দুর্বল করে ফেলা হয়, তাহলে দেশে একক ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হবে সেনাবাহিনী। এর ফলে সেনাবাহিনী জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় হবে। আর এটা হবে সবচেয়ে বিপর্যয়কর। ... তাহলে জাতি হিসাবে আমরা যে ক্ষতির মধ্যে পড়বো তা থেকে উত্তরণ মোটেই সহজ হবে না।" অন্যদিকে একইদিনে 'দৈনিক আমার দেশ'-এর সাথেই এক সাক্ষাৎকারে বিশিস্ট বুদ্ধিজীবী ও কলামিস্ট ফরহাদ মজহার তার বক্তব্যের এক জায়গায় বলেছেন, "আমি বার বার একটি কথাই মনে রাখতে বলছি যে, এই সংকটের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছ থেকে আমাদের সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে।" (দৈনিক আমার দেশ, ৭ জুলাই, ০৭) এখানে দেশের দুই প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যে যে আকুল আকুতি প্রকাশ পেয়েছে সেটা হলো, জনগণের গৌরবের এবং নির্ভরতা ও নিরাপত্তার শেষ ভরসাস্থল সেনাবাহিনী বিতর্কিত হয় কিংবা জনগণের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এমন অবস্থা সৃষ্টি না হোক। এটা জনগণেরও কথা। কিন্তু দেশের শত্রুদের চাওয়া হলো, আমাদের রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল দুর্বল, বিপর্যস্ত হোক এবং আমাদের সেনাবাহিনী রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আসুক। এরপর শত্রুদের কাজ হবে খোদ সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা, যা সৃষ্টি করবে দেশে নৈরাজ্য। আসলে শত্রুরা চায় আমাদের দেশে এই নৈরাজ্যই, যাতে এ দেশকে অকার্যকর অভিহিত করে একে আরেক সিকিম তারা বানাতে পারে। বেদনার বিষয় 'ডেইলী স্টার'-এর নিবন্ধে কৌশলে শত্রুদের এই চাওয়াকেই তুলে ধরা হয়েছে, প্রমোট করা হয়েছে।

শত্রুদের, শত্রুর এজেন্টদের এই ষড়যন্ত্র থেকে দেশকে, দেশের অতন্দ্রপ্রহরী সেনাবাহিনীকে রক্ষা করার জন্য রাজনীতির স্বাভাবিকতায় আমাদের ফিরে আসতে হবে। রাজনীতিকদের একটা অংশের যে চরিত্র বিপর্যয় ঘটেছে, তাকে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের চরিত্র বিপর্যয়ের একটা অংশ এবং চলমান প্রবণতার একটা ফল হিসেবে দেখতে হবে। সংস্কারের মাধ্যমে রাজনীতিকদের এ বিপর্যয় রোধ করতে হবে, চরিত্র-বিপর্যয় রোধ করতে হবে ব্যবসায়ী ও আমলাদেরও। না হলে তাদের কু-চরিত্র রাজনীতিকে যেমন কলুষিত করেছে, ভবিষ্যতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। কিন্তু কোনভাবেই দেশের রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলকে খাটো করে ফেলা যাবে না। রাজনীতিকরা

www.pathagar.com

বিতর্কিত, সমালোচিত কোন দেশে নয়; জনগণের মধ্যে জনগণের জন্য কাজ করে বলেই তারা স্বাভাবিকভাবে আলোচনা-সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও রাজনৈতিক দল তীব্র সমালোচনার শিক্ষার। 'Political Parties in the Unites States' নিবন্ধে John F. Bubby লিখছেন, "Inspite of the long and impressive evidence of partnership within the Amercian political system, an ingrained component of the American civic culture is a distrust of political parties. The adoption of the primary system for nominating congressional and state candidates early in the 20th century, and the more recent proliferation of the presidential primaries, which have become the determining factor in presidential nominations are testimony to anti-party sentiment within the public. Americans are uncomfortable with the leaders of their party organisations exercizing great power over their government." (Elections 2001, US Department of State, Bureau of International Information Programs, page-4)

মিঃ জন এফ বাব্বি'র এই বক্তব্যের সারকথা হলো, আমেরিকান পলিটিক্যাল সিস্টেমে পারস্পরিক সমঝোতা ও অংশীদারিত্বের দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনাস্থার একটা কালচার মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস প্রার্থীদের নমিনেশেন পদ্ধতির বিভিন্ন সংস্কার তাদের এ্যান্টি-পার্টি মনোভাবেরই প্রকাশ। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা তাদের সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করে এটাকে মার্কিন নাগরিকরা খুব অস্বস্তির চোখে দেখে।

দুইশ' বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মার্কিন রাজনৈতিক দলগুলো যদি এই সমালোচনার সম্মুখীন হয়, তাহলে আমাদের দুই যুগ-আড়াই যুগের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনীতিকরা ও রাজনৈতিক দলগুলো আরও দোষ-ত্রুটি করবে, আরও সমালোচনার সম্মুখীন হবে, এটাই স্বাভাবিক। মার্কিন গণতন্ত্র সংস্কার সংশোধনের মাধ্যমেই সামনে অগ্রসর হয়েছে। তাদের সংস্কার এখনও চলছে। আমাদেরকেও অপরাধীদের শাস্তি এবং সংস্কার সংশোধনের মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হতে হবে। তা না করে যদি রাজনীতি, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলোরই মুণ্ডুপাত করি, তাহলে গণতন্ত্রের দু'আড়াই যুগে আমরা যতটা এগিয়েছি, ততটাই আবার পিছিয়ে পড়বো। ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন উত্তরণ অসম্ভব না হলেও কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সুতরাং রাজনীতির সংস্কার হোক, রাজনীতিকদের যারা দোষী তাদের বিচার হোক, কিন্তু রাজনীতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ঠিক হবে না, রাজনীতিকদের মাঠছাড়া করা উচিত হবে না এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্বল ও তাদের ধারাবাহিকতা ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করা ঠিক হবে না। মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক মাওলানা আকরাম খাঁ'র সম্পাদিত দৈনিক আজাদের একটা সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করে আমার আজকের বক্তব্য শেষ করতে চাই। সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে প্রবেশের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ১৯৬২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর দৈনিক আজাদ লিখেছিল, "দেশে রাজনীতি চলিবে কিন্তু রাজনৈতিক দল থাকিবে না, এ অবস্থা চলিতে পারে না। দলহীন রাজনীতি আর

www.pathagar.com

নোঙ্গরহীন নৌকার অবস্থা সমান। এ অবস্থা আগুন নিয়ে খেলার শামিল। এরূপ পরিবেশে রাজনীতি করিতে যাওয়া আর নৈরাজ্য এবং উচ্ছৃংখলতা ডাকিয়া আনা একই কথা।" প্রায় অর্ধশত বছর আগে দৈনিক আজাদের এ সম্পাদকীয় নিবন্ধে মাওলানা আকরম খাঁ দেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, রাজনীতির জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিকে অপরিহার্য হিসেবে দেখেছিলেন। এ সম্পাদকীয় লেখার ৪৪ বছর পর এ দেশেরই বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানও তাঁর এক বক্তব্যে শক্তিশালী, সংহত রাজনৈতিক দলকে জাতি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সমার্থক হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "রাজনৈতিক ইনস্টিটিউশন যদি (ভাঙন বা নেতৃত্ব সংকটের কারণে) দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে জাতি রাষ্ট্র হিসেবে আমরা আদৌ টিকে থাকতে পারবো কিনা, সে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেবে। কারণ শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামো ছাড়া কোনো জাতি রাষ্ট্র কখনো টিকে থাকতে পারে না।" (দৈনিক আমার দেশ, ২ জুলাই, ০৭) অতএব ডেইলী স্টার-এর উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ (Should political parties be banned for wholesale corruption?) রাজনৈতিক দলগুলোকে সব ক্ষতি ও ধ্বংসের নিয়ামক ধরে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার কথা বলে কার্যতঃ আমাদের এই প্রিয় জাতি-রাষ্ট্র ও জাতি-রাষ্ট্রের অতন্দ্রপ্রহরী সেনাবাহিনীকে যুগপৎ ধ্বংসের শত্রু-ষড়যন্ত্রের 'হিজ মাস্টার ভয়েস' হিসেবেই কাজ করেছে।

৭ জুলাই, ২০০৭

বিদ্যুৎ খাতে কালো হাত

বিদেশী সাহায্য কোন দেশকে কোন সময় স্বনির্ভর করেনি, স্বনির্ভর করে না। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা দুর্দশাই বাড়িয়ে থাকে। এক পর্যায়ে সাহায্য নামক বস্তুটি উন্নয়নশীল দেশের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে বসে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল বিশ্ব ঋণ পরিশোধ করে ১ লাখ কোটি ডলার। বিস্ময়ের বিষয় এই পরিশোধ সত্ত্বেও কিস্তির বকেয়া ও নতুন ঋণসহ ১৯৮৩ সালের ৮০ হাজার কোটি ডলার সাহায্য ১৯৯০ সালে ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি ডলার এবং ১৯৯৭ সালে উন্নীত হয় ২ লাখ কোটি ডলারে। এককভাবে আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ১৯৮৪ সালের ৮ হাজার ৪শ' কোটি ডলার ঋণ উপরোক্ত সময়ে ২০ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হয়। উন্নয়নশীল দরিদ্র বিশ্বের এই উদ্বেগজনক দায় বৃদ্ধির কারণ শিল্পোন্নত বিশ্ব সাহায্য আকারে দরিদ্র দেশগুলোকে যা দেয়, তার চেয়ে বেশি তারা নিয়ে যায়। এই প্রবণতা বাড়ছে। ২০০২ সালে শিল্পোন্নত বিশ্ব উন্নয়নশীল দেশ থেকে নিয়েছিল ২২৯ বিলিয়ন ডলার। আর ২০০৬ সালে ৭৮৪ বিলিয়ন ডলার বেশি নিয়েছে। এটা দাতাদের এক ধরনের শোষণেরই ফল। সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রে তারা আন্তরিক নয়। যেসব খাতে সাহায্য দিলে দেশ দ্রুত উন্নতি করবে, দেশ স্বাবলম্বী হবে, তেমন খাতে তারা সাহায্য দেয় না। আমাদের কৃষি খাত কখনই দাতা দেশের সুনজর পায়নি। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত আমরা উন্নয়ন খাতে খরচ করিছে ২ লাখ ৮৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে পাওয়া সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা। বিদেশী এই

www.pathagar.com

সাহায্যের মধ্যে কৃষি উন্নয়নে প্রত্যক্ষ সাহায্য নেই বললেই চলে। অথচ কৃষিই বাংলাদেশের জন্যে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবার মাধ্যম ছিলো। অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাতেও দাতারা আন্তরিকভাবে সাহায্য করে না। সাহায্য করলেও তাদের নিয়ন্ত্রণ ও শর্তাবলী অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পকে বিলম্বিত করে সমস্যায় ফেলে একে কার্যত ভণ্ডুল করে দেয়।

আমাদের বিদ্যুৎ সেক্টর বিদেশী কালো হাতের ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত এ ধরনেরই একটি খাত। বিদ্যুৎ খাত সম্পর্কে অভিযোগের শেষ নেই, এই খাতের ব্যর্থতারও কোন সীমা সরহদ নেই। উচ্চ পর্যায়ের একজন দায়িত্বশীল কিছুদিন আগে এক অভিযোগে বলেছিলেন, গত পাঁচ বছরে এক বিদ্যুৎ খাত থেকেই ২০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে। এই অভিযোগ নিঃসন্দেহেই এক অতি কথন। জোট সরকারের গৃহীত পাঁচটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে তদন্তের জন্য শক্তিশালী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্তের জন্য গটিত টাস্কফোর্সটির নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল ওয়াদুদ। তদন্তের আওতায় ছিলো ঘোড়াশাল-১ নামের ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, ঘোড়াশাল-২ নামের ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেঘনা ঘাট-২ নামীয় ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বগুড়ায় রেন্টালের একটা ২০ মেগাওয়াট ও কর্ণফুলী-৩-এর ১৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প। টাস্কফোর্স মাসাধিককালব্যাপী তদন্তের পর টাস্কফোর্সের প্রধান মেজর জেনারেল ওয়াদুদ রিপোর্ট পেশের সময় বলেন, প্রকল্পগুলোতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া বড় রকমের কোন অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা পাওয়া যায়নি।

রিপোর্টের বিষয়ে আরও বিস্তারিত বলেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা তপন চৌধুরী। তিনি বলেন, "বিভিন্ন দিক থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় আমরা বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো পর্যালোচনার জন্য টাস্কফোর্স গঠন করেছিলাম। তারা রাত-দিন পরিশ্রম করে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই শেষে প্রকল্পগুলো এগিয়ে নেবার সুপারিশ করেছে। প্রকল্পগুলোতে বড় ধরনের অনিয়ম-অস্বচ্ছতা থাকলে টাস্কফোর্স প্রকল্প এগিয়ে নেবার সুপারিশ করতো না। তারা বিস্তারিত বিচার-বিবেচনা করেই নিয়মমাফিক ও স্বচ্ছ হওয়ায় প্রকল্পগুলো এগিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন।"

আলোচ্য এই প্রকল্পগুলো নতুন। জোট সরকারই এই প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল এসব প্রকল্প সম্পর্কে। কিন্তু সরেজমিন তদন্তে তেমন কোন দুর্নীতি পাওয়া যায়নি। আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের ভুয়া দুর্নীতির অভিযোগই বাংলাদেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছে দুনিয়ায়।

তাহলে কি বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি নেই? আছে। দুর্নীতি না থাকলে বিদ্যুৎ বিভাগে এত সংকট-সমস্যা কেন। সন্দেহ নেই আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত অবকাঠামোগত দিক থেকে খুবই নড়বড়ে। আমাদের মোট ২৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি কেন্দ্র সরকারি খাতে। এসব কেন্দ্রে রয়েছে মোট ৯৭টি ছোট-বড় ইউনিট। ইউনিটগুলোর অধিকাংশই বয়সের ভারে ন্যুব্জ। স্বাধীনতা-পূর্বকালের সাতটি ইউনিটকে এখনও চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। অবশিষ্ট ইউনিটের ২৯টির বয়স ২০ বছরের উপরে, ১৬টির বয়স এখন ১৫ বছর। দেশে প্রতিষ্ঠিত সবগুলো বিদ্যুৎ ইউনিট চালু থাকলে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৫শ ৮২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব (উৎপাদন ক্ষমতা ৫ হাজার ২শ' ৭৬ মেগাওয়াট)। বর্তমান বিদ্যুৎ চাহিদাও মোটামুটি সাড়ে ৪ হাজার মেগাওয়াটের মত।

www.pathagar.com

অতএব কাগজে-কলমে আমাদের তেমন একটা বিদ্যুৎ ঘাটতি নেই। কিন্তু বিদ্যুৎ ইউনিট বন্ধ থাকা, ঘন ঘন বন্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণেই বিদ্যুৎ চাহিদা ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়ে। এই সংকট সৃষ্টির মূলে এবং সংকট-উত্তরণের ক্ষেত্রেই রয়েছে সীমাহীন দুর্বলতা ও দুর্নীতি।

এই দুর্নীতি ও দুর্বলতার স্বরূপটা খুবই জটিল। তবে এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নয়, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্নীতি-দুর্বলতাই অত্যন্ত প্রকট। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কর্মরতদের অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা ও দুর্বলতা, সমস্যাগ্রস্ত ইউনিটগুলোর মেরামতে দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতা, কেনাকাটার টেন্ডার ও স্থাপন টেন্ডার নিয়ে ভানুমতির খেল ইত্যাদি সমস্যাই সংকট কবলিত করে রেখেছে বিদ্যুৎ খাতকে। শেষের সমস্যাগুলোই বিদ্যুৎ খাতকে পঙ্গু করে রেখেছে। আর এ সমস্যাগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে মধ্যমণি হিসেবে অধিষ্ঠিত রয়েছে বিদেশী দাতা সংস্থাসমূহের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্র। তারাই হলো দুর্নীতির রাজা এবং তারাই আমাদের দেশের সরল, অনভিজ্ঞ আমলাদের দিয়ে দুর্নীতি করিয়েছে, দুর্নীতি শিখিয়েছে। কম বুদ্ধিমান রাজনীতিক নন, বেশি বুদ্ধিমান আমলা-ঠিকাদারদের (ব্যবসায়ী) দুর্নীতির দুষ্ট চক্রই আমাদের অন্যান্য খাতের মত বিদ্যুৎ খাতকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পশ্চিমী দাতাগোষ্ঠী ও দাতা সংস্থাগুলোর কোন জবাবদিহতা নেই, প্রকল্প, প্রকল্পের সংস্কার, প্রকল্পের দেখাশোনার জন্যে এডিবি ও বিশ্বব্যাংক বিদেশী উপদেষ্টা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়। দেখাশোনা ও মেরামত-সংস্কারে তাদেরই কর্তৃত্ব চলে, কিন্তু তাদের কোন দোষ নেই, কোন দোষই তাদের স্পর্শ করতে পারে না। আমরা যদি আমাদের বিদ্যুৎ প্রকল্প ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর দুরবস্থা ও এসবের সমস্যা-সংকটের দিকে তাকাই, তাহলে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাবো। দাতাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাথে শর্ত হিসেবে বিদেশী বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞরাও আমাদের দেশে প্রবেশ করে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ইউরোপীয়-আমেরিকান হলেই তিনি বিশেষজ্ঞ হয়ে যান। তার যাচাই-বাছাই হয় না, তার যোগ্যতা, কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। আমাদের দেশে এমন বিদ্যুৎ প্রকল্পও আছে যেখানে ৩০ বছর বিদেশী বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন। গত বছর আগস্টের এক তথ্য অনুসারে আমাদের রাউজান বিদ্যুৎ প্রকল্পে ১১ জন, ঘোড়াশালে ৭ জন, সিদ্ধিরগঞ্জে ১৭ জন, আরপিসিএল-এ ৪ জনসহ সব বিদ্যুৎ প্রকল্পেই বিদেশী বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত, ওভারহলিং ইত্যাদি কাজ বিদেশী দাতা সংস্থার মনোনীতদের দ্বারাই করিয়ে নিতে হয়। এখানেই সৃষ্টি হয় আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার বড় সংকট, এখানেই চলে দুর্নীতিরও মহোৎসব।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে জড়িত বিদেশী দাতা ও সংশ্লিষ্ট বিদেশী সংস্থার স্বেচ্ছাচারিতা ও বাংলাদেশের অসহায়ত্বের একটা দৃষ্টান্ত হলো বিদেশী কোম্পানী সিমেন্স আমাদের দেশীয় সংস্থা রুরাল পাওয়ার কোম্পানীর (আরপিসি) সাথে ঝগড়া করে কাজ ত্যাগ করে চলে যাওয়া এবং একতরফাভাবে বাড়তি শর্ত আরোপ করা। ২০০০-০১ সালে সিমেন্স ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃতীয় পর্বের নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষর করে ২০০২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আরপিসি'র সাথে। লক্ষ্য ছিল, ৭০ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন। এক পর্যায়ে অর্থ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঝগড়ার অজুহাতে সিমেন্স কাজ বন্ধ করে দিয়ে সরে আসে। পরে কাজ শুরু করার শর্ত হিসেবে ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হোক না বা হোক একটা নির্দিষ্ট সময়ে তার

www.pathagar.com

৪৯১ কোটি টাকা বুঝিয়ে দিতে বলে। ৩০ মে '০৬-এর এক খবর অনুসারে, কাজ বন্ধ করে সরে পড়া এবং চুক্তির ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত না করে টাকা চাওয়া চুক্তির খেলাফ কি না এ প্রশ্ন তুলে সিমেন্সকে অভিযুক্ত করার বদলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিমেন্সকে কিভাবে টাকা দেয়া যাবে এ নিয়ে বিদ্যুৎ প্রশাসন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদেশী কোম্পানীর জবাবদিহিহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আরেকটি চিত্র চট্টগ্রামের শিকলবাহা ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন হতো ৪২ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদন বাড়াবার জন্যে দু'দফা ওভারহলিং করা হয় ১৯৯২ সালে ও ১৯৯৯ সালে। ব্যয় হয় যথাক্রমে ১৪ কোটি ও ১০ কোটি টাকা। ওভারহলিং করেন নির্মাতা কোম্পানী চেকোশ্লোভাকিয়ার স্কোডা কোম্পানী। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন না বেড়ে বরং ১৮ মেগাওয়াট কমে যায়। নানা রকম দুর্নীতির দায় চাপে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর। শক্তিশালী তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। কিন্তু তারা বিদেশী কোম্পানীর কেশ স্পর্শ করেছে বলে জানা যায়নি। বিদেশী কোম্পানী অপকীর্তি করে খুলনার ১১০ মেগাওয়াট ও ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়েও। খুলনা ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সালে মিনি ওভারহলিংসহ মোট চারবার (১৯৯৯, ২০০০, ২০০৫) মেরামত ও ওভারহলিং-এ মোট খরচ হয় ৪৪৭ কোটি টাকা('৯৯ সালে ১৭৫ কোটি, ২০০০-এ ২০০ কোটি এবং ২০০৫ সালে ৭৭ কোটি) খরচ করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়েনি, বরং বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। ২০০৫ সালে ৭৭ কোটি টাকা খরচ করে ওভারহলিং-এর পরও বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হতে পারেনি। কিন্তু বিদেশী কোম্পানী স্কোডা সব টাকা ঠিকই পেয়েছে। ব্যর্থতার জবাবদিহীতা তাকে করতে হয়নি। একই অবস্থার শিকার হয় খুলনার ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র। চীনা ঠিকাদারী কোম্পানীর মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এর মিনি ওভারহলিং, ওভারহলিং ও পুনর্বাসন কাজ করা হয়। প্রতিবার ওভারহলিং-এর পর ওয়ারেনিটটং সময় পার হবার আগেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। আমার দেশ পত্রিকায় ১২ আগস্ট ০৬ তারিখের এক রিপোর্ট অনুসারে সর্বশেষ ওভারহলিং ওয়ারেন্টি পিরিয়ড তখনও চললেও বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে যেতে পারছে না, বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিদেশী কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতার আরেকটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত টংগীর ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি তৈরি করে চীনের হারুবিন কোম্পানী। ৩৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই কেন্দ্রটি উদ্বোধনের কয়েকদিন পরই বন্ধ হয়ে যায়। উদ্বোধনের পরবর্তী দশ মাসে ৮০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্রটি দৈনিক গড়ে মাত্র ৩০ মেগাওয়াটের বেশী উৎপাদন করতে পারেনি। তার ওপর দশ মাসে বন্ধ হয়েছে ৮২ বার। উৎপাদন কম হওয়ার নানা কারণ তুলে ধরা হচ্ছে। তার একটি হলো পর্যাপ্ত গ্যাস না পাওয়া। গ্যাস না পেলে উৎপাদন কম হবে, কিন্তু উদ্বোধনের পরই এবং বার বার তা বন্ধ হবে কেন? এখানেও পাওয়া যাবে বিদেশী কোম্পানীরই স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, অনভিজ্ঞতা।

আমি এই ভাবে বিদেশী কোম্পানীর স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতকে সামনে আনার কারণ হলো, আমাদের দেশ দুনিয়ায় দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কারণে আমাদের বুদ্ধিমান আমলা-কর্মচারী-ব্যবসায়ীরা দুর্নীতি দুষ্ট হবেন, কম বুদ্ধিমান রাজনীতিকরা দুর্নীতি করবেন, কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত বিদেশী কোম্পানীদের এই স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা,

www.pathagar.com

ব্যর্থতা কেন? বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যাতে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার না হয়, এজন্য নির্মাতা কোম্পানীকে দিয়েই বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তারপরও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যাতে ভালোভাবে চলে, যথোচিত উৎপাদন দেয়, অনভিজ্ঞতা প্রসূত কোন বিপত্তি বিপর্যয়ের মধ্যে না পড়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন, এজন্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো দেখাশুনার জন্যে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশী বিশেষজ্ঞ পালন করা হয়। কিন্তু এরপরও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বেহাল অবস্থা কেন? দশ মাসে ৮০ বার বন্ধ হয় কেন? নির্মাতা ও বিদেশী কোম্পানী দ্বারা স্থাপিত হওয়ার পরেও উদ্বোধনের পর তা বন্ধ হয় কেন? বিদেশী কোম্পানীরা একের পর এক ওভারহলিং, সংস্কার হবার পরেও তা ঠিক হয় না কেন, টার্গেট উৎপাদন দেয় না কেন? তারা স্বার্থপর না হলে, দুর্নীতি না করলে, অভিজ্ঞ ও আন্তরিক হলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই ধরনের দুর্দশা হবে কেন? প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ খাতের বেহাল অবস্থার জন্যে আমাদের বেশী বুদ্ধিমান আমলা ও কম বুদ্ধিমান রাজনীতিকরা দায়ী অবশ্যই, কিন্তু সবচেয়ে বেশী দায়ী 'দুর্নীতিমুক্ত' দেশের সীমাহীন দুর্নীতিপরায়ণ কিছু দাতা গোষ্ঠী ও বিদেশী সংস্থারা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তদানীন্তন জ্বালানী উপদেষ্টা এবং বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব হাসান মাসহুদ চৌধুরীও সে সময় তার রিপোর্টে এই ধরনের কথাই বলেছিলেন। তার মতে, 'বিদ্যুৎ খাতের বেহাল অবস্থা ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার পেছনে দাতা সংস্থাও দায়ী। গত পাঁচ বছর দাতা সংস্থার পরামর্শে যে সব প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল তার সবই ছিল ব্যয়বহুল। গত পাঁচ বছর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে প্রায় প্রতিদিনই বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে ছিল দাতাদের পদচারণা। এছাড়া দাতাদের বরাদ্দকৃত ঋণের বিনিময়ে দাতাদের পছন্দমতো পরামর্শক নিয়োগ, অপ্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও নীতি উন্নয়নের নামে বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করতে হয়েছে কোটি কোটি টাকা। যে সব স্টাডি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অনায়াসে করতে পারতেন, দাতাদের চাপে সে সব স্টাডির জন্যে টেন্ডার আহ্বান করা হতো। বিভিন্ন শর্ত দিয়ে তাদের পছন্দের লোককেই সে স্টাডির জন্যে নিয়োগ দেয়া হতো। যে স্টাডি মন্ত্রণালয় অনায়াসে ১০ হাজার টাকায় করতে পারতো, সে স্টাডির জন্যে বাইরের প্রতিষ্ঠানে বিল আসত কোটি টাকার ওপর। আর দাতাদের কথা না শুনলে ঋণ দেয়া বন্ধ করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হতো।' (সংবাদ, ১ জানুয়ারি, ০৭) একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মন্ত্রণালয় ছিল দাতাদের কাছে অসহায়। দাতদের পছন্দমত টেন্ডার তৈরি না করলে, তাদের পছন্দের পক্ষকে কাজ না দিলেই টেন্ডার প্রক্রিয়া যতই স্বচ্ছ হোক তা দাতাদের কাছে অস্বচ্ছ হয়ে দাঁড়াত। তাদের এইসব ভুয়া অভিযোগের কাছে মন্ত্রণালয় কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তার একটা দৃষ্টান্ত জোট সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের একটা চিঠি। চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিনা আই. ওয়ালিককে। ক্রিস্টিনা ওয়ালিক বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের একটা টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনেছিলেন। এই অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করেই বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ ক্রিস্টিনা ওয়ালিককে এই চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিতে প্রতিমন্ত্রী বলেন, "বিশ্বব্যাংক চাঁদপুর ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যে অনিয়ম রয়েছে বলে উল্লেখ করছেন, সে ব্যাপারে আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে, এ টেন্ডার

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের অস্বচ্ছতা নেই। কিন্তু তারপরেও আমি বিশ্ব ব্যাংককে অনুরোধ করছি আদৌ এসব টেন্ডারে কোন রকমের অস্বচ্ছতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্যে বিশ্ব ব্যাংকের কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হোক। ... ...

আমরা বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ২০০৪ সালের প্রথম দিকে সব উন্নয়ন সহযোগীকে ডেকেছিলাম, যেখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে কী পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন করা যায়। এ ছাড়াও এসব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি উন্নয়ন সহযোগীদের কাছেও আর্থিক সহযোগিতা চেয়েছিলাম। কিন্তু এরপর প্রায় দেড় বছর পার হয়ে গেলেও আমরা কারও কাছ থেকে কোন সাড়া পাইনি।" (সংবাদ, ১৭ মে, ০৬) দাতারা মন্ত্রীর আহ্বানে যেমন সাড়া দেয়নি, তেমনি ক্রিস্টিনা ওয়ালিকও তার ভুয়া অভিযোগ মন্ত্রণালয়ের ওপর থেকে প্রত্যাহার করেনি। দাতাদের কাছে এটা শুধু এক মন্ত্রণালয়ের অসহায়ত্ব নয়, স্বাধীন সার্বভৌম সরকারেরও অসহায়ত্ব।

দাতা সংস্থারা এক সাথে কার্যকারক ও সমালোচক দুই-ই। বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবি তাদের দেয়া ঋণের চুক্তিতে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার দুরবস্থা বলে এসেছে। তাদের মন রক্ষার জন্যে ১৯৯১ সালে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (PDB) থেকে আলাদা করে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ডেসকো) সৃষ্টি করা হয়। পরে বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবি'র প্রেসক্রিপশন অনুসারেই সঞ্চালন, বিতরণ ও পরিচালনকে আরও বিখণ্ডিত করে নতুন ট্রান্সমিশন কোম্পানী সৃষ্টি করা হয়। দুই সিদ্ধান্তই বিদ্যুৎ বিভাগের সমস্যা বাড়িয়েছে, বিদ্যুৎ খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিশ্বব্যাংক ও এডিবি এই ক্ষতি ও সমস্যারও সমালোচক। এই সমস্যা ও ক্ষতির কারণ তারা হয়েও ব্যর্থতার দায় তারা চাপাচ্ছে আমাদের বিদ্যুৎ খাতের ওপর।

দাতা সংস্থা এডিবি'র দুর্নীতি, অন্যায় চাপ ও পদে পদে হস্তক্ষেপের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ২৪০ মেগাওয়াটের দুইটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ পাবার জন্যে একটি চীনা ও একটি ভারতীয় কোম্পানী পাগল হয়ে ওঠে। ভারতীয় কোম্পানী এডিবি'তে থাকা তাদের লোকদের মাধ্যমে এডিবি'কে বশে আনতে সমর্থ হয়। কিন্তু টেন্ডার অনুসারে কাজ পাবার কথা চীনা কোম্পানীর। চীনা কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানীর চাইতে ১৪০ কোটি টাকা কম দর প্রস্তাব করে। নির্মাণ সময় সীমার দিক দিয়েও চীনা দরপত্র গ্রহণযোগ্য ছিল। বাংলাদেশ পক্ষ চীনা দরপত্র গ্রহণ করে মতামতের জন্যে ফাইলটি এডিবি'র কাছে পাঠায়। এডিবি ভারতীয় কোম্পানীকে কাজ দেবার পক্ষে সুস্পষ্ট মত দেয়। এ নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলা অবস্থায় চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এডিবি'র অন্যায় চাপের ফলে ভারতীয় কোম্পানীই সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ পেয়ে গেছে। এডিবি তার এই মহা দুর্নীতিকে নিশ্চয় তার অধিকার বলে মনে করে! এডিবি'র মত দাতাদের এই ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি আমাদের 'বুদ্ধিমান' একশ্রেণীর আমলা ও 'কমবুদ্ধির' একশ্রেণীর রাজনীতিকদের দুর্নীতিগ্রস্ত বানিয়েছে। কিন্তু তারা দুর্নীতির নির্মাতা হয়েও আজ সাধু, আর আমরা আজ চোর বটে। এই চোর ধরার অভিযান চলছে বাংলাদেশে, কিন্তু চোর যারা তৈরি করেছে সেই দাতাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাধ্যটুকুও কিন্তু আমাদের কারও নেই। থাকলে ভারতীয় কোম্পানী সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ পেল কি করে?

www.pathagar.com

এডিবি'র মত দাতাসংস্থাগুলো শুধু দুর্নীতি নয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে, বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতকে তাদের জমিদারি বলে মনে করছে। পশ্চিমী উৎসের দাতা সংস্থাগুলো অন্য কোন দাতা সংস্থাকে তাদের এই জমিদারিতে ঢুকতে দিতে নারাজ। আবার তারাও ঋণ দিচ্ছে না তাদের স্বার্থের ষোল আনা পূরণ না হলে। গত পাঁচ বছর এডিবি প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে কোন ঋণ দেয়নি। অথচ তাদের ঋণ পাবার শর্ত পূরণ করতে গিয়েই জোট সরকারের পাঁচ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৪ বার। জ্বালানী তেলের দাম বেড়েছে ৮ বার, গ্যাসের দাম বেড়েছে ৩ বার। কিন্তু তাদের শর্ত পূরণ করার পরেও তারা ঋণ দেয়নি, নানা সংস্কারের অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করেছে। হতাশ হয়ে বাংলাদেশ সরকার ভিন্ন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহের উদ্যোগ যখনই নিয়েছে, তখন এডিবি'রা ছুটে এসেছে। বলেছে তারাই ঋণ দেবে। গাজীপুরে ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা ছিল। একটি জার্মাণ সংস্থা ৯০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ দিতে রাজী হয়েও অজ্ঞাত কারণে পিছিয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকারের চেষ্টার ফলে ওআইসি'র ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ঋণ দিতে রাজী হয়। কিন্তু এই প্রকল্প যাতে কার্যকরী না হয় পশ্চিমী দাতা সংস্থাগুলো এর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে যায়। প্রকল্পটি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বার বার প্রতিশ্রুতি দিলেও এডিবি'র ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না। এডিবি ও বিদেশী দাতাদের ঋণ প্রস্তাবের সাথে থাকে তাদের পছন্দনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা এবং তাদের মনোনীত কোম্পানীকে কাজ দেয়ার শর্ত। শর্ত না মানলে বিভিন্ন অজুহাতে ঋণ অনিশ্চিত করে তোলা হয়। জোট সরকারের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারও আজ এই সংকটের মুখোমুখি। ভারতীয় কোম্পানীকে কাজ দেয়ার ফলে সন্তুষ্ট এডিবি'র কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সিদ্ধিরগঞ্জ প্রকল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় ঋণ পাবে। কিন্তু তার পরে? পরেও এইভাবে এডিবি'র দুর্নীতির সাথী হতে হবে। দুর্নীতির সাথী হলে ঋণ মিলবে বটে, জনগণের মাথায় ঋণের বোঝা বাড়বে বটে, কিন্তু বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন হবে, এটা বলা যাবে না। বিগত বছরগুলোতে বিদ্যুৎ খাতের জন্য পশ্চিমী উৎস থেকে পাওয়া সহযোগিতা ও ঋণের এটাই ইতিহাস। এই বাস্তবতা ছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্যে আরেকটা সমস্যা আছে। সেটা হলো, দেশীয় দুর্নীতিবাজদের জেলে পুরে তারা দুর্নীতিবাজ দাতাদের সাথী হবেন কি করে? আর দাতাদের শেষহীন সংস্কারের দাবি পূরণই বা করবেন কি করে? দু'দিন আগেও তারা সংস্কারের নতুন নকশা দিয়েছে। আমাদের বিদ্যুৎ খাতকে প্রতুল অথবা বিদ্যুৎ চাহিদাকে পরনির্ভরশীল না করা পর্যন্ত তাদের সংস্কার রাজনীতি থেকে আমাদের উদ্ধার নেই, তাদের সন্তুষ্ট করাও সম্ভব নয়। আমার মনে হয় ঋণের বিকল্প উৎস তালাশ করার সময় এসেছে, যদি বিদ্যুৎ খাতের সত্যিই আমরা উন্নতি চাই।

১৬ জুলাই, ২০০৭

এরদোগানের তুরস্ক

তুরস্কে জনতার বিসয় হয়েছে, বিজয় হয়েছে গণতন্ত্রের। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আহমেদ নেকদেত সেলজারের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার প্রশ্নে তুরস্কে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। তুরস্কের জনগণ এরদোগানের এ. কে. পার্টিকে বিরাট বিজয় দান করে সংকটের অবসান ঘটিয়েছে। ইসলামপন্থী বলে পরিচিত ক্ষমতাসীন জাস্টিস এন্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি (এ.কে. পার্টি) প্রেসিডেন্ট পদে

www.pathagar.com

তাদের প্রার্থী হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুলকে দাঁড় করায়। সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার জন্যে পার্লামেন্টের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট দরকার হয়। তবে তিন পর্যায়ের নির্বাচনের প্রথম দুই পর্যায়ে যদি কোন প্রার্থীই দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না পায়, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেলেই তিনি নির্বাচিত হবেন। এই হিসাবে আব্দুল্লাহ গুলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া অবধারিত ছিল। কারণ পার্লামেন্টে এ.কে. পার্টির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, যার ফলে তৃতীয় পর্যায়ে এসে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে যেতেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সেনাবাহিনী ও প্রেসিডেন্ট যাতে কোন ইসলামপন্থী প্রেসিডেন্ট হতে না পারে এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। প্রথম রাউন্ড ভোটের দিনেই সেনাবাহিনী কোন ইসলামপন্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার বিপক্ষে শাসনতান্ত্রিক আদালতে একটা নোট প্রেরণ করে। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি হুমকিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে যে, 'তুরস্কের সেনাবাহিনী প্রয়োজন হলে প্রকাশ্যে তাদের অবস্থান প্রদর্শন করবে।' তাদের সাথে বিরোধী কিছু দল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাতিল করার জন্যে শাসনতান্ত্রিক আদালতের কাছে আবেদন জানায়। গণতন্ত্রের মাথা খেয়ে সেনাবাহিনীকেও উস্কানি দিয়ে তারা বলে, 'আব্দুল্লাহ গুলকে প্রেসিডেন্ট হবার অনুমতি দেবেন না।' রাজপথেও তারা ভয়ঙ্কর আন্দোলন গড়ে তোলে। ইস্তাম্বুল, আংকারার রাজপথ লাখ মানুষের মিছিল, প্ল্যাকার্ড, ব্যানারে ছেয়ে যায়। রাজপথে সেনাবাহিনীর প্রশংসা এবং এ.কে. পার্টির বিরুদ্ধে ধ্বনি ওঠে, প্রধানমন্ত্রী এরদোগান এবং আব্দুল্লাহ গুলকে রাষ্ট্রীয় ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি হুমকি হিসাবে অভিহিত করা হয়। তারা বলে, 'আমরা শরিয়া আইন চাই না, সামরিক অভ্যুত্থানও চাই না, আমরা চাই পূর্ণ গণতন্ত্র।' তারা আরও বলে, 'তুরস্ক আজ এ.কে. পার্টির হুমকির মুখে। তারা ক্ষমতায় এলে আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা থাকবে না।' ইস্তাম্বুলে তাদের সবচেয়ে বড় মিছিলে ৬শ' এনজিও জনশক্তি অংশগ্রহণ করে।

এই সংকট মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী রেসিপ তাইয়েব এরদোগানের এ.কে. পার্টি সংঘাত এড়ানোর পথ অনুসরণ করে। আব্দুল্লাহ গুল প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়া থেকে সরে দাঁড়ান। এ.কে. পার্টি রাজপথে না গিয়ে জনগণের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। জনরায় নেয়ার জন্য পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। গত ২২ জুলাই তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে এ.কে. পার্টি তুরস্কের ৫০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ভোটে বিজয় লাভ করে। ৫৫০ সদস্যের পার্লামেন্টে তারা ৩৪১ আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। মাত্র অল্প ব্যবধানে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। সকল অপপ্রচার, গালিগালাজ ও মিথ্যাচার এ.কে. পার্টির জনপ্রিয়তার সয়লাবে ভেসে যায়। এ.কে. পার্টির জনপ্রিয়তা তুরস্ককেও এক সংকট থেকে বাঁচায়।

আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইস্যু আসে। এ.কে. পার্টি আব্দুল্লাহ গুলকেই আবার প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড় করায়। এবার কিন্তু সেনাবাহিনীর তরফ থেকে আগের মত বিরোধিতা আসে না। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট চুপচাপ থাকেন। শাসনতান্ত্রিক আদালত আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। এবার আব্দুল্লাহ গুলের প্রার্থিতার বিরোধিতায় একটি মিছিলও তুরস্কের রাজপথে নামেনি। জনতার রায় এভাবে বিরোধী সকলের মুখ বন্ধ করে

www.pathagar.com

দিয়েছে। অবশেষে জনতার জয় হয়েছে, জয় হয়েছে গণতন্ত্রের। সংকট থেকে বেঁচেছে তুরস্ক। আরও শক্তিশালী হয়ে ইসলামপন্থী বলে অভিহিত এ.কে. পার্টি তুরস্কের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

সংকট থেকে সাফল্যে উত্তরণ তুরস্কের ইসলামী দলের এক গৌরবজনক ইতিহাস। অন্ধকারে পথ চলেই তারা সবসময় আলোর তালাশ করেছে। শত নির্যাতনের মধ্যেও তারা অগণতান্ত্রিকতাকে পরিহার করেছে এবং ধৈর্যের সাথে গণতন্ত্রকে ধারণ করে চলেছে। মিসরের একজন কলামিস্ট আমর তাহা সম্প্রতি লিখেছেন, "The majority of Islamic Parties in Turkey rejects violence or forceful attempts to over-rule the established regime, except for minor limited groups. More significantly, the evolution of political Islam in Turkey has dynamically changed to absorb ideas of democracy, human rights, rule of law and accountability." 'Political Islam in Turkey', Amr Taha, Islam online, net, Aug 29, 07. অর্থাৎ দু'একটি ক্ষুদ্র ও সীমিত গ্রুপ ছাড়া তুরস্কের অধিকাংশ ইসলামী দল প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারকে সন্ত্রাস ও শক্তির জোরে উৎখাত করাকে প্রত্যাখ্যান করে। অধিকন্তু তুরস্কে 'রাজনৈতিক ইসলাম'-এর ক্রমবিকাশ পরিবর্তনের মাধ্যমে জওয়াবদিহিতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও গণতন্তের ধারণাকে আত্মীকরণ করেছে।' অবশ্যই কলামিস্ট এখানে তার বক্তব্যে ইসলামী দলগুলোর গণতান্ত্রিক চরিত্র তুলে ধরার সাথে এই বৈশিষ্ট্য তারা ক্রমবিকাশের পরিবর্তনের ধারায় আত্মীয়করণ করেছে বলে যে মন্তব্য করেছেন তা কিন্তু ইতিহাস নয়, তুরস্কের ইসলামী দলগুলোর গত ৩৭ বছরের ইতিহাস বলে না এই কথা। তাদের যাত্রার শুরু থেকেই তারা গণতন্ত্রের পথে চলেছে। পদে পদে তাদের যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। বাধা সত্ত্বেও জনগণের কাছে হাজির হওয়ার পথেই তারা অগ্রসর হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় ৩৭ বছর আগে ১৯৭০ সালে নাজমুদ্দিন আরবাকান, পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার, প্রথম ইসলামী দল 'মিল্লি সালামত পার্টি' (ন্যাশনাল সলভেশন পার্টি) গঠন করেই মানুষের বিপুল সমর্থন নিয়ে সোলেমান ডেমিরেলের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। সোলেমান ডেমিরেল হন প্রধানমন্ত্রী এবং নাজমুদ্দিন আরবাকান উপপ্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ১৯৭১ সালেই সেনাবাহিনী মিল্লি সালামাত পার্টিকে তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য হুমকি অভিহিত করে বেআইনী ঘোষণা করে। নাজমুদ্দিন আরবাকানের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়।১৯৮০ সালে নাজমুদ্দিন আরবাকানের অনুসারী বন্ধুরা মিল্লি সালামত পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করে। কিন্তু ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের সময় এই দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বেআইনী হওয়ার অব্যবহিত পরেই জনৈক আলী তিরকমেন্ট 'ওয়েলফেয়ার পার্টি' প্রতিষ্ঠা করে দলের কাজকে পুনরুজ্জীবিত করে। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে 'ওয়েলফেয়ার পার্টি' আহমেদ তেকদাল-এর নেতৃত্বে ৪ দশমিক ৪ পারসেন্ট ভোট লাভ করে। দলটি নানা রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে আরও ভালো করে এবং মোট ভোটের ৭ শতাংশের অধিকারী হয়। এর ৪ বছর পর ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই দল লাভ করে ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট। কিন্তু পৌর নির্বাচনের মত স্থানীয় ভোটে ওয়েলফেয়ার পার্টি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়। ১৯৮৯ সালের পৌর নির্বাচনে এই দল একশটি ছোট নগরী ছাড়াও ৫টি বড় বড় শহরের মেয়রের পদে বিজয় লাভ করে।

www.pathagar.com

আবার বিধি-নিষেধের কবলে পড়ে ওয়েলফেয়ার পার্টি। তার রাজনীতি বন্ধ হয়ে যায়। 'রাফা' পার্টি নামে নতুনভাবে দল গঠন করা হয়। নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হয়ে নাজমুদ্দিন আরবাকান নতুন দলের দায়িত্বে আসেন। ১৯৯৪ সালের পৌর নির্বাচনে দলটি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। মোট ভোটের ১৯ শতাংশ লাভ করে রাজধানী আংকারা ও বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুলের মেয়র পদসহ ২৭টি বড় শহর ও ৪শ'টি ছোট শহরের মেয়র পদে বিজয়ী হয়। তুরস্কের আজকের প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েব এরদোগান রাফা পার্টি তেকে ইস্তাম্বুলের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরের বছর তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে নাজমুদ্দিন আরবাকানের 'রাফা' পার্টি ২১ দশমকি ৩২ শতাংশ ভোট পেয়ে তুরস্কের সর্ববৃহৎ দলে পরিণত হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন 'ট্রুথ পার্টি" পেয়েছিল ১৯ দশমিক ২০ পারসেন্ট এবং মাদারল্যান্ড পায় ১৯ দশমিক ৬৬ পারসেন্ট ভোট। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তখন সোলেমান ডেমিরেল। তিনি বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবে নাজমুদ্দিন আরবাকানকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করেন। 'ট্রুথ পার্টি'র সাথে কোয়ালিশন করে নাজমুদ্দিন আরবাকান সরকার গঠন করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সরকার টিকেনি ট্রুথ পার্টি কোয়ালিশন ত্যাগ করায়। এর পরই আবার বিপদ নেমে আসে 'রাফা' পার্টির ওপর। ১৯৯৭ সালে সামরিক বাহিনী রাফা পার্টির ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং ১৯৯৮ সালে এই দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে রাফা পার্টির স্থলে 'ভার্চু পার্টি' নাম নিয়ে নাজমুদ্দিন আরবাকানরা আবার কাজ শুরু করেন। এই সময় একটা বড় ঘটনা ঘটে। তুরস্কের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েব এরদোগান ও তার সাথীরা কিছু নীতির প্রশ্নে নাজমুদ্দিন আরবাকানের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২০০১ সালে তারা 'জাস্টিস এন্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি' (A.K.P.) গঠন করেন। ২০০১ সালেই এই পার্টি সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৩৪ পারসেন্ট ভোট লাভ করে বৃহত্তম দল হিসাবে সরকার গঠন করে। পার্টিপ্রধান এরদোগানের জন্য ভোটে দাঁড়ানো তখন নিষিদ্ধ ছিল। ফলে দল বিজয় লাভ করে ক্ষমতায় গেলেও এরদোগান কিন্তু নির্বাচিত হতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী হন তারই সহকারী আবদুল্লাহ গুল। পরে পার্লামেন্টে আইন পাস করে এরদোগানের ওপর নিষিদ্ধ-আদেশ প্রত্যাহারের পর তাকে বাই-ইলেকশনে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত করার পর তাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। আব্দুল্লাহ গুল হন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এই আব্দুল্লাহ গুলকেই প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে প্রার্থী করায় এরদোগানের এ.কে. পার্টি সামরিক বাহিনীর হুমকির মুখে পড়ে এবং বিরোধী দলগুলোর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। পূর্বের মতই সংঘাত এড়িয়ে দলটি রায়ের জন্যে জনগণের কাছে যায় এবং জনগণ তাদেরকে আরো বেশি ভোট দিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় পাঠিয়েছে। আব্দুল্লাহ গুলই আবার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এইভাবেই তুরস্কের ইসলামপন্থী দল সকল প্রতিকূলতার মধ্যে গণতন্ত্রকে আঁকড়ে থেকে ক্রমবর্ধমান হারে জনগণের সমর্থন ও ভালোবাসা লাভ করছে। ক্রমবিকাশের ধারায় তারা গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে আত্মীকরণ করেনি, বরং গণতনত্র ও আইন সাথে নিয়েই তাদের জন্ম।

অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়ে এই প্রসঙ্গে একটা বেদনাদায়ক ইতিহাসের এখানে উল্লেখ করা যায়। শতকরা ৯৯ জন মুসলমানের দেশ তুরস্কের আধুনিক ইতিহাসে ইসলামপন্থী দলগুলো যেভাবে নির্যাতিত হয়ে এসেছে, অতীতে উসমানীয় খেলাফতের আমলেও ইউরোপকে খুশি করার জন্য খৃস্টান নাগরিকদের অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে

www.pathagar.com

মুসলিম প্রজাদের ওপর নিপীড়ন চালানো হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, তুরস্কের উসমানীয় খলিফারা ইউরোপের খৃস্টান শক্তিসমূহের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার জন্যে তাদের মন জয়ের কম চেষ্টা করেনি। রাজস্ব, বিচার, সামাজিক প্রথা, আর্থিক, সামাজিক, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে খৃস্টান প্রজাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হতো। এমনকি বৈধ, কি অবৈধ তারও তোয়াক্কা করা হতো না। ইতিহাস বলছে, তুর্কি সরকার বহুবার বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন ও খৃস্টানদেরকে নানা প্রকার সুবিধাদানে বাধ্য হয়েছেন। মুসলমানেরা প্রতিবারই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু সেসব অরণ্য-রোদনে পর্যবসিত হয়েছে। অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও এ কথারই সাক্ষ্য দিয়েছেন। লিখেছেন, "সুলতানের খৃস্টান প্রজারা সংখ্যায় বাড়ছে এবং ধন ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হচ্ছে। –এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনেক পেছনে ফেলেছে।" (Luke, 66-67) "প্রকৃতপক্ষে রায়াহ (খৃস্টান) প্রজাদের উপর কর খুবই কম। নিশ্চিতভাবে দুনিয়ার কোন কৃষককেই এমন সুবিধাজনক পজিশনে রাখা হয়নি।" (Clair and Brophy, 115-116) "খৃস্টানরা যাহাতে খাজনায় ইজারা লইয়া ধনী হইতে পারে তজ্জন্য সরকার তাহার (তুর্কি মুসলমানদের) ওয়াক্‌ফগুলি বিনষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু রায়াহর (খৃস্টানদের) ওয়াক্‌ফে হাত দেয়ার সাহস তাহাদের হয় নাই। ... ... বস্তুত রায়াহ্‌র সুখ বর্ধনের জন্যে নানা জুলুমের চাপে তুর্ক জাতি যেভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে, মুসলমান জাতি রায়া অপেক্ষা অধিকতর ও কঠোরতর পরিশ্রম না করিলে ইউরোপের মানচিত্র হইতে বহু পূর্বে তাহার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইত। ... ...

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত প্রজার উন্নতি বিধান না করিয়া কেবল খৃস্টানদিগকে একচেটিয়া সুবিধা দেওয়ার ফলে হতভাগ্য তুর্ক জাতির সর্বনাশ হইয়াছে।" (তুরস্কের ইতিহাস, ডঃ আব্দুল কাদের, পৃঃ ২২০ ও ২২২) তুর্কি খলিফারা এসব করেছেন পশ্চিমী খৃস্টান রাষ্ট্রশক্তির চাপে এবং তাদের মনোরঞ্জনের জন্যেই। কিন্তু তুর্কি সুলতানরা কি তাদের মন পেয়েছিলেন? পাননি। এতো সুখে থাকার পরেও তুরস্কের খৃস্টান প্রজাদের কল্পিত দুঃখের মর্মন্তুদ কাহিনী ইউরোপে প্রচার হয়েছে। এ সম্পর্কিত বই লিখিত হয়ে পানির মত বিক্রি হয়েছে ইউরোপের বাজারে। ফল হিসেবে তুর্কি সুলতানারা পেয়েছে খৃস্টান প্রজাদের ষড়যন্ত্রমূলক বিদ্রোহ এবং সেই উপলক্ষে ইউরোপীয় খৃস্টান রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ। আজকের তুর্কি সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ পদক্ষেপে ইউরোপ-আমেরিকায় যারা আনন্দ-আহলাদে গদগদ হচ্ছে তাদেরই অতীত ইতিহাস এটা। সুতরাং তাদের কাছে আজকের তুরস্কের পাবার কিছু নেই। বরং তুর্কি সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ আচরণে সেখানকার মুসলিম জাতিসত্তা যতকানি নিঃস্ব হবে পশ্চিমের ওরা ততখানিই ঐশ্বর্যশালী হবে। কামাল আতাতুর্ককে দিয়ে ইসলামের খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে, কিন্তু পোপীয় ব্যবস্থাকে পশ্চিমীরা ধ্বংস করেনি। খৃস্টান বিশ্বের মুরুব্বী হিসেবে 'পোপ'-কে এখন তারা শক্তিশালীই করে তুলছে। এটাই পশ্চিমীদের আসল চেহারা। ধর্মনিপেক্ষতাবাদের নেশায় মুসলমানদের মাতাল করে রেখে ওরা বিশ্বব্যাপী খৃস্টরাজ্য কায়েম করার দিকে এগুচ্ছে। একদিন আফ্রিকাকে বলা হতো মুসলিম মহাদেশ। সেই আফ্রিকায় আজ খৃস্টানদের সংখ্যা ২৮ কোটি, আর মুসলমানদের সংখ্যা ২৪ কোটি। (ব্রিটানিকার সর্বশেষ ইয়ারবুক দ্রষ্টব্য) কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে ইউরোপ বানিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপ তুরস্ককে গ্রহণ করেনি। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর সদস্যপদও তুরস্ককে দেয়নি এখনও।

www.pathagar.com

যাক প্রসঙ্গের বাইরে চলে গিয়েছিলাম। আগের কথায় ফিরে আসি। একটা প্রশ্ন খুব বড় হয়ে উঠছে, আব্দুল্লাহ গুলকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে না দেয়ার ক্ষেত্রে তুরস্কের সামরিক বাহিনী, সাংবিধানিক আদালত এবং বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কেন? এই কেন-এর উত্তর প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত। তুরস্কে সরকার নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হলেও প্রেসিডেন্টের হাতে মৌলিক কিছু ক্ষমতা রয়েছে যা রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ন্ত্রণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সব প্রতিষ্ঠানেরই প্রধানকে নিয়োগ করেন প্রেসিডেন্ট। সাংবিধানিক আদালত, সেনাপ্রধান, আপীল আদালত, কাউন্সিল অব স্টেট, হায়ার এডুকেশনাল কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রেক্টরসহ মন্ত্রণালয়েরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পদের নিয়োগ প্রেসিডেন্ট করে থাকেন। তাছাড়া মন্ত্রীদের নিয়োগ এবং পার্লামেন্ট প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক সংশোধন ও বিল অনুমোদনের অধিকার প্রেসিডেন্টের। তুর্কি প্রেসিডেন্টের এই সব দায়িত্ব নিছক আলঙ্কারিক নয়। গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব কোন ইসলামপন্থীর হাতে যাক, তা সেনাবাহিনী, ধর্মনিরপেক্ষ দলসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো চায়নি। তারা ভয় করেছে সরকার ইসলামপন্থী একটা দলের হাতে যাবার পর প্রেসিডেন্ট পদও তাদের হাতে গেলে দেশের চরিত্র তারা পাল্টে দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট পদে আব্দুল্লাহ গুলের বিরোধিতার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখিয়েছেন তুরস্কের দৈনিক জামান পত্রিকার কলামিস্ট ও কূটনৈতিক সংবাদদাতা কিউমালি ওনাল। তার মতে আব্দুল্লাহ গুলের বিরোধিতার পিছনে গোষ্ঠী স্বার্থও কাজ করেছে। এই গোষ্ঠী-স্বার্থ, তার মতে, গত প্রায় তিনশ' বছর ধরে তুরস্কের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনি লিখেছেন, "Thorughout all the history of the Turkish Republic and the last 200 years of the Ottoman Empire, the power has been in the hands of the same elites community. Who are these elites? They are the people of big enterprises, the army, universities, high courts and the important posts in some Ministries... In its 80 year history, the Turkish Republic has had 10 Presidents, but just Turgut Ozal was seen out of the elites and was portrayed as a 'civil, democrat and devout' president who made many extra-ordinary changes."

'অর্থাৎ তুর্কি প্রজাতন্ত্রের গোটা কাল এবং তার পূর্ববর্তী ওসমানীয় খিলাফতের শেষ ২০০ বছরের ইতিহাস হলো ক্ষমতা একটা এলিট শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত থেকেছে। বড় ব্যবসায়ী, সশস্ত্র বাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয়, হাইকোর্ট এবং উল্লেখযোগ্য পদের আমলারাই ছিল এই এলিট। প্রজাতন্ত্রের ৮০ বছরের ইতিহাসের ১০ প্রেসিডেন্টের মধ্যে মাত্র একজন, তুরগুত ওজাল, এই শ্রেণীর বাইরের ছিলেন এবং এই কারণেই তাকে 'গণতন্ত্রী' বলার সাথে সাথে গোঁড়া ধর্মপ্রাণও বলা হতো। তিনি এলিটদের অপছন্দনীয় অনেক অসাধারণ আইনী সংস্কার নিয়ে আসেন।'

আব্দুল্লাহ গুলকে এলিটদের বাইরে এবং তুরগুত ওজাল-এর চেয়েও আরও বেশি 'গোঁড়া' মনে করছে এলিটরা। তিনি প্রেসিডেন্ট হলে তুরগুত ওজালের পরিবর্তনের ধারাকে আরও বেগবান করবেন বলে তাদের আশঙ্কা। এর কারণ হিসাবে তারা বলছেন যে, এ.কে. পার্টি নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী এরদোগান সব সময় তুরগুত ওজালের সূচিত সংস্কারের প্রশংসা করেন। এসব কারণেই আব্দুল্লাহ গুলের বিরোধিতায় তারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

তুরস্কের উক্ত এলিটরা সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হিসাবে বলেন, 'রাষ্ট্রের দর্শন' ও 'সংবিধানের ভিত্তি' ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংস্কারের নামে আহত করবে এ.কে. পার্টি। এলিটদের আশংকার যে ভিত্তি সেটাই একেবারে অমূলক। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তুরস্কের 'রাষ্ট্র দর্শন' এবং 'সংবিধানের ভিত্তি' এটা বাস্তবতা নয়, অতিরঞ্জন। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক যখন খিলাফত উৎখাত করে তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র ও সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে তিনি গ্রহণ করেননি, বরং রাষ্ট্র দর্শন হিসাবে ইসলামই বর্তমান ছিল। মোস্তফা কামাল ইন্তিকাল করেন ১৯৩৮ সালে। তার মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে তুরস্কের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাব ঘটে। তুরস্কের এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট এবং ট্রুথ পার্টির নেতা সোলেমান ডেমিরেল এ সম্পর্কে বলেছেন, "১৯২৪ সালে মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নতুন তুর্কি প্রজাতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। প্রতিষ্ঠিত হবার দীর্ঘ তের বছর এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ছিল ইসলাম। কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে ১৯৩৭ সালে শাসনতান্ত্রিক নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা পরবর্তীকালের উড়ে আসা একটা বিষয়, নতুন প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি তা কিছুতেই ছিলো না।" সোলেমান ডেমিরেল এই স্পষ্ট সত্য উচ্চারণের পর এ ব্যাপার নতুন কোন যুক্তির প্রয়োজন পড়ে না। তবু আর একটা কথা, মোস্তফা কামাল জাতির কাছ থেকে 'আতাতুর্ক' বা 'জাতির পিতা' উপাধি পান ১৯৩৫ সালে, তখনও কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা তুরস্কের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আসেনি। অর্থাৎ যখন তিনি 'আতাতুর্ক' হলেন তখনও তুরস্কের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ধর্মনিরপেক্ষ মোস্তফা কামালকে তুর্কি জাতি 'আতাতুর্ক', উপাধি দেয়নি। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের জীবনের শেষ বছরে কিভাবে তুরস্কের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবেশ করলো, এ নিয়েই বরং প্রশ্ন উঠতে পারে।

তবু কিন্তু আব্দুল্লাহ গুল এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এরদোগান তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতাকে এই দৃষ্টিতে দেখছেন না এবং প্রশ্নও তুলছেন না। সাবেক প্রেসিডেন্ট সোলেমান ডেমিরেল 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে উড়ে এসে জুড়া বসা' বিষয় বললেও এরদোগানরা তা বলছেন না। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে লড়াইয়ে নামতে চান না। কিন্তু মানবাধিকারের পক্ষে অনড় অবস্থান নিতে চান। উল্লেখ্য, এরদোগানের এ. কে. পার্টির ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে মানবাধিকার, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, বিশ্বায়ন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়া ইত্যাদি। তাদের মানবাধিকার দাবির মধ্যে মানুষের ধর্মীয় অধিকারের বিষয়ও রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মানুষের এই অধিকার লংঘন করা যাবে না তারা মনে করেন। কিন্তু তুরস্কের চলমান ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের ধর্মীয় অধিকার হরণ করে রেখেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা-নীতির এই মানবাধিকার লংঘনের প্রতিবিধান করে এরদোগানরা তুরস্কের জনগণকে তাদের ধর্মীয় অধিকার ফিরিয়ে দিতে চান। যতটা আমার মনে পড়ে, নির্বাচনে বিজয় লাভের পর তাৎক্ষনিক এক অনুষ্ঠানে এরদোগান ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, ধর্ম রাষ্ট্র-কাজে হস্তক্ষেপ করুক এটা যেমন চাই না, তেমনি চাই না রাষ্ট্র মানুষের ধর্মীয় জীবন ও তাদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করুক। এটা নিশ্চিত যে, এরদোগানরা তাদের চাওয়া আইন সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবেন। তা যদি হয়, তাহলে তুরস্কের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে রাষ্ট্রের এক প্রকারের জুলুম থেকে রক্ষা পাবে। মাথায় ওড়না

www.pathagar.com

পরার মত বহু কাজ তারা বিনাবাধায় করতে পারবে। নিছক আবেগ নয়, এই আইনের পথে চলেই তুরস্কের ইসলামী দল তুরস্কের ক্ষমতায় এসেছে। ঝড়ের মধ্যে পথ চলে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছা তুরস্কের ইসলামী দলের একটা বিরাট যোগ্যতা।

রাষ্ট্রের পলিসি-প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এরদোগানের এ.কে. পার্টির যোগ্যতার প্রকাশ আরও বেশি। গত সাড়ে চার বছরের শাসনে তারা অর্থনীতি, তুরস্কের আইন-শৃঙ্খলা, তুরস্কের মান-মর্যাদা ও স্থিতিশীলতাকে একেবারে ভূতল থেকে বহু উপরে নিয়ে এসেছে। সাড়ে চার বছর তুরস্কের অর্থনীতি দ্বিগুণ আকার লাভ করেছে। তুরস্কের রফতানি ৩০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৯০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। জিডিপি বলা যায়, লাফ দিয়ে ২০০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৪০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রতিবছর বেড়েছে ৩০ বিলিয়ন ডলার করে। মুদ্রাস্ফীতি কমেছে, দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেয়েছে। এরদোগান সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, যোগাযোগ, পরিবহন এবং কর-ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী সংস্কারের সূচনা করেছে। তুরস্কের স্থিতিশীলতা ও তুরস্কের অর্থনীতির ওপর বিদেশীদের আস্থা বেড়েছে। সকল রাষ্ট্র বিশেষ করে পশ্চিমী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের পররাষ্ট্রনীতি সফল হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে আলোচনায় তারা সফল হচ্ছে।

এ.কে. পার্টির সর্ববিধ এই যোগ্যতাই পর্বত প্রমাণ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তাদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। এই যোগ্যতার বলেই তারা নির্বাচনের পর মুহূর্তে দ্বিধাহীনভাবে বলতে পেরেছে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দল তুরস্কে নেই। তুরস্কের মানুষকে সন্তুষ্ট করার মতো পলিসি-প্রোগ্রাম তুরস্কের আর কোন রাজনৈতিক দলেরই নেই। এ.কে. পার্টির কথা আবেগতাড়িত কোন শূন্যগর্ভ বক্তব্য নয়। এটাই বাস্তবতা। তাদের কাজ, কাজের ফলাফল এবং নির্বাচনের রেজাল্ট এর সাক্ষী। অশেষ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ধৈর্য ও আইনের মাধ্যমে তাদের অব্যাহত সংগ্রাম তাদের অতুলনীয় সাফল্যে অভিষিক্ত করেছে।

৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

দুর্নীতি দমনের ফর্মুলা তালাশ

আমাদের দেশের ললাটে দুর্নীতির যে সাইনবোর্ড ঝুলছে, তা বোধ হয় এখন দেশ-বিদেশের কারও দৃষ্টির বাইরে নেই। তাই আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশন সবার আকর্ষণের একটা বস্তু। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, দাতা সংস্থার লোকরা সেখানে যাচ্ছেন। করুণা ও উপদেশ বিতরণই লক্ষ্য। অনেকের কথা-বার্তা শুনলে মনে হয় দুর্নীতি নামক কোন বস্তুই তাদের দেশে নেই, সব এসে আসন গেড়েছে বাংলাদেশে। সেদিন ভারতীয় হাইকমিশনার দুর্নীতি দমন কমিশনে গিয়ে এর চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করলেন, আলোচনা করলেন। এই আলোচনার উপর ব্রিফ করতে গিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বললেন, বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের সাথে ভারত একাত্মতা ঘোষনা করেছে। এ ব্যাপারে তারা সাহায্য করতে আগ্রহী।' দুদক চেয়ারম্যানের এই বক্তব্য পর্যবেক্ষক মহলের চোখে লেগেছে। তারা বুঝতে পারছেন না বাংলাদেশর দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের সাথে ভারতের একাত্ম হওয়ার অর্থ কি! ভারত একটি ভিন্ন দেশ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কার্যক্রম তাদের ভালো লাগলে তারা এর প্রশংসা করতে পারেন, উৎসাহিত করতে পারেন, কিন্তু একাত্ম হওয়ার অর্থ এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন কিছুর সাথে একাত্ম হওয়ার অর্থ কার্যক্রমটির লক্ষ্য অর্জনে এক সাথে হয়ে যাওয়া। এই অর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে পর্যবেক্ষক মহল ভারতের আগ্রহটাকে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি মনে করছেন। তারা বলছেন, ভারত যদি দুর্নীতিমুক্ত দেশ হতো তাহলে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিবেশীর প্রতি এই ধরনের আগ্রহের একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত, কিন্তু ঘটনা তা নয় মোটেই। ভারতও দুর্নীতিমুক্ত দেশ নয়। কলকাতার 'দেশ' গত ১৭ই এপ্রিলের সংখ্যায় ভারতের দুর্নীতি প্রসঙ্গে লিখেছে, "দুর্নীতি অবিসংবাদিতভাবে আজ প্রতিটি মানুষের জীবনের অঙ্গীভূত। সাধারণত দুর্নীতি বললেই যে চেনা ছবিটা আমাদের মনে ভেসে ওঠে তা হলো, মন্ত্রী-নেতৃবৃন্দের কেলেঙ্কারী অথবা একটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে আসীন কোনও ব্যক্তির ঘুষ নেয়ার ঘটনা। কিন্তু সমাজের প্রতিস্তরে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতির রূপ এখন বিবিধ।"

ভারতীয় সমাজের প্রতিস্তরে ছড়িয়ে পড়া এই 'বিবিধ' দুর্নীতিকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে 'দেশ' পত্রিকা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে, "প্রথমতঃ মন্ত্রী-আমলা-পার্টি, এই ত্রিকোণ স্তম্ভ লালিত রাজনৈতিক পরিকাঠামো ও জনসেবামূলক কাজকর্মের নামে গাড়ি-বাড়ি, অর্থলাভের, এক কথায় আখের গুছিয়ে নেয়ার নির্লজ্জ দুর্নীতি। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষা প্রকল্পের নামে অর্থ তছরূপ। তৃতীয়তঃ প্রশাসন-পুলিশ-পার্টি নিয়ন্ত্রিত বাজার-নীতি থেকে (যাকে লোকে দুর্নীতি বলেই জানে)। চতুর্থতঃ প্রশাসন-আইন-মাফিয়া পরিচালিত সরকারি অর্থের লেনদেনমূলক কুকর্ম, যেখানে অন্তর্ভুক্ত প্রতিরক্ষা-স্বরাষ্ট্র-রেল-পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য অর্থকরী সরকারি দপ্তর সমূহ।" (দেশ ১৭ এপ্রিল, ২০০৭)

দেখা যাচ্ছে, ভারতের এই বিভিন্ন ক্যাটাগরির দুর্নীতি সেখানকার সমাজের সকল স্তরকেই গ্রাস করেছে। ভারতে সর্বব্যাপী এই দুর্নীতি রোধের চেষ্টা কাগজে-কলমে কম হয়নি। ১৯৫০ সালে একটি অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালে 'সান্তানাম' নামক কমিটির সুপারিশে গঠিত হয় 'সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন' (সিভিসি)। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এই দুর্নীতি দমন উদ্যোগের আওতার বাইরে রাখা হয় 'পুলিশ', 'প্রশাসন' ও 'অরণ্য'-এর মত দুর্নীতি জর্জরিত ক্ষেত্রগুলোকে। অনেক পরে 'জনস্বার্থ' সম্পর্কিত আর একটা মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্ট ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের দুর্নীতি খতিয়ে দেখার জন্য একটা কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ অনুসারেই ২০০৪ সালের ২১ এপ্রিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বে গঠিত সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন' (সিভিসি) কেই এই কাজে নিযুক্ত করে। এই দায়িত্ব দেয়ার পরও দুর্নীতি দমনে কোন অগ্রগতি হয়নি। 'দেশ' লিখেছে, "কিন্তু কার্যত (সিভিসি দ্বারা) কিছুই হয় না। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নশীল দেশ ভারতে গণতন্ত্র শুধুই একটা সাইনবোর্ড, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে। যদিও এ দেশে দুর্নীতির উৎসগুলো তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে অনেক গভীরে, এ সমস্যা একদিনে সমাধান হওয়ারও নয়।' ভারতে দুর্নীতির মূল সন্ধান করতে গিয়ে দেশ সর্বশেষে বলেছে, "একটি গণতান্ত্রিক দেশে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই 'ধনলক্ষ্মী'র আশীর্বাদ ধন্য হওয়া একান্ত জরুরি, কিন্তু সেই সাথে

www.pathagar.com

এটাই ভীষণ সত্যি, সেই আশীর্বাদের 'উৎস'গুলোর কাছেই টিকি বাঁধা থাকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ব্যক্তিদের। শেষ পর্যন্ত তাদেরই অঙ্গুলি হেলনে নির্ধারিত হয় ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা।' (দেশ, ১৭ এপ্রিল, ০৭)

ভারতে দুর্নীতির এই যে মহাচিত্র, এর মুখে লাগাম দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ২০০৪ সালে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের দুর্নীতি খতিয়ে দেখার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতের 'সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন' লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। আরও বলা যায়, ১৯৬৪ সালে সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন (সিভিসি) গঠিত হবার পর তার যে ইতিহাস সেটা আমাদের সাবেক দুর্নীতি দমন ব্যুরোর চেয়ে ভালো নয়।

সুতরাং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের খুব ভালো ইতিহাস আছে, এটা ঠিক নয়। দুর্নীতি দমনে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া কিংবা তারা আমাদের সাহায্য করতে পারার মত দুর্নীতিমুক্ত বা দুর্নীতিদমনে তারা সিদ্ধহস্ত, এটাও বাস্তবতা নয়। বরং আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশনের মত স্বাধীন ও শক্তিশালী সংস্থা ভারতে নেই। আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় বিষয়টা জানেন না, তা বলা যাবে না। কিন্তু দুর্নীতি দমনে তিনি ভারতের সাহায্যের প্রশ্নে যে পরিমাণ উৎসাহী হয়েছেন, তাতে ব্যাপারটা তিনি জানেন তাও মনে করা মুশকিল। যেখানে ভারতে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশের পরও সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন কোন কাজে আসেনি এবং যে ভারত নিজেই দুর্নীতি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, সে দেশের সাহায্যের ব্যাপারে একটু বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠা কিছুটা বিদঘুটেই দেখায়।

একটি দেশের সাহায্য প্রস্তাব পাওয়া, কিংবা একটি দেশের সাহায্য চাওয়া নিয়ে এই আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন যেভাবে দেশে-বিদেশে দুর্নীতি দমনের উপায় হাতড়ে বেড়াচ্ছে, তা থেকেই এই আলোচনার প্রয়োজন পড়েছে। দুদক অফিসে বহু বিদেশীর পদধুলি পড়েছে। পদধুলির সাথে তাদের ভাব-গতি দেখে মনে হয়েছে তারা সবাই ধোয়া তুলসিপাতা। কিন্তু তাদের প্রকৃত চিত্র কিন্তু তা নয়। অন্যদিকে দুদকের নতুন কমিশন দায়িত্ব নেবার শুরু থেকে তাদের কথা-বার্তা, দৌড়াদৌড়ি দেখে মনে হচ্ছে রাতারাতিই তারা দেশের ললাট থেকে দুর্নীতির কালদাগ মুছে ফেলবেন। মনে হয়েছিল আগের কমিশনই ছিল সমস্যা। তারা চলে গেছে, এখন দুর্নীতি দমনের কাজ রকেটের গতিতে এগিয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। গত দুই মাসে তাদের সাফল্য মাত্র কয়েকটি মামলা দায়ের। দুদকের ঐ দৃষ্টিভঙ্গি দুর্নীতিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখার ফল অবশ্যই নয়। দুর্নীতির অভিযোগে রাজনীতিক ও কিছু ব্যবসায়ীকে ধরলেই দুর্নীতি দূর হবে না। উপরে 'দেশ' তার শেষ বক্তব্যে বলেছে যে, রাজনীতিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতি করে তাদের রাজনীতির প্রয়োজনে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতেও টিকে থাকার প্রতিযোগিতা থাকে। এই প্রতিযোগিতায় জেতার জন্যই রাজনীতিকদের প্রয়োজন হয় অর্থের। এই অর্থ আসে অরাজনৈতিক এমন সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে যারা প্রকৃতপক্ষে হয় রাজনীতি ও প্রশাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। 'এটা শুধু ভারতের অবস্থা নয়, আমেরিকা-ইউরোপের গণতন্ত্রের জন্যও এ কথা সত্য, বাংলাদেশের জন্যও সত্য। দুর্নীতির এই মূল বা উৎস অব্যাহত রেখে রাজনীতিকদের মুণ্ডুপাত করলেই দুর্নীতি দূর হয়ে যাবে না। কারণ যাদের মুণ্ডুপাত করা হবে, তাদের জায়গায় নতুন যে রাজনীতিকরা

www.pathagar.com

মাঠে আসবেন, তারাও তাদের রাজনীতির স্বার্থে 'দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ঐ ধনপতি ব্যক্তি'দের হাতের পুতুল হয়ে যাবেন।

এটা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত রাজনীতিকেন্দ্রিক দুর্নীতির এক দুষ্টচক্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর রূপ যতটা কদর্য, উন্নত দেশগুলোতে তা নয়। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র আসলে ধনতন্ত্র। গণতন্ত্র সেখানে টাকার আয়ত্তাধীন, দরিদ্ররা এর নাগাল পায় না। সেখানে একজন কংগ্রেস ও সিনেট প্রার্থীকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে হয়। এই অর্থের মালিক হতে গিয়ে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠী স্বার্থের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এবং তারা পরিণত হয় গোষ্ঠী স্বার্থের ক্রীড়নকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও এটাই সাধারণ দৃশ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের দুর্নীতির এই দৃশ্যকে আমাদের দেশে আরও একটু ক্রুড ফর্মে দেখা যায়। আমাদের দেশে দুর্নীতিই শুধু ক্রুড হয় না, দুর্নীতির প্রচারও অনেক ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে হয়। শত বছরেরও বেশি আগে একজন বৃটিশ কর্মকর্তা উইলিয়াম হান্টার আমাদের দেশ সম্পর্কে লিখেছিলেন, এ দেশে সব অভিযোগকে যদি আমলে আনা হয় তাহলে প্রতি থানায় জেলখানা করতে হবে। একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে দেশের অধিকাশ মানুষ জেলখানায় গিয়ে ঢুকতে পারে।'

আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় দেখা যাবে পাল্টাপাল্টি অভিযোগের ছড়াছড়ি, যার অধিকাংশই অসত্য কিংবা বড় একটা অংশই ভিত্তিহীন। পাইকারীভাবে সত্য-অসত্য নির্বিশেষে দুর্নীতির এই প্রকাশই আমাদের দেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কারণ। ভারতে দুর্নীতি থাকলেও ভারত দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ধারে কাছে যায়নি। কারণ প্রথম আলোদের মত পত্রিকা ভারতে নেই, যারা যে পাতে খায় সে পাতই ছিঁড়ে ফেলে। সংবাদ মাধ্যমের এই ভূমিকাও একটা দুর্নীতি। সংবাদ মাধ্যমের এই দুর্নীতিই দেশকে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত দেশ হিসেবে তুলে ধরেছে। এক শ্রেণীর সংবাদপত্র দেশের চেহারা বিকৃতরূপে দেখাতেই যেন আনন্দ পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান এ বিষয়ে একটা সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সামজের ভাল-মন্দ, সংকট-সম্ভাবনা, ব্যত্যয় ব্যঞ্জনা–এসব কিছুই সংবাদপত্রের পাতায় আমরা দেখতে চাই। কিন্তু সমাজের এ দর্পণে আমাদের সমাজচিত্র কতোটুকু প্রতিফলিত হয়? অনেকেই তাই বলে থাকেন, আমাদের এ দর্পণটি ভাঙ্গা বিবর্ণ। ভাঙ্গা আয়নায় তাই সমাজের সব প্রতিচ্ছবি ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেখায়।...কেন পাঠক একাধিক পত্রিকা পড়ে তথ্যের গভীরতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তথ্যের বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে? একটি প্রসঙ্গ, একটি সংবাদ পরিবেশনের ধরন-ধারণ কিবা আঙ্গিকে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু পৃথক দু'টি পত্রিকা পড়ে পাঠক এতোই বিভ্রান্ত হচ্ছেন যে, তিনি পত্রিকা পাঠ থেকে বিরত থাকতে পারলে নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে করতেন। সংবাদের তথ্য বিভ্রান্তি শুধু সংখ্যাগত কিংবা পরিমাণগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকছে না। লেখকের (সাংবাদিক?) ইচ্ছা এবং আচরণের খেয়াল-খুশীতে পর্যবসিত হচ্ছে।" বলাই বাহুল্য এরাই দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন সাজাবার ক্ষেত্রে আত্মঘাতি বাহন হিসেবে কাজ করেছে।

আমি সম্প্রতি এক লেখায় বলেছিলাম, ঠগ অবশ্যই বাছতে হবে, কিন্তু অভিযোগ শুনেই সবাইকে নির্বিচারে ঠগ সাজিয়ে গ্রাম উজাড় করা যাবে না। আরও বলেছিলাম,

www.pathagar.com

দুর্নীতিবাজদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করে বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে অবৈধ পথে, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ভোগকে অসম্ভব করে তোলার পদক্ষেপকে। এ দু'টি কাজ অবশ্য কমবেশী সবদেশেই হয়। অনেক দেশে দ্বিতীয় কাজটি খুব কড়াকড়িভাবে হয়, কিন্তু দুর্নীতি বন্ধ করা যায়নি। এর কারণ এটাই যে, দুর্নীতি প্রবণতার মূল এতটাই গভীরে যে, এই প্রতিকারগুলো যথেষ্ট নয়। নয় বলেই দুর্নীতি দমনের বড় বড় কথা, লম্বা লম্বা পরিকল্পনা মাঠে মারা যায়। এই ব্যাপারে কলকাতার 'দেশ' পত্রিকা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছে, "রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী মুখে যতই বলুন দুর্নীতি দমনের কথা, বাস্তবে তার প্রয়োগ ও ফলাফলে আশার আলো খুবই ক্ষীণ। এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে প্রয়োজন কড়া দাওয়াই, স্বচ্ছ ও সৎ প্রশাসনই যার মূল শর্ত।"

এটা শুধু কলকাতার 'দেশ' এর কথা নয়, আমাদেরও কথা। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় স্বচ্ছ ও সৎ প্রশাসন গড়ে উঠবে কি করে? প্রশাসনের সাথে কমপক্ষে তিনটি পক্ষ জড়িত। রাজনীতিক ও আমলা এবং রাজনীতিক ও আমলাকে যারা ব্যবহার করে সেই 'ধনপতি'রা। এই তিন পক্ষের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 'ধনপতি'রাই দুর্নীতির প্রধান রক্তবীজ। এরাই টাকা বাড়াবার জন্য টাকা বিনিয়োগ করে রাজনীতিতে এবং আমলাদের পকেটে বা আমলাদের সংসারে। এদেরকে স্বচ্ছ ও সৎ না করে প্রশাসন ও রাজনীতিকে সৎ ও স্বচ্ছ করা যাবে না। এই ধনপতিদের মুখে লাগাম পরাবে কে? ভারতের রাজনীতিক ও রাজনীতির ভিত্তি অনেক মজবুত। কিন্তু তারাও পারছে না 'ধনপতি'দের অর্থ-বাণিজ্য রাজনীতিকদের পুতুল সাজিয়ে সততাকে গলা টিপে মারছে। এর হাজারো দৃষ্টান্ত আছে ভারতেই। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। সত্যেন্দ্র দুবে ৩১ বছর বয়সী একজন প্রতিভাবান সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকান মোটা স্কলারশীপ ও লোভনীয় চাকরির অফার উপেক্ষা করে দেশ সেবার জন্য তিনি যোগ দিয়েছিলেন ভারতের 'ভূতল পরিবহন মন্ত্রণালয়ে'। দায়িত্ব পেয়েছিলেন, ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান ৬০ কিলোমিটার লম্বা 'সোনালী চতুর্ভুজ' প্রকল্পের ডিভিশনাল ম্যানেজারের। কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, অসংখ্য ত্রুটিতে ভরা প্রজেক্ট রিপোর্ট, ঠিকাদারদের মধ্যে বেআইনিভাবে প্রভূত পরিমাণে অগ্রীম অর্থ বণ্টন, অযোগ্য ঠিকাদারদের এই মেগা প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সরকারি চাকরিরত ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে বহুজাতিক নির্মাতা সংস্থা ও স্থানীয় রাজনৈতিক দল-নেতৃবৃন্দের সীমাহীন অর্থ হরিলুটের দৃশ্য। সৎ ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্র দুবে এই অর্থ হরিলুট বন্ধের কোন উপায় না দেখে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে লুটের কাহিনী সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন তার নাম ও পরিচয় যেন গোপন রাখা হয়। কিন্তু গোপন থাকেনি। পরিণতি হয়েছিল সৎ ও প্রতিভাবান তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যু। সে প্রজেক্টের হরিলুট আর বন্ধ হয়নি এবং ইঞ্জিনিয়ার হত্যার মামলাও চাপা পড়ে যায়। এই কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে একজন দেশপ্রেমিক সৎ ইঞ্জিনিয়ার দুর্নীতির মোকাবিলা করতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয় নিয়েও রক্ষা পেলেন না। এই মহা দুর্নীতি চক্রের হাতে ইঞ্জিনিয়ার নিহত হওয়ার জন্য কাকে আসামী করা হবে, কাকে ফাঁসি দেয়া হবে? দেশের নির্বাহী প্রধান হিসেবে রাজনীতিক প্রধানমন্ত্রীকে আসামী করা হবে, ফাঁসি দেয়া যাবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ দুর্নীতি তাঁরই ব্যর্থতার ফল ও ইঞ্জিনিয়ার নিহত হয় তারই কারণে।

www.pathagar.com

এটা ন্যায়বিচার হবে অবশ্যই। কিন্তু তাতে কি দুর্নীতি বন্ধ হবে? সত্যেন্দ্র দুবের মত সৎ ইঞ্জিনিয়ার নিহত হওয়া কি বন্ধ হবে? হবে না। কারণ রাজনীতিক যিনি নতুন প্রধানমন্ত্রী হবেন, তিনিও সৎ কোন ইঞ্জিনিয়ারকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবেন, যেভাবে আগের প্রধানমন্ত্রী সৎ ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্র দুবেকে রক্ষা করতে পারেননি। আসল অপরাধী হলো রাজনীতিক ও আমলাদের ব্যবহারকারী দুর্নীতিবাজ ধনপতিরা। এদের দুর্নীতি বন্ধ না হলে রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রও দুর্নীতিমুক্ত হবে না। এই ধনপতিদের দুর্নীতি রাজনীতিক ও আমলাদের মধ্যেও অনেক ধনপতি সৃষ্টি করেছে এবং এই নতুন ধনপতিদের দুর্নীতি সমাজে নতুন ধনপতিরও সৃষ্টি করেছে। সব মিলিয়ে দুর্নীতির মাকড়সাজাল সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

সুতরাং রাজনীতিকে দোষ দিয়ে কিংবা কিছু রাজনীতিককে জেলে পুরলেই দুর্নীতির মুলোচ্ছেদ হয়ে যাবে না। দুর্নীতি-জালে আবদ্ধ সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে আইনী ব্যবস্থার সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছা-বাসনাকে সৎ বানাতে হবে এবং এটা মানুষের মনে খোদাভীতি সৃষ্টির মাধ্যমেই মাত্র সম্ভব। এই খোদাভীতি আসে ঈমান থেকে। ঈমান অনুযায়ী আমলই মানুষের মধ্যে অন্যান্য গুণাবলির সাথে স্বচ্ছ ও সৎ স্বভাব সৃষ্টি করে থাকে। এ ধরনের মানুষ ব্যবসায়ী হলে সৎ ব্যবসায়ী হন, আমলা হলে সৎ আমলা হন, রাজনীতিক হলে সৎ রাজনীতিক হন এবং তারা "ধনপতি" হলে সৎ ধনপতি হয়ে থাকেন। মানব-মনের এই অভ্যন্তরীণ এই সংস্কারকই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ ঘটাতে পারে। বিগত সরকারের মন্ত্রিসভায় জামায়াতে ইসলামী থেকে দু'জন মন্ত্রী ছিলেন। সকলেই তাঁদেরকে সততার একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেছেন। তাদের মন্ত্রণালয় থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ হয়তো হয়নি, কিন্তু তারা দুর্নীতিমুক্ত থাকতে পেরেছেন এবং দৃশ্যমান কোন দুর্নীতি তারা চলতে দেননি, এটা সত্য। মন্ত্রণালয়ে এবং মন্ত্রণালয়ের বাইরে এই দুই মন্ত্রীর কাজের একটা বিস্তারিত সমীক্ষা যদি হয়, তাহলে দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এটা একটা দিক-নির্দেশনা হতে পারে।

এটাই বাস্তবতা, দুর্নীতি দমন ফর্মুলা তালাশের জন্য দিল্লী, লন্ডন, ওয়াশিংটন হাতড়ে ফেরা নয়, নিজের ঘরের দিকেই নজর দিতে হবে। জাতি হিসেবে আমরা আদর্শ জাতি গঠনের উৎস অমূল্য আদর্শ-ভাণ্ডারের মালিক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের এই নীতি-আদর্শের কথা আমরা জানি, কিন্তু মানি না। এই না মানাটাই আমাদের দুর্নীতির যাত্রা শুরুর বাহন। একজন বিশ্বাসী মানুষ যখন আল্লাহর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করে, তখন সে জাগতিক সব আইন ও নীতি-নিয়ম ভাঙায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। বিশ্বাসী হবার পর সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ তায়ালার আইন ভাঙ্গার চেয়ে বড় দুর্নীতি আর নেই। একজন এই দুর্নীতি করার পর যেকোনো দুর্নীতিই তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এই পতিত অবস্থা থেকে ফিরে আসতে হলে স্রষ্টার দিকে আবার ফিরে আসতে হবে। বাড়তি আইনী ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু মানুষ ও সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য এই অভ্যন্তরীণ সংস্কারই হলো প্রাকৃতিক পথ, প্রাকৃতিক বলেই এটাই নিশ্চিত কার্যকর পথ। এর বাইরে গিয়ে শুধুই আইনী ব্যবস্থা দ্বারা অস্থায়ী ও আংশিক ফল পাওয়া যাবে মাত্র, যেমন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশ পাচ্ছে।

২৮ এপ্রিল, ২০০৭

www.pathagar.com

জেএমবি ভিন্ন নামে আবার আঘাত হেনেছে। আঘাতটা বড় নয়। বড় নয় এই অর্থে যে, তিনটি বোমার বিস্ফোরণ থেকে বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। একজন আহত রিকশাওয়ালার একটা আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয়েছে। এদিক থেকে আঘাতটি বড় না হলেও জাতীয় মনন ও মর্যাদার জন্য আঘাতটা বড় বলেই অনুভূত হয়েছে। সামান্য শক্তির তিনটি বোমা বিস্ফোরণ অসামান্যভাবে প্রচারিত হয়েছে গোটা বিশ্বে। ঘটনার হোতাদের সাথে আল কায়েদার নাম থাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, 'বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নাজুক।'

বালাদেশে এই নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টিই বোমাবাজির লক্ষ্য। এই বোমাবাজির আগে পত্র-পত্রিকায় আমরা তথ্য বোমাও দেখেছি। তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে দেখানো। জেএমবি'র এটাই লক্ষ্য। তারা বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলাকে নাজুক দেখিয়ে ঐ একই লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। জেএমবি তার লক্ষ্য হিসেবে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার যে কথা বলে সেটা তাদের একটা মুখোশ। পরিকল্পিতভাবে এই শ্লোগান তারা মুখে তুলে নিয়েছে বা তাদের মুখে তুলে দেয়া হয়েছে তাদের আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার জন্য। গোটা ইসলামের ইতিহাসে বোমা মেরে বা লোক হত্যা করে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কোন ঘটনা নেই। আইন প্রতিষ্ঠার জন্য শাসন অথরিটি দরকার। বৈধ ও স্বীকৃত শাসন অথরিটিই আইনের প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইসলামী শাসন-অথরিটি প্রতিষ্ঠার কাজ ইসলামের ইতিহাসে হাজারো দেখা যাবে। কিন্তু লোক মেরে বোম ফেলে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কোন দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। আল কোরআনে যেখানে শত্রু বা শত্রু জাতির প্রতিও অবিচার বা সীমা লংঘনকে অবৈধ করা হয়েছে, সেখানে ইসলামের নামে কেউ মানুষের ওপর, দেশের ওপর বোমা ফেলতে পারে কি করে?

জেএমবি তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইসলামের মুখোশ পরেছে কেন? পরেছে নয়, ইসলামী মুখোশ তাদের পরানো হয়েছে। এটা আজকের সময়ের একটা সুপরিকল্পিত কূটনীতি। আমরা কেউ ভুলিনি, এক সময় কম্যুনিজম ছিল পশ্চিমা একটা পক্ষের সকল আক্রমণের টার্গেট। উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের সকল বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলার মধ্যে কম্যুনিস্ট তৎপরতার হাত আবিষ্কার করা হতো। এ সবের অনেকগুলোর সাথেই কম্যুনিস্টরা বা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল, কিন্তু সবগুলোর সাথে ছিল, একথা সত্য নয়। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক এ্যাকশন নেয়াকে সহজ করার জন্য সবাইকে কম্যুনিস্টদের সাথে ব্র্যাকেটেড করা হতো। এমনকি ভুয়া কম্যুনিস্ট পার্টি তৈরি করে তাদের দ্বারা অপকর্ম করিয়ে আসল কম্যুনিস্ট পার্টিকে ফাঁদে ফেলার ব্যবস্থা করা হতো। কম্যুনিজমের পতনের পর আজ ইসলাম হয়েছে অনেকেরই টার্গেট। যে কূটনীতি কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হতো, তা এখন ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কূটনৈতিক কার্যক্রমের একটি হলো, জ্ঞানহীন আবেগগ্রস্ত মুসলিম অথবা ভুয়া ইসলামিস্টদের মুখে সস্তা শ্লোগান এবং হাতে অর্থ ও অস্ত্র তুলে দিয়ে ইসলামকে ও ইসলামপন্থীদের সন্ত্রাসী সাজানো। পৃথিবীর অনেক ভুয়া ইসলামিস্টদের মত জেএমবি'ও

www.pathagar.com

এই কূটনীতিরই সৃষ্টি। জেএমবি'র বিশেষ বিদেশী লিংক এর একটা প্রমাণ। লক্ষণীয়, এবার জেএমবি কাদিয়ানী ও এনজিও বিরোধী যে হিংসাত্মক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে, সেটা ইসলামের আন্তর্জাতিক শত্রুদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগসাজশ কিংবা তাদের হাতে ক্রীড়নক হবারই প্রমাণ। দুনিয়ার কোন দেশে কোথাও কোন ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা কোন ধর্ম পরিচয় নেয়াকে ও নিছক এনজিও সদস্য হওয়াকে কারও অপরাধ হিসেবে অভিহিত করে তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কর্মসূচি নেয়নি, নেয়াকে বৈধ মনে করেনি। এটাই ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের মহান ইমেজকে কলঙ্কিত করার জন্যই ইসলামের শত্রুরা ইদানীং মুসলিম নামের কিছু লোককে তথাকথিত ইসলামপন্থী সাজিয়ে তাদের হাতে মানবতা বিরোধী হিংসাত্মক কর্মসূচি তুলে দিচ্ছে। জেএমবি বাইরের ও বিজাতীয় এই ষড়যন্ত্রেরই ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।

জেএমবি'র পেছনের ষড়যন্ত্রকারী এই 'কূট-নীতিক'রা কারা? এই প্রশ্নের সহজ জবাব সম্ভব নয়। কারণ, এই ধরনের ষড়যন্ত্রকারীরা সব সময় নেপথ্যে থাকে, মুখোশ খুলে সামনে আসে না। এরা মাধ্যম ব্যবহার করে উদ্দেশ্য সাধন করে। এই মাদ্যমদের এমনভাবে বাছাই করা হয়, যাতে তারা টার্গেটদের (জ্ঞানহীন আবেগগ্রস্ত মানুষ) নিঃসন্দেহ আস্থাভাজন হতে পারে। ষড়যন্ত্রকারীদের এ ধরনের মাধ্যমের সাথে জেএমবি'র গোপন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার খবর তাদের মুখ থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। জেএমবি'র অর্থের কিছুটা সৌদি আরব, ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের কিছু সূত্র থেকে আসলেও অস্ত্র, ট্রেনিং ও পরিকল্পনা-পরামর্শ এসেছে কিছু ভারতীয় নাগরিকের কাছ থেকে। এই ভারতীয় নাগরিকরাই মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ২০০৬ পর্যন্ত জেএমবি'র যে অস্ত্র ধরা পড়েছে তা হলো, ১৯টি পাইপ গান, একটি রিভলভার, ৭ হাজার ৮৯৫টি ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ১০০টি নন-ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৩১০টি পাওয়ার জেল, ২২টি ওয়ার জেল, ৫০ কেজি গান পাউডার, ১৩ কেজি হোয়াইট পাওডার, ২৭ কেজি এলুমিনিয়াম পাউডার, ৭৯ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ৪২ কেজি লিড অ্যাজাইড ও ৩৮ কেজি পটাসিয়াম নাইট্রেট। এর মধ্যে ওয়ান শুটার গান, ডেটোনেটর, পাওয়ার জেল, গান পাউডারের মত সব অস্ত্রই ভারত থেকে আসা। জঙ্গীদের মূল ট্রেনিংও ভারতেই হয়। এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ভারতকে জানানোও হয়েছে। বিডিআর-বিএসএফ'র দিল্লী বৈঠকের (২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ ২০০৬ অনুষ্ঠিত) বরাত দিয়ে যায় যায় দিন লিখে, "১৭ আগস্টের বোমা হামলার পরিকল্পনায় ইন্ডিয়ান মাওলানা মহসিন ভাদুড়িয়া, মিস্টার রামেশ্বর প্রসুনসহ আরো অনেকে জড়িত ছিল। ইন্ডিয়ার উত্তর চব্বিশ পরগনার মিস্টার রামেশ্বর প্রসুনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নয়টিরও বেশি ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলাদেশ বিরোধী ট্রেনিং ক্যাম্প চালু আছে। ওইসব ক্যাম্পেই ১৭ আগস্টের (একই সাথে ৬৩ জেলায়) বোমা হামলার হোমওয়ার্ক সম্পন্ন হয়।" (যায়যায়দিন, ৪ অক্টোবর, ২০০৫) গ্রেফতারকৃত ভারতীয় নাগরিক নাসিরউদ্দিন ও গিয়াসউদ্দিনের কাছ থেকে এসব তথ্য বাংলাদেশ পেয়েছে। তারা বেশ কয়েক বছর বাংলাদেশে অবস্থান করে ইন্ডিয়ান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে লিপ্ত ছিল বলেও যায়যায়দিন গোয়েন্দা জিজ্ঞাসাবাদ সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়। জেএমবি'র কাছ থেকে উদ্ধার করা পাওয়ার জেল, এক্সপ্লোসিভ ও ইলেক্ট্রনিক ডেটোনেটরগুলো ভরতের ঝাড়খন্ড কারখানা থেকে তৈরি। এ তথ্যও ভারতকে জানানো

www.pathagar.com

হয়। জেএমবি'র সাথে জড়িত অর্ধডজনের বেশি ভারতীয়ের নাম এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, এদের কেউই এখনও ভারতে গ্রেফতার হয়নি। বাংলাদেশ জেএমবি'র শীর্ষ সব নেতাসহ তাদের সাতশ' কর্মীকে গ্রেফতার করতে পেরেছে, কিন্তু ভারত জেএমবিকে অস্ত্র সরবরাহকারী, ট্রেনিংদানকারী কোন ভারতীয়কেই গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ জেএমবি'র সাথে ভারতীয় নাগরিকদের যোগসাজশের কথা বাংলাদেশের কাছে জানতে পেরে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, সে দেশে জঙ্গীদের তৎপরতা তাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাদের আশঙ্কা ও অ্যাকশনের মধ্যে এই ফারাক কেন? এই আশঙ্কা প্রকাশ কি নিছকই লোক দেখানো, না এর মধ্যে দিল্লী-সরকার ও তার গোয়েন্দা বিভাগের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত না জানা না বুঝার কোন ব্যাপার আছে?

আছে এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ সরকারের আগে চলে, এটা দেখা গেছে। অবশ্য ঠিক আগে চলা একে বলে না, সেখানকার বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রীয় দিক-নির্দেশনা বা মিশন সামনে রেখেই কাজ করে যায়। দিল্লীর তখতে সরকার আগে সরকার যায়, এতে গোয়েন্দাদের এই কার্যধারার কোন ব্যত্যয় ঘটে না। আসা-যাওয়া সরকারের কাছে এই গোপন তৎপরতার অনেক কিছুই আড়ালে থেকে যেতে পারে। এটাই সেখানে ঘটে আসছে। অনেক উদাহরনের মধ্যে সিকিম নিয়ে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ 'র' এর অগ্রবর্তী ভূমিকার দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরের ঘটনা। এই সময় দিল্লী সরকার সিকিম নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা শুরু করার অনেক আগে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সিকিম দখলের কাজ শুরু করে দেয়। ভারতীয় লেখক অশোক রাইনা তার বিখ্যাত 'ইনসাইড 'র' বইতে বিষয়টা এইভাবে শুরু করেছেন, "অপারেশন বাংলাদেশ শেষ। এক মাস পর একজন উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা 'র' প্রধানের অফিসের বারান্দা দিয় হেঁটে সভাকক্ষের দরজার নিকটে এসে থামলেন। টোকা দেয়র পূর্বেই তাঁকে সাদরে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে চারজন লোক নীরবে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। শান্ত-নীরব পরিবেশ তপ্ত চঞ্চল হয়ে উঠল মুহূর্তে। 'ভালো দেখিয়েছেন, কাজটা ভালোভাবেই হয়েছে (অপারেশন বাংলাদেশ)। এখন আমাদের পরবর্তী কাজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে।' বাকি চারজন বিস্মিত হয়ে ভেবেই পেলেন না 'এ আবার কি?' 'সিকিম' ভদ্রমহোদয়গণ 'সিকিম'। দেখুন এ টার্গেট কি বের করতে পারেন। আপনারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে ২৪ মাস সময় পাবেন', অবশ্য সরকার যদি আদৌ কোন ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা নেয়।' বাকি আলোচনায় সকলই একটার পর একটা আশ্চর্যজনক অথচ সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কথাই শুনলেন। আর নতুন চিন্তার সূত্রগুলো সাজাতে লাগলেন গোয়েন্দা মস্তিষ্কের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। অবশ্য ঐ ক্ষমতাবান কর্মকর্তার এটা কোন অফিসিয়াল সভা ছিল না বটে, তবুও সিকিম নিয়ে আন-অফিসিয়াল চিন্তা-ভাবনা এভাবেই শুরু।" (ইন সাইড 'র' পৃষ্ঠা-৭৫)

এই আন-অফিসিয়াল সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই সিকিমকে অস্থিতিশীল করার কাজ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' শুরু করে দেয়। অশোক রাইনা লিখছেন, "অতঃপর সিকিমের চারটি জিলা সদর গ্যাংটক, মাঙ্গান, নামচিত্ত, গিয়ালসিং-এর 'র'-এর এজেন্টদের অনুপ্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তারা ধীরে ধীরে অপারেশনাল তথ্যাদি

www.pathagar.com

সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল এবং ভারতকে যদি মাঠে নামতেই হয় তবে যেন সবকিছু গুছানো পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করার চেষ্টায় রইল। আগন্তুক কর্মকর্তার সাথে 'র' সদর দপ্তরে সেই 'চারজন' 'র' কর্মকর্তার সেই আলাপচারিতার আঠার মাসের মধ্যে 'র' এর সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়। এখন শুধু মাঠে নামার পালা। এ সবের পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 'সিকিম অপারেশন' সম্পর্কে অবহিত করা হয়।" (ইনসাইড 'র' ৭৮)

সিকিমের এই দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে, 'সিকিম অপারেশন'-এর সব প্রস্তুতি শেষ করার পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে, অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে জানানো হয়। সুতরাং দিল্লী সরকারের অজান্তেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশের জেএমবি'কে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ এবং ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেছে বা করতে পারে তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। ভারতীয় কারখানায় ভারতীয় সামরিক উপকরণ পাওয়ার জেল, ডোটোনেটরের মত দ্রব্যের বিপুল সরবরাহ মুসলিম নামের অজ্ঞাত, অখ্যাত কিছু ভারতীয় নিজেরাই করেছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আগের আলোচনায় ফিরে আসি। জেএমবি'র ইতিপূর্বেকার বোমাবাজি, বিচারক হত্যা, সেদিন তিনটি স্থানে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো, সর্বহারাদের সন্ত্রাস সবকিছুরই লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক করে তোলা এবং নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত করা। লক্ষণীয়, জেএমবি ও সর্বহারাদের সন্ত্রাস শুধু নয়, নির্বাচনের মুখে আমরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত হতেও দেখেছি। সেনাবাহিনী এগিয়ে না এলে রাজনৈতিক বিপর্যয় গোটা দেশকেই বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিত। এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রকাশ্য একটা রাজনৈতিক কারণ আছে, কিন্তু অপ্রকাশ্য কোন কারণ ছিল কিনা, প্রকাশ্য মঞ্চ-নটদের আমরা সকলেই চিনি, কিন্তু নেপথ্যে কোন নট-নটি ছিল কিনা, থাকলে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল, এসব বিষয়ে অনুসন্ধান এখনো হয়নি। দুর্নীতির বিষয়টা আমাদের এমনভাবেই গ্রাস করেছে যে তার বাইরে আমরা যেন কিছুই দেখছি না। নৈরাজ্য সৃষ্টির গোটা ব্যাপারের নেপথ্যটা আমাদের অজানাই থেকে যাচ্ছে। তবে একথা খুবই সত্য যে, দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রেরও প্রথম টার্গেট দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটানো। বিপর্যয় ঘটে যায় আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই বিপর্যয় আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। জরুরি অবস্থা ভেঙে পড়া শাসনব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলার নৈরাজ্য থেকে দেশকে ফিরিয়ে এনেছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার স্বাভাবিকতায় এখনও ফিরে যেতে পারেনি।

এই পরিস্থিতিতেই দেশের তিনটি স্থানে একই সাথে জেএমবি'র বোমা বিস্ফোরণ। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে বসেছে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্কলা পরিস্থিতি নাজুক। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশ সন্নিহিত তার জেলাগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে বাংলাদেশের সন্ত্রাস যেন তাদের দেশের শান্তিতে কোন বিঘ্ন না ঘটায়। তারা বুঝাতে চাচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলার দিক থেকে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নাজুক ও অস্থিতিশীল। এ মন্তব্য সম্পর্কেই আমার ঘোর আপত্তি।

এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে অতিকথন। জেএমবি বোমা এই প্রচারই চাচ্ছে। আর তারা পরিস্থিতি 'নাজুক' বলে এই প্রচারই করছে। বিভিন্ন স্থানে কিছু বোমা ফুটলেই কি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক হয়ে যায়? ৬৩ জেলায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকেও

www.pathagar.com

কি বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে শামাল দেয়নি? জঙ্গী দমনে বাংলাদেশের যে সাফল্য, যেভাবে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী জেএমবি জঙ্গী ও সর্বহারা সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করছে, তাতে বাংলাদেশ সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলার দিকে ভারতের আঙুল উঁচানো 'চালুনি সূচেরে বলে তুই বড় ছেদা' প্রবাদ বাক্যের মতই লাগে শুনতে। বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভারতের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত এবং আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতাও ভারতের তুলনায় চোখে পড়ার মত। ভারতে সন্ত্রাসী ঘটনা এবং এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আতঙ্কিত হবার মত। সেখানে প্রতি ১৬ মিনিটে একটি খুন এবং প্রতি ২৯ মিনিটে ১টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বড় সন্ত্রাসী ঘটনা আরও আতঙ্কজনক। গত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় ভারতে মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ২১০ জন। এর মধ্যে পুলিশের সংখ্যাই ৭৬ জন। জানুয়ারিতে এক গেরিলা হামলায় আসামে ৫৫ জন নিহত হয়। ফেব্রুয়ারিতে দুইটি গেরিলা হামলার ঘটনায় মনিপুরে নিহত হয় ২১ জন পুলিশ। ফেব্রুয়ারিতেই ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় ৬৬ জন। মার্চে তিনটি বড় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। দিল্লীতে একজন পুলিশ কর্মকর্তার গুলীতে তার পাঁচজন সহকর্মী নিহত হয়। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের গুলীতে নিহত হয় ১৩ জন কৃষক। মাচ্ মাসেই ছত্তিশগড়ে একটি থানায় মাওবাদী আক্রমণে ৫০ পুলিশ নিহত হয়। ভারতে সন্ত্রাসী ঘটনার এই চিত্র শুধু এই কয়েক মাসের নয়। বহুদিন ধরে সেখানে চলছে এই প্রবণতা। ২০০৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লী থেকে জয়ন্ত ঘোষাল 'নকশাল সদস্য ৩ লক্ষাধিক, সশস্ত্র ক্যাডার ৭ হাজার' শীর্ষক এক রিপোর্টে বলেন, 'বিভিন্ন নকশাল সংগঠনের শাখাগুলোর সদস্য সংখ্যা এখন তিন লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এর মধ্যে সাবেক জনযুদ্ধের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার এবং এমসিসি'র ৭৫ হাজার।... অন্ধের নাল্লামাল্লা জঙ্গল এবং দন্তকারণ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ-উড়িষ্যা-ঝাড়খন্ডের সংযোগ স্থলে নকশালরা আরও একটি গেরিলা অঞ্চল তৈরির চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের নকশালেরা জলপাইগুড়িতে একটি রাজনৈতিক সেল তৈরির চেষ্টা করছে। এছাড়া মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর দিয়ে নেপাল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগের একটি নিরাপদ করিডোর তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।... এই মুহূর্তে দেশের ১২৬টি জেলাকে নকশাল প্রভাবিত বলে মনে করছে কেন্দ্র। নিজেদের প্রভাব বাড়াতে আরও ৩১টি জেলায় তারা ঢোকার চেষ্টা করছে। ১১টি রাজ্যে মোট ৮০টি জেলা থেকে এখন সব থেকে বেশি হিংসাত্মক ঘটনার খবর আসছে।... ২০০২-০৩ সালে সারাদেশে ১৬০১টি হিংসাত্মক ঘটনায় ৫৭২ জনের মৃত্যু হয়।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

এই একই তারিখে আসামের শিলচর থেকে পাঠানো উত্তম সাহার একটি দীর্ঘ রিপোর্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়। সে রিপোর্টের ভূমিকাই ছিল এই রকম, "হাফলং থেকে ১২২ কিলোমিটার গেলে দয়ামুখ, যেখানে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা এবং কার্বি আংলং বিভাজিত হয়েছে, সেখান থেকে জঙ্গলের পথ ধরে তিন কিলোমিটার এগোলে 'নো এন্ট্রি জোন।' পুরোপুরি সামরিক কায়দায় এসএলআর, এম-১৬, এ কে-৮, এ কে-৫৬ নিয়ে ঘোরাফেরা করছে ২০ থেকে ২৫ এর একদল চোয়াল শক্ত করা যুবক।" এই রিপোর্টের ১ বছর পর ২০০৬ সালের ২৩ অক্টোবর India Today এই ধরনের আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট ছিল শুধু নকশাল তৎপরতার

www.pathagar.com

ওপর। এ রিপোর্টে বলা হয়, নকশাল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ১৬৫টি জেলা। ২০০৬ সালে নকশালরা ৯৩০টি হামলা চালায়। প্রায় ১১শ'র মত লোক নিহত হয়। মারা যায় ৫০০ নকশাল। পুলিশ নিহত হয় ১৩০ জন। নকশাল তৎপরতা রোধে দিল্লী সরকারকে খরচ করতে হয় ৮০০ কোটি টাকা। উপরের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২০০২, ২০০৩ সালে সন্ত্রাসী ঘটনায় মোট নিহত ৫৭২ জন, কিন্তু এক ২০০৬ সালেই নিহত ১০৭২ জন। ২০০৭ সালের পরিসংখ্যান ভালোর দিকে নয়। মাত্র তিন মাসের ৭টি বড় সন্ত্রাসী ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২১০ জন। এই তিন মাসে পুলিশ নিহত হওয়ার সংখ্যা ৭৬ জন। অথচ ২০০৬ সালে ১২ মাসে পুলিশ নিহত হয় ১৩০ জন। অন্যদিকে ২০০৩ সালের দিকে নকশাল প্রভাবিত জেলার সংখ্যা ছিল ১২৬, গত ২০০৬ সালে এই সংখ্যা উন্নীত হয় ১৬৫ টিতে। অতএব সেখানে পরিস্থিতি ভালোর দিকে নয়, খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এই অবস্থাতেও যদি ভারতের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক না বলা হয়, তাহলে বাংলাদেশের অবস্থাকে নাজুক বলা হবে কেন? জাতিগত অসন্তোষ, বিদ্রোহ, দারিদ্র্যজনিত কারণে সোসিয়াল সেক্টরের বেহাল অবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বিপর্যয়, ধর্মীয় সংঘাত ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে ভারতের রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ হলেও উল্টো বাংলদেশের ঘাড়ের ওপর অকার্যকর রাষ্ট্রের বদনাম চাপাবার চেষ্টা করা হয় কেন?

আসলে বাংলাদেশ অপপ্রচারের শিকার। এই অপপ্রচারে ইন্ধন দিচ্ছে বাংলাদেশেরই একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা। অন্যদিকে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী কালিদাসের মত যে ডালে বসে সে ডালেরই গোড়া কাটার চেষ্টা করছে। নিরাময় ব্যবস্থাকে ব্যাধি হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করছে তারা। গত পরশু একজন শীর্ষ আইনজীবী এবং সিপিডির অন্য একজন শীর্ষ নেতা একটা টিভি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে বললেন, ধর্মের নামে জঙ্গী উত্থান বন্ধ করতে হলে দেশের ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে। তাদের এই কথা বাস্তবতার একেবারেই উল্টো। ধর্মীয় জঙ্গীবাদ-চিন্তাকে নির্মূল করার জন্যে বরং ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। সকলেই জানেন, জঙ্গীপনা গণতান্ত্রিক চিন্তার বিপরীত। অনুরূপভাবে ধর্মের নামে জঙ্গীপনাও ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির খেলাফ। ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারণা যত শক্তিশালী হবে, যত বিকশিত হবে, ধর্মীয় জঙ্গীবাদের ততই বিলয় ঘটবে। এই সাদা কথাটা উল্লেখিত শীর্ষ বুদ্ধিজীবীরা জানেন না তা নয়। তাদের এই উল্টো কথা বলাটা, আমি বলতে চাই, একটা ষড়যন্ত্রের অংশ। ষড়যন্ত্রটা হলো, ধর্মীয় জঙ্গীপনাকে সামনে এনে, একে অজুহাত সাজিয়ে ইসলামের অবস্থান ও উত্থানের ওপর আঘাত হানা। জেএমবিকে যারা তৈরী করেছে এবং অস্ত্র দিয়ে, ট্রেনিং দিয়ে, অর্থ দিয়ে মদদ দিচ্ছে, তাদের লক্ষ্য এটাই। আমাদের ঐ বুদ্ধিজীবীরাও এই লক্ষ্যেই উল্টো কথাগুলো বলছেন। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা কথা বলতে হয়, বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গীবাদকে উস্কে দেয়া বা লেলিয়ে দেয়ার মধ্যে ভারতের একটা ঐতিহাসিক স্বার্থ আছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গীপনাকে সামনে এনে ইসলামকে কলংকিত করে এবং একে বিপজ্জনক অভিহিত করে যদি এখানকার ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও জনগণের ইসলামী চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়, তাহলে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের যুক্তি ও ভিত্তিকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে ফেলা যাবে এবং তাতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীক ভিত্তিরও ধীরে ধীরে বিলয় ঘটবে। যার ফলে বাংলাদেশ সিকিম হওয়ার পথে অলংঘনীয় কোন বাধা আর থাকবে না। বাংলাদেশের ধর্মীয় জঙ্গীপনাকে মদদ দেয়াকে ভারত এই কারণেও অপরিহার্য মনে করতে পারে।

www.pathagar.com

আমি আমার আলোচনার বিষয় থেকে আবার একটু দূরে সরে গেছি। যারা বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক বলে অভিহিত করেছেন, তারা সত্য কথা বলছেন না। এমন কথা বলছেন কেন তারা? বলার কারণ আছে। বাইরের যারা বলছেন, তারা বাংলাদেশকে চাপে রাখতে চান বা চাপে ফেলতে চান যাতে তারা বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে পারেন। আর ভেতর থেকে যারা বলছেন বা বলবেন, তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উত্তরণকে বাধাগ্রস্ত করা। বাইরেরও কেউ কেউ এটা চায় বাংলাদেশে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। এদের কারও চাওয়াই সফল হবে না ইনশায়াল্লাহ। ৬৩টি জেলায় এক যোগে বোমা বিস্ফোরণের পর উদ্ভূত সংকট বাংলাদেশ যোগ্যতার সাথে যেভাবে কাটিয়ে উঠেছে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্যকর যে সংকট দেশকে গ্রাস করে, সে সংকট যেভাবে বাংলাদেশ কাটিয়ে উঠেছে, গণতন্ত্রের উত্তরণের পথেও যে বাধা আসবে তাকেও বাংলাদেশ সেভাবেই টপকে যাবে।

৬ মে, ২০০৭

বাংলাদেশ-ভারত রেল চলাচল

আজকের লেখার বিষয়টাতে যাবার আগে একটা জরুরি বিষয়ে কয়েকটা কথা না বলে পারছি না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রদান জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ গত বুধবার বিবিসি'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে দেশের কিছু বিষয়ে কথা বলেছেন। এর মধ্যে দুই নেত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা সম্পর্কেও কথা আছে। তাদের চলাচলের উপর বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, দুই নেত্রীই মুক্ত নাগরিক। দেশে ফেরার ব্যাপারে শেখ হাসিনার উপর নিরাপত্তাজনিত কারণে বিধি-নিষেধ ছিল। তা তুলে নেয়া হয়েছে। তিনি দেশে ফিরেছেন।' অন্যদিকে বেগম জিয়াকে চাপ দিয়ে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'যা সত্যি তাই আমি বলছি। বেগম খালেদা জিয়া তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ওমরা করার জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই পরিকল্পনা করছিলেন।' এখানে দুইটি বিষয়– এক, দুই নেত্রীর চলাচলের উপর বিধি-নিষেধ, দুই, বেগম জিয়াকে বিদেশ যেতে বাধ্য করার চেষ্টা। এই দুই বিষয়ে জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ যা বলেছেন, তা মানুষ যা জানেন তার একেবারেই উল্টো। গত বৃহস্পতিবার যেদিন জনাব ফখরুদ্দীনের এই বক্তব্য ছাপা হয়ছে, সেদিনই আরও দু'টি নিউজ ছাপা হয়েছে তার বক্তব্যের পাশাপাশিই। নিউজ দু'টি দুই নেত্রী সম্পর্কে। একটিতে বলা হয়েছে, খালেদা জিয়ার বাসায় গতকালও কেউ যেতে পারেননি। অন্য নিউজ বলেছে, শেখ হসিনার সাথে সাক্ষাতে কড়াকড়ি। তিনি ৩২ নম্বরে যেতে চেয়েও পারেননি।' এই দুই নিউজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ফখরুদ্দীন আহমদের এই বক্তব্যকে অসত্য প্রমাণ করে যে, দুই নেত্রী মুক্ত মানুষ। দ্বিতীয়তঃ ফখরুদ্দীন আহমদ সাহেবের এই কথাও সত্য নয় যে, বেগম জিয়াকে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, এ কথা দেশের সব সংবাদপত্র লিখেছে। দেশের মানুষ জেনেছে। বিদেশও তা বুঝেছে। একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, এমন মানুষ খুব কম পাওয়া যাবে যে লোক অবাক হয়নি জনাব ফখরুদ্দীন

www.pathagar.com

আহমদের কথায়। এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও কূট-কূটনীতিকের মত তিনি সত্যকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তিনি তো রাজনীতিক নন, কূট-কূটনীতিকও নন। সাধারণ মানুষও যা ঠিক মনে করে না এমন কথাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি চাইলেন কেন? মিথ্যা সব পাপের মা। কিন্তু সাধারণ মানুষের মুখের মিথ্যা অতবড় হয় না যতটা তা বড় হয় একজন অসাধারণের মুখে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ সাধারণের মধ্যে পড়েন না। অসাধারণদের মিথ্যাও অসাধারণ হয়ে থাকে। অসাধারণরা অসাধারণ কাজে যুক্ত থাকেন। সেসব অসাধারণ কাজে মিথ্যা যুক্ত হলে তা অসাধারণ অর্থাৎ মারাত্মক ফল হয়ে দেখা দেয়। এ কারণেই পশ্চিমী সমাজে 'ফ্রি সেক্স' খুব আপত্তির না হলেও তাদের অসাধারণদের অর্থাৎ নেতাদের 'ফ্রি সেক্স'কে কিন্তু তারা খুবই আপত্তির দৃষ্টিতে দেখে। বহু প্রতিভাবান নেতার পতন ঘটেছে এমন অপরাধের কারণেই। আমাদের দেশে জনমতকে এমন মূল্য দেয়া হয় না এবং আমাদের জনমত এমন শক্তিশালীও নয়। তাই একশ্রেণীর নেতা-নেত্রীরা জনমতকে, গণরায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে বিবেকের দংশন একটুও অনুভব করে না। আমাদের রাজনৈতিক সংকটগুলো এভাবেই তৈরি হয়। এই তো তিন দিন আগে ফ্রান্সের নির্বাচনে পরাজিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বিজয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানাতে একটুও দেরি করেননি। কিন্তু আমাদের দেশের একটা বড় দলে একজন নেত্রী পরাজিত হবেন এই ভয়ে এমন রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করলেন যে, শুধু নির্বাচন বাতিল নয়, দেশের রাজনীতিকেও সংকটের মুখে ফেলেছেন। এ ধরনের রাজনীতিকরাই মিথ্যাকে সত্যের মত করে বলতে পারেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ফখরুদ্দীন আহমদ তো এই শ্রেণীর রাজনীতিক নয়, এমনকি তিনি রাজনীতিকও নন। তাহলে কেন বিদেশী মিডিয়ার কাছে তিনি এমন কথা বললেন, যা সত্য নয়। 'যা সত্যি তাই আমি বলছি' বলে তিনি যে কথা বলেছেন, তাকে সত্য বলা যাবে না, একথা তিনিও জানেন। বিদেশী মিডিয়ার এই অসত্য কথা বলে তিনি শুধু নিজের মর্যাদা নষ্ট করেননি, কেয়ারটেকার সরকারের মর্যাদা নষ্ট করেছেন এবং মর্যাদা নষ্ট করেছেন দেশেরও।

কথায় কথা আসে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ফখরুদ্দীন আহমদের বক্তব্য মানুষকে যেমন অবাক করেছে, তেমনি ৮ই মে'র আরেকটি ঘটনা মানুষকে বিস্মিত করেছে। সেটা হলো, সুপ্রিম কোর্ট ভাংচুরের অভিযোগে আনিত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার শুনানি এক বছর পিছিয়ে দেয়া। মামলাটির বিষয় বাংলাদেশের ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা। গত বছর ৩০শে নভেম্বর একটা রীট আবেদনের কার্যক্রম প্রধান বিচারপতি স্থগিত করায় কিছু শীর্ষ আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে নজিরবিহীন তাণ্ডব চালায়। তারা দফায় দফায় ব্যাপক হামলায় প্রধান বিচারপতির এজলাস, তার কক্ষ, এটর্নি জেনারেলের কার্যালয় ভাংচুর, দরজায় লাথ এবং লুটপাট চালিয়েছে। এই ঘটনাটির সচিত্র বিবরণ দেশ-বিদেশের পত্রিকায় ছাপা হয়। একমাত্র ভাংচুরকারী মহল ছাড়া সকল মানুষের পক্ষ থেকে এই তাণ্ডবের নিন্দা জানানো হয় এবং এর বিচার দাবি করা হয়। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিরা এই তাণ্ডবের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন। তারা কয়েক দিন একযোগে বিচার কাজ পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন। ঘটনা কত বড় অন্যায় ও ভয়াবহ হলে বিচারপতিরা একযোগে এটা করতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়। সাবেক প্রধান বিচারপতি ও বাংলাদেশ আইন কমিশনের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টে সেদিন যা ঘটেছে তার

www.pathagar.com

ফলে আমাদের গোটা বিচার ব্যবস্থাই আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। সেদিন যা ঘটেছে তাতে পুরো বিষয়টি নিয়ে আমি ভীষণ বিমর্ষ, শঙ্কিত।' আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, "সুপ্রিম কোর্টে ভাংচুরের ঘটনা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। শুধু তাই নয় এমন ঘটনা যাতে হাজার বছর কেন কোনদিনই না ঘটে তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।" আমার মনে হয় সুপ্রিম কোর্টে ভাংচুরের যে ঘটনা সেদিন ঘটেছিল, তার প্রতিক্রিয়া আরও ভয়ঙ্কর হতো যদি ভাংচুরের ঘটনার সাথে ড. কামাল, ব্যারিস্টার আমির উল-ইসলাম, ব্যারিস্টার রুকনউদ্দিন মাহমুদ, ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর প্রমুখের মত শীর্ষ আইনজীবী জড়িত না থাকতেন। কোনো সাধারণের দ্বারা এমন ঘটনা ঘটলে তাদেরকে বাইরের আলো-বাতাসের মুখ আর দেখতে হতো না। নজিরবিহীন তাণ্ডবের বিচার চেয়ে হাইকোর্টের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে মামলাও দায়ের হয়েছে। আসামীরা সকলেই জামিনে আছেন। এই মামলার কার্যক্রমই গত ৯ই মে ১ বছরের জন্যে স্থগিত করা হয়েছে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা দীর্ঘদিনের জন্যে স্থগিত করে দেয়ার বিষয়টি মানুষকে বিস্মিত করেছে। বহুল প্রচলিত একটা নীতিকথা হলো, Justice delayed justice denied. অর্থাৎ সুবিচার বিলম্বিত হওয়া সুবিচার না হওয়ারই শামিল। এই মামলাটির দুই পক্ষের কে ঠিক, কে বেঠিক, তা নিয়ে আমার ব্যথা নেই। মহামান্য আদালত এই মামলার কি রায় দেবেন, তা নিয়েও আমার কোন কথা নেই। আমার বক্তব্য বিচার বিলম্বিত করা নিয়ে। মামলাটি যে কত বড়, কত চাঞ্চল্যকর তা আগেই বলেছি। এ মামলার প্রতি সর্ব সাধারণের আগ্রহ থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। মামলাটি বিলম্বিত হওয়ায় মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। মামলার আসামী যদি কতিপয় শীর্ষ আইনজীবী না হতেন, তাহলে কি মামলার এই পরিণতি হতো? হতো না, এই ধারণাই আজ মানুষের মধ্যে প্রবল। এই ধারণা সৃষ্টি হওয়া আমাদের উচ্চতর আদালতের মর্যাদার জন্যে কোনভাবেই কাঙ্খিত নয়। সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামালের– 'সুপ্রীম কোর্টে সেদিন যা ঘটেছে তার ফলে আমাদের গোটা বিচার ব্যবস্থাই আজ প্রশ্নের সম্মুখীন'–কথাটাকে আবার সামনে এনে বলতে চাই, মামলাটির বিচার কার্যক্রমের অস্বাভাবিক বিলম্বতা কি এই প্রশ্নটাকে আজ আরও তীব্র করে তুলল না?

যাক এসব প্রসঙ্গ। আজ আমার লেখার বিষয় বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যেকার আসন্ন রেল যোগাযোগ। আমি বিষয়টিতে ফিরে আসছি। বাংলাদেশ-ভারত রেল যোগাযোগের ব্যাপারটি আগের দু'টি বিষয়ের মত বিস্ময়কর কিছু নয় বটে, কিন্তু দ্বিপাক্ষিক এ বিষয়ে দরকষাকষির ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতাকে উদ্বেগজনক হিসাবে দেখার যুক্তিসংগত কারণ আছে। ঢাকা-কলকাতা রেল চালুর সিদ্ধান্তগত সব কাজই সম্পন্ন। রেল চলাচল শুরু হবার বিষয়টি এখন সময়ের ব্যাপার। মাস দেড়েক আগে ইন্ডিয়ান এক টিভি চ্যানেলে ভারতের একজন কর্মকর্তা বললেন, কলকাতার শিয়ালদহ ও ঢাকা জয়দেবপুরের মধ্যে ট্রেন চলাচল পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হচ্ছে।' 'ঢাকা থেকে এ খবর অস্বীকার করে বলল, 'ডেট ঠিক হয়নি, এ নিয়ে আলোচনা চলছে।' পরে আবার ভারতের কর্মকর্তাদের তরফ থেকে বলা হলো মধ্য জুলাই থেকে রেল চলবে। কিন্তু ঢাকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন আগামী বছরের প্রথম দিকের আগে রেল চলাচল শুরু হচ্ছে না। তবে যখনই হোক রেল চলাচল শুরু হচ্ছে ঢাকা-কলকাতার মধ্যে, এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

পশ্চিম বাংলা-বালাদেশ রেল যোগাযোগ নতুন বিষয় নয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত কলকাতা থেকে বাংলাদেশের গোয়ালন্দ অবধি ট্রেন চলেছে। তবে এবারের রেল যোগাযোগকে আগের মত নিছক বাংলাদেশ-পশ্চিমবংগ রেল যোগাযোগ হিসাবে দেখা হচ্ছে না। বিশেষ করে ভারত তা দেখছে না। অবস্থা দেখে বাংলাদেশেও এ প্রশ্ন জোরদারভাবে উঠেছে, Is the proposed Kolkata-Dhaka train service prelude to transit facility to Tripura and Agartala? অর্থাৎ ঢাকা-কলকাতা রেল চলাচল কি ভারতের রেল ট্রানজিট লাভের পূর্ববার্তা? ভারতে কিন্তু কোন প্রশ্ন নয়, ঢাকা-কলকাতা রেলকে তারা ভারতের বহুল আকাংখিত transit-এর অংশ বলে মনে করছে। ভারতের সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই একটা নিউজ করেছে। নিউজটি ছাপা হয়েছে ভারতের 'দি হিন্দু' পত্রিকায় ২১শে এপ্রিল (০৭) সংখ্যায়। এই নিউজে বলা হয়েছে যে, ত্রিপুরার কুমার ঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের কাজ শেষ হবে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে। এরপর বাকি থাকবে শুধু বাংলাদেশের আখাউড়া হতে আগরতলা রুটে সংযোগ গড়ে তোলা। ভারত এই কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে বাংলাদেশকে অনুরোধ জানিয়েছে।' বাংলাদেশের সরকারি সূত্র আগরতলা-ঢাকা রেল চলাচলের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও নিরবে ঢাকা-আগরতলা রেল চলচল তথা ভারতকে টানজিট দেয়ার পক্ষে কাজ করছে। একটি পত্রিকা সম্প্রতি খবর দিয়েছে, 'গত ৬ থেকে ৮ই মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩ দিনব্যাপী দুই দেশের মধ্যে আন্ত রেল বৈঠকে এ সংক্রান্ত (ঢাকা-আগরতলা রেল) ভারতীয় জরীপ রিপোর্ট হস্তান্তর করা হয়েছে বাংলাদেশ রেল কর্তৃপক্ষের কাছে। তারা (বাংলাদেশ রেলওয়ে) এ সংক্রান্ত জরীপ কাজ চালাবেন বলে ওই বৈঠকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে। ট্রানজিটের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করা ও এগিয়ে নেয়ার জন্যে ভারত বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে ১৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। রেল সূত্র থেকে প্রকাশ, ট্রানজিট বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে ভারত পণ্য বা পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের সুযোগ পাচ্ছে না। পরবর্তী ধাপে পাচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

অর্থাৎ ভারত রেল ট্রানজিট পাচ্ছে। নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া হয়েছে। না হলে জরীপের প্রশ্ন উঠে কি করে, এজন্যে ভারতীয় ঋণ প্রস্তাব আসে কেন এবং ট্রানজিটের ধাপ নিয়ে পরিকল্পনা হয়ে যায় কি করে?

বহুল আলোচিত, বহুল বিতর্কিত ট্রানজিট নিয়ে সিদ্ধান্ত এভাবে হতে পারে কি করে? দেশে এখন জরুরি অবস্থা চলছে। দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ। রাজনীতিকদের মতামত প্রকাশেরও সুযোগ নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসন এখন দেশে। মাত্র দশজন উপদেষ্টা চালাচ্ছেন কয়েক ডজন মন্ত্রণালয়। কোন বিষয়েই প্রয়োজনীয় সময় দেবার এবং কোন বিষয়ের গভীরে যাবার সুযোগ তাদের নেই। যে কাজ পার্লামেন্টে আলোচনার মাধ্যমে হয়, যে কাজ কয়েক ডজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর দ্বারা হয়, সে কাজ তাদের দ্বারা হবার প্রশ্নই উঠে না। এ অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্ত বহুলাংশেই আমলা নির্ভর হবার সম্ভাবনা বেশী। ট্রানজিটের মত মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত যদি এই পরিস্থিতিতে হয়, তাহলে সেটা যথার্থ না হবার আশঙ্কা রয়েছে। এই আশঙ্কাই সত্য হতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ঢাকা-আগরতলা রেললাইনের ব্যাপারে ভারতের সাথে অবশ্যই

www.pathagar.com

উপযুক্ত দরকষাকষি করা হয়নি। এমনকি ঢাকা-কলকাতা রেললাইন নেয়ার পর ঢাকা-আগরতলা রেললাইনকে ভারত কার্যত যে ট্রানজিট নিয়ে নিচ্ছে এ বোধ আমাদের মধ্যে এসেছে বলে আমার মনে হয় না। ঢাকা-কলকাতা, ঢাকা-আগরতলা রেললাইন এক সাথে নেয়ার চেষ্টা ভারত কেন করেনি? একটা পাওয়ার পর অন্যটা পাওয়ার চেষ্টা করছে কেন? এ 'কেন' এর উত্তর হলো, এই দুই রেল সংযোগ এক সাথে চাইলে ভারতের ট্রানজিট আদায়ের গোপন অভিলাষটা নগ্নভাবে ধরা পড়ে যেত। তাতে করে তাদের উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যেত বলে তারা মনে করেছে। এ জন্যেই ভারত তাদের ট্রানজিট নেয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে ধাপে ধাপে। ভারতের এই কৌশল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানীদের গৃহীত কৌশলের মত। জাপান তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে, জাপানের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ তখন মার্কিনীদের হাতে। সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় জাপানীদের কোন স্বাধীন ভূমিকার অবকাশ ছিল না। এই অবস্থায় জাপানীরা ধীরে ধীরে মার্কিনীদের হাত দিয়েই খণ্ড খণ্ড সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে গোটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। মার্কিনীদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় যখন তারা দেখতে পায় যে, হাজারো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা জাপানীদের হাতে চলে গেছে এবং তা মার্কিনীদের দস্তখতেই গেছে। খণ্ড খণ্ড সিদ্ধান্ত দেয়ার সময় তারা এটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু খণ্ড খণ্ড সিদ্ধান্ত একত্র জোড়া দেয়ার পরই পরিষ্কার হয়ে যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গোটা প্রক্রিয়া জাপানীদের হাতে চলে গেছে। ভারতীয়রা এইভাবেই বাংলাদেশের কাছ থেকে ট্রানজিট হাত করতে চাচ্ছে। এক সময় কলকাতা-গোয়ালন্দ রেলসংযোগ ছিল, সেই যুক্তিতে কলকাতা-ঢাকা রেল সংযোগ পাওয়া যুক্তিসঙ্গত। তা আগে নিয়ে নেয়ার কাজ ভারত সম্পন্ন করেছে। এরপর যুক্তি উঠেছে, ঢাকা-কলকাতা রেল সংযোগ যে কারণে হয়েছে, সে কারণে ঢাকা-আগরতলা রেল সংযোগও হওয়া উচিত। কলকাতার লোকরা ঢাকা আসার সুযোগ পেলে ত্রিপুরা-মিজোরামের মানুষ ঢাকা-বাংলাদেশে আসার সুযোগ পাবে না কেন? খুবই সত্য কথা। এ সুযোগ ভারত পেয়ে যাচ্ছে। এ সময় বলা হবে সংযোগ রেলপথে ভারতীয়রা কলকাতা-ত্রিপুরা চলাচল করবে, এটা মেনে না নিলে রেল সংযোগের প্রয়োজন ছিল না। অতএব এ নিয়ে আপত্তির কোন প্রশ্ন নেই। এরপর আসবে সংযোগ রেলে মানুষ চলাচলের সাথে পণ্য চলাচলের প্রমাণ। মানুষ যখন চলছে, তখন পণ্য চলতে আর আপত্তি কেন? আপত্তি থাকবে না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পণ্য চলাচল শুরু হবে মালবাহী বগি সংযোগের মাধ্যমে। পরে কথা তোলা হবে ভারতের পক্ষ থেকে যে, প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পণ্য পরিবহন অসুবিধাজনক হচ্ছে এবং প্রয়োজনও পূরন করছে না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যখন পণ্য পরিবহন করতে দেয়াই হচ্ছে, তখন পণ্যবাহী মালট্রেন চলতে না দেয়ার পেছনে যুক্তি নেই। এ দাবীর পেছনে যুক্তি আছে। যুক্তিটি মেনেও নেয়া হবে। এভাবে জাপানীদের মত কৌশল বা অপকৌশল ব্যবহার করে ভারত বাংলাদেশের কাছ থেকে পূর্ণ রেল ট্রানজিট ছিনিয়ে নেবে।

ঘটনা এইদিকেই যাচ্ছে। যারা ভারতকে এইভাবে ট্রানজিট দিতে যাচ্ছেন, তারা দ্বিপাক্ষিক দরকষাকষির সাধারণ নীতি জানেন না তা বলা যাবে না। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ রেল সংযোগ নিয়ে যা ঘটছে, তাতে প্রমাণ হচ্ছে না যে, তারা এই নীতি অনুসরণ করছেন। যদি অনুসরণ করতেন তাহলে তারা রেল ট্রানজিট আলোচনা শুরু করার আগেই ভারতকে বলতেন যে, নেপাল-বাংলাদেশ ট্রানজিটের উপর থেকে বাধা

www.pathagar.com

নিতে চাইছে। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য সরবরাহ, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডারের নাগাল পাওয়ার মত বিষয়।" (নয়াদিল্লী থেকে পাঠানো আনন্দবাজারের রিপোর্ট, এপ্রিল ৪, ২০০৪)। আর ৪ মে আনন্দবাজার তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখে, "অন্তর্বর্তী তদারকি শাসনে থাকা বাংলাদেশের সহিত চোখে পড়িবার মতো হার্দ্য উষ্ণতা। দলীয় রাজনীতিকরা মঞ্চ হইতে আপাততঃ অবসৃত হওয়ায় ভারত বিরোধিতার চিরাচরিত কূটনীতি হইতে তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ... রূপান্তরমুখী বাংলাদেশের উষ্ণ ও সকৃতজ্ঞ নৈকট্য দক্ষিণ এশিয়ায় নয়াদিল্লীকে যে সুবিধাজনক অবস্থানে স্থাপন করিয়াছে, মনোমোহন সিংহ তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ... ভারত যদি ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের স্থলভাগ দিয়া সড়ক সংযোগ কিংবা সে দেশের ভূগর্ভস্থ তেলভাণ্ডার ব্যবহারের সুবিধা পায, তবে তাহার চেয়ে উত্তম আর কি হইতে পারে?" (সার্ক চতুর্দশী, সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার, ৪ মে, ২০০৭) 'স্বার্থ' নামক এই 'উত্তম'-এরই অভিলাষী ভারত। প্রতিবেশী দেশে সুস্থ গণতন্ত্রের বিকাশ তার এই অভিলাষের পরিপন্থী। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের সরকার বলে তাদের দ্বারা তার অভিলাষ পূরণ হয় না। এ জন্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এত প্রশস্তি এবং তার অভিলাষ পূরণের এত আকাংখা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট নিকোলাস বার্নস এই সাদা বিষয়টা জানেন না, তা আমি মনে করি না। সব জেনেই তিনি ভারত খুশী হওয়ার মত কিছু কথা বলেছেন একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। যেখানে মিঃ বার্নস ঐ উক্তি করেছেন এবং যখন করেছেন, তা প্রমাণ করে তার মন্তব্য উদ্দেশ্যমূলক। তিনি কথাগুলো বলেছেন 'ইউএস-ইন্ডিয়া রিলেশন্স' শীর্ষক এক সেমিনারে। সেমিনারের বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে তিনি যে উক্তি করেছেন, তা এ জন্যেই বিশেষ অর্থ বহন করে না। দ্বিতীয়তঃ তার এই কথা বলার সময়টা হলো তার ভারত সফরের পূর্ব মুহূর্ত। আর তার এই সফরটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-মার্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তির ব্যাপারে তারা গত বছর যে সমঝোতায় পৌঁছেছে, তাকেই চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্যে নিকোলাস বার্নস-এর দিল্লী আসা। ভারতকে মার্কিন স্বার্থের সাথে বেঁধে ফেলার জন্যে এই চুক্তি সম্পাদন মার্কিনীদের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ নিয়তের কথা কারোই অজানা নেই যে, সে চীনের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভারতকে ব্যবহার করতে চায়। অর্থনৈতিক ও সামরিক সব দিক দিয়েই চীন একুশ শতকের এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। অন্যদিকে পারমাণবিক শক্তিধর ভারতও আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে দ্রুত সামনে এগিয়ে আসছে। ২০২৫ সালের মধ্যে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে বটে, কিন্তু ভারতও তখন চতুর্থ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। চীনের মত অত বিশাল সামরিক আয়োজন ভারতের নেই, কিন্তু এরপরও এশিয়ার আকাশ ও নীল সাগরে চীনের পরেই ভারতের সরব উপস্থিতি অনুভূত হবে। সুতরাং চীনের মোকাবিলায় ভারতকে পক্ষে পাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে অপরিহার্য। এই অপরিহার্য লক্ষ্য অর্জনেরই কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গত বছর স্বাক্ষরকৃত ভারত-মর্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি। সুতরাং এই চুক্তির বাস্তবায়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজকেই

www.pathagar.com

বার্নস-এর এই উক্তিতে দৃশ্যতঃ অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কারণ বিশ্ব রাজনীতিতে এগুলো একান্তই গদবাধা কথা। কিন্তু বিশেষভাবে যদি উপমহাদেশের রাজনীতিকে সামনে রাখা হয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্কের বিষয় যদি বিবেচনায় আনা হয়, তাহলে কথাটা দাড়ায় অনেকটাই আঁৎকে ওঠার মত। আতংকটা শিয়ালছানাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে কুমিরের হাতে তুলে দেয়ার মত। নিকোলাস বার্নস বলেছেন, 'ভারতের গণতন্ত্র তার প্রতিবেশীদের জন্যে মডেল হতে পারে।' মডেল হতে পারে যদি সে মডেল চায় যে, প্রতিবেশী দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু ভারতের ভাঁড়ারে কি এমন শুভেচ্ছাবোধের কোনো সঞ্চয় আছে? নেই, এটাই ইতিহাস। বরং ভারতের কাছে তার ছোট প্রতিবেশীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই। ভারত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তার এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটায়। প্রথমে তারা স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর হাত দেয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় ২৮১টি দেশীয় রাজ্য ছিল। দেশ বিভাগের নীতি অনুসারেই ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা ছাড়ার সাথে সাথেই তারা স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বাধীন থাকতে দেয়া হয়নি। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে তাদের গ্রাস করে ফেলা হয়েছে। ভূপাল, মহীশুর, ইন্দোর, হায়দরাবাদ, উদয়পুর, নাগাল্যান্ড, যোধপুর, ত্রিপুরা, মনিপুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি যে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল তা মানুষ ভুলেই গেছে। অন্যান্য প্রতিবেশীদের প্রতিও ভারতের এই একই লোলুপ দৃষ্টি। প্রতিবেশী ছোট দেশগুলোর সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতের বড় প্রতিবেশীসুলভ কোন উদারতা নেই। পাকিস্তান পারমাণবিক দেশ হওয়ার কারণে তার সাথে ভারতের ব্যবহার ভিন্ন। কিন্তু গরীব ও দুর্বল নেপালকে পালিত 'মুরগি'র বেশী কিছু মনে করে না ভারত। আর বাংলাদেশকে মাথা নত করতে বাধ্য করার জন্যে ভাতে মারার, পানিতে মারার কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করছে না। ভারতের পানি-কূটনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্যে ভয়াবহ এক খড়গ। তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর চীনের বাঁধ নির্মাণের খবরে ভারত ইতোমধ্যেই চিৎকার শুরু করেছে। বলছে, ব্রহ্মপুত্র আন্তর্জাতিক নদী। এতে বাঁধ দিয়ে চীন পানি সরিয়ে নিতে পারে না। অথচ ভারত নিজের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নীতি কথা মানে না। বাংলাদেশের উজানে আন্তর্জাতিক নদীর উপর ভারত ২৪টির মত বাঁধ নির্মাণ করেছে। বৈধ ও অবৈধ বাণিজ্য পথে ভারত শোষণ করছে বাংলাদেশকে। চুক্তির টেবিলে বসলে ভারত শুধু নিতে চায়, দিতে চায় না কিছুই। বাংলাদেশের সীমান্ত জুড়ে ভারত কাঁটা তার দিয়ে অবিশ্বাসের প্রাচীর গড়ে তুলছে। এমন ভারতকে তো প্রতিবেশীরা আতংকের চোখেই দেখার কথা। নিকোলাস বার্নস যদি মনে করে থাকেন যে, এই ভারত বাংলাদেশে গণতন্ত্র এনে দেবে, তাহলে সেটা হবে শিয়ালকে কুমিরের বিশ্বাস করার মত ব্যাপার। ভারতের গণতন্ত্র ভারতের জন্যে, প্রতিবেশী দেশে গণতন্ত্র সে চায় না। চায় না কারা গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে অবৈধ ও অযৌক্তিক সুবিধা আদায় করা যায় না। লক্ষণীয়, ভারত এখন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকে তাদের দাবি আদায়ের সুবর্ণ সুযোগ মনে করছে। তারা পরিষ্কার বলছে, "এর আগের রাজনৈতিক সরকার বহুক্ষেত্রেই ভারতের কূটনৈতিক আশা-আকাংখাকে আমল দেয়নি।... নতুন তদারকি ক্ষমতায় আসার পর আশার আলো দেখা যাচ্ছে।...বাংলাদেশের রাজনীতি যে পথে যাচ্ছে, তা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক...। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারত...কিছু সুবিধা অর্জন করে

www.pathagar.com

স্বেচ্ছামূলক। এছাড়া এখন নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অন্যান্য যে বিধান প্রস্তাব করেছে, সেগুলো ঐ আদেশে ছিল না। প্রশ্ন হলো, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২-এর বিধানাবলীর সাথে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সংক্রান্ত তাদের প্রস্তাব যোগ করতে পারেন কিনা। পারেন না এটাই এর উত্তর। কারণ, সংবিধানের ১১৯(২) ধারায় 'অন্য কোন আইন'-এর পরিসীমা নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এটাই সংবিধানের স্পিরিট। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত আইন করবে, এটাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। তাদের কাজ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, নির্বাচনের বাইরের বিষয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকার কথা নয় এবং এসব বিষয়ে আইন প্রণয়নের তো প্রশ্নই ওঠে না। এ অধিকার সবিধান তাদের দেয়নি, দিতে পারে না। এই অধিকার এমনকি সংবিধান জাতীয় সংসদকেও দেয়নি। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবিধান জাতীয় সংসদকে সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বলেছে। 'নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা' শিরোনামে সংবিধানের ১২৪ ধারায় বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্যে প্রযোজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।" এই ধারায় পরিষ্কার যে, নির্বাচন সংক্রান্ত বিধানকে নির্বাচন বিষয়ক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। জাতীয় সংসদের প্রতি যদি সংবিধানের এই নির্দেশ হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে গঠিত বিশেষ সংস্থা হয়েও নির্বাচনী আইনকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে রাজনৈতিক দলগুলোর ঘর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন কি করে? পারেন না। কিন্তু নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাতেই চাচ্ছে। নিয়ত তাদের অবশ্যই সৎ, পথ কিন্তু তাদের বেআইনী, অসংগত, অনভিপ্রেত। এটা তারা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন, বিতর্কে তাদের ততোই কম জড়াতে হবে এবং তারা নিজের মাথায় চিন্তা করেন না, এমন কথাও তাহলে কেউ তাদের লক্ষ্য করে বলবে না। রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলের সংস্কারের আমি পক্ষে। কিন্তু এই সংস্কারের জন্যে নির্বাচন কমিশন নয়, এগিয়ে আসতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকেই। আর আইন যদি এখন করতেই হয়, তাহলে সেটা করতে হবে সরকারকে, রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা নিয়ে।

২৬ মে, ২০০৭

দক্ষিণ এশিয়ার মনিবত্ব

মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট নিকোলাস বার্নসের সাম্প্রতিক একটি উক্তি বাংলাদেশের জন্যে একটা বড় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বার্নস বলেছেন, "রাজনৈতিক সংঘাতে ব্যাহত হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পার্টনার হিসেবে অত্র অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতায় এক সাথে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত।"

www.pathagar.com

কমিশনের সহিত নিবন্ধিত হইয়াছে উহাকে বুঝাইবে" – এই বাক্যাংশ সংজ্ঞার সাথে যুক্ত করেছে। সবিধান প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে এই বাক্যাংশ যুক্ত হবার ফলে সংবিধানের দেয়া রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সংজ্ঞা অনুসারে কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত না হলে তাকে নির্বাচনযোগ্য 'রাজনৈতিক দল' বলা যাবে না। কিন্তু নির্বাচন কমিশন কি এতবড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে? নিলে তা কি সংবিধানসম্মত হবে? আমার মনে হয় হবে না। কারণ, সংবিধান তার দেয়া রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত হওয়াকে নির্বাচনযোগ্য 'রাজনৈতিক দল' হওয়ার শর্ত বানায়নি। নির্বাচন কমিশন যদি রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকে অপরিহার্য করে দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অভিভাবক সেজে বসে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব ব্যাপারে এইভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করে, তাহলে সেটা হবে সংবিধানের খেলাপ।

নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে আচরণ বিধি তৈরি করেছে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর নির্বাচন কেন্দ্রিক বিধিমালায় যে সংশোধন আনতে চাচ্ছে, তা সবই ঠিক আছে। সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, নির্বাচন পরিচালনা ও ফলাফল ঘোষণা এবং সংবিধান ও অন্য কোন কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে এমন দায়িত্ব পালন করতে বলেছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের 'খসড়া সুপারিশমালা' শীর্ষক বিধিমালায় রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব এনেছে, তা তাদের সংবিধান নির্ধারিত দায়িত্বের পরিপন্থী। এ সংস্কার প্রস্তাবে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে : এক. নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক, দুই. নিবন্ধিত দল ছাড়া কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবে না, তিন. দেশ-বিদেশে দলের ব্যাংক একাউন্টের নাম ও নাম্বার নির্বাচন কমিশনে দিতে হবে, চার. দলীয় গঠনতন্ত্রে দলের অভ্যন্তরে নির্বাচনের বিধান থাকতে হবে ও নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে, পাঁচ, দলীয় ফান্ডের অডিটেড রিপোর্ট এবং দলীয় নির্বাচন ও কমিটি গঠনের প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে দাখিল করতে হবে এবং অনিবন্ধিত দলের সাথে জোট বাঁধা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের এসব প্রস্তাব ভাল কি মন্দ, অযৌক্তিক না যুক্তিসঙ্গত, এ নিয়ে আমার কোন মন্তব্য নেই। আমার কথা হলো, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিধি-বিধান প্রণয়ন করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশন রাখে না। সংবিধানের ১১৯(১) থেকে এর 'ক', 'খ', 'গ' এবং 'ঘ' পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্বের যে বিধান রয়েছে, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর গায়ে হাত দেবার কোন সুযোগ নেই। ১১৯(২) ধারায় নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত কিছু দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে, "উপরিউক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।" সংবিধানের এই ধারায় অতিরিক্ত দায়িত্বের দুইটি উৎসের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো 'সংবিধান', অপরটি হলো 'অন্য কোন আইন'। বিদ্যমান 'অন্য কোন আইন'-এর মধ্যে রয়েছে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২'। এই আদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত আইনই রয়েছে। নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের বিধান এতে ছিল। কিন্তু তা ছিল

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলের অভাব শুধু নয়, জনমতের ওপর প্রভাবশালী ও জনগণের আস্থাভাজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করতে পারে। সুস্থ গণতন্ত্র ও নিরাপদ দেশের জন্যে বড় ও শক্তিশালী কিছু রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অপরিহার্য। বড় নেতৃত্ব যেমন এসব দলের সৃষ্টি করে, এসব দল তেমনি আবার বড় নেতৃত্বের জন্ম দেয়। দল যত খণ্ড-বিখণ্ডিত হবে, নেতৃত্ব ততোই দুর্বল, ভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। দেশের শত্রুদের জন্যে এমন রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই লোভনীয়। কারণ এমন দুর্বল ও ভঙ্গুর নেতৃত্ব হয়ে থাকে ক্রয়যোগ্য। ক্রয় করার জন্যে ক্রেতার অভাব নেই আমাদের দেশের চারপাশে। এই ক্রয়-বিক্রয়ে দেশের স্বাধীন রাজনীতি শুধু শেষ হয়ে যাবে না, দেশের স্বাধীনতাও সংকটে পড়তে পারে লোভী লেন্দুপ দরজীদের উত্থানে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য বলতে পারেন, আমরা দেশে এই সংকট তৈরি করতে চাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি দলগুলোতে গণতন্ত্র আসুক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রসেসটা সামষ্টিক হোক। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তারা আইন করলেই কি রাজনৈতিক দলে এসব এসে যাবে? বড় রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে কি গণতন্ত্রের চর্চামূলক ও সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহন বিষয়ক বিধি-বিধানের অভাব আছে? তাদের কি দলীয় নির্বাচনের জন্যে কাউন্সিল নেই? সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে নির্বাহী কমিটি, প্রেসিডিয়াম কী নেই? আছে। তাহলে শতভাগ গণতন্ত্র চর্চা দলগুলোতে হচ্ছে না কেন? হচ্ছে না এই কারণে যে, ঐ দলগুলোতে ঐতিহ্যিকভাবেই এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত যে, তার প্রতি দলের লোকদের আস্থা নির্ভরতা এতো বেশি যার কারণে সকলেই সাধারণভাবে তার সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী। দলগুলোর নির্বাহী কমিটি, প্রেসিডিয়াম বা স্থায়ী কমিটিতেই সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকাই মুখ্য থাকে। এর একটা কারণ মানসম্পন্ন, প্রভাবশালী ও ইমেজের অধিকারী এক সেট নেতৃত্বের অভাব। তাই দল মূল নেতৃত্বের প্রাধান্যকে স্বাভাবিক বলেই মনে করে। দল যাকে স্বাভাবিক মনে করে তাকে অস্বাভাবিক বলার মাথা ব্যথা নির্বাচন কমিশন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কেন? নির্বাচন কমিশন নতুন বিধি-বিধান দিয়ে কি এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন? বিধি-বিধান জারি করলেই নির্বাহী কমিটিতে শেখ হাসিনা কিংবা খালেদা জিয়ার বর্তমান প্রভাব খর্ব হয়ে যাবে? যাবে না যে, একথা নির্বাচন কমিশনও জানে। তাহলে রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে এতো হৈ-চৈ কেন? আর এই সংস্কারকে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু বা মুক্ত রাজনীতির জন্যে শর্ত বানানো হচ্ছে কেন?

নির্বাচন কমিশনের এই অহেতুক কসরত নিশ্চয় একটা বাড়াবাড়ি অথবা তাদের দায়িত্ব এবং সাংবিধানিক পন্থার অবশ্যই খেলাপ। নিজেরা জয়েন্ট স্টক কোম্পানী সেজে রাজনৈতিক দলগুলোকে কমার্শিয়াল ফার্মের পর্যায়ে তারা নিতে চাচ্ছেন, এটা কি সংবিধান চেয়েছে? আমি মনে করি, চায়নি। নির্বাচন কমিশন তার প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের আচরণবিধিতে রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, তা সংবিধান নির্ধারিত সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন। প্রস্তাবিত আচরণবিধিতে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো, "রাজনৈতিক দল বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১)-এ সংজ্ঞায়িত রাজনৈতিক দল যাহা নির্বাচন কমিশনের সহিত নিবন্ধিত হইয়াছে উহাকে বুঝাইবে।" এখানে নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ১৫২(১) ধারায় প্রদত্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সংজ্ঞা গ্রহণ করেছে, কিন্তু "যাহা নির্বাচন

www.pathagar.com

স্ত্রী বেগম জিয়া এবং শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আছেন তার কন্যা শেখ হাসিনা। এই দু'নেত্রী রাজনীতি করতেন না। তাদের পরিবারের গুডউইলকে দল, দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজে লাগাবার জন্যেই তাদেরকে রাজনীতিতে আনা হয় এবং তাদেরকে রাজনীতিতে আনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

এখন একেই বলা হচ্ছে একনায়কতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্র। এই একনায়কতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্রকে ধ্বংস করা বা এর অবসান ঘটানোর জন্যে নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। কিন্তু তারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্ত বানাচ্ছেন রাজনৈতিক সংস্কার ও রাজনৈতিক দল থেকে একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদকে। তাদের চোখের ষোল আনা বিষদৃষ্টি গিয়ে পড়েছে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার উপর। তারা মনে করছেন এই দুই ব্যক্তিত্ব মাইনাস হলেই দুই রাজনৈতিদ দলে গণতন্ত্রের মহাসুবাতাস বইবে। আমি নিশ্চিত, এই চিন্তা তাদের রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার ফল। তারা উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে কোনই জ্ঞান রাখেন না। আসলে খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্ব আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রয়োজন ও কালচারের অপরিহার্য ফল। নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের ইতিহাস থেকে চোখ বন্ধ করে রাখলে চলবে নাই। বিএনপি থেকে অনেকেই বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু জিয়া পরিবারের ইমেজ বাদ দিয়ে পাল্টা বিএনপি গঠন সম্ভব হয়নি। এর কারণ হলো উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের মত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র রাজনৈতিক দল হিসেবে গঠন ও প্রতিষ্ঠা সামষ্টিক নেতৃত্বে নয়, শেখ মুজিব ও জেনারেল জিয়ার একক নেতৃত্বের ফল। তাদের ইমেজ ও নেতৃত্ব অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে দল দু'টি। তাদের ইমেজ ও আদর্শই দলের মূলধন ছিল, এখনও আছে। তাদের ইমেজ ও আদর্শ মাইনাস করলে দল দু'টি থাকে না। এ কারণেই দেখা গেছে, আওয়ামী লীগের অনেক বড় বড় নেতা নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে পাল্টা আওয়ামী লীগ করেছে, কিন্তু সবাই ব্যর্থ হয়েছেন। জেনারেল জিয়ার জাতীয়তাবাদী আদর্শ ছিনতাই করে ও নিজের ক্ষমতাসীন ইমেজ নিয়ে বিএনপির বিকল্প জাতীয় পার্টি গঠন করেছিলেন জেনারেল এরশাদ ক্ষমতার আসনে বসে। কিন্তু এরশাদ যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন, ততদিন দল টিকেছে সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার কারণে, তারপর খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে। সুতরাং আওয়ামী লীগের প্রাণ যেমন শেখ মুজিবের ইমেজ ও আদর্শ, তেমনি জেনারেল জিয়ার ইমেজ ও আদর্শ হলো বিএনপির প্রাণ। শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়া মরহুম দুই নেতার ইমেজ ও আদর্শের প্রতীক হিসেবে দুই দলকে এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অন্য কথায় বলা যায়, শেখ মুজিব ও জেনারেল জিয়ার অবর্তমানে দুই নেত্রীই এখন তাদের স্ব স্ব দলের প্রাণ। এই রাজনৈতিক সত্যটা ইলেকশন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবশ্যই জানেন, কিন্তু মানেন না তা পরিষ্কার। মানেন না কি এ জন্যেই যে দল দু'টিকে দৃশ্যপট থেকে সরানো দরকার? এটা তারা নিঃসন্দেহে জানেন, শেখ হাসিনা পরিবার ও জিয়া পরিবারকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি থেকে মাইনাস করলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নাম অবশ্যই টিকে থাকবে, কিন্তু সেটা মুসলিম লীগের মত হাজারো খণ্ডের অস্তিত্ব নিয়ে। কিন্তু বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্যে এটা শুভ হবে না, আর দেশের জন্যে হবে খুবই অশুভ। কারণ এই পরিস্থিতি দেশে শক্তিশালী

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সংকট বড় রাজনৈতিক দলগুলোর একনায়ক নেতৃত্বের ফল কিনা, সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে আমার মতে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর এই ব্যাধি সাম্প্রতিককালের নয় যে, বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনাকে এ জন্যে দোষ দেয়া যাবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো অতীতে কোনো সময়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কথিত একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্ত ছিলো না। এই উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে সফল রাজনৈতিক দল মুসলিম রীগ ও কংগ্রেসের ইতিহাসও এটাই। এ দু'টি দল থেকে অনেক দলের জন্ম হয়েছে, অনেক নতুন দল দৃশ্যপটে এসেছে। তাদেরও ইতিহাস এটাই বলে। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অত্যন্ত গণতন্ত্রমনা লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, মুসলিম লীগের সভাপতির পদ অলংকৃত করে রেখেছিলেন। কংগ্রেসে সভাপতির বদল হতো বটে, কিন্তু মুসলিম লীগের চেয়ে অনেক বেশী একনায়কতন্ত্র ছিল কংগ্রেসে। সেখানে এম. কে গান্ধী যা বলতেন, সেটাই ছিল কংগ্রেসের আইন, কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। কংগ্রেসে সভাপতি পাল্টানো হতো, সেটা নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, গান্ধীর সিলেকশনের মাধ্যমে। আজ গান্ধী নেই, গান্ধীর সেই কংগ্রেস কিন্তু ভারতে আছে। সেখানে আজও চলে সেই সিলেকশন। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী এবং আজ সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসে সেই এম. কে গান্ধীরই একনায়ক রোল প্লে করছেন। ভারতের আর একটি বড় দল বিজেপি'র নেতা-নির্বাচন হয় নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, একটা গোষ্ঠী-সিলেকশনের দ্বারা। আরএসএস ও সংঘ পরিবারের গোপন মতামতের বাইরে কারও পক্ষে বিজেপি'র সভাপতি হওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্তানের গোটা ইতিহাসে মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচন কোন সময়ই নির্বাচনের উপর নির্ভর করে হয়নি; বরং নেতার মত অনুসারেই দলের কাউন্সিল ও নির্বাহী কামিটি তৈরি হয়েছে। আজও পাকিস্তানে মুসলিম লীগ জেনারেল মোশাররফের একনায়কতন্ত্রের অধীন। বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্ন নয়। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হওয়ার পর চার বছর কোন কাউন্সিল মিটিং হয়নি। চলেছে ভাসানীর একনায়কতন্ত্র। ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়া এবং সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগে যোগদান করায় ভাসানী, মুজিব, সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমানের বহুমুখী নেতৃত্বের সুযোগ হয়। কিন্তু এটা আমাদের রাজনীতির কালচার ছিল না। নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে ৪ বছর এ ব্যবস্থা চললেও পরে আধিপত্যের প্রশ্নে ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ দু'ভাগ হয়ে যায়। ভাসানী ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) গঠন করেন, সোহরাওয়ার্দী, মুজিব ও আতাউর আওয়ামী লীগে থেকে যান। দলে আধিপত্যের কোন্দলই ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন নিয়ে আসে। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন শেষে ১৯৬৪ সালে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ পুনর্জীবিত করে এর সভাপতি হলেন। আমৃত্যু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। অন্যদিকে ভাসানী ১৯৫৭ সালে ন্যাপের সভাপতি হবার পর আমৃত্যু এর সভাপতির পদে থেকে যান। জেনারেল জিয়া গঠন করেন বিএনপি এবং জেনারেল এরশাদ গঠন করেন জাতীয় পার্টি। জেনারেল জিয়ার রাজনৈতিক জীবন তুলনামুলকভাবে সংক্ষিপ্ত ছিল। জেনারেল জিয়া যতদিন জীবিত ছিলেন তার দলকে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং জেনারেল এরশাদ প্রায় দু'দশকের বেশীকাল ধরে তার গঠিত জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে বহাল আছেন। আর বর্তমানের অবস্থা হলো জেনারেল জিয়ার অবর্তমানে তার দলের নেতৃত্বে আছেন তার

www.pathagar.com

কমিশন প্রস্তাব-পরামর্শ তালিকাভুক্ত করা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এই যুক্তির সীমা মানছেন না। উদাহরণ হিসেবে তাদের সর্বশেষ একটা প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা যায়। এতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দলের সব কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব থাকতে হবে। বোধসম্পন্ন যে কেউ বলবে, কোন প্রস্তাবকে বিবেচনাযোগ্য ভাবতে হলে সর্বনিম্ন যে যুক্তিটুকু থাকা দরকার, তা এই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নেই। পৃথিবীর কোন দেশের কোন রাজনৈতিক দলে এই ধরনের ব্যবস্থা নেই। নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতায় শীর্ষে পৌঁছা কোন দেশেও এই ব্যবস্থা রাখা হয়নি। পৃথিবীর কোন নারী সংগঠনের তরফ থেকে এমন অবাস্তব দাবিও ওঠেনি। ওঠেনি কারণ তারা জানে নেতা নির্বাচনের যে মানদণ্ড তার খেলাফ এই চিন্তা। নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন মহিলার সংখ্যা যদি বেশী হয়, ৩৩ শতাংশ কেন অধিকাংশ নেতার আসন তারা দখল করে নিতে পারে। আর সেই যোগ্যতার মহিলা যদি না থাকে, তাহলে ৩৩ শতাংশ নয় ৩ শতাংশ নেতৃত্বের আসনও তারা পাবে না। নারী স্বাধীনতার দেশ বৃটেনে মহিলা রাজনীতিক থ্যাচার তিনবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচতি হয়েছেন, কিন্তু নারী স্বাধীনতার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও কোন মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেনি। এর অর্থ থ্যাচারের মত যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা মার্কিন রাজনীতিতে আসেনি। অথচ বাংলাদেশে গত দেড় দশক ধরে মহিলারাই প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। এটা তাদের যোগ্যতা ও মানুষের আস্থা লাভের কারণেই। পরিবারতন্ত্রের প্রশ্ন উঠতে পারে। পরিবারতন্ত্রও একটা যোগ্যতা। বিখ্যাত কেনেডি পরিবারের সদস্য হওয়ার সুযোগ কি ঐ পরিবারের সদস্যরা নেয় না? মিসেস ক্লিনটন কি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটএনর স্ত্রী হওয়ার সুযোগ নিচ্ছেন না? নেহেরু পরিবারের দৃষ্টান্ত সবার সামনে রয়েছে। নেহেরু পরিবারের রাজনীতি আজ ৫ম পুরুষে (fifth generation) প্রবেশ করেছে। যাহোক, আমি যোগ্যতার কথা বলছিলাম। যোগ্যতা ও তার ব্যবহারই ঠিক করবে ছেলে ও মেয়ে রাজনীতিতে কে কতটা এগুবে, তেত্রিশ শতাংশ নেতৃত্ব মহিলাদের জন্যে বরাদ্দ করার প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্রেরও এটা পরিপন্থী। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, দেশে গণতন্ত্র না থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতান্ত্রিক সংস্কার আনার জন্যে নির্বাচন কমিশনসহ সরকারের যখন চেষ্টার অন্ত নেই, তখন মহিলাদের জন্যে ৩৩ শতাংশ প্রস্তাব সংরক্ষিত করার অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব উঠেছে। ব্যাপারটা 'নীতির নামে দুর্নীতি'র মতো।

রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে নির্বাচন কমিশন যা করছে, তাকে নীতির নামে দুর্নীতি বলা যাবে না। তবে বাড়াবাড়ি বলা যাবে অবশ্যই। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যে নির্বাচন কমিশন যে সব বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে চাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন যেন জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, আর রাজনৈতিক দলগুলো যেন কমার্শিয়াল ফার্ম। রাজনৈতিক দলগুলো এজিএম করছে, ফান্ডের অডিট হচ্ছে, বিভিন্ন কমিটির নির্বাচন ঠিকমত চলছে, এসব রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনে দিতে হবে। পৃথিবীর কোন দেশে রাজনৈতিক দলগুলোকে এইভাবে কমার্শিয়াল ফার্মে পরিণত করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এটা যেন একটা পানিশমেন্ট। এই পানিশমেন্টের কারণ নাকি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেকার নৈরাজ্য। বলা হচ্ছে, বড় রাজনৈতিক দলগুলোর একনায়ক নেতৃত্বের কারণেই দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক হানাহানি এবং জরুরী আইন। সাম্প্রতিক

www.pathagar.com

হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে আগের পরিকল্পনায় এমনটা ছিল না বলেই জানি। এর ফলে ভারত বাংলাদেশে চারটি রেল রুট (কলকাতা-ঢাকা রেল সংযোগসহ) পেয়ে যাবে। এতে চোরাচালান ও অন্যান্য সমস্যাসহ নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি বাড়বে। দুই. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চূড়ান্তকৃত আন্তঃএশীয় রেল-রুটের পশ্চিমমুখী রূপরেখাটা স্পষ্ট নয়। ভারত আন্তঃএশীয় রেল-রুটের মাধ্যমে বাংলাদেশ হয়ে মায়ানমারে প্রবেশ করতে পারছে, কিন্তু আন্তঃএশীয় রেলের মাধমে বাংলাদেশ নেপাল ও পাকিস্তানে প্রবেশ করতে পারছে কিনা কিংবা কিভাবে পারছে, এ বিষয়টার কিছুই জানা যাচ্ছে না। অতীতে ভারত আন্তঃএশীয় রেল চলাচল রুটে বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানকে এই সুযোগ তাদের চাহিদা অনুসারে দিতে চায়নি। এ বিষয়টির নিষ্পত্তি যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আন্তঃএশীয় রেল-এর বাংলাদেশ অংশ চূড়ান্ত করা একটা আগাম ব্যাপার হয়ে গেছে, বলতেই হবে। তিন. আন্তঃএশীয় রেল চুক্তিতে যারা এ পর্যন্ত স্বাক্ষর করেছে কিংবা স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের তালিকায় ভারত ও পাকিস্তানের নাম নেই। আমরা চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তাদের মনোভাব বিবেচনায় রেখেছি কিনা, এ বিষয়ও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে না।

তবে ভারত আন্তঃএশীয় রেলের বাংলাদেশ থেকে মায়ানমার প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কারণ, বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক রেল-চুক্তির মাধ্যমে রেল-ট্রানজিট পাওয়ার বিষয়টি তার কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে এ উজ্জ্বলতা নিভে গেলে ভারত কি করবে সেটা বলা মুশকিল। একতরফা সুবিধা লাভ করা ভারতের অভ্যাস। তা না পেরে কোন কিছুরই কোন অর্থ থাকে না তার কাছে।

অন্যে কি করবে, তার চেয়ে আমরা কি করব এ বিষয়টিই আমাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হতে হবে। সমতাভিত্তিক সম্পর্ককে সব সময় স্বাগত জানাতে হবে। কিন্তু একতরফা সুবিধা আদায়কে কেউ যদি তার অধিকার মনে করে, তাহলে সে স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না কোনমতেই।

১০ মে, ২০০৭

রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশন

একজন সিনিয়র রাজনীতিকের অভিমত হলো, 'আমাদের নির্বাচন কমিশনের মাথায় নিজস্ব বলতে কিছু নেই।' এই উক্তির পক্ষে যুক্তিও আসছে। বলা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন এখন পোস্ট বক্সের মত। বাক্সে এসে নানা প্রস্তাব পড়ছে, আর কমিশন সেসব প্রচার করছে মতামত যাচাইয়ের জন্যে। খুঁজলে এর মধ্যে কমিশনের গণতান্ত্রিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে অবশ্যই। কিন্তু গণতন্ত্র লাগামহীন নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ যদি তার সব কাজই মানুষের কথা মনে করে, নিজের যুক্তি-বুদ্দির কোন ব্যবহার না করে, তাহলে তার দায়িত্বের মর্যাদা থাকে না। গণতান্ত্রিকতা যুক্তি ও বুদ্ধির পথ অনুসরণ করে চলে। যেমন রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় মেনিফেস্টো প্রকাশ করে, যাতে দেশের প্রয়োজন এবং সামর্থ্যের যুক্তির মধ্যেই দলের লক্ষ্য ও কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু নির্বাচন

www.pathagar.com

ভারত প্রথমে তুলে নিক, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের পন্য প্রবেশের বাধা ভারত প্রত্যাহার করুক এবং বাংলাদেশ-ভারতের কমন নদীর কণ্ঠরোধকারী বাঁধসমূহ ভারত ভেঙ্গে দিক। বাংলাদেশের এসব দাবী ভারতের বর্তমান রেল সংযোগ দাবীর চেয়ে অনেক বেশি পুরানো। নেপালের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট চুক্তি হয় ১৯৭৬ সালে। ৩০ বছর আগের এই চুক্তিটি বাংলাদেশ এখনও কার্যকরি করতে পারেনি ভারত তার ভূখণ্ড বাংলাদেশ ও নেপালকে ব্যবহার করতে না দেয়ার কারণে। ভূখণ্ড ব্যবহার করতে না দেয়ার অজুহাত হিসেবে ভারত এমন সব শর্ত আরোপ করে যা মেনে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার সম্ভব নয়। ৩০ বছরের পুরানো এই দাবী আদায় না করে কেমন করে বাংলাদেশ ভারতের সাথে রেল সংযোগ নিয়ে আলোচনা করতে পারে। অনুরূপভাবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যে বাংলাদেশী পণ্য ঢুকতে না দেয়ার পেছনে কোন যুক্তি নেই। ভারতের সাথে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি আকাশ পরিমাণ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে বাণিজ্য করতে দিলে এ ঘাটতি কিছুটা হলেও কমতে পারতো। ভারতের সাথে পানি বণ্টন সমস্যাও সাড়ে তিন দশকের পুরানো। ভারত এক এক করে আমাদের নদী মেরে ফেলছে। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় ভারত যখন তার স্বার্থ হাসিলের চেষ্টায় মরিয়া হয়েছে, তখন আমাদের এসব স্বার্থের প্রশ্ন উঠেনি কেন? আগে না উঠলেও এখন উঠতে হবে। এসব দাবী পূণের আগে ঢাকা-আগরতলা রেল সংযোগের কোন আলোচনাই আর চলা উচিত নয়। ট্রানজিট দেয়ার সাথে নিরাপত্তার যে প্রশ্ন জড়িত আছে, তা একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু এ নিয়ে আমি এখানে কোন আলোচনা করছি না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাম্প্রতিক আন্তঃএশিয়া রেল যোগাযোগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েও এই সুযোগে কয়েকটা কথা বলতে চাই। গত কয়েকদিন আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্তঃএশীয় রেল যোগাযোগ চুক্তিতে স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তঃএশীয় রেল যোগাযোগের বাংলাদেশ অংশের রূপরেখাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার চূড়ান্ত করেছেন। এই চূড়ান্ত নক্সা অনুসারে আন্তঃএশীয় রেল পশ্চিম দিক থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশের তিনটি স্থান দিয়ে প্রবেশ করবে। একটি পশ্চিমবঙ্গের গেদে থেকে কুষ্টিয়া সীমান্ত হয়ে দর্শনা দিয়ে ঈশ্বরদী আসবে। দ্বিতীয় শাখা পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গাবাদ থেকে রাজশাহী সীমান্ত হয়ে ঈশ্বরদী আসবে। তৃতীয় শাখা পশ্চিমবঙ্গের রাধিকাপুর থেকে দিনাজপুর সীমান্ত হয়ে তিনটি শাখাই ঈশ্বরদী আসবে। তারপর তিনটি শাখাই ঈশ্বরদী থেকে যমুনা সেতু-জয়দেবপুর-আখাউড়া, চট্টগ্রাম-দোহাজারী হয়ে মায়ানমারের গুনদুমে প্রবেশ করবে। আন্তঃএশীয় রেলের এই রুট-প্ল্যানের সবচেয়ে আনন্দের দিক হলা, আন্তঃএশীয় হলে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের পর তা চট্টগ্রাম হয়ে মায়ানমারে প্রবেশ করবে, এটা বাংলাদেশের দাবী ছিল, সে দাবী পূরণ হয়েছে। অন্যদিকে ভারত চেয়েছিল আন্তঃএশীয় রেল বাংলাদেশে প্রবেশ করে তা মায়ানমারমুখি না হয়ে বাংলাদেশের সিলেট হয়ে পুনরায় ভারতের আসামে প্রবেশ করুক এবং সেখান থেকে তা প্রবেশ করুক মায়ানমারে। ১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের এ দাবী মেনে নিয়ে আন্তঃএশীয় রেলের পূর্বমুখী রুট চূড়ান্ত করেছিল। নতুন রুট-প্ল্যান অনুসারে এই সিদ্ধান্ত আর কার্যকরি থাকলো না এবং ভারতের অবাস্তব দাবীও পূরণ হলো না। কিন্তু আন্তঃএশীয় রেল রুটের বাংলাদেশে অংশ চূড়ান্ত করা ও চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নেয়ার মধ্যে তিনটি প্রশ্নবোধক বিষয় রয়েছে। এক. আন্তঃএশীয় রেল ভারত থেকে তিনদিক

www.pathagar.com

চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্যে নিকোলাস বার্নস দিল্লী আসছেন। আসার মুখেই বলা যায়, তিনি ভারতকে খুশী করার মত উপরোক্ত উক্তিটি করেছেন। তার উক্তি যদি এই দিক দিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে দেখা যাবে উক্তিটি কোন রিজনিং থেকে আসেনি, এসেছে 'গরজ বড় বালাই'-এর মজবুরি থেকে।

আমি যখন এই নিবন্ধটি লিখছি, তখন নিকোলাস বার্নস দিল্লীতে ভারত-মার্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। চূড়ান্ত চুক্তির খসড়া এখানে চূড়ান্ত হলে জার্মানীতে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন "G-8"-এর বৈঠককালে একে চূড়ান্ত রূপ দেয়া যাবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনোমোহনও সে সময় 'পর্যবেক্ষক' হিসেবে "G-8" বৈঠকে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত এই বৈঠককালে চুক্তিটি চূড়ান্ত রূপ পাবে কিনা কিংবা কখন পাবে অথবা পেলেও চুক্তিটি ভারতকে বেঁধে রাখতে পারবে কি না মার্কিন স্বার্থের সাথে, এ নিয়ে গুরুতর সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই সন্দেহের কারণ হলো, ভারত কোন দেশ বা কোন চুক্তির প্রতি নয়, তার স্বার্থের প্রতিই মাত্র আন্তরিক। ভারত তার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা চুক্তিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখবে। বিশেষজ্ঞরা একমত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারমানবিক সহযোগিতা চুক্তি ভারতের জন্যে খুবই প্রয়োজন। কারণ ভারত মনে করে, এই সহযোগিতা চুক্তির মাধ্যমে ভারত তার পারমাণবিক জ্বালানির প্রয়োজনীয় প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করতে পারবে এবং তার অর্থনৈতিক খাতকেও আরো বিকশিত করতে পারবে। কিন্তু জ্বালানি-বুভুক্ষু ভারতের জ্বালানি তৃষ্ণা শুধু এই পারমাণবিক জ্বালানি থেকে মিটবে না এবং তার জ্বালানি প্রয়োজনের ভবিষ্যত এর দ্বারা নিশ্চিতও হবে না। তাকে তার জ্বালানি প্রয়োজন মেটাতে তাই অন্য উৎসের দিকে নজর দিতে হবে এবং সে জন্যেই তাকে মার্কিন স্বার্থের জালে বাঁধা পড়লে চলবে না।

ইতোমধ্যেই ভারতের এই বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য-অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি ও পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি থাকার পরও ভারত মার্কিন মতামতকে উপেক্ষা করে স্বাধীন জ্বালানি নীতির অনুসরণ করছে। জ্বালানির সহজ ও নিরাপদ সরবহরাহকে নিশ্চিত করাকেই এখন সে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। মার্কিন বিরোধিতা উপেক্ষা করে ইরান থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে তেল আমদানির সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে তার এই মনোভাবের শক্তিশালী প্রকাশ ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণবিক সহযোগিতার দোহাই দিয়ে এবং চাপ প্রয়োগ করেও ভারতকে ইরান থেকে গ্যাস আমদানির সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারছে না। গত বছর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস ভারতকে লোভ দেখিয়ে বলেছিলেন, ভারত যদি ইরান থেকে গ্যাস আনার চিন্তা পরিত্যাগ করে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর আরোপিত পারমাণবিক সংক্রান্ত সকল নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মলফোর্ড ইরান থেকে ভারতের গ্যাস আমদানির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে হুমকি দিয়ে বলেছেন, ভারত এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করলে তাকে মার্কিনী পাল্টা ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে।' কিন্তু এই হুমকি ভারতকে তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়াতে পারেনি। ভারতের তেলমন্ত্রী মনি শংকর আয়ার পরিষ্কার বলেছেন, 'ইরানের সাথে আমাদের সম্পর্ক কোন তৃতীয়পক্ষের উদ্বেগ দ্বারা বাতিল হবে না। দুনিয়ার সকল বন্ধু

www.pathagar.com

দেশের বোঝা উচিত যে, তাদের জাতীয় উদ্বেগ আছে বটে, কিন্তু আমাদেরও জ্বালানি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা রয়েছে, জ্বালানি ছাড়া আমরা আমাদের একান্ত অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারবো না।' এর আগে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিংহ এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইসের পাশে দাঁড়িয়ে তার মুখের উপর বলে দিয়েছিলেন, "ইরানের সাথে আমাদের কোনো ধরনেরই কোনো সমস্যা নেই। আমাদের জ্বালানি খাতের জন্যে নতুন নতুন উৎস আমাদের প্রয়োজন। সুতরাং ইরানের সাথে আমাদের গ্যাস পাইপ লাইনের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।"

এটাই ভারতের রাজনীতি। তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হলে কোন দেশ, কোন চুক্তিরই তারা কোন মূল্য দেয় না। আগাম অনেক তোষণমূলক কথা বলে নিকোলাস বার্নস নয়াদিল্লী এসে দ্বিপাক্ষিক পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি চূড়ান্ত করতে বসেছেন। চুক্তি চূড়ান্ত হবে, স্বাক্ষরও হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কৌশলগত স্বার্থের যে জালে ভারতকে বাঁধতে চাচ্ছে, সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির গোটা ইতিহাস এটাই বলে যে, সে সবার কাছ থেকে স্বার্থ আদায় করেছে, কিন্তু স্বার্থ কারও জন্যে ছাড়েনি। ঠান্ডাযুদ্ধকালে ভারত তার নাম তথাকথিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে যুক্ত রেখে সোভিয়েত ব্লকের নেতা রাশিয়ার কাছ থেকে ষোল আনা স্বার্থ আদায় করেছে। আবার বড় গণতন্ত্রের সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে মার্কিন ব্লকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কোন স্বার্থ আদায়েই পিছপা হয়নি।

আজও ভারতের এটাই পররাষ্ট্রনীতি। আজকের পৃথিবীটা একমাত্রিক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর নেতা। এই হিসেব থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের টোটাল আনুগত্য আশা করছে। কিন্তু ভারতের মাথায় আছে অন্য চিন্তা। সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাটেজিক পার্টনার সাজতে গিয়ে রাশিয়া এবং উদীয়মান এক নতুন এশিয়ার শত্রু সাজতে চায় না। ২০০৫ সালের মধ্য জুলাইয়ে একটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে। সে জুলাই মাসে সাংহাইতে কাজাকস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান ও তাজিকিস্তানসহ রাশিয়া ও চীনের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়। সে বৈঠক থেকেই 'সাংহাই কো'পারেশন অর্গানাইজেশন (SCO)' নামে একটা প্ল্যাটফরমের জন্ম হয়। এই প্ল্যাটফরম জন্মের আগের কাহিনী হলো, ২০০৫ সালের ১লা জুলাই মস্কোতে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও "Declaration on the world order in the 21st Century" নামক এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণাকে "Anti-US Political Manifesto" বলা হয়ে থাকে। সংগঠনের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণায় বলা হয়, এটা 'a new security structure' to promote 'a just and rational world order based on the respect of the right of all countries to equal security' এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বলা যায় 'SCO' পাল্টা একটা world order-এর ঘোষণা দিয়েছে। ইতিমধ্যে 'SCO' সামিট পর্যবেক্ষক হিসেবে ইরান, পাকিস্তান ও ভারতকে সংস্থায় গ্রহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত এতে আহলাদে আটখানা হবার কথা এবং হয়েছেও তাই। কারণ জ্বালানি-বুভুক্ষু ভারতের জন্যে SCO-এর সদস্য হওয়া মার্কিন মৈত্রীর চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয়। কারণ রাশিয়া, মধ্য এশিয়া ও ইরান হতে যাচ্ছে একুশ শতকের জ্বালানির প্রধান উৎস। সুতরাং অন্যান্য দিক বিবেচনায় না আসলেও শুধুমাত্র তেলের কারণেই

www.pathagar.com

ভারত এশীয়মুখী নীতি গ্রহণ করবে, সেটাই স্বাভাবিক। রাশিয়ার তেল ভাণ্ডার সাখালিন তেল ক্ষেত্র থেকে পশ্চিমী কোম্পানিকে সরিয়ে দেবার পর ভারত এই তেল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই সাখালিন-১ তেলক্ষেত্রে ২০ শতাংশ শেয়ার নিয়ে ভারত প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে। এই বিনিয়োগ সাড়ে তিন বিলিয়নে উন্নীত হচ্ছে। সাখালিন-৩ তেলক্ষেত্রেও ভারত এর মধ্যেই দেড় বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে ইরান-পাকিস্তান গ্যাস পাইপলাইন মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ভারত ইতোমধ্যেই কাজাখ এলাকায় কাস্পিয়ান তেল ক্ষেত্রে রাশিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে দেড় বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। সুতরাং ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্টের পেছনে নয়, তেলের পেছনে ছুটছে। এই তেলের পেছনে ছোটার ক্ষেত্রে পুরনো বন্ধু রাশিয়াকে ভারত সাথী হিসেবে গ্রহন করেছে। রাশিয়ার মাধ্যমে চীনের সাথেও একটা ওয়ার্কিং রিলেশন গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই প্রয়াস বন্ধুত্ব পর্যন্ত না গড়ালেও সংঘাতের পরিবেশ থেকে তাদের সরিয়ে আনবে এটা ভারত মনে করছে। চীনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত খুব বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে। ভারতের গোটা অরুনাচল চীন তার ভূখণ্ড বলে দাবি করছে। অন্যান্য দাবির প্রশ্ন তো রয়েছেই। এই অবস্থায় আর্থিক ও পারমানবিক কিছু সহযোগিতা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশীপে টেনে নিতে পারবে, সে আশায় গুড়ে বালি।

সুতরাং নিকোলাস বার্নসের উক্তি 'গাছে কাঁঠাল গোফে তেল' দেয়ার মত ব্যাপার হয়েছে। ভারতকে হাতের মুঠোয় পেয়েই গেছেন ধরে নিয়ে তাকে দক্ষিণ এশিয়ার মনিবত্ব তিনি দিয়েই দিয়েছিলেন। বার্নসরা মনে করেছিলেন, ভারতের কাছে দক্ষিণ এশিয়ার মনিবত্ব বিক্রি করলেই বিনিময়ে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হয়ে যাবে এবং ইরানী গ্যাসমুখী হওয়া থেকেও সরে আসবে। বার্নসদের এই গোঁফে তেল দেয়া সফল হওয়ার মত নয় দু'টি কারণে। এক, আগেই বলেছি ভারত নিজের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কিছুই দেখে না। কোন স্বার্থই সে ছাড়ে না কারও জন্যে। মার্কিনীদের সাথে পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তিও সে চাইবে, ইরানী তেলও চাইবে এবং চাইবে SCO-এর সাথে পুরো সম্পর্ক। কিন্তু পার্টনারদের সকলের ভিন্ন ভিন্ন দাবি পূরণে ভারত সবসময় নিরাপদ দূরত্বেই থেকে যাবে এবং দুই, দক্ষিণ এশিয়ার মনিবত্ব মার্কিনীরা দিলেও ভারত তা পাবে বলে সে মনে করে না। পৃথিবী এখন খুবই ছোট। কারও উপর মনিবত্ব করে চলার সময় এটা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারছে না, ভারতও দক্ষিণ এশিয়ায় পারেনি। মনিবত্ব দূরে, নিরাপদ বন্ধুত্ব দাবি করার মত ভাল অবস্থানেও ভারত নেই। বন্ধুত্ব অন্ততঃ শুভেচ্ছার যে সমতাটুকু দাবি করে তা ভারতের নেই।

৬ জুন, ২০০৭

হিরন্ময়-সুমন সিএনএন'দের আঁতাত

মানবতাবাদী ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টির জন্যই ইসলামকে, ইসলামের পবিত্র জিহাদকে সন্ত্রাসের সাথে এক করে দেখার সুপরিকল্পিত প্রয়াস চলছে গোটা দুনিয়া জুড়ে। এরই সাথে গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনৈতিক দরগুলোকেও সন্ত্রাসী সাজাবার মত জঘন্য মিথ্যাচার চালানো হচ্ছে একই লক্ষ্যে যাতে মাঠ থেকে ইসলামের বাস্তব উপস্থিতির উচ্ছেদ সম্ভব হয়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইসলামী দল জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামীও এই নগ্ন মিথ্যাচারের শিকার। এই মিথ্যাচারে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের কিছু পত্র-পত্রিকা, কিছু মানুষ। এদের মিথ্যাচারের পেছনে রয়েছে দৃশ্যত স্থানীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক বিদ্বেষ। কিন্তু পশ্চিমী অনেক মিডিয়ার মত CNN এই মিথ্যাচারে অংশ নিয়েছে কেন? এই প্রশ্নটা তুলছি 'CNN-IBN SPECIAL' নামের একটি রিপোর্ট দেখে। 'Eye to eye with terror in Bangladesh' শীর্ষক CNN তৈরি কাহিনীতে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসী-চক্রের কেন্দ্র অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামের নামে সন্ত্রাস যারা করছে, তাদের প্রথম সারির ও উল্লেখযোগ্য প্রায় সবাই যে গ্রেফতার হয়েছে, শীর্ষ ছয় নেতার ফাঁসি হয়েছে এবং অন্যদের বিচার চলছে, এ বিষয়ে একটি কথাও বলা হয়নি CNN-IBN রিপোর্টে। এই সত্য গোপন করার সাথে সাথে চূড়ান্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে CNN ইসলামী নামের সন্ত্রাসী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও আফগান ফেরত মুজাহিদদেরকে গণতান্ত্রিক ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামীর অংশ বলে উল্লেখ করেছে। সাক্ষী হিসেবে শাহরিয়ার কবিরকে হাজির করা হয়েছে রিপোর্টে। মন্দ নয়, চোরের সাক্ষী গাইট কাটা CNN-IBN-এর জন্য এই রিপোর্টটি করেছেন Suman K. Chakrabarti মহাশয়। সুমন বাবু নাকি বাংলাদেশে ব্যাপক সফর করে এই রিপোর্ট করেছেন। কিন্তু তার রিপোর্ট নামক কাহিনীটি পড়লে ওয়াকিফহাল যে কেউ বলবেন, তিনি সম্ভবত ঢাকাও দেখেননি কিংবা দেখলেও ঢাকাকে বুঝেননি। তার রিপোর্টে বায়তুল মোকাররমের নাম আছে। কিন্তু বায়তুল মোকাররমের ভুল পরিচয় তিনি লিখেছেন। তিনি বায়তুল মোকাররমকে বলেছেন মাদরাসা এবং এই মাদরাসাকে তিনি চরমপন্থীদের লালনের জন্য অভিযুক্ত করেছেন (Over 2 lackh madrasas are there in Bangladesh, out of which the famous Baitul Mokarram in the heart of capital Dhaka is accused of harbouring radicals). সুমন বাবু যেভাবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমকে মাদরাসা বানিয়েছেন, সেভাবেই তিনি গণতান্ত্রিক দল জামায়াতে ইসলামীকে সন্ত্রাসী হরকাতুল জিহাদের সাথে এক করে দেখেছেন। তিনি যখন মসজিদ ও মাদরাসার পার্থক্য বুঝেন না, তখন তিনি কিভাবে গণতান্ত্রিক দল জামায়াতে ইসলামী ও সন্ত্রাসী সংগঠন হরকাতুল জিহাদের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝবেন! বুঝবেন না অবশ্যই। এইভাবেই গোটা দুনিয়ায় আজ ইসলামী গণতান্ত্রিক দলকে যারা ইসলামের নাম ব্যবহারকারী সন্ত্রাসী সংগঠন হারকাতুল জিহাদ বা আল-কায়েদার সাথে এক করে ফেলছেন, তারাও CNN-এ সুমন বাবুদের মতই ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝেন না বা সত্য গোপন করেন। না বুঝে বা সত্য গোপন করে তারা জামায়াতে ইসলামীর মত ইসলামী গণতান্ত্রিক দলকে সন্ত্রাসী হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে অলীক কাহিনী রচনা করে চলেছে।

এমন অলীক কাহিনী রচয়িতাদেরই আরেকজন হলেন বাবু হিরন্ময় কারলেকার। অতি সম্প্রতি তিনি 'Dhaka fails to curb Islamism' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ বিরোধী, ইসলাম বিদ্বেষী এই লোকটি এর আগে 'Bangladesh : The next Afghanistan' নামে একটি বই লিখেছিলেন। CNN-এর সুমন চক্রবর্তীর মতই এই হিরন্ময় বাবু তার বইতে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের শাহরিয়ার কবির, ভারতপন্থী হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ, আওয়ামী লীগের একশ্রেণীর রাজনীতিক এবং একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকার

www.pathagar.com

অপপ্রচারের উপর ভিত্তি করেই বাবু হিরন্ময় বইটি লিখেছিলেন। এবারের লেখাতেও তিনি পরের মুখে ঝাল খেয়ে, বিশেষ করে ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচারকে সম্বল করে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এক হাত নিয়েছেন। বাংলাদেশের কয়েকটি রেলস্টেশনে বোমা ফাটানো এবং ভারতের মক্কা মসজিদে বোমা হামলার অপরাধে বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের, আরো সবিশেষভাবে ইসলামের কেন গলা টিপে ধরছে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার, এ প্রশ্ন তুলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন বাবু হিরন্ময় কাললেকার। মনে হচ্ছে হিরন্ময় বাবু যেন দু'চোখে দেখেছেন বাংলাদেশের কেউ গিয়ে ভারতের মক্কা মসজিদে বোমা ফেলে এসেছে। ষড়যন্ত্রকারী প্রপাগান্ডিস্টরা গোয়েবলসের মত এভাবেই সত্যের মতে করে মিথ্যা বলে থাকে। এক্ষেত্রে সুমন চক্রবর্তী, হিরন্ময় বাবু ও CNNদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে এবার হিরন্ময় বাবু তার মুখোশ খুলে ষড়যন্ত্রকারীর কুৎসিত মুখ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এবার খোদ ইসলামকেই টার্গেট করেছেন (তার লেখার শিরোনাম : 'Dhaka fails to curb islamism'-ইসলামকে দমন করতে ঢাকা ব্যর্থ)। বাবু হিরন্ময় সন্ত্রাস ও ইসলামকে এক করে ফেলে খোদ ইসলামেরই কণ্ঠরোধ করার কথা বলেছেন। অলীক কাহিনী সাজিয়ে একেই প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে ইসলামকে সন্ত্রাসী বলা হয়েছে। সুমন চক্রবর্তী, বাবু হিরন্ময় কারলেকার ও CNNরা দুনিয়া জুড়ে ইসলাম ও ইসলামের জিহাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে আলো এবং কালোকে এইভাবেই এক করে ফেলার প্রয়াস চালাচ্ছেন।

সোনার পাথর বাটি একটা অলীক কথা। বাটি যদি সোনার হয়, তাহলে একে পাথর-বাটি বলা যায় না। আবার বাটি পাথরের হলে তাকে সোনার বলা যাবে না। ঠিক এই একই অবস্থা জিহাদ ও সন্ত্রাসকে নিয়ে এবং ইসলামী গণতান্ত্রিক দল ও ইসলামের নাম ব্যবহারকারী সন্ত্রাসী সংগঠনকে নিয়ে। ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাস কোনভাবেই, কোন দিক দিয়েই এক জিনিস নয়। ইসলাম মানবতাবাদী ধর্ম, আর সন্ত্রাস মানব হত্যাকরী একটা কাজ। ইসলাম বিশ্বপালক আল্লাহর অসীম করুণার এক নিয়ামত হিসেবে মানুষের শান্তি কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত করতে চায়, অন্যদিকে সন্ত্রাস কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হত্যা ও ধ্বংসলীলার মাধ্যমে মানুষের শান্তি, স্বাধীনতা হরণ করে থাকে। সুতরাং ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাস এই দুইয়ের এক হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু ইতিহাসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে দেখা হয়েছে। ইসলামকে সন্ত্রাস এবং মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিন্দুদের বাপুজী গান্ধীর মত ব্যক্তিত্বও বলেছেন "ইসলাম এমন পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যে, তার চূড়ান্ত শক্তির উৎস আগেও তরবারী ছিল, এখনও তরবারীই আছে।" এটা অতীতের কথা। কিন্তু অতীতের চেয়েও সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসের সাথে ইসলামকে সংযুক্ত করার বহুমুখী প্রয়াস আজ ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেছে। নাইন-ইলেভেনের পর গত ২০০৫ সালের ১৭ই আগস্ট দেশব্যাপী প্রায় ৫ শত বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বাংলাদেশেও তা ছোবল হেনেছে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশের উপর আপতিত এই সন্ত্রাসের সাথেও ইসলামকে যুক্ত করা হয়েছে। আজ পৃথিবীকে যে জিনিসটি অশান্ত করে তুলেছে সেটা হলো সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আর এই সন্ত্রাসের উৎস এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো

www.pathagar.com

হয়েছে ইসলামকে। এইভাবে সোনার পাথর-বাটি অলীক কল্পনা হলেও প্রচারের জোরে তাকেই সত্য বলা হচ্ছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ একেবারেই সত্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চরম অজ্ঞতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত দুরভিসন্ধি ইসলামকে বিকৃত করে তুলে ধরার মূলে কাজ করছে। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য সন্ত্রাস কি, ইসলামের জিহাদ কি তা সকলের সামনে আসা দরকার। এর সাথে আজ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে ঝড় উঠেছে, তার উৎস কি, লক্ষ্য কি এবং বাংলাদেশেও আজ হঠাৎ করে ভয়াবহ যে সন্ত্রাস মাথা তুলেছে তার মূলে আসলে কি আছে, কি তারা চাচ্ছে তাও অন্ধকার থেকে আলোতে বের হয়ে আসা উচিত।

প্রথমেই আসে সন্ত্রাসের কথা। সন্ত্রাসকে ইংরেজিতে বলা হয় 'টেররিজম' (Terrorism)। সন্ত্রাস বা টেররিজম এর সর্বসম্মত সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে না। আজকের দুনিয়ায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যোদ্ধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় একমত হতে রাজি নয়। রাজি না হওয়ার কারণ যাকে ইচ্ছা তাকে সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী সাজাবার সুযোগ উন্মুক্ত রাখা। একজন সমীক্ষক লিখেছেন, "United States reluctance to come up with a working definition for terrorism out of fears that a clear-cut definition would change the fight against terrorism from a political issue into an ethical one ... in its capacity as superpower, America does not need ethical laws restricting its ambition and targets. Rather, it wants to have spacious room for movement and maneuvering and as such keeping the definition ambiguous fits perfectly with this strategy" অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের কোন কার্যকর সংজ্ঞা নির্ধারণে গররাজী। কারণ সন্ত্রাসের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের পথে নৈতিক প্রশ্নকে বাধা হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। বৃহৎ শক্তি হিসেবে লক্ষ্য অর্জনের পথে নীতি-নৈতিকতার বেড়াজাল তার কাম্য নয়। বরং তার দরকার অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ সংজ্ঞা যাকে বারবার কৌশলের সাথে যথেচ্ছা ফিট করা যাবে।

কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা সন্ত্রাসের না থাকলেও সন্ত্রাসের সংজ্ঞা আছে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'World Book' encyclopaedia সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Terrorism is the use of threat of violence to create fear and alarm. Terrorists murder, kidnap people, set off bombs, hijack airplanes, set fires and commit other serious crimes. Common victims of terrorist kidnappings and assassinations include diplomats, business executives, political leaders, judges and police"

অর্থাৎ সন্ত্রাস হলো ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যে হিংসাত্মক কাজ সংঘটিত করা অথবা এর হুমকি প্রদান করা। সন্ত্রাসীরা হত্যা, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, বিমান হাইজ্যাক, বোমা হামলা ইত্যাদিসহ মারাত্মক অপরাধের কাজ করে। কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ও বিচারকরা সন্ত্রাসীদের হত্যা ও অপহরণের শিকার হয়। সন্ত্রাসীদের এ কাজগুলোর সবই সাংঘাতিক ধরনের অপরাধ। এই অপরাধগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়। উদ্দেশের দিক দিয়ে সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন পরিচয়ের হয়ে থাকে। World

www.pathagar.com

Bookএর মতে "লক্ষ্যের দিক থেকে সন্ত্রাসীরা (Terrorists) সাধারণ অপরাধীদের চেয়ে আলাদা হয়ে থাকে। সন্ত্রাসীরা কেউ কেউ বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী হয়, আবার অনেকে স্বাধীনতাকামী কোন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হতে পারে।" সন্ত্রাসের এই উদ্দেশ্যগত পরিচয় থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও তাদের সংগ্রামের একটা পন্থা হিসেব সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়তে পারে। একে সন্ত্রাস না বলে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ দুনিয়ার সবদেশের সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই ধরনের কর্মকাণ্ডে কমবেশি জড়িত হতে দেখা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার আজকের পশ্চিমী সহযোগীরা সন্ত্রাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের দিকটা মানতে রাজি নয়। কারণ ফিলিস্তিন, কাশ্মীরের মত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নির্বিচারে তাহলে টেররিস্ট বলা যাবে না। একটি দেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে রাজনৈতিক বা মতবাদিক কোন গ্রুপের হত্যা, অপহরণ, বোমাবাজি ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজের যে যোজন পার্থক্য রয়েছে তা মার্কিন পক্ষ মানতে চাচ্ছে না।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগী পাশ্চাত্য দেশগুলো সন্ত্রাসের নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় রাজি না হলেও সন্ত্রাসের ইতিহাসের মধ্যে এর স্বীকৃত সংজ্ঞার সুস্পষ্ট অবয়ব আমরা দেখতে পাই। Terrorism-এর প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ফরাসী বিপ্লবের সময় (১৭৮৯-১৭৯৯)। ক্ষমতা দখলকারী কিছু বিপ্লবী তখন তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আচরণের নীতি গ্রহণ করে। এই শাসনকালকে বলা হয় 'Reign of Terror'. এটা ঘটেছিল একটা 'শাসন অথরিটির' অধীনে। কিন্তু 'শাসন-অথরিটি'র বাইরে বেসরকারি পর্যায়ে রাজনৈতিক বা মতবাদিক গ্রুপের দ্বারা সন্ত্রাসের প্রথম যাত্রা শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে ১৮৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের পর এবং পুনরায় উনিশ শতকে 'কুক্ল্যাক্স ক্ল্যান' নামক একটা শ্বেতাঙ্গ গ্রুপ কৃষ্ণাঙ্গ ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী সন্ত্রাস চালায়। বিশ শতকের তিরিশের দশকে হিটলার জার্মানীতে, মুসোলিনী ইটালিতে এবং জোসেফ স্টালিন সোভিয়েট ইউনিয়নে বিরোধী পক্ষকে দমনের জন্যে হত্যা-নির্যাতন চলায়। কুক্ল্যাক্স ক্ল্যান ছিল প্রাইভেট গ্রুপ, কিন্তু এসব সন্ত্রাস চলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে বেআইনীভাবে। বিশ শতকের ষাটের দশকে সন্ত্রাসী প্রাইভেট বাহিনী 'রেড ব্রিগেড' এর উত্থান ঘটে ইটালিতে এবং 'রেড আর্মি' উত্থান ঘটে পশ্চিম জার্মানীতে। এরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। তবে সবচেয়ে জঘন্য সন্ত্রাস শুরু করে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন বিভক্তির আগে। তাদের লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিন থেকে ফিলিস্তিনীদের তাড়িয়ে দেয়া। নিজেদের স্বাধীনতা ও ভূখণ্ড রক্ষার জন্যে ফিলিস্তিনীরাও তখন বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপে সংঘবদ্ধ হয় এবং তারা এখনও লড়াই করছে। প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেদের আত্মরক্ষাকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী। এমন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্ভব ঘটে উত্তর আয়ারল্যান্ডে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে (I.R.A-Irish Republican Army)। ঠিক এমনিভাবে সত্তরের দশকে ক্যারিবিয়ান সাগরের পোর্টোরিকোতে FALN নামের স্বাধীনতা সংগ্রামী গ্রুপের উদ্ভব ঘটে আমেরিকান শাসনের বিরুদ্ধে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য বোমা হামলার ঘটনা ঘটায়।

www.pathagar.com

উপরে সন্ত্রাসের ইতিহাসে আমরা তিনটি গ্রুপের মুখোমুখি হচ্ছি। এক. রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাস যা হিটলার, মুসোলিনী ও স্ট্যালিনদের মধ্যে দেখা গেছে, দুই. আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম, যদি তার সাথে কোন সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও যুক্ত হয় এবং তিন. রাজনৈতিক ও মতবাদিক গ্রুপের বা কোন ক্রিমিনাল গ্রুপের সন্ত্রাস। পরিচয়ের দিক দিয়ে সন্ত্রাস এখানে তিনভাগে বিভক্ত হলেও অপরাধ বিচারে সন্ত্রাসের এই তিন গ্রুপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অন্যদিকে ইসলাম ও ইসলামের জিহাদ এই অপরাধমূলক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। আকৃতি, প্রকৃতি উদ্দেশ্য কোন দিক থেকেই সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের জিহাদের কোন মিল নেই।

ইসলামের জিহাদ সামনে আনার আগে ইসলাম মানুষের জীবন ও তার সমাজ-সভ্যতাকে যে দৃষ্টিতে দেখে সেটা জানা দরকার। মানব সভ্যতার ভিত্তি যা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার সর্বপ্রথম ধারা হলো এই যে, "প্রত্যেক মানুষের প্রাণ ও রক্ত পরম পবিত্র। মানুষের নাগরিক অধিকারসমূহের মধ্যে প্রথম অধিকার বেঁচে থাকার অধিকার, আর অপরাধ থেকে বাঁচতে দেয়া হলো নাগরিক কর্তব্যসমূহের মধ্যে প্রথম কর্তব্য।" আর এটাই ইসলামের প্রথম কথা মানুষের অধিকার সম্পর্কে। এরই বিধান দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কুরআনে। তাঁর বাণী, "...যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কোন একটি মানুষেরও প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই রক্ষা করলো।..." (সুরা মায়েদা, আয়াত ৩২) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কোরআনের আরেক জায়গায় বলেছেন, 'হে মুহাম্মদ, আপনি এইরূপ আহ্বান জানান যে, এসো তোমাদের প্রতিপালক কি কি বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন তা জানিয়ে দেই। তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে না। নিজেদের সন্তানদেরকে অভাব-দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করবে না। কেননা তোমাদের জীবিকা যেমন আমিই দিয়ে থাকি, তেমনি ওদের জীবিকাও আমিই দেবো। আর তোমরা অশ্লীলতার ধারেকাছেও যাবে না। মানুষের প্রাণ-সত্তাকে আল্লাহ সম্মানার্হ্য বলে ঘোষণা করেছেন। সেই প্রাণ বিনা অধিকারে হনন করবে না। তোমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্যেই আল্লাহ এসব তোমাদের দিয়েছেন।" (সুরা আনাম, ১৫১)

শুধু মানুষের জীবন রক্ষা নয়, মানুষের সহায়-সম্পদ ও সমাজকেও ইসলাম পবিত্র ঘোষণা করেছে। সমাজে, দুনিয়ায় ফেৎনা-ফাসাদ (গোলযোগ) সৃষ্টিকে হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ বলে অভিহিত করেছে আল-কুরআন। ইসলামের লক্ষ্য মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। মানুষের ইহকালীন কল্যাণের মধ্যে আইনানুগ, ন্যায়ানুগ সকল শান্তি ও স্বস্তির বিষয় শামিল রয়েছে। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর বান্দাহদের জন্যে এমন শান্তির সমাজ কায়েমের জন্যেই দুনিয়ায় এসেছিলেন। সে সমাজ তিনি কায়েমও করেছিলেন। আরবের কাসেদিয়া থেকে সানআ পর্যন্ত একটি মেয়ে একাকী ভ্রমণ করেছে, কেউ তার জান-মাল ও ইজ্জতের ওপর হামলা চালায়নি। অথচ এর ২৫ বছর আগে ইসলাম-পূর্ব যুগে বড় বড় কাফেলাও এই অঞ্চলে নির্ভয়ে চলতে পারতো না। তারপর সভ্য জগতের অর্ধেকেরও বেশি অংশ ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হলো এবং ইসলামের নৈতিক প্রভাব বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন ইসলাম মানব জাতির অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির ন্যায় হিংস্রতা ও নৃশংসতার মূলোৎপাটন করে।

মানব সমাজে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠার জন্যেই প্রয়োজন জিহাদের। জিহাদের অর্থ যুদ্ধ মাত্র নয়। মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যে লক্ষ্য তা অর্জনের জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো অর্থে জিহাদ শব্দের ব্যবহার। লেখা, কথাবার্তা ও বিভিন্ন রকম কাজের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনের সকল কর্মপ্রচেষ্টা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ জিহাদের একটি পর্যায় মাত্র। যুদ্ধ যখন আপতিত হয়, জুলুম-নির্যাতনের যখন সয়লাব নামে এবং বিপর্যয় মানুষকে, মানব-সমাজকে যখন গ্রাস করে, তখন অপরিহার্য হিসেবে মানুষকে, সমাজকে বাঁচাবার জন্যে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "যাদের উপর যুদ্ধ আপতিত হয়েছে, তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা নির্যাতিত। আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এরা সে লোক, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। ... আল্লাহ অবশ্যই সে লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ... এরা সে সব লোক, তাদেরকে আমরা যদি জমীনে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং মন্দের নিষেধ করবে।" (সুরা হজ্জ, আয়াত ৩১, ৪০, ৪১) যুদ্ধের নির্দেশ দিতে গিয়ে আল-কুরআনের আরেক জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না।..." (সুরা বাকারা, আয়াত-১৯০)

যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার উপরোক্ত আয়াতগুলোতে দেখা যাচ্ছে, তিনটি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রথম, আক্রমণের শিকার হওয়া, দ্বিতীয়, নিজ স্থান থেকে বহিষ্কৃত হওয়া, উচ্ছেদ হওয়া এবং তৃতীয়, কারও দ্বারা যদি ফেৎনা-ফাসাদের (সন্ত্রাস-গোলযোগের) সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার এই তিনটি কারণের প্রথম দুইটি আপতিত যুদ্ধকে যুদ্ধ দিয়ে মোকাবিলার নির্দেশ। আর তৃতীয়টি আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ। এই তৃতীয় কারণটি বুঝাতে আল-কুরআনে 'ফেৎনা', 'ফাসাদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরানিক পরিভাষা হিসাবে এর অর্থ বিরাট, ব্যাপক। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবেও ফেৎনার অর্থ হলো অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে দুঃখ ও অশান্তির আগুনে নিক্ষেপ করা। আর এ দিক দিয়ে ফাসাদের অর্থ ন্যায়-নীতি ও মধ্যপন্থার পরিপন্থী কাজের মাধ্যমে সামাজিক বিকৃতি ও বিপর্যয় সাধন। সুতরাং 'ফেৎনা'-'ফাসাদ' সমাজে ও মানুষের জীবনে যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে, সেটাই আজকের পরিভাষায় 'সন্ত্রাস'। ইসলামের জিহাদ এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও। সুতরাং ইসলামের জেহাদ সন্ত্রাস নয়, বরং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রকৃতি ও পরিসীমার দিক থেকে আধুনিক যুদ্ধের সাথে রয়েছে ইসলামের যুদ্ধের যোজন পার্থক্য। হিটলার মুসোলিনীর যুদ্ধ-প্রয়াস ও যুদ্ধকে সন্ত্রাস বলা হয়েছে। এদিক থেকে আধুনিক সব যুদ্ধই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে। ছোট ছোট আন্তঃরাষ্ট্র যুদ্ধ বাদ দিয়ে গ্লোবাল যুদ্ধের কথা যদি ধরি, তাহলেও দেখা যাবে এ যুদ্ধগুলোও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে যায়। ১৪৯৪ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ৬টি গ্লোবাল যুদ্ধমালা সংঘটিত হয়। ১৪৯৪ থেকে

www.pathagar.com

১৫১৬ পর্যন্ত ইটালিয়ান ও ইন্ডিয়ান ওস্যান ওয়ার, ১৫৮০ থেকে ১৬০৯ পর্যন্ত স্প্যানিশ ওয়ারস, ১৬৮৮ থেকে ১৭১৩ পর্যন্ত চতুর্দশ লুই ওয়ারস, ১৭৯২ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত ওয়ারস অব নেপোলিয়ান এবং ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ ও ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দুই বিশ্বযুদ্ধ এর মধ্যে রয়েছে। ফেৎনা, ফাসাদ থেকে মানুষকে মুক্ত করার, সমাজকে রক্ষার মত কোন মহৎ উদ্দেশ্য এই যুদ্ধগুলোর পেছনে ছিল না। ধ্বংস ও হত্যালীলার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সীমা বাড়ানো, সম্পদ লুট করা ও মানুষকে দাস বানানোই ছিল এসব যুদ্ধের লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসমূলক এসব যুদ্ধে ৮ কোটি ৫৫ লাখ লোক মারা যায়। সাড়ে ৮ কোটি মানুষের এই কুরবানী রাষ্ট্র-সন্ত্রাসের সাম্রাজ্য ও সম্পদ লালসাপূর্ণ করে, আর হরণ করে মানুষের শান্তি ও স্বাধীনতা। ১৯৪৫ সালের পরেও রাষ্ট্র সন্ত্রাসের এই যুদ্ধ এখনও চলছে। ভিয়েতনাম, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, আফগানিস্তান ও ইরাকের লাখ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে এই যুদ্ধে।

প্রকৃতি ও পরিসীমা– উভয় দিক দিয়ে এই আধুনিক যুদ্ধ থেকে ইসলামের জিহাদ সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী জিহাদের কোন আগ্রাসী লক্ষ্য থাকে না, ইসলামী জিহাদ থেকে আসা বিজয় মানুষকে দাস বানায় না। ইসলামের জিহাদ যে তিনটি ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুমতি পেয়েছে, এর দুইটা আত্মরক্ষা ও আত্মসাহায্যমূলক এবং তৃতীয়টি ফেৎনা-ফাসাদ তথ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধকালীন নীতি ও যুদ্ধ পরবর্তী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামের যুদ্ধ আধুনিক যুদ্ধ থেকে আলাদা। ইসলামের যুদ্ধ মানবিক। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তা মানুষকে রক্ষার জন্যেই। খৃষ্টান বাহিনী যখন জেরুসালেম নগরী দখল করে, তখন তারা ৭০ হাজার নারী-পুরুষকে হত্যা করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী যখন এই নগরীতে প্রবেশ করে তখন একজন নাগরিকও নিহত হয়নি। ইসলামের যুদ্ধ দেশ দখল করে না, সেখানকার মানুষকে মুক্ত করে। তাইতো মুসলমানদের সিরিয়া বিজয়ের পর একজন যাজক তার ইউরোপীয় বন্ধুকে লিখেছিলেন, "এইসব আরব যাদেরকে আল্লাহ এ যুগে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তারা আমাদের প্রভু হয়েছে। কিন্তু তারা খৃষ্টধর্মের সাথে আদৌ কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না, বরং তারা আমাদের ধর্ম রক্ষা করে, আমাদের ধর্মযাজক-সাধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আমাদের গীর্জা ও মঠে চাঁদা প্রদান করে।" ইসলাম বিজয়োত্তর মুক্ত দেশে ভেতরের কিংবা বাইরের শত্রুর হাত থেকে নাগরিকদের জীবন ও শান্তি-স্বাধীনতা হেফাজতের নির্দেশ দেয়। প্রতিরক্ষার এ দায়িত্ব পালনের জন্যে অমুসলিম নাগরিকদের (যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না) কাছ থেকে প্রতিরক্ষা ট্যাক্স বা যিযিয়া নেয়া হয়। রক্ষার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা ঘটলে ট্যাক্স অর্থ ফেরত দেয়া হয়। তদানীন্তন ইসলামী দুনিয়ার হেমস প্রদেশে মুসলিম শাসক এক অপরিহার্য পরিস্থিতিতে হেমস ত্যাগ করার সময় এই কথা বলে অমুসলিমদের যিযিয়া করের টাকা ফেরত দিয়েছিলেন, "আমরা তোমাদের হেফাজত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। যেহেতু আমরা তা পারছি না, তাই তোমাদের দেয়া ট্যাক্সের উপর আমাদের কোন অধিকার নেই।"

এমনকি যুদ্ধকালীন সময়েও মানুষের জীবন শুধু নয়, গাছ-গাছড়া ও মন্দির-গীর্জা এবং নারী-বৃদ্ধ-নাবালককেও বিশেষভাবে রক্ষার এবং সম্পদ আত্মসাৎ-অপহরণ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তার বাহিনীকে যুদ্ধযাত্রায় বলেন, "অর্থ অপহরণ করো না, তসরুপ করো না, প্রতারণা করো না। শিশুকে কিংবা বয়ঃবৃদ্ধকে কিংবা স্ত্রীলোককে হত্যা করো না। খেজুর গাছ কাটবে না বা দগ্ধ করবে না। কোন ফলের গাছ কাটবে না। গীর্জা ধ্বংস করো না, ফসল পোড়াবে না।"

আর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর যুদ্ধযাত্রাকালে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন, "যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করো না। তোমার শক্তি থাকলেও কারো অঙ্গচ্ছেদ করো না। বিজয়ী হলে বাড়াবাড়ি করো না। বৃদ্ধ ও নাবালককে হত্যা করো না, যুদ্ধের সময়ও তাদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো।"

ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে এই কিঞ্চিত আলোচনাতেও পরিষ্কার যে, ইসলামের জিহাদ সন্ত্রাস নয়, বরং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইসলামী জিহাদের একটা বড় অংশ। ইসলামের যে জিহাদ যুদ্ধ চলা অবস্থাতেও নারী, শিশু, বৃদ্ধদের হত্যা নিষিদ্ধ করেছে, মন্দির-গীর্জা ধ্বংস করতে নিষেধ করেছে, গাছ-গাছড়া পোড়ানো থেকে বিরত থাকতে বলছে, এমনকি যুদ্ধের মধ্যেও মানুষের অঙ্গচ্ছেদ সমর্থন করেনি ইসলামের যে জিহাদ– সে জিহাদকে সন্ত্রাস বলা পাগলের প্রলাপ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সে জিহাদের নাম ব্যবহার করা চরম প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই প্রতারণাই হয়েছে নাইন-ইলেভেনের ঘটনায় এবং এই প্রতারণারই পুনরাবৃত্তি ঘটনো হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার বালি, লন্ডনের সিরিজ বোমা হামলার ঘটনাবলিতে। বাংলাদেশের জেএমবিরা তাদের বোমা সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের নাম জুড়ে দিয়ে দেশের মানুষের সাথে এই প্রতারণাই করেছে এবং পৃথিবী জুড়ে করেছে ইসলামের বদনাম।

প্রশ্ন হলো, 'সোনার বাটিকে 'পাথর-বাটি' বলার এই অব্যাহত প্রতারণা কেন? সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যার যুদ্ধ, সেই ইসলামকে কেন সন্ত্রাসী সাজানো হচ্ছে, ইসলামের পবিত্র যুদ্ধকে কেন সন্ত্রাস বলা হচ্ছে। অথচ শুধু যুদ্ধ নয়, ইসলাম সব রকম চরমপন্থা পরিহার করতে বলে, সব ক্ষেত্রেই ইসলাম মধ্যমপন্থা অনুসরণ করে। কাজ-কর্ম, মামলা-মুয়ামেলাত সবক্ষেত্রে সুবিচার ও নীতিবোধকে প্রাধান্য দিতে বলে। এমনকি শত্রু কিংবা শত্রু-জাতির ক্ষেত্রেও সুবিচারকেই সিদ্ধান্তের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহার ওয়াস্তে ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনে অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।" (আল কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত-২) এই একই কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও এক জায়গায় বলছেন, "কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (আল কোরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত-৮) এই দুই আয়াতে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেউ বা কোন জাতি শত্রু হলেও, তার বা তাদের প্রতি বিদ্বেষ-শত্রুতা থাকলেও তার বা তাদের প্রতি অবিচার করা যাবে না, ন্যায়ের সীমালংঘন করা যাবে না। এই যদি হয় অবস্থা যে, শত্রুতা থাকলেও শত্রুর প্রতিও অবিচার করা যাবে না, তাহলে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে কিংবা বোমা মেরে যারা

www.pathagar.com

চেনা নয়, যারা শত্রু নয়, যাদের প্রতি বিদ্বেষও নেই, শত্রুতা নেই, এমন নারী, পুরুষ, শিশু, বিচারক, উকিল, পথচারীদের হত্যা কি করে সম্ভব? সম্ভব নয়। কোন মুসলমান এটা পারে না। কেউ যদি এটা পারে, তাহলে সে আল্লাহর কোন স্বাধীন বান্দাহ নয়। সে হতে পারে কারও বেতনভুক পুতুল। এদেরকে আল্লাহ সুবিচার বর্জনকারী, সীমালংঘনকারী বলেছেন। এদের জন্যে আল্লাহর কাছে শাস্তি বরাদ্দ আছে। সুতরাং কোন দিক দিয়েই ইসলামকে, মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসের উৎস বলা যেতে পারে না। তাহলে ঘুরে ফিরে সেই প্রশ্ন আবার আসে, ইসলামের পবিত্র জিহাদ বা খোদ সন্ত্রাসেরও বিরুদ্ধে, তাকে সন্ত্রাস, সন্ত্রাসের উৎস বলা হচ্ছে কেন?

এই প্রশ্নের জবাব গ্লোবাল পলিটিক্স এবং আধুনিক বিশ্ব রাজনীতির যুদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে পাওয়া যাবে। আজকের এই বিশ্ব রাজনীতি এক বা একাধিক বিশ্বশক্তির জন্ম দিয়েছে যার 'ওয়ার মেশিন' চালু রাখার জন্যে বিশ্বের সব জায়গায় তাদের উপস্থিতি অপরিহার্য করে তোলার জন্যে এবং বিশ্বের চারদিকে তার প্রভুত্বের ছড়ি ঘুরানোকে যৌক্তিক করার জন্যে সবসময় তার জন্যে একটি ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ দরকার। 'ভয়ঙ্কর' কম্যুনিজম-এর পতন এবং ভয়ংকর প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর আজকের বিশ্বশক্তির সামনে ভয়ঙ্কর কোন প্রতিপক্ষ থাকে না। এর ফলে তার 'ওয়ার মেশিন' অপ্রয়োজনীয় ও সংকুচিত হয়ে পড়ার উদ্বেগ দেখা দেয় এবং বিশ্বের সব জায়গায় তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা হুমকির সম্মুখীন হয়। এই অবস্থার নিরসনের জন্যেই 'ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ' হিসাবে ইসলামকে বাছাই করা হয়। বার্লিন ওয়াল ধসে পড়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিশ্ব শক্তি থেকে সাধারণ পর্যায়ে যখন নেমে আসে, সেই সময় মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যাকনামারা সিনেটের বাজেট কমিটিকে দেয়া এক অফিসিয়াল বক্তব্যে বলেছিলেন, "U.S. defense spending could safely be cut in half. It became clear the U.S. had to either undergo massive shifts in spending, a painful and unwelcome prospect for the defense establishment; or find new justification for continuing high levels of military expenditure." (The War on Islam, Envar Masud) অর্থাৎ মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট এখন খুব সহজেই অর্ধেকে কমিয়ে আনা যায়। এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, এখন হয় মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট বিপুলভাবে কমিয়ে আনতে হবে যা হবে খুবই বেদনাদায়ক ও অগ্রহণযোগ্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্যে, অন্যথায় আমাদের বিরাট রকম সামরিক ব্যয় অব্যাহত রাখার পক্ষে নতুন যুক্তি দাঁড় করতে হবে।' এই নতুন যুক্তিই হলো নতুন শত্রু, নতুন প্রতিপক্ষ। তারা নতুন প্রতিপক্ষ খুঁজতে গিয়ে বাছাই করে ইসলামকে। এনভার মাসুদ লিখেছেন, "The magnitude of U.S. defense spending fuels the search for enemies. With the collapse of the Soviet Union, the choice was between the Yellow Peril (East Asia) and the Green Peril (Islam). Islam was chosen." (The War on Islam, Envar Masud, Page-207) অর্থাৎ মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বিশাল বপুর দায়ই তাদেরকে শত্রু খুঁজতে বাধ্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দুইটি বিকল্পের দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ে। একটি হলো 'হলুদ বিপদ' মানে পূর্ব এশিয়া' অন্যটি হলো 'সবুজ বিপদ' অর্থাৎ ইসলাম। এই দুই বিপদের মধ্যে ইসলামকেই তারা প্রথম শত্রু হিসেবে বেছে নেয়।

www.pathagar.com

ইসলামকে শত্রু হিসাবে বাছাইয়ের পর প্রয়োজন দেখা দিল শত্রু হিসাবে তাকে দাঁড় করানোর। শুধু দাঁড় করানো নয়, দাঁড় করাতে হবে শত্রুর ভয়ঙ্কর রকমের ইমেজ দিয়ে। কিন্তু তখন ইসলামের ইমেজে ভয়ঙ্কর কিছু ছিল না। সন্ত্রাসের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে তারা হুমকি হওয়া তো দূরে থাক মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনার বিষয়ও ছিল না। ফিলিস্তিনের মত কিছু দেশে সন্ত্রাস বলার মত যেটুকু কাজ ছিল তা ছিল মূলতঃ পশ্চিমা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অমুসলিমদের দ্বারা যে সন্ত্রাস হতো সেটুকু সন্ত্রাসও মুসলমানদের মধ্যে সেখানে ছিল না। মৌলবাদ বা চরম পন্থা কাউকে শত্রু সাজাবার ইস্যু হতে পারে। কিন্তু এদিক থেকে মুসলমানরা এমনকি খৃস্টানদেরও পেছনে ছিল। বলা হয়েছে, "As for fundamentalism, Islam has no parallel to the U.S. Protestant Christian movement which opposed modern scientific theory. Rather, Islam has, from its birth, stressed the use of reason and logic." অর্থাৎ মৌলবাদিতার দিক থেকে ইসলাম এমনকি প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টানদের মতও গোঁড়া নয়। মার্কিন খৃস্টান প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন বিজ্ঞানের তথ্য তত্ত্বের বিরোধিতা করে। অথচ ইসলাম শুরু থেকেই রিজনিং ও লজিকের পক্ষে।

'ভয়ঙ্কর ইমেজ' তৈরির উপকরণ হিসেবেই সম্ভবত এই সময় মুসলিম দেশে কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল উইপনস (CBW) থাকার অভিযোগ উঠে। সুদান হয় প্রথম টার্গেট। তখন পর্যন্ত অবয়বহীন-অজ্ঞাত 'আল-কায়েদা এবং তার নেতা হিসাবে মার্কিনীদের সহযোগী 'বিন লাদেন'-এর কথা প্রচারিত হয়। অভিযোগ উঠে লাদেনের তত্ত্বাবধানে সুদানের 'আল শিফা' ফ্যাক্টরীতে বায়োলজিক্যাল উইপনস তৈরী হচ্ছে। অভিযোগ তুলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে সে ফ্যাক্টরী ধ্বংস করে দেয়। এই ধরনেরই অভিযোগ তোলা হয় লিবিয়ার 'তারহুনা' পাম্প স্টেশন সম্পর্কে। বলা হয় ওটা বায়োলজিক্যাল অস্ত্র উৎপাদনক্ষম একটি কেমিক্যাল প্ল্যান্ট। বলা হলো, প্রয়োজন হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে প্ল্যান্ট আণবিক বোমা মেরে ধ্বংস করে দেবে। আসলে ওটা ছিল একটা সেচ প্রকল্প। অনুরূপভাবে প্রমাণ হয় যে, সুদানের আল-শিফা ফ্যাক্টরী নিছকই একটা ওষুধ ফ্যাক্টরী ছিল। New York Times-এর বরাত দিয়ে লিখা হয়, "Hours after they launched cruise missile at the factory on August 20, senior national security advisers described Al-Shifa as a secret chemical weapons factory financed by Bin Laden. But now, says the New York Times, State Department and CIA officials argue that the government cannot justify its actions." ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ৮ দিন পর New York Times লিখে "The plant made both medicine and... drugs according to U.S. and European engineers and consultants who helped build, design and supply the plant."

এসব ঘটনায় 'ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ' দাঁড় করাতে ব্যর্থ হবার পর নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ঘটে। অকল্পনীয় ও ভয়ঙ্কর এই ঘটনার দায় 'আল-কায়েদা' ও 'লাদেন'-এর উপর চাপানো হয় এবং তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। অথচ আল-কায়েদা ও লাদেনকে না মুসলিম দুনিয়ার কেউ চেনে, তা তারা

www.pathagar.com

ইসলামের কেউ। কিন্তু এদেরকেই ইসলাম ও মুসলমানদের সিম্বল হিসেবে সামনে রেখে নাইন-ইলেভেনের ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য আকাঙ্ক্ষিত 'ভয়ঙ্কর শত্রু বা প্রতিপক্ষ' রূপে ইসলাম ও মুসলমানদের দাঁড় করানো হয়। শুরু হয় 'War on Terror'.

এবার বাংলাদেশের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে আসা যায়। সুমন চক্রবর্তী বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি বলেছেন। দেখা যাক এই উক্তির পেছনের ইতিহাস কি। বলা যায়, বাংলাদেশের ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলা এবং তার পরবর্তী আত্মঘাতী ও রক্তাক্ত বোমা হামলার ঘটনাসমূহ নাই-ইলেভেন ঘটনারই অনুরূপ। নাইন-ইলেভেনের মতই একটা অপরিচিত, অদৃশ্য, অজ্ঞাত ইসলাম নামের সংগঠনের দ্বারা এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং একইভাবে ইসলামকে খুনি ও বর্বর ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করা এবং ইসলাম শিক্ষার প্রধান উৎস মাদরাসাকে সন্ত্রাসের ক্ষেত্র হিসাবে অভিহিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এক শ্রেণীর পত্রপত্রিকা এবং সুমন চক্রবর্তী ও হিরন্ময় বাবুদের মত বাংলাদেশেরও এক শ্রেণীর মানুষ অব্যাহতভাবে এই অভিযোগ তুলছে। অথচ উপরে ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাস-এর আলোচনায় আমরা দেখেছি ইসলামী কোন সংগঠন এবং ইসলামপন্থী কোন ব্যক্তি বা শক্তিরা এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে না। এই ধরনের ঘটনা তারাই ঘটাতে পারে যারা রাষ্ট্র ও সরকারকে ব্যর্থ করে দেশকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে চায়, যারা বিকাশমান গণতন্ত্রকে ব্যর্থ করতে চায়, যারা দেশ ও জনগণের আদর্শিক প্রতিরক্ষা ধ্বংস করার জন্য ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের খুনি, সন্ত্রাসী হিসাবে দেখাতে চায়। তারাই কিছু অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত ও বেকার কিছু অল্প বয়স্ক ছেলেকে ও বিপথগামী কিছু মানুষকে ইসলামের পোশাক পরিয়ে দেশে একই দিনে একই সময়ে প্রায় ৫ শতাধিক বোমা ফাটায় এবং এরাই দেশের বিচারক ও বিচারালয়ের উপর বোমা হামলা করে। ভারতের আধ্যাত্মিক নেতা মিঃ গান্ধী বলেছেন, "The spirit of democracy cannot be established in the midst terrorism, whether governmental or popular'. অর্থাৎ সন্ত্রাসের মাঝে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন, 'The administration of justice is the firment pillar of the government.' অর্থাৎ বিচার বিভাগই হচ্ছে সরকারের সবচেয়ে সুদৃঢ় স্তম্ভ।' বাংলাদেশে এই গণতন্ত্র এবং এই বিচারবিভাগকেই টার্গেট করা হয়। দেশকে বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করাই এদের টার্গেট। কোন ইসলামী চরিত্রের মানুষের পক্ষে তার দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে এই অপরাধ করা সম্ভব নয়। এই সন্ত্রাসীরা ইসলামের তো কেউ নয়ই, দেশেরও কেউ নয়। কলামিস্ট ফরহাদ মাজহার সত্যিই লিখেছেন, বিদেশী হাত এর সাথে জড়িত। তার ভাষায়, "যারাই নিরাপত্তা, যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধ কৌশল নিয়ে পড়াশোনা করেন ও খোঁজ-খবর রাখেন, তারা জানেন যে, নাম না জানা যে সব ইসলামী দল, যাদের আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, তাদের হাতে যখন বোমা-বারুদ চলে আসে, তখন সাধারণভাবে বুঝতে হবে এটা ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কাজ। এটা সাধারণ প্যাটার্ন। ইসলামী জঙ্গীদের সাথে ইসরাইল-ভারত-মার্কিন নিরাপত্তা আঁতাতের কারণে উপমহাদেশে নব্বই দশকের শেষ বছরগুলো থেকে এ ধরনের তৎপরতা আমরা বাংলাদেশে লক্ষ্য করছি। ইসরাইল জানে যে, আরবদের মধ্যে ইসরাইলকে টিকিয়ে রাখা ও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে আরব ও ইসলাম সম্পর্কে

www.pathagar.com

বিশ্বে ভাবমূর্তি নষ্ট করার উপর। অর্থাৎ প্রমাণ করতে হবে, ইসলাম মাত্রই একটি বর্বর ধর্ম, এরা নির্বিচারে বোমাবাজি করে, নিরীহ মানুষ হত্যা করে।' মুসলমান সন্তানরা শিশু বয়স থেকেই অন্যদের ঘৃণা করতে শেখে এবং মাদরাসায় গিয়ে তারা জিহাদী হয়ে বেরিয়ে আসে।' এবারের বোমা হামলার পরপরই গণমাধ্যমগুলোর উৎকট চিৎকারের মধ্যে আমরা এই ইসরাইলী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের প্রচারণাই মূলতঃ আমরা দেখেছি।"

ফরহাদ মাজহার ঘটনার প্যাটার্ন এবং টার্গেট প্যাটার্ন দেখে এই অনুমান করেছেন। কিন্তু এটা অনুমান নয়, এটাই সত্য। একই ধরনের ঘটনা ও টার্গেট প্যাটার্নে সংঘটিত নাইন-ইলেভেনের ঘটনার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। কিন্তু হিমালয় সমান প্রচার-প্রপাগাণ্ডার আড়ালে আসল সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছে, তবু এটাই সত্য হয়ে থাকবে যে, নাইন-ইলেভেনের ঘটনাও ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ও তার সহযোগীদেরই কাজ। এ সম্পর্কে Enver Masud মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া থেকে প্রকাশিত তার গ্রন্থ "The War on Islam"-এ লিখেছেন, "On the day of the attack on America, the Washington Times quoted a paper by the Army School of Advanced Military Studies which said that the MOSSAD, the Israeli Intelligence Service, 'has the capability to target U.S. forces and make it a Palestinian/Arab act.' This, coupled with arrest in the U.S. of dozens of suspected Israeli spies and reports that several of the alleged hijackers that struck the World Trade Center were still alive, fuelled alternative theories."

অর্থাৎ যেদিন আমেরিকা আক্রান্ত হয়েছিল ঐদিন 'ওয়াশিংটন টাইমস' পত্রিকা 'আর্মি স্কুল অব এ্যাডভান্সড মিলিটারী স্টাডিজ'-এর বরাত দিয়ে ছাপা একটি নিউজে বলেছিল, ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-এর শুধু মার্কিন সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করা এবং একে ফিলিস্তিনী অথবা আরবদের কাজ বলে চালিয়ে দেয়ার যোগ্যতা রয়েছে। এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক ডজন ইসরাইলী গোয়েন্দা গ্রেফতার হওয়ারও খবর রয়েছে। কিন্তু এ খবর এবং খবর প্রকাশের কণ্ঠ মার্কিন ও বিশ্ব মিডিয়ার পরিকল্পিত কোরামের মধ্যে সকলের কানে পৌঁছেনি। কিন্তু এই সত্য চর্চা বন্ধ হয়নি। একদিন এই সত্যই সকল মিথ্যার উপর মাথা তুলে দাঁড়াবে।

ফরহাদ মাজহার ইসরাইলী-ভারতীয় উদ্দেশ্যের পক্ষে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উৎকট চিৎকারের কথা বলেছেন। এই উৎকট চিৎকার শুধু আমাদের গণমাধ্যম নয়, গোটা বিশ্বের গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই চিৎকার। ভারতের গণমাধ্যম ও জননেতারা এইভাবে চিৎকার শুরু করে যে জিহাদীরা যেন বাংলাদেশ গিলে ফেলেছে এবং ভারতকেও গিলে ফেলতে অগ্রসর হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাংলাদেশ পরিস্থিতিকে ভারতের জন্য 'থ্রেট' হিসাবে অভিহিত করে। গোটা এই প্রচারণা অপরিকল্পিত নয়, ঘটনার মতই পরিকল্পিত। এই ঘটনার সাথে উপমহাদেশের আরেকটা ঘটনার হুবহু মিল পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর দয়ানন্দ সরাস্বতি প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ-এর একজন নেতা এবং ভারতের 'শুদ্ধি আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। একজন মুসলমান এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেফতার হয়। শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে ইসলাম বিরোধীরা এ ঘটনার জন্যে গোটা মুসলিম জাতিকে এবং ইসলামের মূল আদর্শকেই দায়ী করতে আরম্ভ করে।

www.pathagar.com

তারা এমনকি আল-কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, কুরআনের শিক্ষাই মুসলমানদের হিংস্র করে তোলে এবং তা সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সহাবস্থানের পরিপন্থী। এমনও প্রচার চলে যে, পৃথিবীতে যতদিন কুরআনের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সে সময়ের পত্র-পত্রিকাগুলোই এই অপপ্রচারের সূচনা এবং মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। তারা মানুষকে উস্কে দেবার জন্য বলে, ঘাতক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আপন ধর্মের শত্রু মনে করেই হত্যা করেছে এবং উক্ত সৎ কাজ দ্বারা সে বেহেশত পাওয়ার আশা করে। আজ আমাদের গণমাধ্যমের একটা বড় অংশ উৎসাহের সাথে কমবেশি এই প্রচারণাই চালায়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তখন পত্র-পত্রিকা ছিল হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে, আর এখানে গণমাধ্যম মুসলমানদের নিজেদেরই। ফরহাদ মাজহারের কথাই ঠিক, বাংলাদেশে অব্যাহত বোমা হামলার ঘটনা যে ষড়যন্ত্রের ফল, আমাদের গণমাধ্যমের ঐ অংশটি সে ষড়যন্ত্রেরই শিকার।

এই ষড়যন্ত্র অনেকদিনের এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল। বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী মৌলবাদী রাষ্ট্র অভিহিত করে অব্যাহত প্রচার চালিয়ে আসা হয়েছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সফর উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সরকার 'Democracy versus Religious Fundamentalism' নামে একটি বই প্রকাশ করে। এতে বিএনপির সাথে তালেবানদের সম্পর্ক ও বাংলাদেশে তালেবানরা সক্রিয়া থাকার কথা বলা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হবার পর আওয়ামী মহলের এই প্রচারণা তুঙ্গে উঠে। তারা কলকাতা, লন্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে সংঘবদ্ধ ও অব্যাহত অপপ্রচার চালায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। এই অপপ্রচারের মূল কথা ছিল, বাংলাদেশ জঙ্গি মুসলমানদের দেশ। এদেশ তালেবান ও আল-কায়েদাদের চারণভূমি। বাংলাদেশে মানবাধিকার বলতে কিছু নেই। এদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কচুকাটা করা হচ্ছে, উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সম্ভ্রম কেড়ে নেয়া হচ্ছে নারীদের আর তাদের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে দেশ। একটা অদৃশ্য শক্তির ব্যবস্থাপনায় এই অপপ্রচারে অংশ নেন বৃটেনের চ্যানেল-৪ টেলিভিশন, টাইমস ম্যাগাজিন, ফারইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ এবং আওয়ামী লীগও। যারা ইকনমিক রিভিউতে বার্টিল লিন্টনারের রিপোর্ট 'Bangladesh : A Cocoon of Terror', টাইম ম্যাগাজিনে আলেক্স পেরীর 'Deadly Cargo' চ্যানেল-৪-এর জাইবা মারিক ও লিও পোল্ড-এর সাজানো রিপোর্ট তৈরির কাহিনী এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের 'বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ২০০১' ও বাংলাদেশ প্রোট্রেইট অব কভার্ট জেনোসাইড' পড়েছেন, তারা জানেন, এই অপপ্রচার কত জঘন্য, কত ষড়যন্ত্রমূলক। হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ২০০১' শীর্ষক ১৫৬ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিনে যে প্রচ্ছদ আঁকা হয়েছে তাতেই পরিষ্কার বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে তারা কি জঘন্য দৃষ্টিতে দেখে। প্রচ্ছদে উপরের এক পাশে একটি ধর্ষিতা হিন্দু মেয়ের ছবি এবং ডানপাশে এক বৌদ্ধের মৃতদেহ। প্রচ্ছদের ঠিক মাঝখানে দাড়ি-টুপিসহ কয়েকজন বাংলাদেশী মুসলিমের ছবি এবং নিচে লিখা রয়েছে 'বি অয়ার অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশের ব্যাপারে সাবধান)। এর বামে লেখা রয়েছে 'এ কোকুন অব টেরর' (সন্ত্রাসের আবাসস্থল)। প্রচ্ছদের নিচের অংশে রয়েছে একটি মিছিলের ছবি যার মাঝখানে লাদেনের ছবি জুড়ে দিয়ে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে 'প্রো বিন লাদেন র‍্যালি ইন ঢাকা'। এই প্রচ্ছদে বাংলাদেশের এমন ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যার দাবি ছিল

www.pathagar.com

আমেরিকা ঠিক আফগানিস্তানের মত বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড় ক। কিন্তু তা হয়নি। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যেমন সে সময় বাংলাদেশকে 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি' বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট বুশও তাই বলছেন।

এই পরিস্থিতিতেই অজানা-অচেনা জামায়াতুল মুজাহেদীনের আবির্ভাব এবং ১৭ই আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ জুড়ে প্রায় ৫শ বোমার বিস্ফোরণ। বলা যায়, বাংলাদেশ বিরোধী সব প্রচার ব্যর্থ হবার পর খোদ ষড়যন্ত্রকারীরাই বাংলাদেশে তালেবানী কর্মকাণ্ড শুরু করেছে যাতে হাতে-কলমে তাদের এতদিন ধরে তোলা অভিযোগের প্রমাণ হাজির করা যায় বিশ্ববাসীর কাছে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা কারা, সেটা বলার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হলো সরকার। তবে সাদা চোখে যেটা দেখা যাচ্ছে এবং সাধারণভাবেই যেটা বলা যায়, সেটা হলো, বাংলাদেশে সন্ত্রাসী ঘটনাবলীসহ বাংলাদেশ বিরোধী উপরোক্ত সব প্রচারের বেনিফিসিয়ারী হলো আওয়ামী লীগ এবং তাদের মিত্রশক্তি। কারণ, সরকারকে বিব্রত করতে পারাতেই ছিল আওয়ামী লীগের লাভ, সরকারকে দুর্বল করতে পারাই ছিল আওয়ামী লীগের লাভ, জোট ভাঙতে পারাতেও ছিল আওয়ামী লীগের লাভ এবং 'মৌলবাদী', 'সন্ত্রাসী', 'জিহাদী' নামের মোড়কে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দল, আলেম-ওলামা, মাদরাসা-মক্তব ইত্যাদি যদি নির্মূল করা যায়, কমপক্ষে যদি মাটিতে শুইয়ে দেয়া যায়, তাহলে আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্রশক্তি উভয়েরই মহালাভ। তাদের এই মহালাভের বলি হচ্ছে কিছু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত ও বেকার কিশোর এবং বিপথগামী ও পুতুল কিছু মানুষ। কম্যুনিস্টরাও একদিন এই 'এজ গ্রুপ'কে টার্গেট করে তাদের সর্বনাশ করেছিল। তারই পুনরাবৃত্তি আজ ঘটছে। তবে কম্যুনিস্টদের বিভ্রান্তি কাটতে দেরি হয়েছিল। এদের দেরি হবে না। শীঘ্রই ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে পড়ে যাবে।

এটা ঘটছে। প্রায় সহস্রের মত সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে, তাদের আড্ডাসমূহ ধ্বংস হয়েছে, শীর্ষ ৬ জন সন্ত্রাসীর ফাঁসিও হয়েছে। অনেকের কারাদণ্ড হয়েছে। অন্যদের বিচার চলছে। পাকড়াও অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু নাটের গুরু ষড়যন্ত্রকারীরা চিহ্নিত না হলে বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। সুমন চক্রবর্তী, সিএনএন'দের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। এরাই বাংলাদেশে জেএমবি, হুজি সন্ত্রাসীদের স্রষ্টা। এরাই কোটি কোটি টাকা খরচ করে দুনিয়াব্যাপী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এদের অবশ্যই চিহ্নিত করা এবং জাতিকে তা অবহিত করা প্রয়োজন। এই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা জনগণকে সাথে নিয়েই করতে হবে। এ জন্যে জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, "I am a firm believer in the people. If given the truth, they can be depended upon to meet any national crisis. The great point is to bring the real fact." অর্থাৎ আমি জনগণে বিশ্বাসী। যদি সত্য তাদের জানানো হয়, তাহলে যে কোন সংকট মোকাবিলায় তাদের উপর নির্ভর করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আসল ঘটনা তাদের জানতে হবে।' আব্রাহাম লিংকন যেটা বলেছেন, জনগণকে আস্থায় নেয়ার সেই কাজটা কিন্তু আমাদের মত দেশে কম হয়। ছোট দেশগুলো নানা কারণে অনেক কথা প্রকাশ করে না, করতে পারে না, এটা একটা বড় সত্য। কিন্তু অস্তিত্বেই যখন আঘাত এসে যায়, তখন কোন কিছুকে আর ভয় করার, সমীহ করার অবকাশ থাকে না। মনে হয় আমরা সে অবস্থায় পৌঁছে গেছি। সব প্রকাশ করে জাতিকে আস্থায় নেয়া এখন উচিত। Edmund Burks-এর একটি

www.pathagar.com

বিখ্যাত উক্তি : The people never give their liberties, but under some elusion. অর্থাৎ একমাত্র চরম বিভ্রান্তির মধ্যেই কেবল জনগণ তাদের স্বাধীনতা পরিত্যাগ করতে পারে। সত্য জানার অভাবেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সত্য গোপন করে ও মিথ্যাচার চালিয়ে সুমন চক্রবর্তী ও CNN-রা আমাদের জনগণের মধ্যে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই চেষ্টা করছে। জনগণের মধ্যে কিছুতেই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে দেয়া যাবে না।

৯ জুন, ২০০৭

ওরা বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দেখতে চায়

দেশের একজন শীর্ষ রাজনীতিক ও আইনজীবী ড. কামাল হোসেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বরিশালের আগলঝড়া উপজেলার আস্কারা গ্রামে গিয়েছিলেন একজন ধর্ষিতা হিন্দু কিশোরীকে দেখার জন্যে। অনেক পত্রিকায় নিউজটি সচিত্র ছাপা হয়েছে। প্রথম আলোর হেডিং 'বরিশালে ধর্ষিতার বাড়িতে ড. কামাল হোসেন ও সুলতানা কামাল।' আর ইত্তেফাকের হেডিংটা হলো 'আগলঝড়ায় নিরাপত্তাহীন মানুষের মাঝে ড. কামাল ও সুলতানা কামাল।' ঘটনা হিসেবে এটা নতুন কিছু নয়। নিউজ হিসেবেও এ ধরনের খবরের এটা প্রথম প্রকাশ নয়, সেই কারণে নতুনও নয়। নতুন হলো আড়াইশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ঢাকা থেকে ড. কামাল হোসেন ও সুলতানা কামাল এবং বরিশাল থেকে বরিশাল আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মানবেন্দ্র বটব্যাল, বরিশাল আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি দীলিপ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক মাসউদ বাবলু, দৈনিক সমকালের সিনিয়ার সহকারী সম্পাদক অজয়দাস গুপ্ত, যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক সোহরাব হাসান প্রমুখের বরিশালের অজপাড়া গ্রাম আস্কারায় গমন। গমনটা নতুন এই কারণে যে, ঢাকা মহানগরীতে এবং এর অতি কাছের জেলাগুলোতেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ড. কামাল হোসেনকে এইভাবে সদলবলে বা এককভাবে সেখানে যেতে দেখা যায়নি। তবে যাওয়াটায় দোষ নেই। অতি সহানুভূতিপ্রবণ হয়েই তিনি দলবল নিয়ে সেখানে গেছেন। সহানুভূতি যখন জাগ্রত হয়েছে, তখন তা প্রদর্শনের জন্যে তিনি অতঃপর সকল জায়গাতেই যাবেন। এইখানে কথা শেষ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু শেষ করা যাচ্ছে না। কারণ তিনি শুধু সহানুভূতি প্রকাশ, অপরাধীর পাকড়াও ও বিচারের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। ঘটনাকে তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। শুধু দেখেননি, বলেছেনও যে, ২০০১ সাল থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সব ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন।' অর্থাৎ তিনি আস্কারা গ্রামের ঘটনাকে সংখ্যালঘু নির্যাতন হিসেবে ধরে নিয়েছেন। অথচ ইত্তেফাকের খবর বলছে, ড. কামাল হোসেন যাওয়ার খবর পেয়ে ঐ গ্রামের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ড. কামালকে ঘিরে ধরে বলেন, 'ঘটনা কোন সংখ্যালঘু নির্যাতন নয়। পারিবারিক দ্বন্দ্বের ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে যেন ব্যবহার করা না হয়।' কিন্তু ড. কামাল হোসেন গ্রামবাসীর এ কথার প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেছেন বলে মনে হয়নি। কর্ণপাত করতে পারেননি সম্ভবতঃ এই কারণেই যে, ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে না পারলে আড়াইশ' কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে নৌকা চড়ে, পায়ে হেঁটে আস্কারা গ্রামে যাওয়ার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়ে যায়। তার এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব না থাকলে তিনি দেখতে পেতেন গ্রামের শীর্ষ কয়েকজন ব্যক্তি যা বলেছিলেন, সেটাই সত্য। ঘটনার উপর ইত্তেফাক যে রিপোর্ট করেছে, তা থেকে গ্রামবাসীর কথারই সত্যতা মিলে। গ্রামের ২০ ঘর হিন্দুর মধ্যে একজন মুসলমান ঘর তোলে এটা নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত। এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও হয়। এরই পরিণতিতে ঘটনাটি ঘটে। বিরোধ জমি-জমা নিয়ে, কিন্তু সেটাকেই অবশেষে সাম্প্রদায়িক বিরোধে রূপ দেয়া হয়েছে এবং একেই ষোলকলায় পূর্ণ করার জন্য ড. কামালরা ঢাকা থেকে ছুটে গেছেন বরিশালের গ্রামটিতে।

পারিবারিক ও জমি-জমা ঘটিত বিরোধকে এইভাবে সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার প্রয়াস তীব্রতর হয়েছে ২০০১ সালের পর থেকে ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ বিজয়ী চারদলীয় জোট সরকারের উপর প্রতিশোধ হিসেবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্লোগানকে একটা ট্রাম-কার্ড হিসেবে সামনে নিয়ে আসে। এই অস্ত্র প্রয়োগের প্রধান বাহন হিসেবে এগিয়ে আসে তথাকথিত হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান পরিষদ। প্রতি মাসে তারা বুলেটিন জাতীয় একটা বিবরণী বের করত। তাতে গোটা দেশে হিন্দুদের বাড়িতে চুরি-ডাকাতির যে ঘটনা ঘটত, হিন্দুদের সাথে মুসলিম প্রতিবেশীদের ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, মামলা-মোকদ্দমার যে ঘটনা সংঘটিত হতো, সে সবকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা হিসেবে মাসিক বুলেটিনটিতে সন্নিবেশিত করা হতো। এই বুলেটিনগুলোকেই গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হতো বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রমাণ হিসেবে। আস্কারা গ্রামে ড. কামাল হোসেনদের যাওয়া এবং সেখানে তাদের তৎপরতার অনেক ছবি তোলা হয়েছে, কিছু ছবি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। এই সব ছবি সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পাঠিয়ে দেয়া হবে ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী ভারতীয় প্রপাগাণ্ডা মিশনের খোরাক হিসেবে। তার মানে এই সাথে প্রেরিত হবে ড. কামাল হোসেনের দেয়া সার্টিফিকেট যে, ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন সাংঘাতিক বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ে যে ভিত্তিহীন প্রপাগাণ্ডা ভারত অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, ড. কামাল হোসেনরা তারই অংশ হিসেবে কাজ করছেন, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিষয়ে ড. কামালরা যা বলেন, সীমান্তের ওপারে তা প্রতিধ্বনিত হয়, আবার ওপারে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে যা বলা হয় ড. কামাল হোসেনরা তার প্রতিধ্বনি করেন। এই সেদিন গত ৫ই জুন ভারতের জনৈক ডঃ আনন্দ কুমার তার নিবন্ধে লিখলেন, 'Minorities in Bangladesh have been under the attack of Islamic forces ... Unfortunately, this does not appear to be on the agenda of the care-taker government. As a result of this, a systematic disossesion and eviction of minorities has been going in Bangladesh." (Paper No. 2262, e-mail: anandkrai@yahoo.com.in) অর্থাৎ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা ইসলামপন্থীদের আক্রমণের শিকার হয়ে আসছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এজেন্ডায় এই বিষয়টা নেই। ফলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা অব্যাহতভাবে তাদের সম্পদ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ও উচ্ছেদের শিকার হয়ে আসছে।' এই কথা ভারত থেকে আনন্দ কুমার বলেছিলেন ৫ই জুন তারিখে, আর ড. কামালরা আনন্দ কুমারের এই কথা প্রমাণ করার জন্যে আড়াইশ' কিলোমিটার অতিক্রম করে বরিশালের এক হিন্দু

www.pathagar.com

পরিবারের বাড়ি গেলেন সদলবলে সাংবাদিকদের নিয়ে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের কতবড় ঘটনা ঘটলে ড. কামাল হোসেনের মত লোক, যার এক ঘণ্টার মূল্য হাজার হাজার টাকা, বরিশালের অজপাড়া গাঁয়ে ছুটে যেতে পারেন– ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রপাগান্ডিস্টদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া ছোট ঘটনা নয়।

এই রকমের আরেক ড. কামাল হোসেন হলেন প্রফেসর আবুল বারাকাত। আবুল বারাকাত 'Deprivation of Affected Million Families : Living with Vested Property in Bangladesh' শীর্ষক একটি পেপার তৈরি করেছেন। এই পেপারে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের রেখে যাওয়া 'শত্রু সম্পত্তি', পরে 'অর্পিত সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ, কারা, কিভাবে লুট করেছে, এসব বিষয়ে কল্পকথা রচনা করেছেন। কল্পকথা হলে কি হবে, যে উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন, সে উদ্দেশ্য খুবই সার্থক হয়েছে। তার পেপারটি বাংলাদেশে এখনও প্রকাশ না হলেও সীমান্তের ওপারে কিন্তু পৌঁছে গেছে। তারা এ কল্পকথাকে সত্যের মুখোশ পরিয়ে ব্যবহারও করছে। আনন্দ কুমার তার ৫ই জুনের নিবন্ধে লিখেছেন, 'Professor Barakat in his research paper says that nearly two lack Hindu families lost 1.22 lack bighass of land, including their houses in past six years. The study has found that the land of minority Hindus during the reign of the BNP led alliance government between 2001 and 2006 has been 'grabbed' by politically powerful people." অর্থাৎ প্রফেসর বারাকাত গবেষণাপত্রে বলছেন, প্রায় দুই লাখ হিন্দু পরিবার তাদের বাড়িঘর সমেত প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার বিঘা জমি হারিয়েছে গত ছয় বছরে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে ২০০১ থেকে ২০০৬-এর মধ্যে হিন্দুদের ঐ জমি-জমা রাজনৈতিক ক্ষমতাবানরা দখল করে নিয়েছে।' আনন্দ কুমার বাবুর এই বক্তব্য প্রফেসর আবুল বারাকাতেরই কথা। ড. কামালের কথারও প্রতিধ্বনি আনন্দ কুমারের কথা। ড. কামাল বলেন, ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার শাসনের শুরু থেকেই সংখ্যালঘু নির্যাতন শুরু হয়। আনন্দ কুমারও এই কথা বলছেন তার নিবন্ধে এই ভাষায়, "Hindu families met with more incidents of violence and repression in the immediate past five years of the BNP-Jamaat coalition government than in the previous five years of Awami League government." অর্থাৎ অতি সম্প্রতি শেষ হওয়া বিএনপি-জামায়াত সরকারের পাঁচ বছরে আগের আওয়ামী সরকারের পাঁচ বছরের চাইতে অনেক বেশী সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়েছে। আনন্দ কুমারের এই বক্তব্য আসলে ড. কামালদেরই বক্তব্য। ড. কামাল হোসেন ও আবুল বারাকাতরা এ দেশের নাগরিক হয়ে, এ দেশের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে এ দেশের যে বদনাম করছেন এবং আনন্দ কুমারদের মত প্রপাগান্ডিস্টদের হাতে দেশকে সংকটে ফেলবার যে তথ্য তুলে দিচ্ছেন, সে বদনাম ও সে তথ্যকে নিরপেক্ষ ও অনুসন্ধানী বিদেশীরাও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন। ২০০১ সালের অক্টোবরে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ড. কামালদের তরফ থেকেই বাংলাদেশে ব্যাপক সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। এরই প্রেক্ষিতে মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে নিউইয়র্কস্থ জন জে কলেজ অব ক্রিমিনাল জাস্টিসের অধ্যাপক ও মার্কিন অপরাধ ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ম্যাকেল গোমেজ সরেজমিন তদন্তের জন্য বাংলাদেশে আসেন।

www.pathagar.com

২৫ দিন ধরে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে বিশেষ করে অভিযোগের স্পটগুলোতে ব্যাপক সফর করেন এবং তার ভিত্তিতে গবেষণা রিপোর্ট তিনি তৈরি করেন। তিনি রিপোর্টের সার সংক্ষেপ হিসেবে লিখেন, "২৫ দিন অবস্থানকালে আমি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের সাথে কথা বলি। আমি বরিশাল, পটুয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, ঋষিপুর, খুলনা, যশোর, কুমিল্লা, চান্দিনা, ইকরাশি, হাসনাবাদ, দোহার, কালিগঞ্জ, আড়িখোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম– ওইসব শহর এবং গ্রামে গিয়েছি। নির্যাতিত হিসেবে প্রচারিত হিন্দু, খৃস্টান এবং বৌদ্ধ পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছে এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য উদ্ধারই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি আদৌ সত্য কিনা, না কি তা অতিরঞ্জিত– সেটাই ছিল মুখ্য। তাদের বেশিরভাগ কথোপকথনই আমি ভিডিও টেপে ধারণ করি। ছবিও তুলি অনেকের। তাদের কেউই খুন, ধর্ষণ, আঘাত, বাড়িঘরে আগুন দেয়া কিংবা লুটতরাজের মত বড় কোন ঘটনার কথা বলেননি, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে। তাদের বক্তব্য থেকে আমার যা মনে হয়েছে তা হলো নাম ধরে ডেকে বাড়িতে ঢিল-পাটকেল ছোঁড়া, জমি সংক্রান্ত বিবাদ, ব্যক্তিগত বিরোধ, ব্যবসায়িক কোন্দল, আগে থেকে চলে আসা বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি (যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনও লোকের মধ্যে সংঘটনযোগ্য) ঘটনাকেই সংখ্যালঘু নির্যাতন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। বিশেষ করে এ জাতীয় ঘটনা যখন কোনও মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, তখনই এটাকে ধর্মীয় নির্যাতন এবং সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের নামে অতিরঞ্জন করা হয়েছে।" (মানবজমিন, ২ সেপ্টেম্বর, ০২) একজন বিদেশীর এই সরেজমিন রিপোর্ট আমাদের স্বদেশী ড. কামাল হোসেনরা পড়েছেন বলে মনে হয় না। পড়লে তাদের মধ্যে নিশ্চিতই লজ্জাবোধের সৃষ্টি হতো এবং আড়াইশ' কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে তিনি নাটক করার জন্যে বরিশালের আস্কারা গ্রাম পর্যন্ত যেতেন না। সম্ভবত বছর খানেক আগে, একজন মার্কিন কংগ্রেসম্যান বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের শত্রু বাংলাদেশীরাই।' তার মতে বাংলাদেশীরাই বাংলাদেশের বদনাম করে। বাংলাদেশীরাই যে বাংলাদেশের বদনাম করে, তার আরও দু'একটা বেদনাদায়ক উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি।

১৯৯২ সালের ১৮ই এপ্রিল হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধ ঐক্যপরিষদের নরসিংদী জনসভা, পরে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন হলে তারা বলেন, "অত্যাচারের মুখে তিন কোটি সংখ্যালঘু প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পালিয়ে গেছেন।" শেখ হাসিনা কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে বলেন, "অত্যাচারের মুখে হিন্দুরা ভারতে চলে আসছেন। যশোর, ফরিদপুর, খুলনা ও গোপালগঞ্জে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চলছে।" (আনন্দবাজার, ১১ আগস্ট, '৮৮)। ১৯৮৯ সালে পুনরায় শেখ হাসিনা বলেন, "বাংলাদেশে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম করার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধছে।" (আনন্দবাজার, ১১ আগস্ট, '৮৮) আমাদের এই স্বদেশীদের স্বদেশের বদনামের বিপরীতে খোদ কলকাতার দায়িত্বশীলতরা কি বলেন, শোনা যাক। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন আইজি শংকর সেন বলেন, "বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ায় সংখ্যালঘুদের অনুপ্রবেশ বাড়েনি।" (আনন্দবাজার, ৫ জুলাই, '৮৮) ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটাসিং বলেন, "জন্মহার বাড়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে জনসংখ্যা বাড়তে পারে।" (আনন্দবাজার, ২১ মে, '৮৭) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে কিছু লোক আসে বটে, তবে তা তেমন মারাত্মক কিছু নয়।' (আনন্দবাজার, ২১ মে, '৮৭) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

www.pathagar.com

জ্যোতিবসু ১৯৯১ সালে পুনরায় এ প্রসঙ্গে বলেন, "ঢালাও অনুপ্রবেশের ঘটনা সত্য নয়। বাংলাদেশ থেকে কিছু লোক আসে যা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের। এদের মধ্যে অবাঙ্গালীরাও আছেন। তারা আসেন কাজের সন্ধানে। আবার অনেকে ফিরেও যান। ... পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের মধ্যে যেখানে অভিন্ন সীমান্ত আছে, সেখানেও এ ধরনের ঘটনা স্বাভাবিক।" (দৈনিক বাংলা, ১৮ জুন, ১৯৯১)। উপরের কয়েকটা দৃষ্টান্তে বাংলাদেশীরা বাংলাদেশের কতখানি শত্রু তা পরিষ্কার। বাংলাদেশী হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধ ঐক্যপরিষদ বলছে ৩ কোটি বাংলাদেশী গেছে ভারতে, অন্যদিকে ভারতীয় ব্যক্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গের আইজি ও মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যদিকে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বলেছেন, অথচ পশ্চিমবঙ্গের আইজি বলছেন, বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার পর বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশ বাড়েনি। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলাদেশে নেই। এ থেকে প্রমাণ হয়, হিন্দু-খৃস্টান-বৌদ্ধ ঐক্যপরিষদের কর্মকর্তারা এবং ড. কামালরা ভারতীয়দের চেয়েও যেন বেশি ভারতপ্রেমিক। আশঙ্কার বিষয় হলো, এই ড. কামালরাই এখন দেশের বিবেক সাজার চেষ্টা করছেন। মহা সুযোগ মনে করছেন বর্তমান পরিস্থিতিকে। ভাবছেন, 'ভেড়ার মধ্যে বাছুর পরামাণিক' হতে পারবেন তাঁরা। ভারতীয়দের চেয়ে বেশি ভারতপ্রেমিক এই 'বাছুররা' দেশের 'পরামাণিক' যদি সেজেই বসেন, তাহলে দেশের কি হবে, সেটাই আশঙ্কার।' আশার কথা, আশঙ্কার বিষয়টা দেখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পেছনে আমাদের সেনাবাহিনী আছেন।

আনন্দ কুমার তার নিবন্ধে দুইটি খুব মজার কথা বলেছেন। তার মতে, সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে বৈষম্যের শিকার। সুপরিকল্পিতভাবে সরকার সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে অসম চাকরি নীতি অনুসরণ করছেন। (Minorities have been facing a number of negative discrimination in Bangladesh. The state has been following a deliberate policy to creat unequal opportunities for them)। দ্বিতীয়ত: তিনি বলেছেন, ভারতের মত দেশে সংখ্যালঘুরা বিশেষ মর্যাদা পায়। তারা অন্য নাগরিকদের মতোই সকল সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। (In countries like India, minorities get special treatment. They get all facilities at per with other citizen).

'ভারতের সংখ্যালঘুরা অন্য নাগরিকদের মত সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা পায়' –আনন্দ কুমারের একই কথা শুধু মিথ্যা নয়, সত্যকে গলাটিপে মারার মতোই জঘন্য শুনাচ্ছে। এই বিষয়ে ভারতের প্রকৃত অবস্থা যদি তুলে ধরতে যাওয়া হয়, তাহলে বঞ্চনার এক মহাকাব্য রচনা করা যাবে। সেই ধরনের কোন আলোচনায় না গিয়ে ভারতের সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে ভারতের দায়িত্বশীল একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'হাই লেবেল কমিটি'র কিছু কথা তুলে ধরবো। ভারতের সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা তার 'যারে তুমি নিচে ফেলো' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলে, "ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘুগোষ্ঠী মুসলিমরা, দেশের জনসংখ্যার ১২ শতাংশেরও বেশি। তাহার পরেই শিখ ও খৃস্টানরা। উপরন্তু আছেন বৌদ্ধ, জৈন ও পার্সিরা। অধিকাংশ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই সাধারণত একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বা মহল্লায় কেন্দ্রীয়ভূত হয়ে বসবাস করেন। এ ধরনের মহল্লা পরিদর্শন করলেই বুঝা যায়, এগুলো আর্থিক বৈষম্য, অনগ্রসরতা ও

www.pathagar.com

সুযোগহীনতার এক একটি পুঞ্জিভূত বারুদ স্তূপ। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের রূপায়ন প্রায়শ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই মহল্লাগুলিকে পাশ কেটে যায়। সংখ্যালঘু ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাসের এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, অন্যান্য সরকারি পরিসেবা, দোকানপাট কিছুই উচ্চাঙ্গের নয়, বহু ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরিকাঠামোও নেই। ফলে অনগ্রসরতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে কুরিয়া কুরিয়া খায়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপুষ্টি, কর্মহীনতা প্রায়শ সংখ্যালঘুদের একাংশকে চোরাচালান ও দুর্বৃত্তির অন্ধকার জগতে আকৃষ্ট করে। উন্নয়ন বাবদ সরকার যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, তাহার স্পর্শ হইতে সংখ্যালঘুরা বঞ্চিত থাকে।" (সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ জুন, ২০০৬)

ভারতীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো বিচারপতি রাজিন্দর সাচ্চারের নেতৃত্বাধীন 'হাই লেবেল কমিটি'র রিপোর্ট। এই কমিটি নিয়োগ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটা মূল্যায়নের জন্য। এই কমিটি ভারতব্যাপী ব্যাপক সফরের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্ট গত বছর এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেন। এ সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্যে রিপোর্টটি বলেছে, "মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য তাদের একপাশে ঠেলে রেখেছে। সরকারি কল্যাণমূলক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, শিক্ষা অর্জনের সুযোগ, কর্মসংস্থান এবং ব্যাংক ঋণসহ ঋণ পাওয়ার সুযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের মুসলমানরা সর্বনিম্ন তলায় পড়ে রয়েছে।" রিপোর্ট-এর তথ্য ও পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

(ক) ভারতের গ্রামীণ এলাকায় ৯৪.৯ শতাংশ মুসলিম দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে।

(খ) মুসলিমরা মাত্র ৩.২ শতাংশ ভর্তুকিসম্পন্ন ঋণ পেয়ে তাকে।

(গ) দরিদ্রদের মধ্যে অনাহার রোধ করতে ভর্তুকিতে খাদ্যশস্য দেয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তা থেকে মাত্র ১.৯ শতাংশ মুসলমান সুবিধা পায়।

(ঘ) মাত্র ১ শতাংশ মুসলিম চাষীর হ্যান্ড পাম্প আছে।

(ঙ) গ্রাম এলাকায় ৫৪.৬ শতাংশ এবং শহর এলাকায় ৬০ শতাংশ মুসলিম কখনই কোন স্কুলে যায়নি।" (কলম, কলকাতা, এপ্রিল ২৯, ২০০৬)

ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার হার ১৬ শতাংশের নিচে নয়, অথচ সরকারি চাকরিতে তাদের অংশ ২ শতাংশের নিচে। আনন্দ কুমার বাবু ভারতীয় সংখ্যালঘুদের এই অবস্থার কথা অবশ্যই জানেন। জানার পরেও এই মিথ্যাচার কিভাবে করতে পারলেন আনন্দ কুমার বাবু, সেটাই প্রশ্ন। এর চেয়েও বড় মিথ্যাচার তিনি করেছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার হার ৯ শতাংশের মত। কিন্তু বিভিন্ন চাকরি ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান তাদের জনসংখ্যা-হারের দ্বিগুণ হবে। কোন কোন চাকরিতে তাদের অংশ তিরিশ-চল্লিশ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এদিক থেকে বাংলাদেশে সংখ্যাগুরুরাই বঞ্চনার শিকার। অবিরাম সাম্প্রদায়িকতার স্লোগান তুলে সংখ্যালঘুরাই বাংলাদেশে তাদের প্রাপ্য সুবিধার চেয়ে বেশি আদায় করে নিচ্ছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সংখ্যালঘু হিসেবে দেখা হয় না, এজন্য সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলাদা কোন সমীক্ষা হয়নি। এ দাবী সংখ্যালঘুদের তরফ থেকেও কোন সময় উঠেনি। এ কারণেই সীমান্তের ওপার থেকে আনন্দ কুমার বাবুরা বড় বড় কথা বলতে পারছেন। আনন্দ কুমার বাবুর সহযোগী ড. কামালরাও এই কারণে সংখ্যালঘু কার্ড খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। এই সুযোগ যাতে তারা আর না পায় এজন্য আমার প্রস্তাব হলো : বিভিন্ন

www.pathagar.com

চাকরি-বাকরি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ও হার বিষয়ে একটা সমীক্ষা তৈরি করা হোক, দুই. সংখ্যালঘুদের শিক্ষার হার, তাদের দারিদ্র্য সীমাগত অবস্থান, তাদের পাওয়া স্কলারশীপের বার্ষিক পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে পরিসংখ্যান তৈরি করা হোক এবং তিন. জাতীয় আয়ে তাদের অবস্থান, ঋণ বিতরণের জাতীয় অংকে তাদের শেয়ারের পরিমাণ, জাতীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ে তাদের অংশ এবং জাতীয় ব্যাংক ডিপোজিটে তাদের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ক মূল্যায়ন করা হোক। দেশে এখন সংস্কার চলছে। এটাও সংস্কারমূলক একটা কাজই হবে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদাযিক ভেদ-নীতি নেই বলেই উপরোক্ত বিষয়াবলিকে কোন সময়ই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়নি। কিন্তু আমরা সাম্প্রদায়িক না হলেও আনন্দ কুমার বাবু ও ড. কামালরা সাম্প্রদায়িকতা ভুলতে পারছেন না এবং আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক বানাতে চাচ্ছেন। বারবারই তারা আমাদের ওপর সাম্প্রদায়িক হওয়ার দায় চাপাচ্ছেন। এই অবস্থায় ওপারের আনন্দ কুমার বাবু ও এপারের ড. কামালদের সাম্প্রদায়িক প্রপাগান্ডার মোকাবিলা করার জন্যই রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সম্প্রদায়গত অবস্থানের একটা সমীক্ষা হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

১৬ জুন, ২০০৭

ডায়ালগ বিষয়ক মক্কা সম্মেলন একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

মক্কায় অনুষ্ঠিতব্য 'World Islamic conference for dialogue'-এর ফ্যাক্স বার্তা যখন হাতে পেলাম, তখন কনফারেন্সের বিষয় আমাকে বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ করেছিল। 'ডায়ালগ' শব্দটার সাথে অনেকদিন থেকে পরিচিত। 'ইন্টার রেলিজাস', 'ইন্টার ফেইথ', 'ইন্টার কালচার' ইত্যাদি ডায়ালগের কথা অনেকদিন থেকে শুনছি। বিশেষ করে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত খৃস্টানদের মধ্যে ডায়ালগ চলছে অনেকদিন ধরে। আন্তঃধর্ম ও আন্তঃকালচার ডায়ালগের প্রয়োজনের কথাও শোনা যাচ্ছিল। হান্টিংটনের কুখ্যাত 'Clash if civilizations' প্রকাশিত হবার পর, বিশেষ করে নাইন-ইলেভেনের পর যখন পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী ও সর্বশেষ ধর্ম ইসলামের উপর অজ্ঞতা প্রসূত ও উদ্দেশ্যমূলক যে আক্রমণ শুরু হয়, তার প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের সুস্থবুদ্ধি অনেকেও ইসলামের সাথে সংলাপের প্রয়োজন অনুভব করে। ইসলাম, খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্ন পর্যায়ে কিছু সংলাপও শুরু হয়। বিশেষ করে 'World council of churchis'-এর মত কিছু সংগঠন আন্তঃধর্ম ডায়ালগ নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করে আসছে। কিন্তু কোন মুসলিম দেশ কিংবা পরিচিত বা উপযুক্ত কোন মুসলিম সংগঠন এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে আমার জানা ছিল না। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন কিং আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান ২০০৭ সালের নবেম্বরে ভ্যাটিকান সফর করেন এবং সেখানে পোপের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এই উপলক্ষে শান্তি ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে আন্তঃধর্ম সংলাপের আহ্বান জানান। এই কথা মনে পড়ায় মক্কায় অনুষ্ঠিতব্য সংলাপের জন্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের একটা ব্যাক গ্রাউন্ড খুঁজে পেলাম। বাদশাহ তার আহ্বানের ফলো

www.pathagar.com

আপ হিসাবেই রাবেতাত আল আলম আল ইসলামীর মাধ্যমে এই বিশ্ব সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন। আর মনে হলো, রাবেতাই এর জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সংগঠন। রাবেতার ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই আছে। রাবেতা জাতিসংঘ স্বীকৃত একটি সংস্থা। ইউনেস্কো, ইউনিসেফেরও সদস্য রাবেতা। ১৯৬২ সালে সৌদী সরকার কর্তৃক গঠিত হবার পর রাবেতা পৃথিবীর সব প্রান্তে ইসলাম প্রচার, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির উজ্জীবন, ইসলাম বিরোধী প্রচার-প্রপাগান্ডার মোকাবিলা ইত্যাদি দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছে। 'ওয়ার্ল্ড সুপ্রীম কাউন্সিল ফর মস্ক', ইসলামিক ফিকহ্ কাউন্সিল, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল কমিশন ফর মেমোরাইজেশন অব দি হোলি কুরআন, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর মিডিয়া, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর এডুকেশন, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর কনভার্ট টু ইসলাম, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর ইনট্রোডাকশন অব ইসলাম, ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম ফর ইনট্রিডিউসিং দি প্রোফেট অব মারসি, ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর মুসলিম উইমেন এন্ড ফ্যামিলি, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমি এন্ড ফাইন্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর কনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভলপমেন্ট প্রভৃতি সংস্থা রাবেতার স্বীকৃত, মঞ্জুরিকৃত বা রাবেতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়াও গোটা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে আছে রাবেতার সাথে সম্পর্কিত শত শত ইসলামী ও মুসলিম সংগঠন। সুতরাং ডায়ালগ ব্যবস্থাপনার জন্যে রাবেতা উপযুক্ত সংগঠন। বাদশাহ আবদুল আজিজের সৌদী সরকার ডায়ালগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাবেতাকে দেয়া উপযুক্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স অন ডায়ালগ' সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে মক্কায় পৌঁছা পর্যন্ত এই ধারণাই আমার ছিল যে, ডায়ালগ ব্যাপারে সৌদী সরকারের এটাই প্রথম উদ্যোগ। কিন্তু সৌদি আরবে যাওয়ার পর, ডায়ালগ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র পাবার পর আমার এ ভুল ভেঙে যায়। দেখলাম সৌদি আরবে ডায়ালগ কর্মসূচির যাত্রার শুরু সেই ২০০৩ সালে। এ জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান 'কিং আবদুল আজিজ সেন্টার ফর ন্যাশনাল ডায়ালগ (King Abdul Aziz Center for National Dialogue)। এই সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তদানীন্তন ক্রাউন প্রিন্স, বর্তমানে সৌদি আরবের বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ। উদ্যোগকে আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি দিতে গিয়ে ২০০৩ সালের ২৩শে জুলাই এক চিঠিতে বাদশাহ ফাহদ বলেন যে, 'ক্রাউন প্রিন্স' ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ আপনি দেশের সংহতি বিধানকারী বাদশাহ আবদুল আজিজ-এর দৃষ্টান্ত এবং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ঐক্য সামনে রেখে চরমপন্থার বদলে মধ্যম পন্থার কাঠামোতে ইসলামী বিশ্বের সাথে সম্পর্ক সংহত করা ও আমাদের জাতীয় ঐক্য জোরদার করার লক্ষ্যাভিসারী যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তা আমরা দেখেছি। আমরা একে অনুমোদন করেছি। কাজ শুরু করুন।' কাজ শুরু হয়ে যায়। 'King Abdul Aziz center for National Dialogue'-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে তদানীন্তন ক্রাউন প্রিন্স আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ বলেন, "The etiqustte of dialogue must spring from the traditions of the right eours predessors (may god be pleased with them) who practiced constructive argumentation in full

www.pathagar.com

accordance with the guidance of the Prophet (Peace be upon him) who said : 'He who believes in Allah and the final days should say something good or else remain silent.' They also considered cursing a Muslim to be diviation, and fighting him to be a disbelief. This is the proper way of dialogue ..... . This country, which takes pride in the service of the two holy mosque, when the hearts of The Muslims turn, cannot embrace a thought that deviates from the Islamic principles, nor can it sustain thoughts that manipulate the teachings of Islam by means of adapting treacherous slogans for the Passage of the evil goals of calling Muslims non believers and terrorising them. Our Saudi People do not accept any substitute for the moderate middle way which refuses extremism and fanaticism, just as the refuse dessolution and immorality" কিং আব্দুল আজিজ ডায়ালগ সেন্টারের কাজ সউদি আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেন্টারের লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বাসের কাঠামোর অধীনে জাতীয় ঐক্য গভীর ও সুদৃঢ় করা; ইসলামের শিক্ষা মধ্যমপন্থার অনুসরণে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সউদি আরবের ভেতর ও বাইরেও ইসলামী সংলাপের গোড়াপত্তনে অংশ নেয়া; বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা এবং এতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে আলোচনা করাকে সেন্টারের লক্ষ্যের মধ্যে ধরা হয়েছে। সেন্টারের লক্ষ্য হিসেবে ৮টি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যটি হলো জাতীয় সংলাপে কৌশলগত লক্ষ্যকে বিমূর্ত করা এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন করা। কিং আব্দুল আজিজ ডায়ালগ সেন্টার শুধু ডায়ালগ সেন্টার নয়, রীতিমত এটা একটি ইনস্টিটিউশন। যার এমন কতগুলো বিভাগ রয়েছে যা সেন্টারকে জাতীয় সংস্কার, সমৃদ্ধি, উন্নয়নের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত করেছে। বিভাগগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেনিং এন্ড ওয়ার্কশপ, ডিপার্টমেন্ট অব স্টাডিজ, রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক রিলেশন্স এন্ড মিডিয়া, ডিপার্টমেন্ট অব ডায়ালগ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স, ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক রিলেশন্স এন্ড মিডিয়া, ডিপার্টমেন্ট অব ডায়ালগ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স, ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন সেন্টার এন্ড আরকাইভস এবং ডিপার্টমেন্ট অব মিটিংস, সেমিনারস এন্ড কনফারেন্সেস। এছাড়াও সেন্টারের রয়েছে 'ইনটেলেকচুয়াল গাইড প্রজেক্ট'। সেন্টারটি ৫ বছর ধরে কাজ করছে। ৫ বছরে চারটি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমি কিং আব্দুল আজিজ ডায়ালগ সেন্টার নিয়ে এতোটা আলোচনা করলাম এই জন্যে যে, আমি বলতে চাই বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজের তত্ত্বাবধানে রাবেতার উদ্যোগে যে 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স ফর ডায়ালগ' অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা হঠাৎ করে হয়নি। এর পেছনে রয়েছে কিং আব্দুল আজিজ ডায়ালগ সেন্টারের অভিজ্ঞতা। 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স ফর ডায়ালগ'কে বলা যায় 'কিং আব্দুল আজিজ ডায়ালগ সেন্টারে'র বৃহত্তর ফলোআপ। সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মূলত

www.pathagar.com

সউদি আরবের ন্যাশনাল ডায়ালগের জন্যে এবং এর আওতা ইসলামিক ওয়ার্ল্ডে সম্প্রসারিত করা। অন্যদিকে 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স ফর ডায়ালগ-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর ডায়ালগ' এর লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলিম উম্মার মধ্যে ডায়ালগ এবং তার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করা। এর দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও কালচারের সাথে ডায়ালগ করা, যা ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে ভ্রান্তধারণার অবসান ঘটাবে এবং পারস্পরিক জানাজানি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আন্ত:ধর্ম ও আন্ত:কালচার সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। অন্য জাতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে যাই হোক, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে এটা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে সময়ের অপরিহার্য দাবি হিসেবেই মক্কা মুকাররমায় 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স অব ডায়ালগ' অনুষ্ঠিত হলো।

সম্মেলনের যে বিষয়টি প্রথমেই আমাকে চমৎকৃত করে সেটা হলো, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা। এর আগেও কতগুলো আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আমি গিয়েছি। তার মধ্যে রয়েছে ওআইসি'র শীর্ষ সম্মেলন, ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথের কয়েকটি শীর্ষ সম্মেলন, মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন। এসব সম্মেলনে সব মুসলিম দেশ এবং অমুসলিম দেশের মুসলিম মাইনরিটিদের প্রতিনিধি এসেছে। কিন্তু এবার যা দেখলাম, কোন সময়ই তা দেখিনি। এবার মুসলিম দেশের প্রধান সব ধর্মীয় ও সংস্থা এবং অনুরূপভাবে অমুসলিম দেশের সব মুসলিম গ্রুপকে সম্মেলনে হাজির করা হয়েছে। সম্মেলনে ল্যাটিন আমেরিকার সুদূর ও দুর্গম এলাকার মুসলিম প্রতিনিধিদের যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রের মুসলিম প্রতিনিধিদেরকেও। দেখেছি আফ্রিকার চাঁদ-এর মতো গহীন, গভীর বনাঞ্চলের মানুষকে। তার সাথেই দেখেছি মঙ্গোলিয়া, তাইওয়ানের মানুষকেও। দুনিয়ার সবদেশের সব মতের মানুষের এ এক অপরূপ মিলন মেলা। এদের সকলের উপস্থিতিতে মুসলিম উম্মার মধ্যেকার ধর্মীয় মত ও মতাদর্শগত বিরোধের অবসান ঘটাবার ঘোষণা সফল ও তাৎপর্য পূর্ণ হয়েছে। সম্মেলনে নিজেদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং আন্ত:ধর্ম সম্প্রীতি সংলাপের যে আপীল পেশ করা হয়েছিল, তার প্রতি সকলেই অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

সম্মেলন শুরুর কয়েকদিন আগে থেকেই রাবেতাত আল আলম আল ইসলামীর (Muslim World League-MWL) সেক্রেটারি জেনারেল তার বিভিন্ন বক্তব্য, সাক্ষাৎকার ও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচির বিষয় দুনিয়ার মানুষকে অবহিত করছিলেন। উত্থাপিত নানা প্রশ্নের তিনি জবাবও দিচ্ছিলেন। ২ জুন সউদী গেজেটে প্রকাশিত এক বক্তব্যে তিনি বলেন, "আন্ত:জাতি, আন্ত:ধর্ম, ডায়ালগের মূল বিষয় হবে বিভিন্ন মহল থেকে যে জঘন্য অপপ্রচার চলছে তা থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা। .... মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (রাবেতা) এর তার সহযোগী ইসলামী সংস্থাগুলো ভালো করেই জানে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোকেই সভ্যতার দ্বন্দ্ব আখ্যা দেয়া হচ্ছে। .....

www.pathagar.com

কম্যুনিজমের পতনের পর কয়েকটি মহল পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইসলামকেই তাদের এক নাম্বারের শত্রু হিসেবে ধরে নেয় এবং এর প্রচার শুরু করে। অথচ ইসলাম তাদের এই অপপ্রচারের একেবারেই বিপরীত। ইসলাম মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে। ইসলাম সমাজের সকল মতের সহাবস্থানে বিশ্বাস করে।.... নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও অমুসলিমদের সাথে সংলাপের ক্ষেত্রে আল কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতই হবে অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশক। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (MWL) দেশে দেশে সংলাপ। সেমিনার করে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর মোকাবিলা করবে। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদেরকে সতর্ক করেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে, তাদের ধর্ম তাদের রাসূল ও তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার না চালাবার জন্যে।" রাবেতা অর্থাৎ মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারি জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোহসিন আল তুর্কির এই বক্তব্য আল জাজিরা টেলিভিশন ১লা জুন (০৮) তার সাক্ষাৎকার হিসাবে প্রচার করে।

সম্মেলনের ১ দিন আগে আব্দুল্লাহ আল তুর্কি একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন সউদি আরব দৈনিক ওকাজ পত্রিকাকে। এই সাক্ষাৎকারে তিনি আসন্ন সম্মেলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কথা বলেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, "মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ সম্মেলনে অন্যান্য ধর্মের সাথে সংলাপের একটা ঐক্যবদ্ধ কর্মকৌশল তৈরি করবে যা ইসলামকে ডায়ালগের সনদ হিসেবে কাজ করবে।' কালচারাল ও আন্তঃধর্ম ডায়ালগে অমুসলিম দেশের মুসলিম মাইনরিটি সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আবদুল্লাহ আল তুর্কি বলেন, "অমুসলিম দেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবী, মুফতি ও সংস্থা সংগঠনের প্রতিনিধিদের ব্যাপকভাবে সম্মেলনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্মেলনের তারিখ ৪ দিন পেছানো হয়েছে তাদেরই সুবিধার জন্যে। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ বিশ্বাস করে মুসলিম সংখ্যালঘুরা মুসলিম উম্মার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। তাদের সমস্যা ও দাবি দাওয়া সমাধানে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে যাতে তারা তাদের অস্তিত্বও পরিচয় নিয়ে টিকে থাকতে পারে। তারা তাদের এলাকায় যাতে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, এজন্যে তাদের শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ মুসলিম সংখ্যালঘুদের সংস্থা সংগঠনকে প্ল্যান প্রোগ্রামসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করছে।" ডায়ালগের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ আল তুর্কিকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "সংলাপে সমসাময়িক বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়া ইসলামেরও পদ্ধতি, কুরআন- সুন্নাহর এটাই নির্দেশ। সংলাপে বৈচিত্র্য বহুমুখিতার স্বীকৃতি থাকবে এবং থাকতে হবে অংশগ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে সহযোগিতা। ইসলামের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আমাদের সংলাপের ভিত্তি হবে কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিকোণ এবং আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা।' সংলাপে সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ আল তুর্কি বলেন, "বিভিন্ন ইস্যুর সংলাপে বিভিন্ন মত ও মতাদর্শের লোকদের মধ্যে সংহতি প্রয়োজন। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন মতাদর্শ, সংস্কৃতি, জাতীয়তার সংলাপে সব মানুষের আগ্রহ প্রয়োজন। গভীর সংলাপের জন্যে অংশগ্রহণকারী বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহনশীল

www.pathagar.com

এক কমন গ্রাউন্ড প্রয়োজন। দুনিয়ায় শান্তি-নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে সংলাপের সামনে কি কঠিন থাকা উচিত- এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি বলেন, 'অনিশ্চয়তা এবং চাপিয়ে দেয়া অন্যায় যুদ্ধ মানবতার জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হুমকি। আল কুরআন বিভিন্নভাবে মানুষের নিরাপত্তা, বিশ্বের শান্তির কথা বলেছে। শান্তি ভঙ্গ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায় এবং মানবাধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘন, যে অধিকার আল্লাহ্ মানুষকে দিয়েছেন।' সাক্ষাৎকারটির শেষ বক্তব্যে ড. আব্দুল্লাহ আব্দুল মোহসিন আল তুর্কি বলেন, 'আন্তরিক ডায়ালগ অন্যান্য ধর্মকে স্বর্গীয় আলোর পরশ লাভে সাহায্য করতে পারে, যা বিশ্বব্যাপী মন্দ ও অসুস্থতার অবসান ঘটিয়ে গ্লোবালাইজেশনের শক্তিমান স্রোতকে মঙ্গলের দিক-নির্দেশনা দিতে পারে।"

মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারি জেনারেলের উপরোক্ত বক্তব্য এবং সাক্ষাৎকার 'আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অব ডায়ালগ'-এর উদ্দেশ্য ও কার্যসূচি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তুলে ধরে। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

সম্মেলন শুরু হয় জুনের ৪ তারিখে।

সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র কা'বা সংলগ্ন 'রাফা প্রাসাদে'।

বাদশাহ মক্কা শরীফে এলে এই প্রাসাদেই থাকেন।

তিনদিনের সম্মেলনটি এই প্রাসাদেই অনুষ্ঠিত হয়।

সৌদী সরকার সম্মেলনকে যে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে, এটা তারও একটা প্রমাণ। সম্মেলনের সময় আমরা প্রাসাদের মসজিদে যা কা'বার অংশ, নামায পড়েছি। জুমআর নামাযও আমরা এখানেই আদায় করেছি।

৪ জুন সকালে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হলো।

মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের (রাবেতার) সভাপতি সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতি শেখ আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুল্লাহ আল শেখ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। মঞ্চে বসেছিলেন পাঁচজন। মাঝখানে বসেছিলেন তিনদিনের কনফারেন্স যিনি উদ্বোধন করবেন এবং কনফারেন্স যার আগ্রহ ও উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ। তার ডান পাশে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সভাপতি সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতি শেখ আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুল্লাহ আল শেখ। আর বামদিকে বসেছিলেন, ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং ইরানের প্রভাবশালী রাজনীতিক আলী আকবর হাশেমী রাফসানজানি। মঞ্চের অপর দু'জন স্বনামধন্য ব্যক্তি হলেন- ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের সেক্রেটারি জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোহসিন আল তুর্কি এবং গ্রান্ড শেখ অব আল আজহার সাইয়েদ তানতাবি।

কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধনী অধিবেশনের কাজ শুরু হলো। এর পরই উদ্বোধনী বক্তৃতার পালা। উদ্বোধনী বক্তৃতা শুরু করলেন বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ। তার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার শুরুতেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুসলিম চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন মুসলিম সংস্থা-সংগঠনের প্রধানদের তিনি প্রাণঢালা অভিনন্দন জানালেন এবং ডায়ালগ আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, 'অন্যান্য জাতির কাছে ইসলাম এবং ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ডায়ালগ একটা শক্তিশালী মাধ্যম। তিনি বললেন, 'এই সম্মেলনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সম্মেলনটি পবিত্র কা'বার ছায়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা মুসলমানদেরকে বিশ্বের সব মানুষের প্রতি তাদের বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সম্মেলনে অন্যান্য জাতির সাথে সংলাপের কৌশল-পদ্ধতি নির্ধারণের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালনের পথ সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, 'সহযোগিতা, সহাবস্থান, সুবিচার এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি-অবস্থান সম্পর্কে পৃথিবীকে অবহিত করতে হবে। মুসলিম স্কলারস ও বুদ্ধিজীবীদেরকে পৃথিবীর জাতিসমূহ ও মানুষের সাথে সংলাপ ও তথ্য-বিনিময় অব্যাহত রাখতে হবে।' বাদশাহ আব্দুল্লাহ তার বক্তৃতায় বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ ও অন্যান্য মুসলিম সংস্থা-সংগঠনকে এই সব সংলাপের সমন্বয় সাধন ও সম্মিলিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন, সৌদী আরবের গ্রান্ড মুফতি, ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি, গ্রান্ড শেখ অব আল-আজহার এবং মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ আল তুর্কি। সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতি মুসলিম উম্মার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে সর্বশেষ ঐশী বাণী সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে মানবজাতির জন্যে এসেছে, তা দুনিয়ার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া মুসলমানদের দায়িত্ব। সংলাপ হলো মানুষের পারস্পরিক জানাজানি ও সহযোগিতার মাধ্যম এবং মতপার্থক্যের বিষয়টাকে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে।" উদ্বোধনী অধিবেশনে ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের আয়োজনের জন্যে সৌদি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন সেকশনের মধ্যে সংলাপ আজ প্রথম প্রয়োজন। এ ধরনের সংলাপ অব্যাহত রাখতে হবে এবং এটা মুসলিম বিশ্বের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বোধনী অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণ দেন, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ আল-তুর্কি। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই মুসলিম জনগণ এবং মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের তরফ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের

সেবায় অব্যাহত অবদান রাখার জন্যে বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ আল সৌদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইসলামী স্কলার, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা-সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মক্কার এই সম্মেলনে সম্মিলিত হওয়াকে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, নৈতিক নীতিমালা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিভিন্ন সভ্যতা ও ঐশী ধর্মসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতা দুনিয়ার সংঘাত-সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে এবং মানুষের মধ্যে সুবিচার, সহযোগিতা, সহনশীলতার অবস্থাকে সংহত করতে পারে- এই বিষয়টিকে বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। আজ তাঁরই অভিভাবকত্বে অন্যান্য ধর্মের সাথে সংলাপ অনুষ্ঠান ও একটি লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের নিয়ে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে। সংলাপ আল কুরআন নির্দেশিত এবং রাসূল (সাঃ) অনুসৃত একটা পদ্ধতি। মুসলিম উম্মার সংস্কৃতিতে এটা একটা গভীর প্রোথিত বিষয়। ইসলামের শুরু থেকে অন্যান্যের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংলাপ একটি মাধ্যম। আজকের যুগে ইসলামের

www.pathagar.com

সুরক্ষা এবং ইসলামের মূল্যবোধ প্রচারের ক্ষেত্রে সংলাপের সেতুবন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা প্রয়োজনীয় যে, সংলাপের সাথে যারা জড়িত হবেন, তারা অতিতের অভিজ্ঞতা, সংলাপে অতিতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেবেন। এর মাধ্যমে তারা ভবিষ্যত সংলাপের জন্যে নতুন কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে পারবেন। যাতে সংলাপের প্রতিটি ক্ষেত্র, প্রতিটি বিষয় এমনভাবে ঢেলে সাজানো হবে যা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালি এবং বিশ্বাসীদের যোগ্যতাকে বিকশিত করবে যাতে মানবতার সাথে হৃদয়ের বিনিময় সম্ভব হয়। অধিকন্তু, এই পরিকল্পনা বা কর্মকৌশল অবশ্যই একক ও এক ছত্রছায়ার অধীনে সবকাজের সমন্বয় ও উদ্দেশ্যের অধিষ্ঠানকে নিশ্চিত করবে এবং নির্দ্ধারিত করবে বাস্তবায়নের বিধি-নিয়ম, পদ্ধতি ও লক্ষ্য।" তিনি আরও বলেন যে, আজ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কারণ ইসলামের পরিমণ্ডলে বর্তমানে বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদের মত বিষয়ের যে অনুপ্রবেশ ঘটছে, তাতে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ উদ্বিগ্ন।' তিনি উল্লেখ করেন, "আমরা মুসলমানরা আজ আনন্দিত। আনন্দিত শুধু এই কারণে নয় যে, এই সম্মেলন পবিত্র মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বরং এই কারণেও যে এই সম্মেলন ইসলামী দুনিয়ার কেন্দ্র সৌদি আরবের খোদ শাসক এবং হারামাইন শরিফাইনের খাদেম বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।"

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের এইসব কথার মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের দিক নির্দেশনা পরিষ্কার হয়ে যায়। অথবা বলা যায়, সম্মেলনের ওয়ার্কিং সেশনকে যে বিষয়াবলি দিয়ে সাজানো হয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্বোধনী সম্মেলনের বক্তব্যে। সম্মেলনের ওয়ার্কিং সেশনে পেশকৃত প্রবন্ধগুলো চমৎকার। আর বিষয়গুলো বিভিন্ন প্রবন্ধে পরিকল্পিতভাবে বিভক্ত। সম্মেলনে বিষয় হিসেবে ডায়ালগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ধরা হয়েছে। সম্মেলনের চার সেশনে ১৩টি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। এই তেরটি প্রবন্ধের মধ্যে শেষ দু'টি প্রবন্ধ 'ফ্যামিলি এন্ড ইথিক্স' ও 'ডেঞ্জারস অব এনভায়রনমেন্ট' ছাড়া বাকি ১১টি প্রবন্ধই ডায়ালগের বিভিন্ন দিক নিয়ে। সবদিক থেকে 'ডায়ালগ' বিষয়টির আলোচনা করে একদিকে 'ডায়ালগ'-এর প্রকার, পদ্ধতি, পক্ষ, বিষয় ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামের ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে 'ডায়ালগ' এর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। 'ডায়ালগ' নিয়ে এই বিষদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। মুসলিম উম্মার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঐক্যের জন্যেও এটা প্রয়োজন। আধুনিক আঙ্গিকের আন্তঃ ধর্ম 'ডায়ালগ' বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে একেবারেই নতুন একটি বিষয়, যার পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত থাকতেই পারে। নেতিবাচক কোনো মনোভাব থাকলে তা দূরীকরণের জন্যেই ডায়ালগ-এর ইসলামী দৃষ্টিকোণ নিয়ে সম্মেলনের প্রবন্ধগুলোতে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। আমি নিশ্চিত এই ব্যাপক আলোচনার বিষয়টি সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হবে এবং জাতির মধ্যে ঐকমত্যের সৃষ্টি হবে। আমার এই আশাবাদ অমূলক নয়। অন্ততঃ প্রবন্ধগুলোর শিরোনামের দিকে দৃষ্টি দিলেও এ বিষয়টা বুঝা যাবে। বিশেষ লেখকদের লেখা প্রবন্ধগুলো একটা করে দলিল। প্রবন্ধগুলোর দিকে একবার নজর বুলানো দরকার। প্রথম অধিবেশনে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রথম প্রবন্ধটি 'Dialogue in the Holy Qur'an and Sunnah-Concept and Objectives (ডায়ালগ ইন দ্য হোলি কোরআন এন্ড সুন্নাহ, কনসেপ্ট এন্ড অবজেকটিভ্স)। প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন সউদি আরবের আল ক্বাসিম

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আহমদ আব্দুর রহমান আল ক্বাজী। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম 'Dialogue in the Holy Qur'an and Sunnah- Bases and Tendencies' (ডায়ালগ ইন দ্যা হোলি কুরআন এন্ড সুন্নাহ, বেজেস এন্ড টেনডেনসিজ)। এ প্রবন্ধের লেখক ড. আসাদ আল সাহমারী। ইনি লেবাননের পিপ্‌লস কংগ্রেসের ধর্ম বিষয়ক কর্মকর্তা। প্রথম অধিবেশনের শেষ প্রবন্ধটির শিরোনাম 'Experiences of Cultural Dialogue Throughout History (এক্সপেরিয়েন্সেস অব কালচারাল ডায়ালগ থ্রুআউট হিস্টোরি) ইরাকের আল খালিসিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. জাওয়াদ আল খালিমি।

দ্বিতীয় ওয়ার্কিং সেশনের 'থীম' বা মূল প্রসঙ্গ ছিল 'মেথোডলোজি এন্ড রুলস অব ডায়ালগ (র্ণদমঢমফমথহ টভঢ লৈফণ্ড্র মত উধঢফমথলণ)। উল্লেখ্য, প্রথম ওয়ার্কিং সেশনের মূল বিষয়টা ছিল 'বেসিস অব ডায়ালগ ইন ইসলাম' (Basis of Dialogue in Islam)। দ্বিতীয় ওয়ার্কিং সেশনে Methodology and Rules of Dialogue'-এর উপর তিনটি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। প্রবন্ধগুলোর নাম হলো, 'মেকানিকস অব ডায়ালগ' (Mechanics of Dialogue), 'ইথিকস এন্ড রুলস অব ডায়ালগ (Ethics and Rules of Dialogue) এবং 'ডায়ালগ : কমপ্লেক্সিটিজ এন্ড প্রোহিবিশনস (Dialogue : complexities and Prohibitions)। এই প্রবন্ধগুলো উপস্থাপিত করেন যথাক্রমে জর্দানের চীফ জাস্টিস এবং হাশেমী কোর্টের ইমাম ড: আহমাদ মোহাম্মাদ হুলাইল, সউদি আরবের কিং সউদ ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের প্রফেসর ড: মাজিদ মোহাম্মদ আল মাজিদ এবং সউদি আরবের মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের গবেষক ড: মাকিদ মাহমুদ আস-সাকার।

তৃতীয় ওয়ার্কিং সেশনে আলোচনা হয় 'কার সাথে আমরা ডায়ালগ করব' With whom we Hold Diagogue)-এই বিষয়ের উপর। এই বিষয়ের উপর চারটি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। পেশকৃত প্রবন্ধগুলো ছিল : এক. 'কো-অর্ডিনেশন অ্যামোং ইসলামিক অর্গানাইজেশন কনসারন্ড উইথ ডায়ালগ (Co-ordination among Islamic organizations concerned with Dialogue), প্রবন্ধের উপস্থাপক 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কাউন্সিল ফর দা'ওয়া এন্ড রিলিফ, মিসর,-এর সাধারণ সম্পাদক ড: আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ, দুই. 'ডায়ালগ উইথ ফলোয়ারস অব ডিভাইন মেসেজেস' (Dialogue with Followers of Divine Messages), এ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেবাননের 'ইসলামিক স্পিরিচুয়াল সামিট' এর সেক্রেটারী জেনারেল ড: মুহাম্মাদ আল-সামাক, তিন. 'ডায়ালগ উইথ ভেরিয়াস ফিলোসফিস' (উধঢফমথলণ শটরধমল্র দেধফস্রম-যদধণ্ড), এ প্রবন্ধ পেশ করেন ভারতের ইসলামিক ফিকাহ একাডেমির ভাইস চেয়ারম্যান শেখ বাদরুল হাসান আল-কাসামি এবং চতুর্থ. প্রবন্ধের শিরোনাম : 'ফিউচার অব ডায়ালগ ইন দ্য শ্যাডো অব রিপিটেড ইনসাল্টস টু ইসলাম' (Future of Dialogue in the shadow of Repeated Insults to Islam), এই প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মিসরের আল-আজহারের ডেপুটি ডাইরেক্টর শেখ ফউজি আল জাকজাক।

শেষ ওয়ার্কিং সেশনটি অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনের শেষ দিবসের (৬/৬/০৮) সকালের অধিবেশন হিসাবে। এ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'এরিয়াস অব ডায়ালগ' বা 'সংলাপের ক্ষেত্র'। এ বিষয়ের উপর অধিবেশনে তিনটি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। প্রথম

www.pathagar.com

প্রবন্ধটির নাম ছিল 'উফট্রদ মত উধশধফধড়র্টধমভ টভচ ঘমরফচ ণেটডণ'. দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ছিল 'Dangers of Environment' এবং তৃতীয় প্রবন্ধটির নাম, Family and ঋদধদ্র-উমববমভ ঔলবটভ ট্রযণর্দ্র'. প্রবন্ধগুলোর উপস্থাপক ছিলেন যথাক্রমে কাতারের 'কলেজ অব ইসলামিক স্টাডিজ'-এর প্রফেসর ড: মাহমুদ আহমদ গাজী, ইসলামিক এ্যাসোসিয়েশনস-এর ডাইরেক্টর জেনারেল ড: মোস্তফা আল জাব্বাখ এবং তুরস্কের 'ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক সাইন্সের প্রেসিডেন্ট ড: আলী ওজাক।

চারটি ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতিত্ব করেন ইসলামী দুনিয়ার বিখ্যাত সব ব্যক্তি। সউদি আরবের 'শূরা কাউন্সিল'-এর প্রেসিডেন্ট ড: সালেহ আব্দুল্লাহ আল-হুমাইদ প্রথম ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতিত্ব করেন। দ্বিতীয় ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতি ছিলেন ইরানের 'একাডেমী ফর ইসলামিক স্কুলস অব থট'-এর সেক্রেটারী জেনারেল শেখ মোহাম্মদ আলী তাসখেরী। বসনিয়া-হার্জেগোভিনার হেড অব ওলামা ও মুফতি ড: মোস্তফা ইবরাহীম সেরিক তৃতীয় ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতিত্ব করেন। শেষ ওয়ার্কিং সেশনের সভাপতি ছিলেন সুদানের আল-দাও'য়া আল ইসলামিয়ার চেয়ারম্যান ফিল্ড মার্শাল আব্দুর রহমান এম. সিওয়ার আল-দাহাব।

ওয়ার্কিং সেশনগুলোতে পেশকৃত প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই পরিস্কার যে, ডায়ালগ-এর ইসলামী দৃষ্টিকোণসহ ডায়ালগ সম্পর্কিত সবদিকই সম্মেলনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপনার পর এর উপর মন্তব্য ও আলোচনা হয়েছে। তার ফলে প্রবন্ধের বিষয়গুলো আরও পরিস্কার হয়েছে। চার. ওয়ার্কিং সেশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধের উপর আলোচনা ও মন্তব্যকে ভিত্তি করেই সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে 'মক্কা আপীল ফর ইন্টার-ফেইথ ডায়ালগ' নামে সম্মেলনের একটা ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছে।

এই ঘোষণা ইসলামী উম্মার পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর কাছে একটা ঐতিহাসিক দলিল। যারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বহুমাত্রিক সহাব্যস্থানের বিরোধী বলেন এবং ইসলামী আদর্শকে যারা যুক্তি, বুদ্ধি ও মুক্ত আলোচনার বিরোধী বলেন, তাদের একটা বড় জবাব সম্মেলনের এই দলিল। দলিলটির ইংরেজি ভার্সন ১৯ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। এর প্রথম ছয় পৃষ্ঠায় সম্মেলনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য ও মন্তব্যকে স্মরণ করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা হিসেবে। তারপর সম্মেলনের মূল বিষয়কে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হলো:

(ক) ডায়ালগের ইসলাম-সিদ্ধতা (Islamic legitimacy for Dialogue)

(খ) ডায়ালগের পদ্ধতি, আইন-বিধি ও মাধ্যম (Methodology, Rules, Regulations and means of Dialogue),

(গ) কার সাথে আমরা ডায়ালগে বসব (With whom we will engage in dialogue) এবং

(ঘ) ডায়ালগের ভিত্তি ও বিষয় (The Basis and themes of Dialogue)

দলিলটিতে সম্মেলনে আলোচিত এই চারটি বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ পয়েন্টভিত্তিক সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের আকিদা, বিশ্বাস, ইসলামের ইতিহাস সর্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়গুলোকে সামনে আনা হয়েছে, যা

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহর সমসাময়িক মৌল প্রয়োজনের সাথে সংগতিশীল এবং মানবজাতির শান্তি ও সংহতির জন্যেও যা অপরিহার্য।

সবশেষে দলিলটি উপসংহারে তার উদাত্ত ঘোষণায় বলেছে :

"মানবতা আজ যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন, তার মূল্যায়ন করে মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন ধর্ম, সংস্কৃতি নির্বিশেষে বিশ্বের সকল সরকার, সংস্থার সংগঠন এবং মানুষের উদ্দেশে এই আহ্বান জানাচ্ছে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে :

(এক) আপনারা এবং আমরা আসুন এই সমঝোতায় পৌঁছি যে, স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করি, একমাত্র তারই আমরা উপসানা করি এবং প্রফেটস ও মেসেনজারদের মাধ্যমে তার প্রেরিত বাণী থেকে পথ-নির্দেশ গ্রহণ করি।

(দুই) সবধরনের অবিচার, নিপীড়ন, স্বৈরাচার ও আধিপত্যবাদের- আসুন আমরা মোকাবিলা করি এবং যুদ্ধ, সংঘাত ও আন্তর্জাতিক সমস্যার অবসান ঘটাতে একে অপরকে সহযোগিতা করি। সংলাপ ও সহনশীলতার সংস্কৃতি শক্তিশালী করতে এবং সংলাপ-প্রমোটকারী প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন যোগাতে আমরা আসুন এক সাথে কাজ করি। আসুন সংলাপকে ব্যবহার করি বিশ্বশান্তি, সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যম হিসাবে। আমরা সবাই মিলে প্রতিরোধ করি মানব সম্পদের অপচয় এবং পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্যে হুমকি গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণে ব্যক্তি প্রতিভার অপব্যবহারকে।

(তিন) নৈতিক মূল্যবোধ বর্ধিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক নৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণে আসুন পরস্পরকে সযোগিতা করি, যা নৈতিক অবক্ষয়ের আগ্রাসন প্রতিরোধ করবে, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের সয়লাব প্রতিহত করবে এবং আজ পরিবার ব্যবস্থা ঘিরে যে বিপদের সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান দেবে, যাতে করে সুখি পরিবারে বাস করার সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়।

(চার) স্রষ্টা আমাদের পিতা আদম (আঃ) ও তার উত্তরাধিকারীদের সুন্দর পৃথিবী গড়ার দায়িত্ব দিয়েছেন, পৃথিবীর এই বাসিন্দাদের তাদের উত্তরাধিকারীদের প্রতিবেশীক দূষণের আগ্রাসন থেকে যে সংগ্রাম তাতে আসুন সকলে এক সাথে কাজ করি। সকলের সম্মিলিত কাজের মাধ্যমে প্রতিবেশিক ক্ষতিকে সর্বনিম্নে নিয়ে আসি যাতে তার কুফল কমানো এবং শিল্প-প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে আমরা পথনির্দেশ করতে পারি।

(পাঁচ) দুর্নীতি ও অসুখিতা দূরীকরণে আসুন বিশ্ব সমাজকে আমরা সকলে মিলে সহযোগিতা করি। আল্লাহর করুণা লাভের মাধ্যমেই এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া যায়। স্রষ্টার তরফ থেকে যে বাণী আসে রাসূল মুহাম্মদ (সা:)-এর কাছে, তার মূল কথা এটাই। যেমন বলা হয়েছে : "তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি সৃষ্টি জগতের দয়া হিসেবে। (২১ : ১০৭)।"

দলিলটিতে সব শেষে বলা হয়, "সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা সংলাপ-সংস্কৃতি এগিয়ে নেয়া এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে বিকৃত প্রচারণার সংশোধনে ইতিবাচক ফল দেয় এমন সব ইতিবাচক মিটিং, আলোচনা, সিমপোজিয়াম অব্যাহত রাখার দৃঢ় সিদ্ধান্তে একমত হয়েছে।

১০ জুলাই, ২০০৮

www.pathagar.com

মক্কা সম্মেলন এবং মাদ্রিদ সম্মেলন শুধু স্থান নয়, সবদিক থেকেই আলাদা। মক্কা সম্মেলনে সমাবেশ ঘটেছিল বিশ্বের ইসলামী সংস্থার প্রতিনিধি ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের। আর মাদ্রিদ সম্মেলনে এসেছিলেন বিশ্বের সব ধর্মের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। মক্কা সম্মেলনের বিষয় ছিল সংলাপ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা এবং শান্তি ও সহযোগিতার বিশ্ব গড়ার জন্যে ধর্ম ও নৈতিকতার দিকে বিশ্ববাসিকে আহ্বান জানানো। মাদ্রিদ সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল মানব সমাজের শান্তি ও স্থিতির জন্যে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে সংলাপের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা এবং কার্যকর সংলাপের পথ উন্মুক্ত করা। মাদ্রিদ সম্মেলনের আরেকটা লক্ষ্যও ছিল। সেটা হলো, সম্প্রীতির মাধ্যমে সহযোগিতার বিশ্ব গড়ে তোলার জন্যে আন্ত:ধর্ম ও আন্ত:সভ্যতা সম্পর্ক ও সংলাপ বিষয়ে মুসলমানদের আগ্রহ বিশ্ববাসির সামনে তুলে ধরা। ইসলামের কেন্দ্রভূমি হারামাইন শরিফাইনের খাদেম সৌদি আরবের বাদশা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ সম্মেলন আয়োজনে যে অপরিসীম আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যদিয়েই এ আগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে। আমরা বলতে পারি, মক্কা শরীফ কা'বার ছায়ায় অনুষ্ঠিত আন্তজার্তিক ইসলামী সম্মেলন ছিল মুসলমানদের আত্মপ্রস্তুতির সম্মেলন এবং মাদ্রিদ সম্মেলন ছিল নিজস্ব উদ্যোগে বহিরাঙ্গণে মুসলমানদের প্রথম পদক্ষেপ, যেখানে জমায়েত হয়েছিল সব ধর্ম, সব সংস্কৃতি এবং সব সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা। তৃতীয় মিলেনিয়ামের প্রথম শতকের শুরুতে সৌদি আরবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাদ্রিদ সম্মেলনকে আমি তাই ইসলাম ও মুসলমানদের বড় সাফল্য হিসেবে অভিহিত করতে চাই।

মাদ্রিদ সম্মেলনে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ার মত ছিল, সেটা সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতি। পরিচিত প্রায় সকল ধর্মের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব সম্মেলনে ছিল। কোন কোন ধর্ম বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। দেখা গেছে, উল্লেখযোগ্য গ্রুপগুলোকেও সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। খৃস্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দুনিয়াতে এখন সবচেয়ে বেশি। তারা বিভক্ত বহু গ্রুপে। সম্মেলনে মনে হয়েছে তাদের সবারই উপস্থিতি ছিল। সুদূর ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন ভেনেজুয়েলার বেভারেন্ট স্যামুয়েল অলসন। পরিচয় থেকে যতোটা বুঝেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন কমপক্ষে ছয়জন খৃস্টান ধর্মীয় নেতা। তাদের মধ্যে রয়েছেন রেক্টর অব অল সেইন্টস চার্চ বেভারেন্ট জর্জ এফ রেস্যান, রেইনবো পুশ কোয়ালিশনের বেভারেন্ট জেসি জ্যাকসন, ক্যাথলিক থিয়োলজিক্যাল ইউনিয়নের ড. স্কট আলেকজান্ডার। রাশিয়ান অরথডক্স চার্চের পক্ষে এসেছিলেন জর্জি রাবেক, সম্ভবত গ্রীক অরথডক্স চার্চের পক্ষে এসেছিলেন রুমানিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. এমিল কনস্টানটাইনেস্কু, তুরস্ক ও ইইউ থেকে এসেছিলেন যথাক্রমে মেট্রোপলিটান ইমানুয়েল এবং মেট্রোপলিটান ইমানুয়েল অব ফ্রান্স। বৃটেনের প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ থেকে এসেছিলেন দু'জন। তাদের রয়েছেন আর্কবিশপ অব ক্যান্টারবারি বেভারেন্ট ক্যাসন এ্যানথনি বল। আফ্রিকান চার্চ থেকে এসেছিলেন কয়েকজন। তার মধ্যে ইথিওপিয়ার অর্থডক্স চার্চের হোলিনেস আবুন পাওলো। স্পেন থেকে যোগ দেন ৪ জন খৃস্টান প্রতিনিধি। সব মিলিয়ে সম্মেলনে ৬০ জনেরও বেশি খৃস্টান প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনে ইহুদী ধর্মীয় নেতা ও প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ জন। এদের মধ্যে রয়েছেন ল্যাটিন আমেরিকার ইহুদী

www.pathagar.com

কংগ্রেসের ক্লাউডিও ইপেলম্যান, আমেরিকান ইহুদী কমিটির ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক পরিচালক চীফ রাব্বির ডেভিড রোজেন, ওয়ার্ল্ড জুইয়িশ কংগ্রেসের মিঃ মেকাইন স্লেইডার 'এলি' ওয়াইজেল সেন্টার ফর জুডাইক স্টাডিজের পরিচালক ড. স্টিভেন টি. কার্টজ, ইউনিয়ন ফর রিফরম জুদাইজম-এর পরিচালক রাব্বি স্কট পার্লিংসহ গুরুত্বপূর্ণ ইহুদী ধর্মীয় নেতাগণ। হিন্দু ধর্মেরও শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব সম্মেলনে ছিল। হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে হাজির ছিলেন শঙ্করাচার্য ওঙ্কার আনন্দ, সরস্বতীজী মহারাজ, হিন্দু আর্য সমাজের নেতা স্বামী অগ্নি ভেশজী এবং ড. এমএম ভারমা। শিখ ধর্ম নেতাদের মধ্যে হাজির ছিলেন দিল্লী গুরুদুয়ারা রাকাব গঞ্জ সাহিব এর প্রধান প্রেমজিত সিং সারনা এবং প্রফেসর মানজিত সিং। বৌদ্ধ ধর্মনেতারাও হাজির ছিলেন সম্মেলনে। তাদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধিষ্ট সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার সহসভাপতি শ্রীরাম পাল সিং গৌতম, চীনের বৌদ্ধ সমিতির সহসভাপতি জে চেং এবং আন্তর্জাতিক বুদ্ধিষ্ট কনগ্রেগেশনের সভাপতি ফাদার ক্রিশ্চিয়ান ভ্যান নিসপেন। চীনের 'তাও' ধর্মমতের নেতা 'চায়না তাওইজম এ্যাসোসিয়েশন' সহ-সভাপতি ঝাং জু এবং 'শিং তাও শিন' সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। জাপানের ধর্মীয় নেতা কুনিহিকো শিমামতো এবং হিবোমী ইয়ানু তাদের ধর্মমতের প্রতিনিধিত্ব করেন সম্মেলনে। মাদ্রিদের আন্তঃধর্ম সংলাপ-সম্মেলনের উদ্যোক্তা সৌদি আরবের বাদশাহ, মানে মুসলমানরা। সেই হিসাবে সম্মেলনে মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। গোটা দুনিয়া থেকে এসেছিলেন মুসলিম প্রতিনিধিরা। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে এসেছিলেন ল্যাটিন আমেরিকার 'অর্গানাইজেশন অব দি ইসলামিক ফেইথ'-এর জেনারেল সেক্রেটারি মুহাম্মদ ইউসুফ হাল্লার। স্পেন থেকে এসেছিলেন তিনজন। তাদের মধ্যে রয়েছেন মাদ্রিস ইসলামিক সেন্টারের ডাইরেক্টর ড. ইব্রাহিম আব্দুল আজিজ আল-জায়েদ এবং মালাগা ইসলামিক সেন্টারের ডাইরেক্টর ড. সালেহ মোহাম্মদ আল-সেনেডি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেসন্সের নিহাদ আওয়াদ হামাদ, ওয়াশিংটন ডিসি'র 'সেন্টার ফর ফেইথ ইন পাবলিক পলিসি' ড. নাজির খাজা, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা' এর সাঈদ এম সাঈদ প্রমুখসহ কয়েকজন। দু'জন এসেছিলেন জার্মানী থেকে। তারা ড. আইয়ুব এ্যাকসেল কোহলোর এবং ড. নাদিম ইলিয়াস। দু'জনেই 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব মুসলিমস ইন জার্মানী'-এর নেতা। ডেনমার্ক থেকে এসেছিলেন ইসলামিক কাউন্সিল ডেনমার্কের আব্দুল ওয়াহিদ পেডারসন। বৃটেন থেকে এসেছিলেন চার পাঁচজন মুসলিম প্রতিনিধি। সম্মেলনে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিলো প্রায় ৮০ জনের মতো। এদের অধিকাংশই এসেছিলেন মুসলিম দেশগুলো থেকে। এদের মধ্যে ছিলেন, মুসলিম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের সেক্রেটারি জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ আল-তুর্কি, সৌদি শূরা কাউন্সিলের ড. সালেহ আব্দুল্লাহ বিন হামিদ, ড. আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফসহ মুসলিম বিশ্বের ইসলাম-বিশেষজ্ঞ ও ইসলামী চিন্তাবিদরা।

ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন ডায়ালগ-এর উদ্বোধনী অধিবেশন বসে কনফারেন্সের প্রথম দিন ১৬ই জুলাইয়ের বেলা দুইটায়। কনফারেন্সের ভেন্যু ছিল মাদ্রিদের' হোটেল অডিটোরিয়াম। হোটেলটি যেমন বিশাল, তেমনি তার লাউঞ্জগুলো এবং হলগুলোও বড় বড়। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্যে উপযুক্ত জায়গা। কিন্তু উদ্বোধনী অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের উপকণ্ঠে স্পেনের 'এলপারদো' প্যালেসে। উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরবের বাদশাহ এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তা

www.pathagar.com

বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ, স্পেনের রাজা জোয়ান কার্লোস, মুসলিম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের ড. আব্দুল্লাহ আল তুর্কি এবং স্পেনের প্রধানমন্ত্রী জোস লুইস রডরিগেজ জাপাটেরো। এছাড়াও ছিলেন বৃটিশ সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার নেতা এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেসি জ্যাকসন। সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে বাদশাহ আব্দুল্লাহ ছোট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দেন; যা বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের পক্ষ থেকে একটা ঐতিহাসিক একটা মেসেজ। তিনি বিসমিল্লাহ পাঠ করার পর পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত পাঠ এবং মহানবী (সাঃ) ও নবীদের প্রতি সালাম প্রেরণের মাধ্যমে তার বক্তৃতা শুরু করেন। আয়াতটি হলো : "হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজোড়া নারী-পুরুষ থেকে এবং তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে-অপরের সাথে পরিচিত হও। শোন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই বেশি সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ।" আয়াতটি তেলাওয়াতের পর তিনি বলেন, 'শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সকল নবী-রাসূলদের উপর।' তিনি বক্তৃতায় বলেন :

"আমার দাওয়াতে আপনারা সাড়া দিয়েছেন, সে জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং অভিনন্দিত করছি। আপনারা মানবতার সেবায় যা করছেন তাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি। আমি স্পেনের রাজা জোয়ান কার্লোস ও তার জনগণকে এই সম্মেলনের আয়োজনকে তাদের দেশে স্বাগত জানানোর জন্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্পেনের এই গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্য রয়েছে যে, খৃস্টান, মুসলমান, ইহুদী ও অন্যান্য ধর্মের লোক এখানে সহাবস্থান ও শান্তির মধ্যদিয়ে বাস করেছে এবং মানবতার অগ্রগতিতে অপরিসীম অবদান রেখেছে।

দুই পবিত্র মসজিদের দেশ এবং প্রতিটি মুসলমানের প্রিয়তম জায়গা থেকে সদ্য সমাপ্ত মক্কা সম্মেলনের স্কলারস ও থিঙ্কারসসহ ইসলামী বিশ্ব (উম্মাহ)-এর পক্ষে মেসেজ নিয়ে এসেছি আমি। এই মেসেজের ঘোষণা এই যে, ইসলাম সহনশীলতা ও মধ্যমপন্থার ধর্ম। এই মেসেজ সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপের আহ্বান জানায় এবং আল্লাহ চাহে 'সংঘাতের বদলে সংহতি'র এক নতুন পৃষ্ঠার উন্মোচন এই মেসেজের প্রতিশ্রুতি।

আমরা এক আল্লায় বিশ্বাসী। তিনি মানবতার ইহজাগতিক ও পরজাগতিক কল্যাণের জন্যে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর। মানুষ বিভিন্ন বিশ্বাস ও জাতিতে বিভক্ত থাকবে, এটা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি অন্যরকম চাইতেন, তাহলে গোটা মানবজাতি একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো। আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এটাই নিশ্চিত করতে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের যে সুখ চেয়েছেন তা ধর্মই এনে দিতে পারে। সুতরাং মানুষের সুখ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ধর্মই নিশ্চিত মাধ্যম হওয়া উচিত।

সুতরাং এটা আমাদের দায়িত্ব একথা বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করা যে, মতদ্বৈততা যেন সংঘাত-সংঘর্ষের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে না যায়, একথাও বিশ্বকে বলা যে, মানব ইতিহাসে যেসব বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটেছে, তার জন্যে ধর্মের উপর দোষ চাপানো ঠিক নয়। এর জন্যে দায়ী চরম পন্থা, যা প্রতিটি ঈশ্বরিক ধর্ম ও প্রতিটি রাজনৈতিক মতবাদের কিছু অনুসারীর উপর বর্তায়।

www.pathagar.com

মানবতা আজ মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আদর্শিক বিভ্রান্তিতে ভুগছে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষ সংকটজনক পর্যায় আজ অতিক্রম করছে। মানুষ আজ দেখছে অপরাধের মারাত্মক বিস্তৃতি, সন্ত্রাসের বিস্তার, পরিবার ব্যবস্থার খণ্ড-বিখণ্ড দশা, মাদকজনিত কারণে যুবমনের বিকৃতি এবং সবলের দ্বারা দুর্বলের শোষণ ও অবাঞ্ছিত বর্ণবাদ প্রবণতা। এ সবই মানুষের আধ্যাত্মিক বিচ্যুতির ফল। এই বিচ্যুতি ঘটে যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। আর মানুষ আল্লাহকে ভুলে গেলে মানুষ নিজেদেরকেও ভুলে যেতে বাধ্য হয়। সংলাপের মাধ্যমে ধর্ম ও সভ্যতাসমূহের মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ছাড়া মানবতার এই সংকটের কোন সমাধান নেই।

আগের অধিকাংশ সংলাপ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অস্থিরতা অবসানের বদলে বিতর্ক বাড়ানো এবং বিভেদ উস্কে দেয়ার অর্থহীন পদক্ষেপ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অথবা অনেক ক্ষেত্রে তা ধর্মগুলোকে ঘনিষ্ঠ করতে গিয়ে ধর্ম ও আদর্শের বিরোধটাকেই মুখ্য করে তুলেছে। এ ধরনের প্রচেষ্টা আসলেই অর্থহীন। কারণ প্রত্যেক অনুসারীই তার ধর্মকে সত্য বলে মনে করে এবং বিকল্প কিছু গ্রহণ করতে সাধারণভাবে রাজি হয় না। আমরা যদি এই ঐতিহাসিক সম্মেলনকে সফল করতে চাই, তাহলে স্রষ্টার উপর গভীর বিশ্বাস, মহৎ নীতি-নিয়ম এবং নৈতিক মূল্যবোধের মত সব ধর্মের মূল বিষয়গুলোর উপর জোর দিতে হবে, যা আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

এই গ্রহ এবং এই গ্রহের সবকিছু ধ্বংসের নিমিত্ত মানুষ হতে পারে। আবার মানুষই এই পৃথিবীকে শান্তি ও স্বস্তির মরুদ্যানে পরিণত করতে পারে, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, আদর্শ ও দর্শনের অনুসারীরা সহাবস্থান করতে পারবে, যেখানে মানুষ একে অপরকে সসম্মানে সহযোগিতা করবে এবং সন্ত্রাসের বদলে সংলাপের মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর দয়ায় মানুষ আরও সক্ষম ভালোবাসার দ্বারা ঘৃণার এবং সহনশীলতার মাধ্যমে গোঁড়ামীর অবসান ঘটাতে যা মানুষকে সেই মর্যাদায় সমাসীন করবে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের দান করছেন।

আসুন আমাদের সংলাপ অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাসকে, পাপের উপর পুণ্যকে বৈষম্যের উপর সুবিচারকে, যুদ্ধ ও সংঘাতের উপর শান্তিকে এবং বর্ণবাদের উপর ভ্রাতৃত্বকে বিজয়ী করতে সফল হোক।

আমি আল্লাহর নামে কথা শুরু করেছিলাম, তারই কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে আমি কথা শেষ করছি। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।"

বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজের উদ্বোধনী বক্তব্যের পুরোটাই আমি এখানে তুলে ধরলাম এই কারণে যে, এই বক্তব্যে শুধু সম্মেলন নয়, আমাদের সমসাময়িক পৃথিবীর জন্যে একটা সুস্পষ্ট মেসেজ আছে ইসলামের পক্ষ থেকে। বাদশাহ আব্দুল্লাহ সম্মেলনে নিজেকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মার পক্ষ থেকেই নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন। সুতরাং তাঁর কথাগুলো সত্যিই এক ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। তাঁর বক্তব্যের কয়েকটি দিক ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা-পীড়িত আজকের বিশ্বের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন :

(ক) শুরুতেই সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের তিন শতাধিক নেতার সামনে এবং বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফের যে আয়াতে কারিমা তিনি পাঠ করেছেন, তা প্রমাণ করে

www.pathagar.com

কুরআন এবং মুসলমানরা অন্যান্য ধর্ম ও জাতির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নয়, তাই সহাবস্থানেরও বিরোধী নয়।

(খ) দুনিয়া জুড়ে আজ প্রপাগান্ডা চালানো হচ্ছে, ধর্মই যুদ্ধ-সংঘাতের উৎস। যুদ্ধ-সংঘাত সব ধর্মের কারণেই সংঘটিত হয়েছে। বাদশাহ এই অপপ্রচার প্রত্যাখ্যান করে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, যুদ্ধ-সংঘাতের ধর্মের উপর চাপানো যায় না। বিভিন্ন ধর্মসহ দুনিয়ার ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের চরমপন্থী কিছু লোকের কারণেই যুদ্ধ-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে।

(গ) দুনিয়ার মানুষ আজ বিভিন্ন অপরাধের বিস্তারসহ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত। মানুষ আজ তার মানবিক মর্যাদা ভুলে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের আত্মহনন করছে। বাদশাহ আব্দুল্লাহ মানুষের এই অবস্থাকে স্রষ্টাকে ভুলে যাবার ফল বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, স্রষ্টাকে ভুলে গেলে মানুষ নিজের পরিচয়-মর্যাদাকেও ভুলে যায় এবং তারই ফলে সীমাহীন সব অপরাধ ও সংকটে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

(ঘ) সংলাপ ব্যাপারে বাদশাহ আব্দুল্লাহ সহমর্মীতা ও সহযোগিতার পথ হিসাবে একটা মৌলিক বিষয়ের দিকে সকলকে আহ্বান করেছেন। তিনি বলেছেন, অতীতে ব্যর্থতা এড়াতে হলে প্রথমেই বিরোধ নিরসনের আলোচনায় না গিয়ে বিভিন্ন ধর্মের ঐকমত্যের দিক যেমন স্রষ্টায় গভীর বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতার প্রতি নিষ্ঠা এবং আদর্শিক মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

আজকের করণীয় বিষয় সম্পর্কে বাদশাহ আব্দুল্লাহ তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে আরও অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। তবে উপরোক্ত কয়েকটি বিষয় আজকের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে তিনি বাদশাহ আব্দুল্লাহকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মার পক্ষ থেকে এই সত্যগুলো বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার তৌফিক দিয়েছেন। (চলবে)

বাদশাহ আবদুল্লাহ তার উদ্বোধনী ভাষণে যে কথাগুলো বলেছেন, উদ্বোধনী অধিবেশনের অন্যান্য বক্তার কণ্ঠেও তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। স্পেনের রাজা জোয়ান কার্লোস বলেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, সংলাপ ও সহযোগিতা জোরদার করতে আমরা সব সময়ই আগ্রহী। আশার আশা, মাদ্রিদ সম্মেলন সফল হবে।" সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেন, "বাদশাহ আবদুল্লাহর উদ্যোগে পৃথিবীর সব ধর্মের ধর্ম নেতাদের অংগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন সত্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার নেতা এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেসি জ্যাকসন বলেন, "এটা খুব বড় একটা পদক্ষেপ। বাদশাহ আবদুল্লাহ তার নৈতিক শক্তি ও অধিকার বলে এ সম্মেলন আহ্বান করেছেন, যা সকলের জন্যে কাজ করার একটা কমন গ্রাউন্ড। এটা একটা খুব বড় ঘটনা।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর সম্মেলনের ওয়ার্কিং সেশন শুরু হয়। ওয়ার্কিং সেশন ছিল চারটি। সম্মেলনের বিষয়গুলোকে চারটি সেশনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। সম্মেলনের বিষয়গুলো ছিল ঃ

(ক) বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় সংলাপ

(খ) মানব সমাজের জন্যে সংলাপের গুরুত্ব

www.pathagar.com

(গ) সংলাপের ক্ষেত্রে সাধারণ মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব

(ঘ) সংলাপের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি

(ঙ) সহাবস্থান ও সংলাপ-সংস্কৃতির বিকাশ-বিস্তার

সম্মেলনের উপরোক্ত মূল বিষয়কে চারটি ওয়ার্কিং সেশনের আলোচনায় বিভিন্ন শিরোনামে নিয়ে আসা হয়। প্রথম ওয়ার্কিং সেশনের শিরোনাম ছিল, 'সংলাপের ধর্মীয় ও সভ্যতাগত ভিত্তি (উধটফমথলণ ধ্র্ রণফধথধমল্র টভঢ ডধশধফধড়র্টধমভ তমলভ-ঢর্টধমভ)'। দ্বিতীয় ওয়ার্কিং সেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'মানব সমাজে সংলাপের গুরুত্ব (Dialogue : its importance in Human society)'। 'সংলাপের সাধারণ মানবিক দিক' ছিল তৃতীয় ওয়ার্কিং সেশনের বিষয়। চতুর্থ সেশনে আলোচনা করা হয় 'সংলাপের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি' শীর্ষক বিষয়ের ওপর। আর ৫ম সেশনের বিষয় ছিল 'সহাবস্থান ও সংলাপ-সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার।' সমাপ্তি অধিবেশনে মাদ্রিদ সম্মেলনের ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। এই ঘোষণা ছিল তিন দিনের মাদ্রিদ সম্মেলনের একটা রেজাল্ট। ঘোষণা হিসাবে এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক দলিল।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনটি শুরু হয় ১৬ই জুলাই সন্ধ্যা ৭টা তিরিশ মিনিটে। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাদের জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ওয়ার্ল্ড পিস সামিট-এর সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ বাবা জেইন। বিভিন্ন ধর্মে সংলাপের অবস্থার উপর সম্মেলনে চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। 'ইসলামে সংলাপ'— এই বিষয়ের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন ডঃ হোসাইন হামিদ হাসান। তিনি বলেন, " ইসলামের অনুসারী হিসাবে মুসলমানরা অমুসলিমদেরকে মানব প্রজাতি ও তার উদ্ভবের দিক থেকে সমান দৃষ্টিতে দেখে থাকে। মহত্ত্ব ও নিরপেক্ষতা সুবিচারের ভিত্তি এবং কুরআনের নির্দেশ অনুসারে মুসলমানরা এই সুবিচারের অনুসারী। মুসলমানরা শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এবং কখনই সংঘাত শুরু করে না। মুসলিম দেশগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার যে শুধু সদস্য তাই নয়, এই মানবাধিকার ঘোষণার সাথে ইসলাম মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকেও যুক্ত করে।" পোপ দ্বিতীয় সেনুডা—এর উপদেষ্টা এবং মিসরের হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের খৃস্টান নেতা নাজিব জিব্রাইল 'খৃস্টধর্মে ডায়ালগ' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "আমাদেরকে সংঘাত এড়িয়ে, অন্যের উপর বিশ্বাস চাপিয়ে দেবার বদলে কমন প্ল্যাটফরমের সন্ধান করতে হবে। পরার্থে কাজ, সহযোগিতা, অভাবীদের সাহায্য করা ইত্যাদি প্রত্যেক ও প্রতিটি ধর্মের লক্ষ্য। এগুলো আমাদেরকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ করে। আর সংলাপের লক্ষ্য আমাদের জন্যে একটা সাধারণ ভিত্তি তৈরি করা যা আমাদেরকে ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করবে। যাতে আমরা একে অপরের আয়না হতে পারি। আমরা বিভিন্ন পন্থায় একই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হিসাবে ধর্মকে দেখবো। আমাদের মত-পার্থক্য আসলে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ। আমাদেরকে অবশ্যই পথ বের করতে হবে যা আমাদের শিক্ষা দেবে কি করে একই কথা বিভিন্ন পন্থায় বলা যায়। মিসরে আমরা খৃস্টানরা মুসলিম ভাইদের সাথে সুখে-শান্তিতে বাস করছি। এক সঙ্গে চলার এ এক দৃষ্টান্ত। যখন নেতিবাচকতা ও হতাশার উদ্ভব ঘটানো হয়, তখন ধর্মের উগ্র ব্যবহার হতে পারে। এটা যাতে না হয় এ জন্যে সংলাপ ও সম্পর্ক খুবই জরুরি। এই বিষয়টির দিকে চোখ রাখার জন্যে ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের অধীনে একটা 'হিউম্যান রাইটস

www.pathagar.com

সেন্টার' প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।" প্রথম অধিবেশনে এরপর 'ডায়ালগ ইন জুদাইজম' (ইহুদী ধর্মে সংলাপ) বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ইহুদী নেতা 'আপীল কনসাইন্স ফাউন্ডেশনের' প্রতিষ্ঠাতা রাব্বি আর্থার স্নেইডার। তিনি বলেন, "মাদ্রিদের এই আন্তঃধর্ম সংলাপ-সম্মেলন অতীতের সব ধর্মীয় সংলাপ থেকে আলাদা একটি বিশেষ কারণে। সেটা হলো, হিজ ম্যাজেস্টি কিং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ তার ব্যক্তিগত উপস্থিতি দ্বারা এই সম্মেলনকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর প্রভাব সম্মেলনকে অধিকতর কার্যকরী রূপ দিয়েছে।" ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "ঈশ্বরের সব সন্তানের প্রতি ভালোবাসা'- এটা ইহুদী নীতিবোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অস্থির এক সময়ের মধ্যে বাস করছি যা এক ভুল বুঝাবুঝি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে এই ব্যবধান দূর করা যায়? এক বাক্যে আমরা সভ্যতার দ্বন্দ্ব (Clash of civilization) তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এই ব্যবধান দূর করতে পারি। এন্টি সেমেটিজম ও ইসলাম-ফোবিয়া একটা ঝড়। আরব-ইসরাইল সংঘাতের অবসান ঘটাতে হলে পরস্পরের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি প্রয়োজন।" তিনি সিনাগগ ধ্বংসের পরবর্তী তাঁর তিক্ত দিনগুলোর কথা স্মরণ করে বলেন, "২০০১ সালে জাতিসংঘ সর্বসম্মতভাবে ধর্মীয় স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধানের বিষয়কে অনুমোদন করেছে। ধর্মীয় সংস্থা-সংগঠনকে মানবাধিকার রক্ষায় সামনের সারিতে থাকতে হবে।"

প্রথম অধিবেশনে আরও বক্তব্য রাখেন ভারতের 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর ডায়ালগ'-এর চেয়ারম্যান ড. এমএম ভারমা। 'হিন্দু, বৌদ্ধ, শিনটো, কনফুসিয়ানসহ ওরিয়েন্টাল ধর্মসমূহে ডায়ালগ' বিষয়ে তিনি বক্তব্য পেশ করেন। ড. ভারমা তার বক্তব্যের শুরুতেই সহাবস্থানের মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "সবার কথা শোনা একটা ভালো কালচার।" তিনি ধর্মসমূহের সাজুয্যপূর্ণ দিকের প্রতি জোর দেয়ার বিষয় সামনে এনে বলেন, কোন ধর্মই অন্য ধর্মের সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ, শিক্ষা-সংস্কৃতির দাবিই হলো মৌলিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি স্বীকৃতি যার মধ্যে রয়েছে সহনশীলতা, সম্মান ও সংলাপের মতো বিষয়। হিন্দু নেতা ড. ভারমা বলেন, "এক স্রষ্টায় বিশ্বাসের বিষয় ছাড়াও ধর্মসমূহের মধ্যে সাজুয্যপূর্ণ বিষয় অনেক আছে। ধর্মসমূহ আধ্যাত্মিকতার উজ্জীবন ছাড়াও সুস্বাস্থ্যপূর্ণ ও সামাজিক পরিবেশ গঠনের জন্যে কাজ করে।" তিনি বলেন, "সংলাপের ভিত্তি সমতার শিক্ষা। কারণ পয়গম্বর বলেছেন যে, 'ইহুদীরাও মুসলমান।" তিনি উল্লেখ করেন, "পয়গম্বর, বার্তা বাহকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, ইহুদী সকলেই তাদের ঈশ্বর-স্তুতির মাধ্যমে ভক্তিরই উত্থান ঘটায়।" উপসংহারে তিনি বলেন, "সংলাপের প্রতিটি উদ্যোগই নতুন যাত্রা। শান্তি ও মূল্যবোধের উজ্জীবন দ্বারা বিশ্বকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।" প্রথম অধিবেশনের চেয়ারম্যান ড. বাবা জেইন তার সভাপতির মন্তব্যে বলেন, "সম্মেলনের এই বড় ঘটনা সৌদি আরবের চমৎকার একটি অবদান।" তিনি বলেন, "পৃথিবীর সব সমাজই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়- এই তিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক নেতারা ধর্মীয় নেতাদের সমর্থন চান, কারণ এদের উপর আছে জনগণের সমর্থন।" ড. জেইন বলেন, সংলাপ এবং মনোযোগ সহকারে ও সক্রিয়ভাবে অন্যের কথা শোনা খুবই জরুরি। অন্যকে অনুধাবন করা ও জ্ঞানার্জন এই অভ্যাসের মাধ্যমেই সম্ভব।"

www.pathagar.com

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ১৭ই জুলাই বেলা দশটায় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় সৌদি আরবের 'শুরা কাউন্সিল'-এর প্রেসিডেন্ট ড. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদের সভাপতিত্বে। এ অধিবেশনের আলোচনার বিষয় ছিল: মানব সমাজের জন্যে সংলাপের গুরুত্ব (The Importance of Dialogue in Human society)। অধিবেশনের এই মূল বিষয়কে চারটি শিরোনামে ভাগ করা হয় এবং চারজন উপস্থাপক চার বিষয়ে তাদের বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তব্যের চার বিষয়ের উপর আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। এই দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রথম বক্তব্য রাখেন 'World Parliamentary Council for Religion and Peace'-এর জাপান কমিটির প্রেসিডেন্ট মিঃ Nichico Niwano (নিচিকো নিউওয়ানো)। 'ডায়ালগ এন্ড ইন্টার‍্যাকশন অব সিভিলাইজেশনস এন্ড কালচারস (Dialogue and Interaction of civilization and cultures) বিষয়ের উপর তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সংঘাত মোকাবিলার ক্ষেত্রে ডায়ালগের কোন বিকল্প নেই। তিনি উল্লেখ করেন, "আমরা সব মানুষরা পৃথিবী নামক এক তরীতে সফর করছি। আবহাওয়ার পরিবর্তন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দুই-ই আমাদের গ্রহকে আহত করে এবং এই দুই আঘাতকে আলাদা করে দেখার অবকাশ নেই। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নিচিকো নিউওয়ানো বলেন, "সম্প্রতি আমাদের (জাপানের) প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, 'পৃথিবীর সমস্যা কোন একক দেশ একা মোকাবিলা করার সামর্থ্য রাখে না।' ইন্ডিভিজুয়াল এই অক্ষমতা প্রমাণ করে জনগণ অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপ অপরিহার্য।" অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন রয়্যাল মরক্কান একাডেমি'র মেম্বার ড. আবদেল হাদী আল-তাজী। তার উপস্থাপনার বিষয় ছিল : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংলাপের গুরুত্ব (The impact of Dialogue on International Relations). তিনি বলেন, "আল-কুরআন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত সংলাপ সম্পর্কে বলেছে। আমাদের পূর্বসূরিরা ছিলেন আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান। তারা সংলাপের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতেন। ডায়ালগ আমাদের হাতের এমন একটা সম্পদ যার ব্যবহার আমরা এখনও করিনি।"

ড. আবদেল আল তাজী অতীতের আন্তঃধর্ম সহযোগিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, "দশম শতাব্দীতে স্পেনের রাজা আল-ফনসোর শাসনকালে তিনি তার সন্তান সানসোর আকস্মিক বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। রাজা আল-ফনসো মরক্কোর সুলতান আল-ইউসুফের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই সুলতান ইউসুফ একদল সৈন্যকে স্পেনে পাঠান এবং স্পেন-রাজার কর্তৃত্ব স্পেনে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।" ড. আল-তাজী আরেকটি দৃষ্টান্তে সুলতান জলিল ও স্পেনের রাজা জোয়ান দ্বিতীয়-এর বন্ধুত্বের কথা তুলে ধরে একে পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক হিসেবে উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের তৃতীয় উপস্থাপক ফিলিপাইনের কংগ্রেসম্যান ও পার্লামেন্টের সাবেক প্রেসিডেন্ট Pr. Jose De Venecia 'নৈতিকতাবোধের উন্নয়নে ডায়ালগের গুরুত্ব' (The Impact of Dialogue in the Promotion of Ethics) বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "বিশ্বে নৈতিকতার উজ্জীবন ছাড়া বিশ্ব-ব্যবস্থা টেকসই হতে পারে না।" ড. জোস ভানেসিয়া সমঝোতায় পৌঁছার ক্ষেত্রে দুই প্রধান নীতি বোধকে অপরিহার্য হিসেবে তুলে ধরেন। সে দু'টি নীতিবোধ হলো, 'তুমি যে ধরনের ব্যবহার চাও, সে ধরনের ব্যবহার তুমি অন্যের সাথে কর' এবং 'আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান।' তিনি মন্তব্য করেন, "বিশ্ব-

www.pathagar.com

নৈতিকতা কিন্তু বিশ্বাসের বিকল্প নয়।" তিনি বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিকে আমাদের বর্তমান জীবনের অস্থিরতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "ধর্ম আমাদের প্রয়োজন এবং প্রয়োজন ধর্ম ও নৈতিকতাভিত্তিক শক্তিশালী মূল্যবোধ।" ফিলিপাইনের কংগ্রেসম্যান তার বক্তব্যে জাতিসংঘের অধীনে 'ইন্টার-ফেইথ কাউন্সিল' গঠনের এবং সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ এবং স্পেনের রাজা জোয়ান প্রথম কার্লোসকে নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। এ অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ইসলামিক স্টাডিজ'-এর প্রেসিডেন্ট ড. রিজওয়ান নায়েফ আল-সাঈদ। 'Dialogue in the face of advocacy of clash of civilization ('সভ্যতার-সংঘাত' শীর্ষক প্রপাগান্ডার প্রেক্ষাপটে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা) বিষয়ের উপর তিনি বক্তব্য রাখেন। তিনি 'সংঘাত' ও 'এন্ড অব হিস্ট্রি' শীর্ষক শ্লোগানের মোকাবিলায় ডায়ালগকে প্রতিবিধান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "ডায়ালগ বা সংলাপে একমুখীতা তখনই আসবে, যখন বিভিন্ন মতের মানুষ ও ধর্মসমূহের মধ্যেকার সাধারণ সাজুয্যের দিকটা সংলাপের বিষয় হয়ে উঠবে।" তিনি বলেন, "অধিকাংশ মুসলমান সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের বিরোধিতা করেছে। মুসলমানরা আজকের দুনিয়ার একমাত্রিক নীতির প্রধান শিকারে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ যুদ্ধ-সংঘাত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু কারণটা ধর্মীয় নয় বরং স্ট্র্যাটেজিক ও রাজনৈতিক। এটা প্রমাণ হয়েছে যে, ধ্বংসাত্মক সব তত্ত্ব সামনে আনা হয়েছে কাল্পনিক শত্রুকে লক্ষ্য করে, যাতে যুদ্ধকে যৌক্তিক করা যায়। এখন সমস্যা হলো এ থেকে উত্তরণ কিভাবে। এর উত্তর সংলাপে নিহিত। মাত্র সংলাপের দ্বারাই ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির একমাত্রিক পলিসির আমরা অবসান ঘটাতে পারি।"

দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয় ১২টায়। আধা ঘণ্টা বিরতির পর সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় 'সংলাপ মানবতার সাধারণ সম্পদ' বিষয়ের উপর। এই অধিবেশনে বলা হয়, সংলাপের মাধ্যমে মানুষের সাধারণ মূল্যবোধের উজ্জীবন সম্ভব। এ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ভারতের 'সনাতন ধরম এসোসিয়েশনের নেতা শংকরাচার্য ওঙ্কার আনন্দ স্বরস্বতি, 'কাউন্সিল ফর আমেরিকান ইসলামিক বিলেশন্স'-এর ডাইরেক্টর ড. নিহাদ আওয়াদ হামাদ, 'ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর দি রিঅ্যাপ্রোসমেন্ট বিটউইন ইসলামিক স্কুলস অব থট'-এর জেনারেল সেক্রেটারী ইরানের শেখ মোহাম্মদ আলী তাশখেরী এবং ভ্যাটিক্যানের 'পনটিফিসিয়াল ফর এরাবিক স্টাডিজ'-এর বেক্টর মিগেল এ্যাঞ্জেল আয়ুসু গুক্জট। ভারতের সনাতন ধর্মের নেতা শংকরাচার্য ওঙ্কার আনন্দ 'Religion and family and their role in social stability' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'এই সম্মেলনের মত বড় ঘটনা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের পক্ষ থেকে শান্তির আহ্বান।' এই বিষয়টিকে সামনে এনে তিনি বলেন, "ধর্মই আমাদের মধ্যে অহিংস মনোভাবের সৃষ্টি করে। আমাদের এটা শিক্ষা দিতে হবে যে, আমরা সব মানুষরা সবাই সমান। শংকরাচার্যের মতে, যে কেউ কিছু লোকের আদর্শ হতে পারে। তবে সমাজের আসল ভিত্তি হলো নারীরা। একইভাবে পরিবার হলো সহাবস্থানের মূর্তিমান নমুনা।' এ অধিবেশনে 'আধুনিক মানব-সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতা' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন 'কাউন্সিল ফর আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন্স'-এর ডাইরেক্টর ড. নিহাদ আওয়াদ হামাদ। তিনি বলেন, "আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সাথে যা সংশ্লিষ্ট এমন নৈতিক বিধি তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু নৈতিকতার সংজ্ঞায়ন খুব সহজ নয়।

www.pathagar.com

নীতি ও নৈতিকতার সরল অর্থ হলো- নীতি-নৈতিকতা আপনাকে বলে, তুমি তাই কর যা তুমি চাও অন্যেরা তোমার জন্যে করুক।" ইরানের শেখ মোহাম্মদ আলী আল-তাশখেরী 'অপরাধ প্রতিরোধে ধর্ম ও মূল্যবোধের গুরুত্ব' বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, "নিরীশ্বরবাদিতা হলো বিশ্বাসের অভাব। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া মানুষের প্রাকৃতিক অভ্যাস, কিন্তু ভিত্তি হিসেবে কিছু মূল্যবোধের প্রতি আমাদের বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। ভ্যাটিক্যানের 'পনটিফিসিয়াল ইনস্টিটিউটের এরাবিক স্টাডিজ-এর বেষ্টর মিগেল অ্যাঞ্জেল আয়ুসু গুক্‌জট পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণের প্রশ্নে মানব সমাজ-রক্ষার চেষ্টার সাথে সাথে প্রতিবেশ-পরিবেশ রক্ষার উপর জোর দেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের শেষ অধিবেশন হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ অধিবেশন। শুরু হয় রাত সাড়ে ৭টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও আর্জেন্টিনা অঞ্চলের জুইস কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি রাবিব ক্লাউডিও ইপেলম্যান। এ অধিবেশনের বিষয় ছিল 'ডায়ালগ-এর অগ্রগতি ও মূল্যায়ন' (Evaluation and Promotion of the dialogue)। ইউনাইটেড আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের কালচারাল এ্যাফেয়ার্সের কাউন্সিলর ড. ইজ্জেলদীন ইবরাহিম মোস্তফা 'ইসলাম, খৃস্ট ও ইহুদী ধর্মের সংলাপে নতুন দিগন্ত' (The Dialogue between Islam, Christianity and Judaisn : future and Horizons) বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি ৪০ বছর বিভিন্ন আন্তঃধর্ম সংলাপে যোগ দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'প্রথম পর্যায়ের অতি আশাবাদের পর সন্দেহ-প্রবণতার পর্যায় আসে, যা আলোচনাকে হতাশার দিকে নিয়ে যায়। এই অতীত সত্ত্বেও আমি আজ আশাবাদী যে রোম, বৈরুত ও মক্কা এই তিন নগরী আজ নতুন উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দু।' অধিবেশনের অন্য বক্তা চীনের বুদ্ধিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর জু চেং বক্তব্য রাখেন 'প্রাচ্য দেশীয় ধর্ম বিশ্বাসের সংলাপের নতুন দিগন্ত (The Dialogue with Oriental beliefs : future and horizons) শীর্ষক বিষয়ের উপর। তিনি বলেন, 'সকল ধর্মের মধ্যেকার সাদৃশ্যপূর্ণ মূল্যবোধ সকলকে শান্তিতে বসবাস করতে শেখায়। আমরা যুদ্ধ, প্রতিবেশীক বিপর্যয়, অতি জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার মত যে সব বিপদ আমরা মোকাবিলা করি, তার বিরুদ্ধে বিশ্বভিত্তিক উদ্যোগ প্রয়োজন যার ভিত্তি হতে পারে আমাদের 'কমন গ্লোবাল ইথিকস'। অধিবেশনের তৃতীয় বক্তা 'জর্দানিয়ান সেন্টার ফর রিসার্চ অন ইন্টার ফেইথ কো-একজিস্‌টেন্স'-এর নির্বাহী ডাইরেক্টর ফাদার ইকোনোস নাবেল হাদ্দাদ 'ডায়ালগকে শক্তিশালি করা এবং বাধাসমূহ দূর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের চেষ্টা' (The efforts of States and International Organisation to Reinforce dialogue and overcoming obstacles) বিষয়ের উপর বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "সহনশীলতার মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুশীলন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কার্যকর সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যকে জানা সবচেয়ে বড় কথা। সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে এই জানাজানির বিস্তার সম্ভব।" এই ক্ষেত্রে ফাদার ইকোনো বর্তমান উন্নত গণ-মাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন। অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন, কালচার অব পীস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মি. ফেডেরিকো মেয়র জারাগোজা 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সংলাপ এবং এর প্রভাব' বিষয়ের উপর তার বক্তব্য পেশ করেন। মি. জারাগোজা ইউনেস্কোর সাবেক ডাইরেক্টর

www.pathagar.com

জেনারেল। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য পরস্পরকে বোঝা দরকার, পরস্পর পরস্পরকে জানা দরকার, দরকার পারস্পরিক সমঝোতা। এখন আমাদেরকে কথা বাদ দিয়ে বাস্তবতার দিকে ধাবিত হতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা একে অন্যের জ্ঞান শেয়ার করা ছাড়া বাঁচতেই পারি না। আমরা মার্কেট ল'র জন্য মানব প্রজাতির মূল্যবোধ পরিবর্তন করে মারাত্মক ভুল করেছি।" তিনি মন্তব্য করেন, "শুধু আন্তঃধর্ম ডায়ালগ যে প্রয়োজন তা-ই নয়, সমঝোতায় পৌঁছার জন্যে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেও ডায়ালগ দরকার। আমরা যদি সব মানুষকে সমান হিসাবে গ্রহণ করি, আমরা যদি অন্যকে ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে যে সব সমস্যায় ভুগছি, তার সমাধান হয়ে যাবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং গণমাধ্যমের অংগীকার দরকার।"

এদিন সব শেষে অধিবেশনের সভাপতি ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও আর্জেন্টিনার জুইস কংগ্রেসের ডাইরেক্টর রাবিব ক্লাউডিও ইপেলম্যান তার বক্তব্যে বলেন, "পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছার যে জ্ঞান, তার চেয়ে অনেক বড় সংলাপ। সংলাপ সম্পর্কের সৃষ্টি করে, বৃদ্ধি করে জানাজানি ও যোগাযোগ।" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর মাছ, পাখি, গাছ সৃষ্টি করেছেন নানা রকমের, কিন্তু তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন মাত্র একজনই যাতে 'মানুষরা পরস্পর ভাই হয়।"

সম্মেলনের শেষ দিন ১৮ই জুলাই সংক্ষিপ্ত আকারে ৫ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মিসরের 'ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ আহমদ কামাল আবুল মুগিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে 'সহাবস্থান ও ডায়ালগ-কালচারের সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের গুরুত্ব', 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে ডায়ালগের গুরুত্ব' এবং 'সহাবস্থান', 'শান্তি ও ডায়ালগ'- এই বিষয়সমূহের ওপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মিসরের কনসালটেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ডঃ নাবিল লুকা বিবাবী, বৃটেনের 'কো-এক্সিসটেন্স ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর ডঃ জেমস কিডনার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'খৃস্টান-মুসলিম ফর 'পিস'-এর প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম বেকার। ডঃ জেমস কিডনার একটা সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে তার দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করেন। তিনি বলেন, "জ্ঞান ও জানা-জানি থেকে সৃষ্টি হয় 'সম্মানবোধ' এবং এই সম্মানবোধ নিশ্চিতভাবেই একান্ত হৃদয়ের বিষয়। এটা আমাদের ধর্মসমূহ ও সংস্কৃতিরও অন্তরের বস্তু যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ দেখছি। এই সম্মেলনের জন্যে যারা চেষ্টা ও কষ্ট করেছেন, তারা মহৎ। এই সম্মেলন সম্মানের বৃহত্তর ক্ষেত্র তৈরির জন্যে একটা বড় পদক্ষেপ।"

সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন বসে ১৮ জুলাই বেলা ১২টায়। তিনদিন সম্মেলন শেষে প্রণীত ঘোষণা প্রকাশ করা ছিল এই অধিবেশনের মুখ্য বিষয়। ঘোষণা পাঠ করেন ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ আবদুল রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-জায়েদ। ঘোষণা প্রকাশের পর বক্তৃতা করেন অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে 'পনটিফিসিয়াল কাউন্সিল ফর ইন্টাররেলিজাস ডায়ালগ'-এর প্রেসিডেন্ট খৃস্টান নেতা কার্ডিনাল জেন লুইস পিয়েরী তুরাস। সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণ দেন মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ আবদুল্লাহ আল-তুর্কী। তিনি তার বক্তৃতায় স্পেনের রাজা জোয়ান কার্লোস প্রথম ও প্রধানমন্ত্রী জোস লুইস রড্রিগেজ জাপাতেরোকে সম্মেলন সফল করায় তাদের মূল্যবান সহযোগিতার জন্যে প্রশংসা করেন ও তাদের

www.pathagar.com

ধন্যবাদ জানান। তিনি ধন্যবাদ জানান বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দের যারা সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সম্মেলনকে সফল করেছেন। তিনি বলেন, "বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, তারা ভবিষ্যতে পূর্ণ সহযোগিতার সাথে কার্যকরী সব সংলাপে অংশ নেবেন। সকলের এই মনোভাব আজকের বিশ্ব যে সংকটে ভুগছে, তার অবসানে সাহায্য করবে এবং সভ্যতার-সংঘাত-স্লোগানের প্রতিবাদ হিসেবে কাজ করবে। এইভাবেই বিশ্বজনীন সুখ আমরা অর্জন করতে পারবো।"

সমাপ্তি অধিবেশনে তিন পৃষ্ঠার একটা নাতিদীর্ঘ ঘোষণা পাঠ করেন মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সহকারী সেক্রেটারি ডঃ আবদুল রহমান আল জায়েদ। ঘোষণা পত্র সম্মেলনের তিন দিনের আলোচনার সারাংশ নিয়েই তৈরি হয়েছে। এই আলোচনার মধ্যে ছিলো বিভিন্ন ধর্মের নেতা ও বিশেষজ্ঞদের দুই ডজনের মতো মূল্যবান উপস্থাপনা এবং এই উপস্থাপনার উপর ছিলো বহুজনের আলোচনা ও মন্তব্য।

তিন দিনের আলোচনার মূল বিষয় ছিলো দুইটি : মানবজীবনে ধর্মের অপরিহার্যতা এবং পৃথিবীর শান্তি ও সুস্থিতির জন্যে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা। নানাভাবেই বক্তা ও আলোচকরা এ কথা বলেছেন যে, পৃথিবীর আজকের সকল যুদ্ধ-সংঘাতের কারণ নৈতিকতার অভাব ও মূল্যবোধহীনতা। নৈতিকতার অভাব ও মূল্যবোধহীনতা মানব-মনে যে হিংসা-বিদ্বেষ এবং ভোগ-লিপ্সার জন্ম দিয়েছে, তারই বিস্ময় ফল যুদ্ধ-সংঘাত। ধর্মীয় নৈতিক বিধানাবলীর আন্তরিক অনুসরণ ও স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসাই শুধু পারে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সৃষ্টি করতে এবং মানুষের উপর আপাতত যুদ্ধ-সংঘাত বন্ধ করতে। এই লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবেই প্রয়োজন সংলাপের। বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেকার ভুল বুঝাবুঝি ও জানা-শোনার অভাবজনিত অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর মানুষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যুদ্ধ-সংঘাত বাধায়। সংলাপ ধর্মসমূহের মধ্যে জানা-শোনা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে কাছে আনতে পারে এবং এইভাবে স্বার্থবাজদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা যেতে পারে। সংলাপকে সম্মেলনে মানব-জাতির ঐক্যের একটি মাধ্যম হিসেবেও গ্রহণ করা হয়েছে এবং মানবজাতির ঐক্যকে সুন্দর পৃথিবী গঠন এবং মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছে। এদিক থেকে মাদ্রিদ সম্মেলনের মূল সুরকে আমরা তিনটি শিরোনামেও ভাগ করতে পারি : এক, ধর্মের অপরিহার্যতা, দুই, সংলাপের প্রয়োজনীয়তা এবং তিন, মানব-জাতির ঐক্য বিধান। বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজের উদ্বোধনী বক্তব্যেও আমরা এই তিনটি দিককেই প্রধান বিষয় হিসেবে দেখেছি। আর পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামও এই শিক্ষাই দেয়।

মাদ্রিদ ডিক্লারেশন বা মাদ্রিদ ঘোষণাতেও এই কথাগুলোই বলা হয়েছে। মাদ্রিদ ঘোষণার তিন পাতার ইংরেজি সংস্করণে শুরুতেই আট অনুচ্ছেদের একটি ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকায় সম্মেলনের পটভূমি, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সেন্টিমেন্ট, জাতিসংঘ সনদের সাথে সম্মেলনের বক্তব্যের সাজুয্যতা ইত্যাদি বিষয় সামনে আনা হয়েছে। তারপর ১০টি সর্বসম্মত নীতিগত ঘোষণা রয়েছে। এই নীতিগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ৫ দফা সুপারিশ বা লক্ষ্য প্রণয়ন করা হয়েছে। আর এই সুপারিশ বা লক্ষ্যের বাস্তবায়নের জন্যে ৫ দফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মাদ্রিদ ঘোষণার নীতিগত ঘোষণাগুলো এই :

(ক) মূল সৃষ্টিগতভাবেই মানবজাতি একটি একক এবং বর্ণ, জাত, সংস্কৃতি নির্বিশেষে মানুষ সকলেই সমান।

(খ) প্রকৃতিগতভাবে মানুষ ভালো। তাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভালোকে পছন্দ, খারাপকে অপছন্দ করা, সুবিচারের পক্ষ হওয়া ও অবিচারকে প্রত্যাখ্যান করার মতো প্রবণতা দিয়ে। মানুষের এই ভাল প্রকৃতি মানুষকে দয়া ও ধর্ম-বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে।

(গ) খোদায়ী বাণী বা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের লক্ষ মানুষকে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যশীল করা এবং মানুষের জন্য সুখ, সুবিচার, নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা। খোদায়ী এই বাণী চায় মানুষের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা এবং দূর করতে চায় জাত, বর্ণ, ভাষাগত বৈষম্য। এই বাণীরই উদ্দেশ্য জ্ঞান ও বিনয়ের মাধ্যমে সত্যের প্রচার এবং চরমপন্থা ও সন্ত্রাসের প্রত্যাখ্যান।

(ঘ) ঐশ্বরিক ধর্মসমূহকে সম্মান করা, তাদের মর্যাদা রক্ষা করা, সেগুলোর প্রতীকের অবমাননার প্রতিবাদ করা এবং জাতিগত বৈষম্যের প্ররোচক হিসাবে ধর্মের ব্যবহারকে প্রতিরোধ করা।

(ঙ) শান্তি রক্ষা করা, চুক্তি-সমঝোতাকে সম্মান করা এবং মানুষের অধিকার, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারকে মানুষের মধ্যে সুসম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা। এই লক্ষ্য অর্জন সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান লক্ষ্য।

(চ) সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিভাগ এবং মানুষ এসবের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়া স্রষ্টারই ইচ্ছা এবং মানুষের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির একটা মাধ্যম।

(ছ) অপরাধ, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং পরিবার ব্যবস্থা ও সমাজকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা এবং মানুষকে স্রষ্টামুখী করতে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা অপরিহার্য।

(জ) পরিবার সমাজের কেন্দ্রবিন্দু এবং মানব সমাজের মৌলিক একক। নিরাপদ ও স্থিতিশীল সমাজের জন্যে পরিবারকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা জরুরি।

(ঝ) সংলাপ মানব জীবনের একটা অপরিহার্য বিষয়। সংলাপ একে অপরকে জানা, সহযোগিতা, সত্যের উপলব্ধি, পারস্পরিক প্রয়োজনের বিনিময়ের জন্য অপরিহার্য।

(ঞ) পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অন্যান্য বিপদ ও দূষণ থেকে প্রতিবেশকে রক্ষা ধর্ম ও সংস্কৃতির একটা লক্ষ্য। মাদ্রিদ ঘোষণা এই নীতিগত ভিত্তির উপর ৫টি সুপারিশ বা উদ্দেশ্যকে দাঁড় করিয়েছে। সুপারিশ বা উদ্দেশ্যগুলো হলো :

(ক) সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও সংঘাত সৃষ্টির এই আহ্বানের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করা।

(খ) সাধারণ মানবিক মূল্যবোধকে বৃদ্ধি করা, সমাজে এর প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করা এবং একে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন সমস্যাবলির সমাধান করা।

(গ) সহনশীলতা-সংস্কৃতির বিস্তার এবং সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা সৃষ্টি করা যাতে সম্মেলন, সেমিনারসহ সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও গণমাধ্যম বিষয়ক প্রোগ্রামের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটা শক্ত অবকাঠামো গড়া সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

(ঘ) আদর্শিক নীতিমালা ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে ধর্ম ও সংস্কৃতিসমূহের অনুসারিরা সংলাপের একটা আন্তর্জাতিক গাইড লাইনের ব্যাপারে একমত হওয়া, যা বিশ্ব সমাজের স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালি করবে এবং সব মানুষের সমৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক হবে।

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর (এনজিও) প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য কাজ করা, যাতে তারা এমন একটা দলিল প্রণয়ন করে যা ধর্মসমূহ, তাদের প্রতীকের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করে, অসম্মান নিষিদ্ধ করে এবং যারা অসম্মান প্রদর্শনের মত কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়।

মাদ্রিদ ঘোষণার উপরোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নলিখিত ৫টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে :

(ক) সংলাপের বাধা হতে পারে এমন সমস্যা সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং সংলাপের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করার অন্তরায় হতে পারে এমন বিষয়সমূহ দূর করার পথ বের করতে একটি টিম গঠন। এই টিম সংলাপ সংক্রান্ত অন্যান্য বডির সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

(খ) আদর্শিক মূল্যবোধের উজ্জীবন, মহৎ সামাজিক কাজসমূহকে উৎসাহ দান এবং যৌন-বিপথগামিতা ও পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা ও এ ধরনের অন্যান্য অপরাধের প্রতিরোধ-লক্ষ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা বিষয়ক ও গণমাধ্যম সংক্রান্ত সংস্থা-সংগঠনের মধ্যে সহযোগিতা।

(গ) আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসংস্কৃতি মিটিং অনুষ্ঠান, গবেষণা পরিচালনা, গণমাধ্যম সংক্রান্ত কর্মসূচি তৈরি এবং শান্তি, সমঝোতা ও সহাবস্থান-অভ্যাসের বিস্তারের জন্য ইন্টারনেট ও অন্যান্য মাধ্যমের ব্যবহার।

(ঘ) গণমাধ্যম কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিষয়ক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ও যুবকদের মধ্যে ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি বিষয়ে সংলাপে সাহায্য-সহযোগিতা।

(ঙ) মাদ্রিদ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত-সুপারিশের প্রতি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সমর্থন দানের আবেদন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটা বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে এই সম্মেলনের সুপারিশ-সিদ্ধান্তসমূহকে গ্রহণকরতঃ আন্তঃধর্ম, আন্তঃসভ্যতা ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপকে অগ্রসর করানোর জন্য জোর আহ্বান। হারামাইন শরিফাইনের খাদেম বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজের প্রতি এ সম্মেলনের অনুরোধ তিনি যেন তার প্রভাব কাজে লাগিয়ে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট 'বডি'সমূহের সাথে যোগাযোগ করে এই অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করেন। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সদস্যের মাধ্যমে জাতিসংঘের সেই সম্মেলনে যোগ দিতে পারলে এই সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীগণ খুশী হবেন।

মক্কা সম্মেলনের ঘোষণার মত মাদ্রিদ সম্মেলনের ঘোষণাও ঐতিহাসিক। এই ঘোষণা পৃথিবীর সব ধর্মের, সব ধর্মীয় দর্শনের একটা সম্মিলিত আহ্বান। পৃথিবীর যুদ্ধ-সংঘাত, অশান্তি-অনাচার, বিপদ-বিপর্যয় সবকিছু মোকাবিলায় ধর্মের সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা, পৃথিবীর মানব-প্রজাতির ঐক্য-সংহতি, সহযোগিতা-সমঝোতার দুরূহ কাজ একমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই সম্ভব, এই বিষয়টি মাদ্রিদ সম্মেলন তার ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে উদাত্ত কণ্ঠে তুলে ধরেছে। এটা মাদ্রিদ সম্মেলনের ঐতিহাসিক সাফল্য।

www.pathagar.com

এমন সফল সম্মেলন অনুষ্ঠানে মাদ্রিদ সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীগণ সউদি আরবের বাদশাহ আব্দুল্লাহ এবং তার দেশ সউদি আরবের প্রতি অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। এর সাথে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তির ধর্ম ইসলামও অংশগ্রহণকারী ও বিশ্বমিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। একশ্রেণীর বৈরী মিডিয়া সউদি আরব ও সউদি আরবের বাদশাহ আব্দুল্লাহর আন্তরিকতার মধ্যে ছিদ্র খোঁজার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। বাদশাহ আব্দুল্লাহর অত্যন্ত বাস্তবমুখী উদ্বোধনী বক্তৃতা তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে সহায়ক হয়েছে। ইউরোপের কোন কোন মিডিয়া বাদশাহ আব্দুল্লাহ এই সম্মেলন কেন স্পেনে করলেন তার উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করেছে। এর একটা সুন্দর জবাব দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থা 'The Associated Press' তার ১৬ জুলাই-এর রিপোর্টে লিখেছে, " স্পেনকে সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত করা হয় ঐতিহাসিক একটা প্রতীক বা মেসেজকে সামনে রেখে। এই মেসেজ হলো, স্পেন এমন একটি দেশ যেখানে অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম, ইহুদী ও খৃস্টানরা ইসলামী শাসনের অধীনে শান্তির সাথে বসবাস করেছে (Spain was chosen as the conference site, because of its historical symbolism as a place where Muslims, Jews and Christians lived in relative peace under Islamic rule from 8th to the 13th Centuries)। এটাই যদি কারণ হয়, তাহলে এর চেয়ে সত্য কথা, এর চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কিছু নেই। আন্তঃধর্ম সংলাপের সম্মেলন এমন দেশেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। সম্মেলনের পর আমি যখন কর্ডোভা ও গ্রানাডা সফর করি, তখন এই অতীতের কথাই আমার বারবার মনে পড়েছে। সউদি আরব এবং সউদি আরবের মহান বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তাঁরা সম্মেলনটি স্পেনে অনুষ্ঠান করে পৃথিবীর মানুষকে ইসলামী শাসনের একটি সোনালী অতীতকে স্মরণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই স্মরণ আমার জন্য কষ্টের হয়েছে। কর্ডোভার বিপদগ্রস্ত মসজিদ এবং গ্রানাডার শূন্য প্রাসাদ আল হামরার দিকে তাকাবার সময় এই কষ্ট আমাকে অশ্রুসিক্ত করেছে।

৮, ৯, ১০ আগস্ট, ২০০৮

ওয়ান-ইলেভেনের পূর্বাপর দৃশ্যপট

তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সরকারের মত আচরণ করছে। সেদিন সকালে উঠেই একটা খবরের উপর চোখ পড়ার পর নতুন করে এই কথাটা মনে পড়ল। শিক্ষা সচিব ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশনের চারজন সদস্যকে পদত্যাগ করতে বলেছেন। খবরটি পড়েই বুঝা গেল, শিক্ষা সচিবের কথা আসলে শিক্ষা সচিবের নয়। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন উপদেষ্টা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথাই উচ্চারণ করেছেন। এই খবর পড়ে মনে যে কথাটা সর্বপ্রথম এল, তাহলো দুর্নীতি দমনে নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দ্বারা মনে হয় একটা দুর্নীতি বা অনৈতিক কাজ সংঘটিত হলো। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশন একটা সম্মানিত সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মত ক্যালিবারের ব্যক্তিবর্গ এর সদস্য হন এবং সরকারই তাদেরকে একটা মেয়াদের

www.pathagar.com

জন্য নিয়োগ করেন। কোন ধরনের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার মত অপরিহার্য কারণ সৃষ্টি না হলে এই সম্মানিত লোকরা তাদের স্বপদে বহাল থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিকতাকে পদপিষ্ট করেই শিক্ষা সচিব তাদেরকে পদত্যাগ করতে বলেছেন। (পরবর্তী খবর হলো তাঁরা পদত্যাগ করেছেন)। এই বলাটা অনৈতিক হয়েছে এবং যাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তাদের উপর বিনা দোষে অপরাধ আরোপ করা হয়েছে। আনন্দের বিষয় এই অপরাধ আরোপের ব্যাপারটা ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশনের উক্ত চার সদস্যের সকলেই বুঝেছেন এবং তাদের অন্ততঃ দুইজন অনৈতিক ও অপরাধ আরোপমূলক কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের একজন ড. মাহবুব উল্লাহ এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে কতকগুলো মূল্যবান কথা বলেছেন, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবগতি পর্যন্ত পৌছা দরকার। ড. মাহবুব উল্লাহ এক সাংবাদিক সাক্ষাতকারে বলেছেন, "আমাদের জানা মতে আমরা কোন দোষ, অন্যায়, অনিয়ম বা দুর্নীতি করিনি। একটাই দোষ হতে পারে তাহলো পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে যে, আমরা জোট সরকারের আমলে নিয়োগ প্রাপ্ত। এই দোষে যদি পদত্যাগ করতে হয়, তাহলে তো ঐ সরকারের আমলে নিযোগ প্রাপ্ত সকলকেই বিদায় করা উচিত। ... আমরা মনে করি, এ সরকার কোন দলের নয়, সৎ লোকদের রক্ষা করা সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকায় দুর্নীতির কথা লিখলেই দুর্নীতি হবে না। জোট সরকার নিয়োগ দিলেই দলীয় লোক হবে না। যখন যে সরকার আসে, সেই সরকারই নিয়োগ দেয়। ... আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। সমাজে আমাদের একটা ইমেজ ও পরিচয় আছে। তাই কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে শোনা উচিত ছিল।" কতকগুলো সংগত ও সত্য কথা এখানে বলেছেন ড. মাহবুব উল্লাহ। ড. মাহবুব উল্লাহর কথাগুলো প্রমাণ করছে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দলীয় প্রপাগান্ডার শিকার হয়েছে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখারও প্রয়োজন মনে করে নি। এইভাবে সংবাদপত্রবিশেষের দলীয় প্রপাগান্ডার কাছে আত্মসমর্পণ করে দলীয় সরকারের মতই অনেক কাজ করা হয়েছে।

এ ধরনের নিয়োগ বাতিল ও পদত্যাগ করানোর ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে। এমনকি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পিএসসির সদস্যদেরও পদত্যাগ করানো হয়েছে। ড. মাহবুব উল্লাহর মত স্পষ্ট কথা বলার সাহস তাদের নেই বলে তাদের কোন কথা শোনা যায়নি। তবে তাদের না বলা কথা ড. মাহবুব উল্লাহর কথার অনুরূপই হবে। স্বায়ত্বশাসিত অন্য যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সে সব প্রতিষ্ঠানেও পদত্যাগের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এমনকি প্রেস কাউন্সিলের মত প্রতিষ্ঠান যেখানে একজন সম্মানিত বিচারপতি দায়িত্বে রয়েছেন, সেখানেও পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে, পদত্যাগের চেষ্টা করানো হয়েছে বিচারপতিকে।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে সংবাদপত্রকে অথবা একশ্রেণীর সংবাদপত্র প্রভাবিত করছে প্রশাসনকে। যাই হোক, এই শ্রেণীর সংবাদপত্র যে এই কাজে অগ্রবাহিনীর কাজ করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো, বলা হয়, খৃস্টান মিশনারীদেরকে অগ্রবাহিনী হিসেবে কাজে লাগাত। কোন দেশ দখল করতে চাইলে সেখানে তারা খৃস্টান মিশনারীদেরকে পাঠাত। খৃস্টান মিশনারীরা গিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতো এবং সেই অজুহাতে ঔপনিবেশিক সৈন্যরা দেশটির উপর আগ্রাসন চালাত। এইভাবেই এখানে স্বার্থবাদী মহল টার্গেট ঠিক করে

www.pathagar.com

তার বিরুদ্ধে একশ্রেণীর পত্রিকার মাধ্যমে প্রপাগান্ডা শুরু করে এবং এই প্রপাগান্ডাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে টার্গেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এমন ব্যবস্থা গ্রহণের এত দৃষ্টান্ত রয়েছে যে সব স্টোরি মিলিয়ে এক মহাকাব্য রচনা হতে পারে। দেখা যাবে এমনকি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদেরও মিডিয়ার মাধ্যমে চরিত্র হনন করা হয়েছে, নিয়োজিত লোকদের দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের মত হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটানো হয়েছে এবং তারপর দায়িত্ব থেকে কিংবা দায়িত্ব নেয়া থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিক থেকে কেয়ারকেটার সরকার গঠনকে ঘিরে যে প্রপাগান্ডা ও আন্দোলন হয়েছে জানুয়ারির ১১ তারিখ পর্যন্ত, সে সময়ে এক শ্রেণীর মিডিয়ার যে ভূমিকা তা সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভিডিও ফুটেজ পরীক্ষা করলেই বুঝা যাবে। কোন কোন পত্রিকার কর্মকর্তারা পরে গর্ব করে বলেছে, আমরাই জরুরি অবস্থা এনেছি। কোন কোন দলও একথা বলেছে। কারও ভুলে যাবার কথা নয়, সার্বিক এক নৈরাজ্যের পটভূমিতেই জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে সেনাবাহিনীকে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে নামতে হয়েছে। সুতরাং নৈরাজ্য সৃষ্টি ছিল দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে এক জঘন্য অপরাধ। কিন্তু একশ্রেণীর মিডিয়া ও কোন কোন রাজনৈতিক দল এই অপরাধকেই গৌরব হিসেবে সরবে প্রচার করছে। আজ দুর্নীতিবাজ, দুরাচারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে, কিন্তু এই নৈরাজ্য সৃষ্টির অপরাধকে শাস্তিযোগ্য মনে করা হচ্ছে না। তাদের অপরাধ গৌরবের বিষয়ে পরিনত হয়েছে এই কারণেই। তার ফলে তারা মানুষের চরিত্র হননের কাজ আগের মতই পুরোদমে চালাতে উৎসাহিত হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত যারা তাদের পছন্দনীয় নয় কিংবা কোন কাজ যা তাদের ইচ্ছা পূরণ করেনি, তার বিরুদ্ধে তারা উঠে-পড়ে লাগছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহু ক্ষেত্রেই এই প্রপাগান্ডার ফাঁদে পড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত নিতেও বাধ্য হয়েছেন। উচ্চ পদের কিছু আমলাসহ বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, পিআইবি, পিএসসি, ইউজিসি এবং এ ধরনের আরও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলরা কিভাবে পদচ্যুত বা পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন, সেদিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি বুঝা যাবে। এখানে আমি ব্যক্তি বড় করে দেখছি না। বড় করে দেখতে চাচ্ছি আমি সিস্টেমকে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা এ ধরনের সংস্থায় সম্মানিত নাগরিক যারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে নিয়োজিত হবেন, কোন অনিয়ম-অন্যায়-অপরাধ না করলে তাদেরকে মেয়াদপূর্ণ করতে দেয়া দরকার। তাদের অসম্মান, অপমান করা উচিত নয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ আমাদের দেশে হয়ে আসছে। কিন্তু এই কাজ চলতেই থাকবে এটা পীড়াদায়ক। বর্তমান অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এই পীড়াদায়ক কাজ কিছু করেছেন এবং করছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমরা চলে আসা খারাপ দৃষ্টান্তের ব্যতিক্রম আশা করেছিলাম।

আবারও বলছি, এই ক্ষেত্রে সরকার একশ্রেণীর পত্রিকার উদ্দেশ্যমূলক প্রপাগান্ডার শিকার হয়েছেন। হতে পারে পার্লামেন্টের অভাবে, রাজনীতিক ও অন্যদের বিভিন্ন মতামত প্রকাশের অনুপস্থিতিতে, সভা-সমিতি বন্ধ থাকার কারণে সরকার পত্র-পত্রিকাকে পার্লামেন্টের মর্যাদা দিয়েছে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতকে খুবই মূল্য দিচ্ছেন। সরকারের এই মনোভাব খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু পত্র-পত্রিকাকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, সেই মর্যাদার মান অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পত্রিকাঅলারা রাখছি না।

www.pathagar.com

অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থ, নীতি ও আইনের স্বার্থের চেয়ে হঠকারী স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এক শ্রেণীর পত্রিকার এই ভূমিকা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাভাবিক অগ্রসরতাকে বাধাগ্রস্ত করছে, প্রভাবিতও করছে। একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি বহুল আলোচিত সাংবিধানিক একটি প্রতিষ্ঠান পিএসসি'কে সামনে আনতে চাই। পিএসসি'কে সরকার পুনর্গঠিত করেছেন। পিএসসি'র কোন কোন সাবেক সদস্যের বিরুদ্ধে আর্থিক অনাচারের গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। অপরাধীরা কঠোর শাস্তি পাক, এটা আমরা চাই। কিন্তু পিএসসি এবং বিসিএস-২৭ নিয়ে এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা যতটা হৈ চৈ করেছে, একে যতটা রাজনৈতিক রং দেয়া হয়েছে, তা সদিচ্ছা প্রণোদিত নয়। তাদের কথা-বার্তা শুনে মনে হয়েছে, পিএসসি'তে অবাক হওয়ার মত নতুন কিছু ঘটেছে। কিন্তু তারা তো ভালো করে জানেন, বিসিএস-২৭ নিয়ে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা অতীতেরই ধারাবাহিকতা। এই নিন্দনীয় ধারাবাহিকতার কুৎসিত যাত্রা শুরু হয় স্বাধীনতার পর বিসিএস-এর বহুল কথিত তোফায়েল ক্যাডার দিয়ে। যোগ্যতা নয়, রাজনৈতিক বিচারে এই ক্যাডার গঠিত হয়। তারপর বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেনি এমন সৌভাগ্য কি আমাদের খুব বেশি হয়েছে? সেশন জটের মত অনেক বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে জট সৃষ্টি হয়। শেখ হাসিনার শাসনামলের বিসিএস-২৩-এর কিছু সমস্যার গ্রন্থিমোচন এখনও হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এক সরকারের আমলের বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী সরকার প্রশ্ন তুলে আসছে, ঠিক পাল্টাপাল্টি ব্যাপারের মত? বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বর্তমান নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারও একই কাজ করলেন। নিন্দনীয় ধারাবাহিকতার ছেদ ঘটবে আশা করা হয়েছিল, তা আর হলো না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়তো এমনটা চাননি। কিন্তু এক শ্রেণীর পত্রিকার কোটারী স্বার্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিসিএস-২৭-এর ব্যাপারে নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেও পারেনি। পত্র-পত্রিকার অপপ্রচারের মধ্যেও সরকার বিসিএস-২৭ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন। জনকণ্ঠ ১৫ই জানুয়ারী-০৭ সংখ্যায় লিখে যে, ছাত্রদল ও শিবিরপন্থীদের ঢালাও নিয়োগ দেয়ার তোড়জোর চলছে বিসিএস-২৭-এর মাধ্যমে। এমন অপপ্রচার উপেক্ষা করেই ২২শে জানুয়ারী, ০৭ তারিখে বিসিএস-২৭-এর ফল প্রকাশ করা হয়। বিসিএস-২৭ বাতিলের প্রোপাগান্ডা চলতেই থাকে। ৪ঠা মার্চ, ০৭ সংখ্যা সমকাল হতাশ হয়ে লিখে যে, বহাল থাকছে বিতর্কিত ২৭ বিসিএস। ২৫শে মার্চ (০৭) আরেকটি পত্রিকা লিখলো, বিসিএস-২৭ বাতিল করুন। ৪ঠা এপ্রিল একটা পত্রিকা কর্তৃপক্ষীয় সূত্রের বরাত দিয়ে জানাল, ২৭ বিসিএস বাতিল হচ্ছে না। কিন্তু সরকার ঝড়ের মুখে তার অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। এপ্রিলের ৮ তারিখে (০৭) বিএিস-২৭ বিষয়ে তদন্তাদেশের খবর প্রকাশিত হলো। আর এর ১১ দিনের মাথায় জানা গেল (১৯/০৪/০৭) সরকার বিসিএস স্বাথ্য পরীক্ষা স্থগিত করেছেন এবং এর কয়েকদিন পর বিসিএস-২৭ মৌখিক পরীক্ষাও বাতিল করা হলো। এর মাধ্যমে সরকার বিসিএস-২৭ বাতিল দাবির আংশিক পূরণ করলেন। এইভাবেই সরকারের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ পত্রিকার রিপোর্টের দ্বারা। গত ৫ বছরে জামায়াত লক্ষাধিক একর অর্পিত সম্পত্তি গ্রাস করে বলে অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাতের গবেষণাপত্রের একটি নিউজ ছাপে জনকণ্ঠ। দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়টি

www.pathagar.com

টেকআপ করার কথা। কিন্তু তার আগেই খোদ প্রধান উপদেষ্টার অফিস থেকে তড়িঘড়ি করে জেলা ও উপজেলায় চিঠি পাঠিয়ে এ বিষয়ে সরকারী প্রতিবেদন চাওয়া হলো। পত্রিকার রিপোর্টকে এই গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টা খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু প্রধান উপদেষ্টার মত সর্বোচ্চ অফিসের উচিত ছিল বিষয়টি জেলা-উপজেলায় ছড়িয়ে দেয়ার আগে আবুল বারাকাতের গবেষণাপত্রটি একবার দেখার। একটু যাচাই না করে দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী অফিস বিষয়টি নিয়ে তড়িঘড়ি এ্যাকশনে যাওয়ায় কিছুটা হলেও অপমানবোধ করেছে জামায়াতে ইসলামী। পত্রিকা বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অনেক ক্ষেত্রে এভাবেই অনাকাঙ্খিত পথে পরিচালিত করেছে।

এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টার একটি বক্তব্যকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলতে চাই। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একটি চ্যানেলে একজন উপদেষ্টার বলা সেই বক্তব্যের সারকথা হলো, আমরা এত কাজে জড়াতে চাইনি। বড় বড় কিছু দুর্নীতিবাজকে শক্তি দেয়ার মত কিছু কাজ করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পত্র-পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীদের নানা পরামর্শ ও মতামত আমাদের কাজের আওতা বাড়িয়ে দিয়েছে। উপদেষ্টা মহোদয় যা উপলব্ধি করেছেন, সে ধরনের উপলব্ধি আমাদেরও। টেলিভিশন চ্যানেলের একটা টক শো'তে একজন আলোচক বলেছিলেন, দুর্নীতিবাজ ধরার, কালো টাকা উদ্ধারের যে চালুনী তার ফুটো কত বড় হবে, কিংবা কত ছোট থাকবে, তা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। অনুরূপ কথা বলেছেন নতুন রাজনৈতিক দল পিডিপি'র নেতা ফেরদৌস আহমদ কোরেশিও। চালুনীর এই ফুটো নির্ধারণের ব্যাপারটা আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিক বহু প্রকারের রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 'কোটিপতি' থেকে 'হাজারপতি' সকলেই। দুর্নীতি ও কালো টাকার অভিযোগে যদি এদের সকলকেই ধরা হয়, তাহলে খুব কম ব্যবসায়ী এবং খুব কম লোকই অক্ষত থাকবে। গত ৭ এপ্রিলের একটা লেখায় আমি বলেছিলাম, "দুর্নীতির শেকড় সমাজের আপাদমস্তক বিস্তার লাভ করেছে। রাজধানীর সর্বোচ্চ বিল্ডিং-এর মালিক থেকে গ্রামের ক্ষুদে মাতব্বর পর্যন্ত এর বিস্তার রয়েছে। অবৈধ স্থাপনা ভাঙতে গিয়ে আজ যেমন রাজধানীর র‍্যাংগস বিল্ডিং থেকে গ্রামের রাস্তার পাশের কাঁচা স্থাপনা পর্যন্ত হাত দিতে হয়েছে, তেমনি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত ও আত্মসাৎকৃত টাকায় হাত দিতে গেলে সমাজ-কাঠামোতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হবে। বিলিয়ন টাকার পুঁজি থেকে গ্রামের পেটি ফ্যাক্টরির পুঁজিতেও কালো টাকা পাওয়া যাবে। দেশে যে হাজারো মিলিওনিয়ারের সৃষ্টি হয়েছে তার সিংহভাগই কালো টাকার ফল। দেখা যাবে গত আড়াই দশকে বেসরকারী বিনিয়োগ খাতে অর্থনৈতিক বাস্তবতার চেয়ে বেশি অর্থের আগমন ঘটেছে। ১৯৮০-৮১ সালে স্থাবর সম্পদসহ বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৪ হাজার ৫শ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯০-৯১ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৪৭ হাজার মিলিয়ন টাকা। আর এর সাত বছর পর ১৯৯৮-৯৯ সালে এই অংক গিয়ে দাঁড়ায় ৪৪ লাখ ৬৬ হাজার মিলিয়ন টাকায়। হতে পারে এর বৃহত্তর অংশই কালো টাকা। আমাদের বিনিয়োগ অবয়ব, শিল্প অবয়ব ও ব্যবসায় অবয়বকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসতে এই কালো টাকার বড় অবদান রয়েছে। এই অবস্থায় দুর্নীতি ও কালো টাকার বিরুদ্ধে যুক্তির বাইরে অভিযান পরিচালিত হলে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের ক্ষেত্রে যেমন র‍্যাংগস বিল্ডিং থেকে গ্রামের রাস্তা-ঘাটের পাশের কাঁচা

www.pathagar.com

স্থাপনা ধসে পড়ছে, তেমনি দুর্নীতি ও কালো টাকা ধরে টান দিলে রাজধানী থেকে গ্রাম্যবাজার পর্যন্ত বর্তমান বিনিয়োগ অবয়ব, শিল্প অবয়ব ও ব্যবসায় অবয়ব ভেঙ্গে পড়বে। দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের গায়ে হাত দিতে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্প্রতি এর কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জেনারেল (অবঃ) মতিন কয়েকদিন আগে এক ব্রিফিং-এ বলেছেন, দুর্নীতি ও অর্থনীতি এক জিনিস নয়। দুর্নীতি দমন অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। তাঁর কথা ঠিক দুর্নীতি অর্থনীতির অংশ নয়। কিন্তু দুর্নীতিজাত অর্থ যখন অর্থনীতির টপ টু বটম বিনিয়োগ, শিল্প ও ব্যবসায় অবয়বের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, তখন অর্থরূপে রূপান্তরিত দুর্নীতি অর্থনীতি থেকে আর বিচ্ছিন্ন থাকে না।

এক কথায় আমি বলতে চাচ্ছি দুর্নীতি উচ্ছেদ ও কালো টাকা উদ্ধারের ক্ষেত্রে চালুনির ফুটো কত বড় হবে কিংবা কত ছোট হবে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেই দেখা যাচ্ছে। নেই বলেই সরকারের যাত্রা অনির্দিষ্ট এবং এই কারণেই একজন উপদেষ্টাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, তারা যতদূর যেতে চাননি, পত্র-পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীরা তাদেরকে ততদূর নিয়ে গেছে। বড় বড় যে ইস্যু আজ সরকারকে বিব্রত করছে বেশি, দেশের পরিস্থিতিকে অস্থির করেছে বেশি, তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাইরে থেকে আমদানি হয়েছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসেছে ১১ জানুয়ারি '০৭ তারিখে। আর লন্ডনের ফাইনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকায় ১৭ জানুয়ারিই লেখা হয় বাংলাদেশের দুই শীর্ষ রাজনৈতিক নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে দল রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে বিদেশ পাঠানো হচ্ছে। লন্ডনের ফাইনান্সিয়াল টাইমসের পর এ দেশেরও একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা এই ইস্যুকে সামনে এগিয়ে নেবার জন্য নানারকম উস্কানি শুরু করে। গোপনে এক শ্রেণীর রাজনীতিকরাও এতে ইন্ধন যোগায় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের লক্ষ্য ও কার্যক্রমকেও তারা প্রভাবিত করে। একজন উপদেষ্টা পরবর্তীকালে এ কথা পরিষ্কার জানান যে, একশ্রেণীর রাজনীতিকই চেয়েছিল দুই শীর্ষ নেত্রীকে দেশের বাইরে পাঠানো হোক। টিআইবি যেমন করে সংবাদপত্রের নিউজের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে অভিহিত করেছে, ঠিক তেমনি একশ্রেণীর পত্রিকা ওয়ান-ইলেভেন-উত্তরকালে পাল্টা-পাল্টিভাবে দুর্নীতি চিহ্নিতকরণের যে অভিযান শুরু করে, তার প্রবল ঢেউ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতকে অব্যাহতভাবে লম্বা হতে বাধ্য করেছে। এই কারণেই চালুনির ফুটো নির্ধারণের উপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি।

এই সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা কারা? দেখা যাবে এরা সেই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী, যাদের সৃষ্ট নৈরাজ্য থেকে দেশকে রক্ষার জন্য দেশে জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়। এরা বিচারপতি কে এম হাসানকে অপমান করেছে, তাকে অবরোধ করেছে এবং এরাই বিচারপতি আজিকের চরিত্র হনন করেছে। এরা সম্মানিত প্রেসিডেন্টকেও অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করেছে। এরাই হাইকোর্টের রায়ের ভাষায় বিচারপতি ফয়জীর 'সিভিল ডেথ'-এর জন্য দায়ী। এদের আরও পরিচয় হলো, এরা দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে। একটা জাতির আত্মবিশ্বাস নির্ভর করে জাতীয় নেতৃত্বের ঐতিহ্য ও শক্তিমত্তা এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ওপর। একটি দেশের

www.pathagar.com

রাজনীতিকরা যদি ব্যর্থ ও অযোগ্য আখ্যা পান, ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি যদি রাজধানী থেকে গ্রামের হাট পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়, আমলাদের যদি অবিশ্বস্ত ও সুযোগ-সন্ধানীরূপে পরিচিত করানো হয়, তাহলে সে জাতির আত্মবিশ্বাস কিভাবে থাকতে পারে? এ ধরনের রাষ্ট্রকেই আজ ব্যর্থ রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হচ্ছে। ঐ শ্রেণীর সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা এই লক্ষ্যেই বিভেদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং দেশের সম্মানী মানুষদের পাইকারীহারে চরিত্র হননের নীতি অনুসরণ করছে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই নৈরাজ্য চিন্তার বিরুদ্ধেই এক মূর্ত প্রতিবাদ। অবস্থানগত প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নানা কাজে হাত দিতে হয়েছে, বিস্তৃততর করতে হয়েছে তার প্রতিষেধক থাবাকে। কিন্তু সরকার তাদের লক্ষ্য সীমা সম্পর্কে আমি মনে করি অবশ্যই সচেতন আছেন। একজন উপদেষ্টা সম্প্রতি বলেছেন যে, গোটা দেশের দুর্নীতি দূর করা তাদের কাজ নয়। তারা বড় বড় কিছু কাজ করবেন এবং কাজ করার পথ করে যাবেন। পরবর্তী রাজনৈতিক সরকার এই কাজ অব্যাহত রাখবেন। এটাই গণতান্ত্রিক রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়ম। দুর্নীতি দমন ও কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারটা কোন টাইম ফ্রেমের মধ্যে আটকানোর মত নয়। এটা একটা চলমান প্রসেস। দেশ চালাবেন যে রাজনীতিকরা তাদেরই এটা কাজ। এ কাজ তাদেরই করতে হবে। এ কাজ তারা করতে পারবেন। আমি মনে করি, ওয়ান-ইলেভেনের আগের রাজনীতি এবং ওয়ান-ইলেভেনের পরের রাজনীতি অবশ্যই এক হবে না। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর প্রেসিডেন্ট বুশ যেমন বলেছিলেন, টুইন টাওয়ারের আগের পৃথিবী এবং টুইন পরের পৃথিবী কোন দিনই আর এক হবে না। সেই অর্থেই আমাদের ওয়ান-ইলেভেনের পরের রাজনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন আসবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে ২০০৬ সালের শেষ অর্ধে যে আন্দোলন হয়েছে এবং ২৮ অক্টোবর, ২০০৬ থেকে সে আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা গণতান্ত্রিক রাজনীতির সকল নর্মস পদদলিত করে সন্ত্রাসে রূপ নিয়েছিল। যেসব রাজনীতিক এই সন্ত্রাসে অংশ নিয়েছিল, যেসব সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী একে উস্কে দিয়েছিল এবং যেসব আমলা এতে বিভীষণের ভূমিকা পালন করেছিল, তারা রাজনীতি নয় সন্ত্রাস করেছে। ওয়ান-ইলেভেন যদি নাও আসত, তাহলেও পরবর্তী রাজনীতি অনেকখানিই পাল্টে যেত, পাল্টাতে হতো। এই কাজ দলীয় রাজনীতির জন্য কঠিন হতো বটে কিন্তু একটা কিছু না করে উপায় ছিল না। যে কাজটা রাজনীতিকদের করতে হতো, সেই কাজ ওয়ান-ইলেভেন করছে আরও সুন্দর, আরও কার্যকর ও আরও সর্বাত্মকভাবে। রাজনৈতিক সরকারের আমলে র‍্যাবের অভিযান যে রূপ দক্ষতার সাথে সন্ত্রাস নির্মূল করেছিল, সেভাবেই হয়তো র‍্যাব কিংবা অনুরূপ কোন বাহিনীকে রাজনৈতিক সরকার দুর্নীতির মূলোচ্ছেদেও নিয়োগ করতো (যার ইঙ্গিত বেগম জিয়া তার ক্ষমতা ত্যাগকালিন বিদায় ভাষণে দিয়েছিলেন)। র‍্যাংগস, বসুন্ধরা গ্রুপের মত রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের কাঁধে সওয়ার 'অল-পাওয়ারফুল' ব্যবসায়ীদের শোষণের সৌধকে ধুলিসাৎ করা হয়তো এর দ্বারা সম্ভব হতো না। এই মহাকাজ ওয়ান-ইলেভেন করেছে। এদিক থেকে ওয়ান-ইলেভেন শুধু সময়ের দাবি নয়, রাজনীতি ও রাজনীতিকদের সজ্ঞানে ফিরিয়ে আনার শক-ওয়েভই শুধু নয়, আল্লাহর প্রবল একটা হস্তক্ষেপ হিসেবেই এটা এসেছে। আমি মনে করি ওয়ান-ইলেভেনের শক ওয়েভ দেশবাসীকে জাগিয়ে দিয়েছে, দেশের

www.pathagar.com

রাজনীতির চলমান অবয়বে একটা ভূমিকম্প এনেছে এবং রাজনীতিকদের চিন্তা-চেতনাকে দিয়েছে প্রবল এক আছাড়। রাজনীতিকরা অবশ্যই এ থেকে শিক্ষা নেবেন এবং পরিশুদ্ধ হবেন। রাজনীতিকদের মধ্যে সংস্কারের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ এরই একটা প্রমাণ। আমি আবারও বলতে চাই, ওয়ান-ইলেভেনের আগের রাজনীতি এবং পরের রাজনীতি এক হবে না। সংস্কারের যে ঢেউ আজ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মী, সমর্থক ও জনগণের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে, তা দেশের রাজনীতিকে অবশেষে নেতা-নির্ভর নয়, নীতি-নির্ভর করেই গড়ে তুলবে। ওয়ান-ইলেভেন থেকে এর যাত্রা শুরু হয়েছে। তবে রাতারাতি আমরা একটা আইডিয়াল কন্ডিশনে যেতে পারবো না। কোন দেশই তা যায়নি। মার্কিন গণতন্ত্রের বয়স দু'শ বছর এবং বৃটিশ গণতন্ত্রের বয়স তিনশ বছর হলেও নির্বাচনে কালো টাকার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এখনও তাদের লড়াই করতে হচ্ছে। গণতন্ত্র আসলে চর্চার মাধ্যমেই বিকশিত হয়, পরিণত হয়ে ওঠে। এই সুযোগ আমাদের গণতন্ত্রে পাওয়া উচিত। আমাদের দেশের মানুষ বৃটিশ ও মার্কিন জনতার চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। দেশের মানুষের প্রতি যদি আমরা নির্ভর করি, তাহলে তাদের কাছ থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গণতন্ত্র আমরা উপহার পেতে পারি। আমি বলতে চাই, ১৯৪৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত কোন নির্বাচনেই আমাদের জনগণ ভুল করেনি। সময়ের প্রেক্ষিতে তারা সব সময় সঠিক রায়ই দিয়ে এসেছে।

আমাদের সেনাপ্রধান যেটা বলেছেন, লাইনচ্যুত ট্রেনকে আবার লাইনে তুলে দিতে হবে। ওয়ান-ইলেভেনের এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। একশ্রেণীর রাজনীতিকের সীমাহীন অর্থ লোভ ও ক্ষমতা লোভ (আওয়ামী লীগ এ পর্যন্ত নির্বাচনে পরাজয় মেনে নেয়ার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিল না) রাজনীতিকে লাইনচ্যুত করেছিল, সে রাজনীতিকে লাইনে তুলে দেয়ার মধ্যেই ওয়ান-ইলেভেনের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। ওয়ান-ইলেভেন নিজেই যেন এক রাজনীতি না হয়ে দাঁড়ায়। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র পাহারাদার সেনাবাহিনী এবার জনগণের শান্তি-স্বস্তি ও গণতন্ত্রেরও পাহারাদারী করেছে। জাতি কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি। দেশ রক্ষায়, দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় সেনাবাহিনীর এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাই জাতির সব সময়ের প্রত্যাশা।

১১ আগস্ট, ২০০৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 984 70338 0012 9